৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

চতুর্দ্দশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

চতুর্দ্দশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

অক্ষয়ানন্দের পারাভেড়া (রসায়ন-বিজ্ঞান)—শ্রীআদীশ্বর ঘটক ৩২০
অথই জলে সাঁতার-খেলা (গল্প)—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ১১১
অরূপ-রতন (নাট্য)—শ্রীমন্মথ রায় এম-এ ৮৯৯
অর্ঘ্য (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর ৭৪৮
অসি ও মসি (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৩৮৬
আগমনী—আশীষ (কবিতা)—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি এল, বি-সি-এস ৬৬৮
আতঙ্ক-নিগ্রহ (আলোচনা)—শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই ৯০৫
আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময় (অর্থনীতি)—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম এ, এফ-আর-ই-এস ২৩৯
আমিনা বিবির আত্মকথা (গল্প)—রায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর ৩৫৩
ইয়োরোপের পত্র (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু এম-এ বার-এট-ল ৭৭৮
উড়ো চিঠি (বড় গল্প)—শ্রীঅনুরূপা দেবী ৬৬০
উৎকল-অভিযান ও খুর্দ্দা-বিদ্রোহ (ইতিহাস)—শ্রীহরিচরণ বসু ১০৩৯
উপন্যাস-কলেজ (গল্প)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল ৯২০
'উপরি' পাওনা (গল্প)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৮৭২
ঋষির মেয়ে (সমালোচনা) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই ৯৪৫
একজামিনের পর (ভ্রমণ-কাহিনী)— শ্রীমিহিরমোহন মুখোপাধ্যায় ৬৪২
ওয়াটার সাইকেল বোট (শিল্প)—শ্রীউমাপতি ঘটক ৬৯১
কটিগণ্ড (চিকিৎসা-শাস্ত্র)—শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল ১০০৪
কয়েকটি কারবারী তথ্য (রঙ্গ ব্যঙ্গ)—শ্রীহরিপদ মহলানবীশ ২১২৯
কলির দাতাকর্ণ (ব্যঙ্গ কবিতা)—শ্রীনন্দি শর্ম্মা ৬৯৫
কবিতা ও কুসুম (কবিতা)—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী ৯২
কবির আত্মস্মৃতিরিতা (আলোচনা)—অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ ৯৬৬
কান্নাহাসি (কবিতা)—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৭৪
কে মোরে চিনিতে পারে ? (কবিতা)—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৫১
কোষ্ঠীর ফলাফল (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৮
খবরের কাগজ (নক্সা)—কপিঞ্জল ৭০৪
খায়বার কাহিনী (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীরমাদাস হালদার বি-এসসি ৫৩৪
খেয়াল-খাতা (রহস্য)—শ্রীরসরাজ বর্ম্মা ৩৫৮
গোস্বামী-বন্দনা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৭৭৭
গ্রামরত্ন ফুলিয়া (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী ৯২৯
চরকা প্রচলনে নারীজাতির কর্ত্তব্য (আলোচনা)— শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ২৬৯
চিতোর (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ৭১১
ছাত্র-স্বাস্থ্য (স্বাস্থ্যনীতি)—শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস ৪৫
জয় (গল্প)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি টি ১৩৮
জয়দেব (জীবন-কথা)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ৫১৯
জয়-পরাজয় (গল্প)—শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি এ ১০০১
জার্ম্মাণী (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্রদেব ১৫৭,৩৩১, ৫০৪, ৬১২
জাবালি (নক্সা)—পরশুরাম ৮৮১
জিনগণ্ড (চিকিৎসা-বিজ্ঞান)—শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল ৩১৭
জীবনের নিত্য স্রোতে (গল্প)—শ্রীভূপতি চৌধুরী ৬৬১
তক্ষশিলা (ভ্রমণ)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এ ৬২২, ৭৬০, ৯৫৪
তিন অঙ্ক (গল্প)—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ৬৮৮
দয়দী (কবিতা)—বন্দে আলী মিয়া ৩৫৭
দাক্ষিণাত্য (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই ৬৫৪
দিক্‌শূল (উপন্যাস)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৯, ৩৫১, ৫৪১, ৬৯২, ৮৬৫, ৯৯২
দিদি (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর ৮০৬
দুর্গামঙ্গল (সা হত্য)—অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ৭২৯
দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি (নক্সা)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০৭
দেশবন্ধুর ব্রত (আলোচনা)— শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ ২০১
দেশের কথা ৫৪৯
দ্বন্দ্ব (উপন্যাস)—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭, ২৭২, ৩৯৭, ৬০০, ৭৭২, ৯৪৯
দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ (জীবন-কথা)—শ্রীসুরজিৎ দাশ ১১২
নান্নুর পথে (কবিতা)—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৫
নিখিল-প্রবাহ (বৈদেশিকী)—শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় ১৯৪, ২৯২, ৫২৬, ৬৯৭, ৮৭৪, ১০২২
নিরুদ্দেশের যাত্রী (কবিতা)—শ্রীবীণাপাণি রায় ৩৭৬
নিশুতি রাতের একতারা (কবিতা) শ্রীহরিধন মিত্র ৯১০
পাথর কাহিনী (গল্প)—শ্রীনিরুপমা দেবী ৭৯৩
পথের শেষে (উপন্যাস)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৬২৮, ৭৩৭, ৯১১
পদব্রজে সুন্দরবন (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীসরোজেন্দ্র গুহ ৮২৭
পল্লীরাণী (গল্প)—শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ ৬৮৮
পাঁকের ফুল (গল্প)—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় ৮১৪
পাকাদেখা (গল্প)—শ্রীনির্ম্মল দেব ৫৯৭
পারসীকগণের গায়ত্রী (দর্শন)—শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য ৩০৬
পাহাড়পুরের স্তূপ (প্রত্নতত্ত্ব)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর ৮৯৯

পুরাতনী (ইতিবৃত্ত)—শ্রীহরিহর শেঠ ২৩, ২৭৬, ৪৪৭, ৬৭৪, ৯০৯
পুস্তক-পরিচয় ৩৪৮, ৫৪৭, ৭২৫
প্রকৃতি-পরিচয় (বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ ৩৮৭
প্রচ্ছদপট ৬৫১, ৯০৪
প্রণাম (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর ৭৯২
প্রথম বাঙ্গালী ৭০৯
প্রথম বাঙ্গালী (আলোচনা)—শ্রীহিমাংশুবালা রায় ২২৫
প্রবাসী (গল্প)—শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী ৬৩৩
প্রার্থনা (কবিতা)—পরশুরাম ৫৫৩
ভাই ফোঁটা (চিত্র)—শ্রীরাধারাণী দত্ত ১০৪৫
ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতি হইল না কেন ? (আলোচনা)—শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী এম-আর-এ-এস ১০০৬
ভারতের লোকসংখ্যা ও নাম দারিদ্র্য (আলোচনা)—অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল ৫১২
ভারতের স্থাপত্য-শিল্প (প্রতিবাদ)—একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ১৪২
ভূমিকম্প (গল্প)—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ১৪৬
ভোরের শিউলী (কবিতা)—শ্রীবীণাপাণি দত্ত, ৬৯৪
মধুলুব্ধ (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর ৬৮৭
মনের মত (গল্প)—শ্রীরেবা দেবী ১১৪
মনের মতন (কবিতা) শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৫৮৪
ময়মনসিংহের মহিলা কৃত্তিবাস (জীবন-কথা)—শ্রীচন্দ্রকুমার দে ২২৭, ৪০১
মসুরীর কথা (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫২
মিলন-পূর্ণিমা (উপন্যাস)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ, ডি-এল ৩১, ২২১, ৪১৩, ৫৫৫
মিশর (ইতিবৃত্ত)—অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পিএইচ-ডি ৩৭
মুক্তির পথ (আলোচনা)—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত ৬৭১
মুর্শিদাবাদ (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী ২৪২, ৪২৩
মোটরে কাশ্মীর যাত্রা (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল ১৭৫, ৫৮৫, ৯৯৪
রক্তকরবী (সমালোচনা)—অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ ৩২০, ৫১৪
রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গীত (আলোচনা)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৮৬
রসকীর্ত্তন (আলোচনা)—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ ৩৭৭
রসতত্ত্ব (দর্শন)—শ্রীঅনিলকুমার বসু এম-এ ২১৭
রাজ্যপালন (রূপক)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি ৮৮০
রামকৃষ্ণ (কবিতা)—শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮
রাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতি (রাষ্ট্রনীতি)—শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম-এ ৪১
রোঁদ (গল্প)—শ্রী অমলচন্দ্র সেন ৫২২
রোবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম (সমালোচনা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ১৫৩
লক্ষহীরা (কথানাট্য)—মন্মথ রায় এম এ ৫৭
লাখটাকা (নাটক)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল ৪৬১
বংশীধারী (কবিতা)—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০১৫
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং ভারতবর্ষের অধোগতি (আলোচনা)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ৩, ৫০১
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ভারতের অধোগতি (আলোচনা)— শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার ৩৪৫
বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর (বিবরণ)—শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ৯৩
বর্ষ বোধন (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ২০০
বাকী-খাজনা (গল্প)—শ্রীনির্ম্মল দেব ১০৪৯
বাজে কথা (আলোচনা)—অধ্যাপক শ্রীগগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ ৭৪৫
বিক্রমাদিত্য ভট্টার্কা (নক্সা)—শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় ১০১৬
বিচারের অধিকার (গল্প)—শ্রীরমাদাস হালদার বি-এসসি ২৮৩
বিভ্রাট (গল্প)—শ্রীসত্যভূষণ সেন ৭২০
ব্যথার পূজা (উপন্যাস)—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯, ২৬১, ৪৪১, ৬০৫, ৭৪৯, ৯৩৬
ব্রহ্ম-প্রবাসের চিত্র (চিত্রাবলী)—শ্রীগণেশচন্দ্র মৈত্র বি-এসসি ৭৫
ব্রাহ্মণ (গল্প)—শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ ৩০১
শরৎ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৫৯৬
শান্তি (গল্প)—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ ১০৩৩
শিল্পের শিক্ষানবীশি (শিল্প-বিজ্ঞান)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-আই-ই-ই ৯১৬
শিশুদের যকৃৎ রোগ (চিকিৎসা-শাস্ত্র)—অধ্যাপক মেজর ভি, বি, গ্রিণ আর্ম্মিটেজ, এম-ডি, এম-আর সি-পি (লণ্ডন), আই-এম-এস ১০০৭
শুভ-বিবাহ (গাথা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৭৫৪
শৃঙ্খল (কবিতা)—শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৭৪
শোক-সংবাদ ৩৬৩, ৭২৪, ১০৫১
শ্রীকৃষ্ণ (সমালোচনা)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই ৩২৮
সঙ্গীত ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৬২০
সঙ্গীত—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ও শ্রীমতী সাহানা দেবী ২৯১, ৭৭০
সমাধিস্থ (গল্প)—শ্রীনির্ম্মল দেব ১০৬
সরলা (গল্প)—শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ ৯০০
সহর (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৮১৩
সাংখ্যে বন্ধনবাদ (দর্শন)—অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ ৯৮৮
সাময়িকী ১৯৮, ৩৬৫, ৭২৭, ১০৫৩
সাহিত্য-সংবাদ ২০০, ৩৭৬, ৫৫২, ৭২৮, ৯০৪, ১০৫৬
সীতারামের শিলালিপি (প্রত্নতত্ত্ব)—শ্রীবিজয়নাথ সরকার বি-এ, সি-ই ৩১৮
সুরভোলা (গান)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১
সুর-হারা (কবিতা)—শ্রীবীণাপাণি রায় ১০৪৮
সেকালের শিক্ষা (মাতৃ মঙ্গল)—শ্রীনির্ম্মলা দেবী ৬৪
স্বরলিপি—শ্রীগুরুবালা দত্তগুপ্তা ৫৪৫
হাইফেন (উপন্যাস)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯, ২৩৪, ৩৮৩
হিমালয় (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচি বি-এ ১৪১, ২২৩, ৬১৯, ৮৪০
হিমালয়ের পত্র (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীশশিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ-এম-এ-ঈ, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন) ১২৫

চিত্র-সূচি

আষাঢ়—১৩৩৩

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা ... ২৩
ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার ভিতরের দৃশ্য ... ২৪
এই হিন্দু মন্দির...হইয়াছিল ... ২৫
চন্দননগরের পুরাতন গির্জ্জা ... ২৬
পাদরি কেরি ও তাঁহার হিন্দু পণ্ডিত ... ২৭
শ্রীরামপুরের পুরাতন উপাসনা-মন্দির ... ২৮
কলিকাতার সেণ্টজন গির্জ্জা ... ২৯
মিলন-মন্দির ... ৩০
বৃহৎ ঘণ্টা ... ৭৫
ভামোর ঘণ্টাকৃতি প্যাগোডা ... ৭৬
থায়েট্ মিওর সর্পাকৃতি প্যাগোডা ... ৭৬
মান্দালয়ের অতুলনীয় প্যাগোডা ... ৭৭
পাহাড়ের উপর ৭১৬ প্যাগোডা ... ৭৭
পেগানের আনন্দ প্যাগোডা ... ৭৮
সে'য়ে ফন্ বুইন্ প্যাগোডা ... ৭৮
টোয়াণ্টে রবার ক্ষেত্রের একটি দৃশ্য ... ৭৯
ভিক্টোরিয়া পার্ক, মিইজান সহরের দৃশ্য ... ৮০
ব্রহ্মরাজ থিব প্রতিষ্ঠিত মঠ, প্রেমের সাধারণ দৃশ্য ... ৮১
মেমিও রাজপথের দৃশ্য টাঙ্গু সহরের দৃশ্য ... ৮২
মেমিও লাট-প্রাসাদ, লাট-প্রাসাদ—রেঙ্গুন ... ৮৩
নঙ ডজী প্যাগোডা, সেণ্টপল বিদ্যালয় ... ৮৪
টাঙ্গু প্যাগোডা, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আশ্রম ... ৮৫
মডেল স্কুল ও ট্রেণিং কলেজ—ত্রিবাঙ্কুর ... ৯৭
ত্রিবাঙ্কুর—মহারাজার আর্ট কলেজ ... ৯৯
ত্রিবাঙ্কুরের স্বর্গীয় মহারাজ ... ১০১
ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী ... ১০৩
ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত টি রাঘবিয়া সি-এস-আই ... ১০৪
ত্রিবাঙ্কুরের মানচিত্র ... ১০৫
উখী মঠ পথে ... ১২৫
বিষ্ণু-প্রয়াগ ... ১২৬
অনন্তের কোলে—যাত্রীর চটী ... ১২৭
বরফের উপরে—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ... ১২৮
বরফের নদী ... ১২৯
বদরী ধাম ... ১৩০
গিরিসঙ্কটে অলকানন্দ ... ১৩১
তুষারের দৃশ্য ... ১৩৩
দড়ির ঝোলা ... ১৩৫
বদরী-পথে চড়াই ... ১৩৭
প্রকৃত শিক্ষা ... ১৫৬
জর্জ্জিয়ান ক'নে, কুসুমসাজে বর্‌কেবার্গের বধূ ... ১৫৭
ষ্ট্যাট্ গার্টের গ্রাম্য জার্ম্মাণ পরিবার, ওয়ার্মের গির্জ্জা সংলগ্ন বাজার ১৫৮
রাইনের মজুর...বিবাহের প্রীতি উপহার ... ১৫৯
বাভেরীয়ার বিচিত্র পোষাক পরা মেয়ের দল ... ১৬০
কৃষ্ণারণ্যের উৎসববেশে সজ্জিতা কৃষকরমণীর দল ... ১৬১
খৃষ্ট-ধর্ম্মের দীক্ষা ... ১৬১
কৃষ্ণারণ্যের গৃহিণীদের নিত্যকর্ম্ম ... ১৬২
রীচেনহলের রাস্তায় অধিবাসীদের নাচ ... ১৬২
কৃষ্ণারণ্যবাসিনীদের খড়ের দড়ি বোনা ... ১৬৩
বাভেরীয়ার পার্ব্বত্য কৃষক পরিবার ... ১৬৩
দু'টি স্কুলের মেয়ে, কৃষ্ণারণ্যের তরুণী ... ১৬৪
শিরভূষা জার্ম্মাণ-জননী ... ১৬৫
কৃষ্ণারণ্যবাসিনী, কৃষ্ণারণ্যের কৃষক দম্পতি ... ১৬৬
শালটেন্‌বার্গের অরণ্য বিদ্যালয়, ধর্ম্মোৎসবের মিছিল ... ১৬৭
রবিবারের পোষাক, পূর্ব্ব প্রাশিয়ার মজুরণীর দল ... ১৬৮
প্রমোদোদ্যান ... ১৭৯
রাইন গ্রামের দৃশ্য, গ্রামের ঝর্ণা তলায় ... ১৭০
বাভেরীয়ান বরবধূ, ... ১৭১
সাইকেল বিহারিণী, রাইন্ নদী-তীর ... ১৭২
কৃষ্ণারণ্যে বিবাহ-উৎসব ... ১৭৩
রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়িবার উদ্যোগ ... ১৭৫
মারী ও কোহালার পথে, ট্রেণ্ট ... ১৭৬
ঝিলামভ্যালি রোড ... ১৭৭
কোহালা—ঝিলামের উপর পুল ... ১৭৮
উরির পর পাহাড় ধ্বসা ... ১৭৮
পাহাড় পথে জল লওয়া, রাওয়ালপিণ্ডি সহরের দৃশ্য ... ১৭৯
রঘুনাথজীর মন্দির—রাওয়ালপিণ্ডি, গড়হি ডাকবাংলা ... ১৮০
গড়াহ ওপারে হাতিয়ান গ্রাম, উরির বাজার ... ১৮১
উরি—ডাকবাংলা ... ১৮২
উরি—ধ্বসা পথ, ডোমেল ... ১৮৩
ওপিনালার উপর পুল ... ১৮৪
শ্রীনগরে পৌঁছানো, শ্রীনগর বজর ... ১৮৬
চেনারবাগ হাউস্ বোটে পৌঁছানো ... ১৮৭
চেনার নালা ... ১৮৮
ম্যাপ ... ১৮৯
অভিনব দৃশ্য ... ১৯৪
কুকুর গোয়েন্দা ... ১৯৫
স্বয়ং-ক্রিয়-সিঁড়ি, অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষুদ্রতম হরিণ ... ১৯৬
কাচনির্ম্মিত নৃত্যশালা, বিদ্যালয়ের বিশ্রাম ব্যবস্থা ... ১৯৭
র‍্যাডিও-সাহায্যে ছবি তোলা ... ১৯৭
৺কেদারনাথ মজুমদার ... ১৯৯

বহুবর্ণ চিত্র

স্বামী বিবেকানন্দ (প্রচ্ছদপট)
রংয়ের রাণী — অতৃপ্ত-আশা
বসন্তের সজ্জা — লালসা

শ্রাবণ—১৩৩৩

মুর্শিদাবাদ—জাফরগঞ্জ—মির্জাফরের সমাধি ... ২৪২
মির্জাফরের বাটীর দরওয়াজা, ... ২৪৩
সিরাজউদ্দৌলার হত্যার স্থান ... ২৪৩
মির্জাফরের দরবার-গৃহ, জগৎশেঠদিগের বাটীর ভগ্নাবশেষ ... ২৪৪
সতী-চৌরা, কাটরার মসজিদের সম্মুখ ... ২৪৫

কাটরার মসজিদের উপাসনা-গৃহ, তোপখানা— ... ২৪৬
কদম রসুল, কদম রসুলের অভ্যন্তরস্থ মেদিনা ... ২৪৭
প্রাচীন সদর.....মঞ্জিল, নিজামৎ কেল্লা ... ২৪৮
বর্ত্তমান নবাবের নূতন.....সম্মুখভাগ ... ২৪৯
হাজার দুয়ারী বা প্যালেস ... ২৪৯
নবাবের.....দিক ... ২৫০
সিরাজউদ্দৌলার.....মেদিন ... ২৫১
ঘড়ী-ঘর ... ২৫২
মুর্শিদাবাদ.....যাইতেছে ... ২৫৩
ইমামবাড়ী ... ২৫৪
চকের নিকটস্থ ত্রিপলিয়া দরজা ... ২৫৫
ষ্টেসনের.....মসজিদ ... ২৫৬
হাজার.....মসজিদ ... ২৫৭
চৌক মসজিদ ... ২৫৮
মুর্শিদাবাদ.....সম্মুখভাগ ... ২৫৯
বাষ্পীয় জাহাজ—'এণ্টারপ্রাইজ' ... ২৭৬
যে দিন.....নগমাগম ... ২৭৭
সেকালের ডাকবাহী ৩ ঘোড়ার গাড়ী ... ২৭৮
সেকালের.....গমনাগমন ... ২৭৯
সেকালের.....গাড়ী ... ২৮০
অভিনব কাচ, নূতন রকমের টেলিফোন ... ২৯২
লুথার.....কীর্ত্তি ... ২৯৩
বৃহত্তম তারকা ... ২৯৩
অভিনব দোলনা ... ২৯৪
চেহারা সাদৃশ্য ... ২৯৫
বাইসাইকেল নৌকা ... ২৯৬
টট্-আংখ আমেনের কফিন ... ২৯৬
হাতের টিপ ... ২৯৭
কলের দ্বারা.....বোতল প্যাক ... ২৯১
৭১ বৎসর বয়সে.....দৌড় ... ২৯৭
ঘোড়ার গ্যাস মুখোস ... ২৯৮
অভিনব আবাস ... ২৯৯
জনমানবহীন বরফদ্বীপ ... ৩০০
জাঁতার পাথরের অভিনব ব্যবহার ... ৩০১
বাভেরীয়ার গ্রাম্য নারী ... ৩৩১
রাইষ্টাগ্, শব যাত্রা ... ৩৩২
ধাত্রীবিদ্যা.....করছে, স্কুলের মেয়েরা ... ৩৩৩
সৈন্য পরিদর্শন, জার্ম্মাণীর ডাক্তারখানা ... ৩৩৪
বার্লিনের লাইপ্‌জিগার ষ্ট্রাসে, চিত্রাঙ্কন ... ৩৩৫
প্রাশীয়ার পার্ব্বণ দিনে, বার্লিন সহরের দৃশ্য ... ৩৩৬
স্কুলের ছাত্রগণ, ছুটীর ঘণ্টায়, ধাত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ... ৩৩৭
জার্ম্মাণ জননী, গির্জ্জার পথে ... ৩৩৮
কলেজের উৎসবে, খোলা মাঠে পড়া ... ৩৩৯
পরিচ্ছন্নতার পরিচয়, বোটে বসে পড়া ... ৩৪০
লাইপ্‌জিগের মেলায়, শিশু ও শিল্পীর দল ... ৩৪১
সভা গৃহের সম্মুখে, বার্লিনের.....চৌমাথা ... ৩৪২
লাইপ্‌জিগের মেলায় ... ৩৪৩
বাজারের পথে, জার্ম্মাণীর কাঁচের কারখানা ... ৩৪৪
খেয়াল খাতা ... ৩৫৮
বাঙ্গালী নারীরা ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গছেন ... ৩৫৯
দেবর্ষি নারদ ঢেঁকিতে চড়ে শূন্যপথ দিয়ে যাচ্ছেন ... ৩৬০
পশ্চিমে নারীরা যাঁতা ঘোরাচ্ছেন ... ৩৬১
সুসভ্যা সুসজ্জিতা নারী ড্রয়িংরুমে বসে চরকা কাটছেন ... ১৬
৺রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর ... ৩৬৩২
৺কুমার বিজনেন্দ্রনাথ রায় ... ৩৬৪
৺নিমাইচরণ বসু ... ৩৬৫
নারী শিক্ষা-মন্দির...চন্দননগর ... ৩৬৯

বহুবর্ণ চিত্র

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই (প্রচ্ছদপট)
বিশ্ব বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
প্রার্থনা
ওস্তাদজির সর্ব্বস্ব
ব্যথা

ভাদ্র,—১৩৩৩

রোসনীবাগ—সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর সমাধি-গৃহ ... ৪২৪
রোসনীবাগ—গণেশের মন্দির ... ৪২৫
বড়নগরের ভাগীরথী-বক্ষে আমাদের তরণী ... ৪২৬
বড়নগর.....শিবমন্দির ... ৪২৭
বড়নগর ভাগীরথী-তীরে একটি শিবমন্দির ... ৪২৭
বড়নগর ঠাকুরবাড়ী ... ৪২৮
বড়নগর ভবানীশ্বর.....মন্দির ... ৪২৯
বড়নগর—রাজরাজেশ্বরী দশভুজা ... ৪৩০
বড়নগর—নাড়ুগোপালের বাড়ী ও শিবমন্দির ... ৪৩১
বড়নগর.....মদন গোপাল ... ৪৩২
রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডী আসন ... ৪৩৩
রাণী ভবানী.....মন্দির ... ৪৩৪
রাণী ভবানীর.....মন্দির ... ৪৩৫
ষোড়বাঙ্গলা.....ভাগ ... ৪৩৬
দয়াময়ী কালী ... ৪৩৭
সাধুর বাগ.....পার্শ্ব, সাধুর বাগ.....মন্দির ... ৪৩৯
কিরীটেশ্বরীর.....ভগ্নাবশেষ ... ৪৩৯
কিরীটেশ্বরীর বর্ত্তমান গৃহ ... ৪৪০
প্রাচীন কলিকাতা ... ৪৪৯
কাষ্টম হাউসের.....স্মৃতিস্তম্ভ, হাইকোর্ট ... ৪৫০
প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাঁসপাতাল ... ৪৫১
পুরাতন রাইটার্স বিল্ডিং ... ৪৫১
অন্ধকূপহত্যার পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভ ... ৪৫২
পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, ডালহাউসী ইনষ্টিটিউট ... ৪৫৩
লাটসাহেবের বাড়ী ... ৪৫৪
ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ—পলাশি গেট ... ৪৫৪
বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিং ... ৪৫৫
এইস্থানে.....ঘটিয়াছিল ... ৪৫৫
টাউনহল ... ৪৫৬
অন্ধকূপ হত্যার পর, দুর্গের.....দৃশ্য ... ৪৫৭
অক্টারলনি মনুমেণ্ট ... ৪৫৮
ফোর্ট.....ব্যারাক ... ৪৫৯
জেনারেল পোষ্ট আপিস ... ৪৬০
ভোজনের পর ... ৫০৪
রুগ্ন ছাত্রদের পাঠশালা ... ৫০৫
গির্জ্জার পথে, লোহা ঢালাই.....হচ্ছে ... ৫০৬
চুরুটের কারখানায় তামাক পাতার পাট ... ৫০৬
বার্লিনের.....ফেরি ... ৫০৭

বেতের চেয়ার তৈরি হচ্ছে, বেত শুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে ... ৫০৭
বেতের চেয়ারের কারখানা, শিক্ষানবীশ.....হচ্ছে, ... ৫০৮
দীর্ঘকাল.....হচ্ছে তামাক.....হচ্ছে, ... ৫০৯
পাঁচটি মেয়ে.....বেরিয়েছে ... ৫০৯
তৈরী পনীর.....হচ্ছে, জার্ম্মাণ চাষী.....বাড়ী ... ৫১০
বিদ্যুতিক.....হচ্ছে ... ৫১১
চার্লস্ হফ্ ... ৫২৭
ব্যায়াম এবং ক্রীড়া আয়ু বৃদ্ধি করে ... ৫২৮
মোটর বাড়ী অভিনব বেশ, ক্ষুদ্রতম বাঁদর ... ৫২৯
এক্সিডেণ্ট বাঁচাইবার উপায় ... ৫৩০
রেললাইন এবং গাড়ী ইত্যাদির মডেল ... ৫৩০
লম্বা জিরাফ, স্বহস্ত নির্ম্মিত নৌকা ... ৫৩১
সাত সমুদ্রের মান চত্র, একাকী সাত সমুদ্র ভ্রমণ, ... ৫৩২
একহাতে ১৩টি বল ... ৫৩২
সার্কাসওয়ালার ফেরামতি, উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ ... ৫৩৩
নির্জ্জনে চিন্তা করা ... ৫৩৩
ভিজা পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া ঘর ঠাণ্ডা রাখা ... ৫৩৫

বহুবর্ণ চিত্র

ডাক্তার রামদাস সেন (প্রচ্ছদপট)
দোটার্না
অবলম্বন
লক্ষ্মণ
রাস

আশ্বিন,—১৩৩৩

আমাদের হাউস-বোট. শিকারা ... ৫৮৫
কাশ্মীরী বাড়ী. ঝিলামের তীরে ঘাট ও বাড়ী ... ৫৮৬
ঝিলাম. চেনার-নালা ... ৫৮৭
শঙ্করাচার্য পর্ব্বত-শিখর হইতে ঝিলামের গতি-দৃশ্য ... ৫৮৮
ডাল-হ্রদ—কমলবন ... ৫৮৯
ডালহ্রদ—ভাসমান ক্ষেত ... ৫৯০
ডাল হ্রদ—গাগ্‌রি বল্, কাশ্মীরী নারীর ধান কোটা ... ৫৯১
চেনার-বাগ, কাশ্মীর ... ৫৯২
উলার হ্রদ ... ৫৯৩
শঙ্করাচার্য্য পাহাড়, শ্রীনগর—প্রাসাদ ... ৫৯৪
ঝিলামের বুকে পঞ্চম সেতু ... ৫৯৫
কাশ্মীরের সাধারণ গৃহের নমুনা ... ৫৯৫
ড্রেস্‌ডেন্ শহর. ন্যুরেম্বার্গ শহরের বাজার ... ৬১২
বার্লিনের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ... ৬১৩
চাষাদের বের হনে তাহাদের সঙ্গী এবং সহচরীরা ... ৬১৩
আঁশের কাপড় বোনা গাছের আঁশ ছাড়ানো ... ৬১৪
মিউনিক্ শহরের এক অংশ, বীথোভেনের জন্মভূমি 'বন্' শহর ... ৬১৫
স্কটওয়াল্ডের সুসজ্জিতা সুন্দরী তরুণী ... ৬১৬
ফ্রাঙ্ক্ ফোর্ট শহরের একদিক ... ৬১৬
উৎসব দিনের বাদকেরা. উৎসব-প্রাঙ্গণে নৃত্যাভিলাষিণীগণ ... ৬১৭
আঁশের পাঁজ. কবি শীলারের বাসগৃহ ... ৬১৮
উটেম্বর্গের প্রাচীন উল্‌ম্ শহর ... ৬১৯
আমিন গাঁর ষ্টীমার, পাণ্ডুঘাট ... ৬৪২
নির্ঝরের.....দিচ্ছে, নংপো, বৃষ্টির পর ... ৬৪৩
বাজারের দিনে, পাইনের মধ্যে ... ৬৪৪
দুইধারে.....নদী, নদীর আর একটী দৃশ্য ... ৬৪৪
বাগানের মধ্যে—বৃষ্টির পর, পথের ধারে.....কুটীর ... ৬৪৫
বাজারের দিনে.....দোকান ... ৬৪৫
কাউন্সিল হাউস, শিলং মোটর ষ্টেশন ... ৬৪৬
মোটর ষ্টেশন. বাজার ... ৬৪৬
বাজারের পথে, কুটীর, পথের ধারে ... ৬৪৭
জামাতুল্লার প্রসিদ্ধ দোকান, লাবাণের দৃশ্য ... ৫৪৮
নদীর শেষ পরিণাম, পুলিশ বাজার ... ৬৪৯
পাহাড়ের মাঝে, ওয়ার্ড লেক—শিলং ... ৬৫০
প্যারেডের দৃশ্য, পার্ব্বত্য নদী ... ৬৫০
টেলিগ্রাফ আপিস, প্রকৃতির কোলে ... ৬৫১
ঋষির পল্লী, পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য ... ৬৫২
খাসিয়াদের.....প্রতিযোগিতা, উপত্যকার মাঝে, ... ৬৫৩
বাজারের দৃশ্য ... ৬৫৪
হুগলী নদী ... ৬৭৫
হেষ্টিংস ঘাট ... ৬৭৬
জগন্নাথ মন্দির—মাহেশ ... ৬৭৭
বারাকপুর পার্ক হইতে শ্রীরামপুর ... ৬৭৮
দিনেমার গভর্ণরের বাটী. শ্রীরামপুরের গির্জ্জা ... ৬৭৯
শ্রীরামপুর কলেজ, ডাক্তার কেরির সমাধিস্তম্ভ ... ৬৮০
নিস্তারিণী —কালী মন্দির, নিমাই তীর্থের ঘাট ... ৬৮১
শ্রীশ্রীশ্রীনিস্তারিণী কালী ... ৬৮২
চাঁপদানীর মাঠ. গরুটি প্রাসাদ ... ৬৮৩
গরুটি প্রাসাদের শেষ চিহ্ন ... ৬৮৪
শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণার মন্দির ... ৬৮৫
বর্ত্তমান গরুটি ... ৬৮৬
মধুলুব্ধ ... ৬৮৭
ওয়াটার সাইকেল বোট ... ৬৯৫
আমেরিকার প্রথম বৈজ্ঞানিক ... ৬৯৭
প্রাচীন শিলালিপি ... ৯৮৬
ডাকে নিষিদ্ধ বস্তু ... ৬৯৮
ডেড্ লেটার আপিসে সঞ্চিত মালপত্রের নিলাম ... ৬৯৯
ডেড্ লেটার আপিসে নিষিদ্ধ বস্তুর সমাবেশ ... ৬৯৯
ডেড্ লেটার আপিসে সঞ্চিত পার্শ্বেল ... ৭০০
দীর্ঘজীবীর নিত্য স্নান. দীর্ঘজীবী গোল্‌ফ্ ক্রীড়ক ... ৭০০
নব্বুই বৎসর বয়স্ক শিকারী. পালোয়ান নারী, ... ৭০১
অভিনব ঢাল, অভিনব ট্যাক্সি মোটর ... ৭০১
মাথার কেরামতি, কলের খরগোষ ... ৭০২
প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের ভালুক ... ৭০৩
কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় ... ৭২৪

বহুবর্ণ চিত্র

সার তারকনাথ পালিত (প্রচ্ছদপট)
যশোদা দুলাল
"আকুল হইয়া বনে বনে ঘুরি.....কস্তুরী মৃগ সম—"
তুলসী দাস
ঝড়

কার্ত্তিক,—১৩৩৩

অর্ঘ্য ... ৭৪৮
তক্ষশিলার মানচিত্র ... ৭৬১
পাহাড়োপরিস্থ টেরিসাহী গ্রাম ... ৭৬২

তক্সানালার এক দৃশ্য ... ৭৬৩
মিউজিয়মের নবনির্ম্মিত-গৃহ ... ৭৬৪
আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ-পথ ... ৭৬৬
উইণ্ডারমেয়ার হ্রদ ... ৭৭৮
আম্‌বেল সাইড ... ৭৭৯
গ্লাসমেয়ার হ্রদ ... ৭৮০
ডোভ কটেজ ... ৭৮১
থিরল্‌মেয়ার হ্রদ ... ৭৮২
কেসউইক ... ৭৮৩
হনিষ্টার পাস ... ৭৮৪
ডেভিল্‌স্ এল্‌বো ... ৭৮৫
কেসউইক—বড় রাস্তা, লক্ লোমন ... ৭৮৬
সন্ধ্যায় ডিরওয়েষ্ট ওয়াটার ... ৭৮৭
গ্রাসমেয়ার উপত্যকা, কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ... ৭৮৮
ডোভ কটেজ—বাগান, রিডাল মাউণ্ট ... ৭৮৯
বসবার ঘর, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমাধিক্ষেত্র ... ৭৯০
ওয়ার্ডসওয়ার্থের শয়ন-গৃহ, পাঠাগার ... ৭৯১
প্রণাম ... ৭৯২
দিদি ... ৮০
পদব্রজে যাত্রা আরম্ভ ... ৮২৮
ভাটায় খাল জলশূন্য ... ৮২৯
আলোকঘর ... ৮৩০
বনের ভিতর পথ ... ৮৩১
কপিলমুনির আশ্রম ... ৮৩২
ধবলাট দত্তদের বাড়ী ... ৮৩৩
মানচিত্র ... ৮৩৪
চ্যাপম্যান্‌স এজেন্সী ... ৮৫২
হাফওয়ে হাউস, লাইব্রেরী বাজার—মসুরী ... ৮৫৩
চার্লিভিল রোড ... ৮৫৪
চার্লিভিল হোটেল ... ৮৫৫
চিরতুষার ... ৮৫৬
কুলুরীর পথে ... ৮৫৭
কুলুরীর বাজার, স্কেণ্ডাল পয়েণ্ট ... ৮৫৮
পিকচার প্যালেস, ল্যাণ্ডোরের সাধারণ দৃশ্য, ... ৮৫৯
ল্যাণ্ডোর হাসপাতালের পথে, হ্যাপিভেলী ক্লাব ... ৮৬০
"ম'স" জলপ্রপাত, কয়লা-বিক্রেতা ... ৮৬১
বারলোগঞ্জের পথে ... ৮৬২
মল,.....মসুরী ... ৮৬৩
লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৬৪
তড়িৎ-শক্তিতে উৎপন্ন বৃক্ষ, লাফ দিবার সময়ের ছবি ... ৮৭৪
আশ্চর্য্য উল্লম্ফন, অভিনব মানুষ ... ৮৭৫
অভিনব মানুষ, হেন্‌রী মাম্‌বোল্ট ... ৮৭৬
পরলোকগত.....ভ্যালেন্যাটিনো, কেইসার ব্রিজ ... ৮৭৭
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মিস্ ফ্রেডি হাম্‌ফ্রি ... ৮৭
নিউইয়র্কের সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা ... ৮৭
অক্সফোর্ড.....হকি ম্যাচ, নূতন খেলা ... ৮৭৯
জাবালি ... ৮৮১
রে রে রে রে— ... ৮৮৪
রে রে রে রে ... ৮৮৫
আবার নৃত্য সুরু করিলেন ... ৮৮৬
আবার নৃত্য সুরু করিলেন ... ৮৮৭
রে নারকী যমরাজ ... ৮৯১
বৎস আমি প্রীত হইয়াছি ... ৮৯২
নূর নদীর.....স্তূপ ... ৮৯৪
নূর নদীর.....স্তূপ নূর নদীর.....প্রাকার ... ৮৯৫
পাহাড়পুর স্তূপের দৃশ্য ... ৮৯৬
মধ্যভাগের.....প্রাকার মধ্যভাগের বেষ্টনী প্রাঙ্গণ ... ৮৯৭
উত্তর দিকের মণ্ডপের সম্মুখভাগ ... ৮৯৮
উত্তর মণ্ডপ.....খনকগণ ... ৮৯৮
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৯৯

বহুবর্ণ চিত্র

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (প্রচ্ছদপট)
ঝরণা
বিরহী শিব
ভগ্ন মন্দির
গাঁয়ের গেজেট্

অগ্রহায়ণ,—১৩৩৩

ফুলিয়া ... ৯২৯
ফুলিয়া—কৃত্তিবাসের ভিটা ... ৯৩০
ফুলিয়া—কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ ... ৯৩১
ফুলিয়া.....চিহ্নিত স্থান ... ৯৩২
ফুলিয়া কৃত্তিবাস স্মৃতি-বিদ্যালয় ... ৯৩৩
মানচিত্র ... ৯৩৫
বীরনগরের ধ্বংসাবশেষ ... ৯৫৫
শিরকাপ—উত্তর.....কতকাংশ ... ৯৫৬
শিরকাপ নগরের ধ্বংসাবশেষ ... ৯৫৭
শিরকাপ—আংশিক নক্সা ... ৯৫৮
শিরকাপ—দ্বিমস্তক ঈগলবিশিষ্ট স্তূপ ... ৯৫৯
শিরকাপ—প্রাসাদের নক্সা ... ৯৬০
শিরসুখ—খনিত প্রাচীরাংশ ... ৯৬১
বিভিন্ন ধরণের গাঁথনি ... ৯৬২
ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ ... ৯৬৩
ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের নক্সা ... ৯৬৪
রেনেলের প্রস্তুত হুগলী নদীর নক্সা ... ৯৭০
পুরাতন চন্দননগর ... ৯৭১
একটী পুরাতন নীলকুঠি ... ৯৭২
ষণ্ডেশ্বর তলার ঘাট—চুঁচুড়া ... ৯৭৩
ওলন্দাজের সময় চুঁচুড়া ... ৯৭৪
পুরাতন গির্জ্জা ও হুগলী কলেজ ... ৯৭৫
হুগলী কলেজ (১৮৫৪) ... ৯৭৫
মহম্মদ.....বিল ... ৯৭৬
হাজি মুহম্মদ মহসীন ... ৯৭৭
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ... ৯৭৮
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ... ৯৭৯
চুঁচুড়ার গোরবারিক ... ৯৮০
ভূদেববাবুর বাটী—চুঁচুড়া ... ৯৮১

টিকেণ্ডারের……নক্সা	...	৯৮১
ইমামবাড়া—হুগলী	...	৯৮২
হুগলীর……দৃশ্য	...	৯৮৩
পুরাতন ব্যাণ্ডেল	...	৯৮৪
হংসেশ্বরী মন্দির—বংশবাটী	...	৯৮৫
ত্রিবেণী ঘাট	...	৯৮৬
জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ	...	৯৮৭
ঝিলাম বক্ষে	...	৯৯৫
কাশ্মীরে নারীর নৌ-বাহন	...	৯৯৬
ঝিলাম ঘাটে ধান কোটা	...	৯৯৭
চেনার নালা	...	৯৯৮
কাশ্মীর মহারাজের শবযাত্রা (১)	...	৯৯৯
কাশ্মীর মহারাজের শবযাত্রা (২)	...	১০০০
বিষাক্ত ধূমের কৃত্রিম প্রদর্শনী	...	১০২২
বিষাক্ত ধূমের ব্যবহার	...	১০২৩
বিষাক্ত গ্যাস প্রতিরোধক বর্ম্ম, স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত গাভী		১০২৪
ফায়ার ব্রিগেডের…মানচিত্র, ফায়ার-সিগন্যালের…সঙ্কেত		১০২৫
অগ্নিকাণ্ডের খবর শোনা—	...	১০২৫
৮০ ফিট……পিচকারী, উচ্চস্থান……অভ্যাস	...	১০২৬
দোলার……অভ্যাস, অভিনব চেয়ার	...	১০২৭
অভিনব খাটিয়া, চন্দ্রালোকে নারিকেল-কুঞ্জ	...	১০২৮
চন্দ্রালোকের ফটোগ্রাফ	...	১০২৮
হাতীর দন্ত চিকিৎসা, বানরের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা	...	১০২৯
বায়ু মিশ্রিত……সাফ, পকেট-ছাতা, নতুন ডুবুরি পোষাক		১০৩০
ইস্পাতের……নিক্ষেপ, একাই একশো, রুমালের কল	...	১০৩১
শস্য কাটা ও ছাঁটা কল, উভচর মোটর বোট	...	১০৩২
৺আদীশ্বর ঘটক	...	১০৫১

বহুবর্ণ চিত্র

৺সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রচ্ছদপট)	
গোরা-হারা	১০২২
স্নেহ	১০২৩
কল্কি-অবতার	১০২৪
সচকিতা	১০২৫



ভারতবর্ষ



আষাঢ়, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

সুর-ভোলা

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনি না যে।
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে,
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে,
তাহার মাঝে সহসা মাতে বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপদন তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে;
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনি না যে॥

চলিতে দিনু তব কমলবনে,
পথের মাঝে ভুলালে পথ উতলা সমীরণে।
তোমার সুর দেছনু রাতে জাগে,
তোমার সুর সকালে আমারো কথায় একুল-ওকুলে,
সে সুর বাহি' চলিতে চাহি তোমার-ভোলা লোকে
শুভ্র রবিতে ত্বরিত-সোনা মরীচির সনে,
কুয়াশা ঢেকে অতল আবরণে,
তাঁহারে আলো তারকা কাঁপি' করে সারা।
তোমার বাণী কথারো শুনি, কথারো শুনি না যে॥

২৮ চৈত্র ২৩৩২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

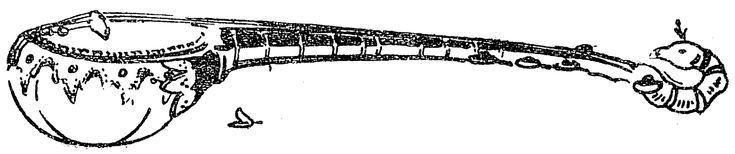

বর্ণাশ্রম-ধর্ম এবং ভারতবর্ষের অধোগতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

বর্ণাশ্রম-ধর্ম হিন্দু জাতির উপকার করিয়াছে না অনিষ্ট করিয়াছে, এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শূদ্র-ধর্ম" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিরোধী তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাবলে এবং চিন্তাশীলতায় রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এ জন্য উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতিকূলে যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলির বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। বিষয়টির গুরুত্ব অতিশয় বেশী। হিন্দুর আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কর্ম সকলই বর্ণাশ্রম-ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে কি কর্ত্তব্য, তাহা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে; এবং সে সকল শাস্ত্রবিধান বর্ণাশ্রম-ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রূপ ব্যবস্থাকে হিন্দু-সমাজ-সৌধের ভিত্তি বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। অন্ততঃ তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু-সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম-রূপ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম ও সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এ জন্য গভীর চিন্তার সহিত, ধীর ও সংযত ভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি এই যে ইহা বংশগত! পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে পুত্রকেও যে শাস্ত্রব্যবসায়ী হইতে হইবে, ইহা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। শাস্ত্র-চর্চ্চা করিবার জন্য বা ধর্ম জীবন যাপন করিবার জন্য যেরূপ শক্তি ও সাধনার প্রয়োজন, পুত্রের সেরূপ শক্তি ও সাধনা যদি না থাকে, তাহা হইলে পুত্রকে পিতার ন্যায় জীবন যাপন করাইবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মতে অনর্থক,—শুধু অনর্থক নহে, অনিষ্টকর। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যে সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, বা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, তা' ব্যক্তিগত না হ'য়ে বংশগত হ'তেই পারে না।" কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া রবীন্দ্রনাথ একটি সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সে সত্যটি এই যে পুত্রের মন ও বুদ্ধি পিতা-মাতার অনুরূপ হয়। পিতা-মাতার যেরূপ মতিগতি, পুত্র সেইরূপ স্বাভাবিক মতিগতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। একই প্রকারের মতিগতি যদি পিতা, মাতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পুত্রের তদনুরূপ মতিগতি হইবার সম্ভাবনা আরও বেশী। পুত্র পিতামাতাকে যেভাবে জীবন যাপন করিতে দেখে, নিজের সেইভাবে জীবন যাপন করিবার প্রবৃত্তি হয়। এই সকল কারণে যদি পুত্রের শৈশব হইতে পিতামাতা যত্নপূর্ব্বক নিজ বিদ্যাবুদ্ধি এবং আচার ব্যবহার পুত্রকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। কে কি ভাবে জীবন যাপন করিবে তাহা প্রথম হইতে স্থির করিয়া তদনুরূপ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করাই সমীচীন। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেইভাবে জীবন যাপন করুক, এরূপ ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না।

এই গেল সাধারণ বুদ্ধির কথা। আধুনিক সৌজাত্য-বিজ্ঞান (Eugenics) সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও বলেন যে, বংশের মধ্য দিয়া বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ লক্ষণগুলি সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। সন্তানের যে কেবল বাহ্য আকৃতি পিতামাতার অনুরূপ হয় তাহা নহে, তাহার আন্তরিক বৃত্তিগুলিও পিতামাতার অনুরূপ হয়। অধিকন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যদি একপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, তাহা হইলে সন্তানের সেইরূপ বিশেষ বুদ্ধির স্বাভাবিক আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা বেশী। এরূপ হইবার কারণ মোটামুটি এই ভাবে নির্দেশ করা যাইতে

পারে যে, মানবদেহ অসংখ্য অণুকোষ দ্বারা গঠিত। আমরা যে সকল কার্য্য করি বা চিন্তা করি, সেইরূপ প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তার ছাপ প্রতি অণুকোষের উপর পড়ে। যে বীজ হইতে পুত্রের জন্ম হয় তাহার মধ্যে এই অণুকোষ বিদ্যমান। এজন্য সন্তানের বাহ্য আকৃতি এবং আন্তরিক প্রবৃত্তি সকল পিতামাতার অনুরূপ হয়। সৌজাত্যবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুক্ষেত্রে এই সকল তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া ইহাদের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দুর বংশগত বর্ণাশ্রম-ধর্ম এই সকল বিজ্ঞান-সম্মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। বংশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা—heredity and environment—এই দুইটি জিনিসের উপর সন্তানের চরিত্রের বিশেষত্ব নির্ভর করে। এই সত্যও বর্ণাশ্রম-ধর্ম বংশগত করিবার পক্ষে অনুকূল। পিতামাতা যদি যথার্থ ব্রাহ্মণ হন এবং নিষ্ঠার সহিত ধর্ম-জীবন যাপন করেন, তাহা হইলে সন্তানের শান্ত স্বভাব, আত্মসংযম, আস্তিক্য বুদ্ধি প্রভৃতি গুণাবলি সহজাত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। শৈশব হইতে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পালিত হয়, তাহার প্রভাবে এই সকল গুণাবলি পুষ্টি লাভ করে;—তাহার পিতামাতার জীবনে শান্তি, ধর্মানুরাগ, ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রভৃতি দেখিয়া সেও ঐ সকলের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। কারণ শৈশবে অনুকরণ-স্পৃহা অতিশয় বলবতী থাকে। পুত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলি যাহাতে স্ফূর্ত্তিলাভ করে, পিতা দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দ্বারা সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন এইরূপ আশা করা যায়। পিতা যেরূপ অনুরাগের সহিত নিজ জীবনের সাধনা পুত্রকে অভ্যস্ত করাইতে চেষ্টা করিবেন, অন্যের পক্ষে ততদূর অনুরাগ স্বাভাবিক নহে। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, যে সকল কাজ "বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা সাধিত হইতে পারে" সেগুলিও বংশগত হওয়া উচিত। যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন—শক্তি ও সাধনা। এ কথা রবীন্দ্রনাথও উক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক তা'র জন্যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার।" আমরা পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বংশ বা heredityর প্রভাবে এইরূপ ব্যক্তিগত শক্তির আবির্ভাব হওয়া খুবই সম্ভব; এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা environmentএর প্রভাব এইরূপ সাধনার অনুকূল।

ইহা সত্য যে কোনও কোনও স্থলে পুত্রের স্বভাব পিতামাতার স্বভাব হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হইতে দেখা যায়। কিন্তু এগুলি নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়ম এই যে পুত্রের স্বভাব পিতামাতার স্বভাবের অনুরূপ হইবে। সামাজিক ব্যবস্থা সাধারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত করা সমীচীন। দুই এক স্থলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে এই সামাজিক ব্যবস্থা সুফল প্রসব করিতে না পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সাধারণ নিয়ম অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থায় যে সুফল পাওয়া যাইবে, তাহা যথেষ্ট মূল্যবান। দুই চারি স্থলে সুফল না ফলিলে সামাজিক ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আসল জিনিসটি ম'রে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হ'য়ে উঠে' জীবন-পথের বিঘ্ন ঘটায়।" কিন্তু কাজ বংশগত হইলে যে আসল জিনিসটি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা কম, ইহা আমরা পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিবাহ অনিয়মিত হইলে বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত বংশের মিশ্রণের ফলে প্রত্যেক বংশের স্বতন্ত্র বিশেষত্ব মন্দীভূত বা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী; এবং অবিচ্ছিন্ন বংশাবলীর মধ্য দিয়া অনুরূপ চর্চ্চার ফলে "আসল জিনিসটি" সমধিক প্রাণময় এবং তেজস্বী হইবার সম্ভাবনাই অধিক। বংশপরম্পরা ধরিয়া যে সাধনা চলিয়া আসিয়াছে, সেই সাধনা যাহাতে সজীব থাকে, মানবের এইরূপ চেষ্টা হওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে বাহির হইতে দেখিয়া মনে হয় যে ধর্মের প্রাণ নাই, সেখানেও যে আচারের কোন মূল্য নাই এবং তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত—ইহা সমীচীন মনে হয় না। অনেক সময় প্রাণশক্তি সুপ্ত থাকে, পরে অনুকূল অবস্থায় তাহা জাগ্রত হইয়া উঠে। জলমগ্ন ব্যক্তিকে যখন জল হইতে তোলা হয়, তখন মনে হয়, তাহার প্রাণ নাই। কৃত্রিম নিঃশ্বাস বহাইবার জন্য তাহার হাত তুলিয়া নামান হয়; এই ভাবে ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। সেইরূপ, যেখানে ধর্মের প্রাণ নাই বলিয়া মনে হয়, সেখানেও আচার পালন করিবার ফলে প্রকৃত ধর্মভাব আবির্ভূত হইতে পারে।* বৈষ্ণবেরা যে বলেন নাম করিলেই মুক্তি হইবে, আর কিছুর প্রয়োজন

* তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন "আচার প্রভবো ধর্মঃ"—আচার পালন করিলে ধর্মভাব আবির্ভূত হয়।

নাই, তাহার মধ্যেও এই সত্য নিহিত আছে। নাম করিয়া গেলে ভক্তি আসিবে, ভক্তি হইলে মুক্তি হইবে। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্মেই প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার নিয়ম আছে। হয়ত নির্দিষ্ট সময়ে মনে যথেষ্ট ভক্তির উদয় হইল না; তথাপি প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে যে প্রার্থনা করিবার কোন ফল নাই তাহা বলা যায় না। রবিবাবুর কথাতেই বলা যায়,

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ,
তখনও হে দেব প্রণমি তোমায়,
গাহি বসে তব গান।
অন্তর্যামী ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার
পুষ্পবিহীন পূজা আয়োজন
ভক্তিবিহীন প্রাণ।

বীজকে রক্ষা করিবার জন্য তুষের যেরূপ প্রয়োজন, সাধনকে রক্ষা করিবার জন্য আচারের ঠিক সেইরূপ প্রয়োজন। তুষটি শুষ্ক কঠিন এবং কর্কশ বটে, কিন্তু সেই কারণে কেহ যদি তুষটি ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে তণ্ডুল হইতে নূতন বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। সাধনা বস্তুটি অতি শুষ্ক এবং কোমল, নিরাবরণ অবস্থায় সংসারে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহা অচিরাৎ শুকাইয়া যাইবে। তাহাকে বাঁচাইতে হইলে, তাহাকে প্রাণবান এবং সফল করিতে হইলে, আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। আচারগুলিকে অর্থহীন বোঝা হ'য়ে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটাতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন; তিনি কি ইহাও দেখেন নাই যে, অনেক স্থলে বাহ্য আচার পরিত্যাগ করাতে সাধনার প্রাণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? রোমাণ ক্যাথলিকদের অনেক আচার প্রোটেষ্টাণ্টরা পরিত্যাগ করিয়াছেন; সেই সঙ্গে ধর্মের প্রভাবও কি প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে শিথিল হইয়া যায় নাই? মধ্যযুগে খৃষ্টানধর্মযাজকদের মধ্যে St Francis of Assissiর ন্যায় যথার্থ সাধুপুরুষ অনেক দেখা যাইত। আজকাল প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে তত বেশী দেখা যায় না। গির্জায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ধর্মভাবের অভাবের দরুণ অনেক ধর্মযাজক অনুযোগ করিয়া থাকেন। তাহার তুলনায় আমাদের তীর্থস্থানে নিরক্ষর দরিদ্র রমণীর মুখে যে পবিত্র ভাব, যে ভগবদ্ভক্তির আকুলতা দেখা যায়, তাহা কি সমধিক স্পৃহনীয় নহে? এক স্থানে আচার বর্জন, অপর স্থানে আচার রক্ষা। উভয়ের ফলের পার্থক্য দেখিয়া সুধিগণ বিচার করিবেন কোনটি ভাল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যে শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান ক'রতে ছোটে, সে নিজের চেয়ে অনেক ভাল লোককে বাহ্য শুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে ক'রতে দ্বিধা বোধ করে না।" সত্য কথা। এখানে "স্নান করা ভাল" এই আচারের অপব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু আচারটি কি খারাপ? মেয়েটির বুদ্ধি কম, ঘৃণা করিবার প্রবৃত্তি প্রবল, তাই এই ভাল নিয়মটি সে খারাপ ভাবে দেখিয়াছে। সব ভাল নিয়মেরই অপব্যবহার হইতে পারে। ঈশ্বরের নামেরও ত অপব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু সেজন্য কি ঈশ্বরের নাম পরিত্যাগ করা উচিত? দেখিতে হইবে নিয়মটি ভাল কি না; এই নিয়মের যে ভাল ফল হইয়াছে তাহার গুরুত্ব অধিক, না, যে খারাপ ফল হইয়াছে তাহার গুরুত্ব অধিক? অনেক নিরপেক্ষ সমালোচকের মতে শারীরিক পরিচ্ছন্নতায় দরিদ্র হিন্দুরা অপর জাতির দরিদ্র লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। Is India Civilized এই পুস্তকে Sir John Woodroffe বলিয়াছেন, "প্রত্যহ স্নান করিবে এবং ধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে" এই নিয়মটি ভারতবর্ষের নিকট য়ুরোপের শিক্ষা করা উচিত। শরীর পরিষ্কার রাখিবে, মন পবিত্র রাখিবে, হিন্দুধর্মে এই দুইটি উপদেশই দিয়াছে। ইহার ফলে দেহ ও মন উভয়ই শুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। যাহারা কেবল দেহকে পবিত্র করিয়া রাখে, তাহারাও একটা ভাল কাজ করে। তাহারা যদি অশুচি অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিকে ঘৃণা করে তাহা হইলে একটা অন্যায় কাজ করে, কিন্তু এ অন্যায় কাজের কারণ শাস্ত্রের উপদেশ নহে; ইহার কারণ তাহার মনে ঘৃণা নামে একটি দুষ্ট প্রবৃত্তি আছে। সে যদি শুচিবায়ুগ্রস্ত না হইত, তাহা হইলেও অন্য কারণে ভাল লোককে ঘৃণা করিত। আচার বংশগত হইলে যে এইরূপ ঘৃণার উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা বেশী থাকিবে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না; রবীন্দ্রনাথও কোনও কারণ দেখান নাই। সকল ধর্মেই সমগ্র অনুশাসনের কিয়দংশ সহজ, কিয়দংশ কঠিন। কঠিন অংশ অপেক্ষা সহজ অংশ যে বেশীর ভাগ লোক পালন করিবে তাহা স্বাভাবিক। কঠিন অংশ বাদ দিয়া

সহজ অংশ পালন করা—উভয় অংশ পালন না করা অপেক্ষা খারাপ নহে। যাহারা এরূপ করিবে তাঁহাদের অধিকাংশের মনে যে দম্ভ ও ঘৃণার উদ্রেক হইবে তাহা নহে। খুব অল্প সংখ্যকের মনেই হইবে। এই কুফলের জন্য ধর্ম্মানুশাসন যে পরিমাণে দায়ী, ধর্মানুশাসনটি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে সুফল প্রসব করিয়া থাকে।

পাছে আচারকে লোকে অত্যধিক আদর করে এবং উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ভ্রম করে, এজন্য হিন্দুধর্মশাস্ত্র যথেষ্ট সাবধান হইয়াছে। সাধনার পথে সাহায্য করে বলিয়াই আচার প্রয়োজনীয়, সাধনা সিদ্ধ হইলে আর আচারের প্রয়োজন থাকে না,—এ কথা হিন্দুধর্মে খুব স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে আচারের সবচেয়ে কড়াকড়ি, গার্হস্থ্য আশ্রমে ততদূর নহে, বানপ্রস্থ আশ্রমে অনেকটা শিথিল, সন্ন্যাস আশ্রমে প্রায় কিছুই নাই। সাধনার পথে লোকে যেমন অগ্রসর হয়, আচারের বাঁধন সেই পরিমাণে খুলিয়া দেওয়া হয়। হিন্দুর আরাধ্য মহাদেব শ্মশানে থাকেন, সর্বাঙ্গে ছাই মাখেন, গলায় সাপ জড়ান। শুচিবায়ু-গ্রস্ত মেয়েও যে এ কথা জানে না তাহা নহে। আচারহীন সাধু-সন্ন্যাসীকে সেও ভক্তি করে। তবে যে কোথাও ভাল লোককে অন্যায় ভাবে ঘৃণা করে, তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। সে যাহাতে এরূপ না করে সেজন্য হিন্দুধর্ম যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। বোধ হয় এরূপ সঙ্কীর্ণতা অপর ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মে কম। শুনিয়াছি বিলাতে যদি কেহ ধুতি পরিয়া পথে হাঁটে, লোকে তাহাকে পাগল করিয়া দেয়। ইংলণ্ডে প্রথমে যিনি ছাতা লইয়া পথে হাঁটিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এইরূপ দল বাঁধা সঙ্কীর্ণতার উগ্র অত্যাচার আমাদের দেশে কম বলিয়াই মনে হয়।

যে সকল কাজ বুদ্ধিমূলক, কেবল সেই সকল কাজ বংশগত করিতে যে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেন, তাহা নহে; যে সকল কাজ কেবল শারীরিক চেষ্টার উপর নির্ভর করে, সে সকল কাজও বংশানুক্রমিক করিতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেন। এজন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরি করা, বা ঘানির তেল বের করা, বা উচ্চতর বর্ণের দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়,—বরং তাতে মন যতই মরে যায় কাজ ততই সহজ হ'য়ে আসে। এই সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম্ম পালন ক'রতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিত্তও বাকী থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হ'য়ে, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যাই হোক আজ ভারতে বিশুদ্ধ ভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নাই। এই জন্যেই ভারতবর্ষের নিমন্ত্রকে জীর্ণ দেশফেরা ইংরেজ গৃহিণীর মুখে অনেকবার শুনেছি স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তা'রা বড় বেশী অনুভব করে।" হাঁড়ি তৈরি করা, তেল বের করা প্রভৃতি দরিদ্রের উপ-জীবিকাকে রবীন্দ্রনাথ যতটা হীন বলিয়া মনে করিয়াছেন, বাস্তবিক ইহারা ততটা হীন নহে। দরিদ্রের জীবিকা অবলম্বন করিলেও মানুষ যদি সৎপথে থাকে, ঈশ্বর-চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার জীবন সার্থক হয়। চাকুরি ওকালতী প্রভৃতি তথাকথিত ভদ্রজনোচিত বৃত্তি অপেক্ষা দরিদ্রের জীবিকা অধিক অনিষ্টকর বা লজ্জাজনক নয়। আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়াছিল বলিয়াই তাহার এত দুর্গতি।

বাস্তবিক পক্ষে তথাকথিত ভদ্রবৃত্তিতে মনের যেরূপ অধোগতি হয় একঘেয়ে হাঁড়ি তৈরি করা, তেল বের করা বা চরকা কাটাতে সেরূপ অধোগতি হয় না। হাঁড়ি তৈরি করা, তেল বের করার সময় শরীরের একঘেয়ে পরিশ্রম হয় বটে, কিন্তু মন মুক্ত থাকে। চাকুরি ওকালতি প্রভৃতিতে মনের দাসত্ব প্রায় অনিবার্য্য। দেহের দাসত্ব অপেক্ষা মনের দাসত্ব অধিকতর শোচনীয়। মনের দাসত্ব হইলে কোন্ কাজ করা উচিত আমরা তাহার বিচার করি না, যে কাজ করিলে প্রভু খুসী হইবেন সেই কাজ করিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। তখন আত্মসম্মানবোধ থাকে না; চাটুকারিতা, পরনিন্দা, প্রবঞ্চনা, পরের সর্বনাশ করিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। কুমার, তেলি, কামার, তাঁতীদের হৃদয় অনেকটা সরল থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বংশগত জাতিভেদের ফলে মানুষ কেবল যন্ত্র হ'য়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে। কিন্তু ইহা কি সত্য নহে যে, য়ুরোপের শ্রমজীবী অপেক্ষা আমাদের শ্রমজীবীদের মধ্যে ধর্মভাব বেশী? স্মরণ হয়, পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী মহাশয় ইংলণ্ডের একটি শ্রমজীবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যিশুখৃষ্টের বিষয় কি জান?" সে বলিয়াছিল, "তাহার নম্বর কত?"—

অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট কত নম্বরের কুলি? আমাদের শ্রমজীবিগণ ধর্মবিষয়ে এতদূর উদাসীন নহে। ইংলণ্ডে বংশগত জাতিভেদ নাই, আমাদের আছে। অতএব জাতিভেদ বংশগত হইলে যে শ্রমজীবীদের বেশী অবনতি হইবে ইহা ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশের দরিদ্র লোকেরা অন্য দেশের দরিদ্র লোক অপেক্ষা শান্ত, সংযত এবং ধর্মবিষয়ে উন্নত। ইহা অবশ্য আমরা স্বীকার করি যে পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ লোক আমাদের দেশের সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী লেখাপড়া জানে। কিন্তু বেশী লেখাপড়া শিখিলেই যে মনোবৃত্তিসকল বেশী উন্নত হয়, তাহা নহে। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকদের মনের ভাব অন্য দেশের লেখাপড়া-জানা লোকদের মনের ভাব অপেক্ষা হীন নহে। পাশ্চাত্যদেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, বেশী টাকা রোজগার করা এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা ও বিলাসভোগই জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরাও জানে যে, এসকল জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ এসকল চিরকাল ভোগ করিতে পারা যায় না। ঈশ্বরকে লাভ করিলে যে সুখ হয় তাহা চিরস্থায়ী; অতএব ঈশ্বরলাভই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। রামায়ণ এবং মহাভারতের শিক্ষাপ্রদ গল্প, ঈশ্বরের দয়া, সর্ব্বশক্তিমত্তা, পার্থিব সুখসম্পদের অনিত্যতা, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এসকল কথা আমাদের দেশের দরিদ্র নিরক্ষর সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে জানে। যাত্রা, কথকতা, সাধুসন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উপদেশ, ভিখারী, বৈষ্ণব এবং বাউলের গান, এই সকল উপায়ে ধর্মের বড় বড় তত্ত্বগুলি দরিদ্র ও নিরক্ষরের হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। কৃষক গান শুনিয়াছে

মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত—
আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা।

কলু শুনিয়াছে

মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।

এই সকল গানের পদ অনেক শ্রোতার মন ঈশ্বরের দিকে "মোড় ফিরাইয়া" দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এই সকল কাজেও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই।" তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে বংশগত ভাবে একই রকম কাজ করিয়া আমাদের শিল্পীদের চিত্তের অবনতি হইয়াছে; এজন্য তাহারা শিল্পের নূতন উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতে সকল প্রকার শিল্পবিদ্যা যে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত। এবং প্রাচীন ভারতে বংশগত ভাবেই শিল্পচর্চ্চা হইত। অতএব বংশগত ভাবে শিল্পচর্চ্চা করিলে যে শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না, ইহা যথার্থ নহে। আজকাল ভারতে শিল্পের অবনতি হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার কারণ প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থা; বংশগত শিল্পচর্চ্চা তাহার কারণ নহে। কার্পাস, পশম, রেশম, কাষ্ঠ, ধাতু প্রভৃতির উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের জন্য ভারত অতীত কাল হইতে বিখ্যাত। ভুবনেশ্বর, কোনারক এবং মাদুরার মন্দির, অজন্তা এবং এলোরার চিত্র, আজমীরের বিগ্রহরাজ-নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়, এ সকল যাহাদের কীর্ত্তি, তাহারা বংশগত ভাবেই শিল্পচর্চ্চা করিয়াছিল। গভীর চিন্তাশীল এবং স্বদেশের ঐকান্তিক উন্নতিকামী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে জাতিভেদ-প্রথা প্রাচীন ভারতের শিল্পে উৎকর্ষলাভের পথে বাধা দেয় নাই, সহায়ক হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "জাতিভেদ প্রচলিত থাকায় ভারতবর্ষের সমুদায় শিল্পকার্য্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে উহা তুলনারহিত হইয়াছে।" (সামাজিক প্রবন্ধ ১০৪ পৃঃ) পাশ্চাত্যদেশে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীতে অনেক "নূতনতর উৎকর্ষ" হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সকল ঔৎকর্ষে মানবজাতির কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিবার বিষয়। কারণ এই সকল "নূতনতর উৎকর্ষ" কলকারখানার উপযোগী; কলকারখানাতে খুব দ্রুতভাবে দ্রব্য প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু কারখানায় কার্য্য করিলে মানুষ কলের মত হইয়া যায়, উচ্চ মনোভাব তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না, পারিবারিক সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া সে নানা প্রলোভনে পতিত হয়; এবং পাশ্চাত্যদেশে সস্তায় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ফলে আমাদের ন্যায় অনেক দেশের দরিদ্র লোকদের জীবিকার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে কলের নূতন উৎকর্ষ বাস্তবিক বাঞ্ছনীয় কি না, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে কামার, কুমার, তেলীরা বংশগত ভাবে একই কাজ করে বলিয়া যন্ত্রের মত হইয়া যায়—ইহা রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার বিপরীত অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। কলকারখানায় কয়েক বৎসর কাজ করিলেই মানুষ কলের একটা অঙ্গের ন্যায় হইয়া যায়। কারণ, কল-কারখানাতে শ্রমজীবীকে কলের ভৃত্যের ন্যায় কাজ করিতে হয়। গৃহশিল্পে সেরূপ নহে। সেখানে শ্রমজীবী প্রভুর ন্যায়, এবং যন্ত্রগুলি তাহার সম্পূর্ণ অধীন। ইহাই স্বাভাবিক। এবং এই স্বাভাবিক ভাবে কাজ হইলে বংশপরম্পরাতেও শ্রমজীবীর অবনতি হয় না। কলের অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে অল্প দিনেই তাহাদের অবনতি হয়। একঘেয়ে কাজ করিলেই যে মনের অবনতি হয়, ইহা কুসংস্কার মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আজ ভারতে বিশুদ্ধ ভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা।" কিন্তু ইহা সত্য নহে। ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। কৃষি বৈশ্যের কাজ। কৃষি এবং ব্যবসাতে বৈশ্যধর্ম এখনও উচ্ছিন্ন হয় নাই। পরাধীন জাতির ক্ষাত্রধর্ম বিনষ্ট হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। বাকী ব্রাহ্মণ। দেশ পরাধীন হইলে ব্রাহ্মণের স্বধর্মে টিকিয়া থাকা খুব কঠিন। ব্রাহ্মণের রাজদত্ত বৃত্তি এখন বন্ধ। পরাধীনতার ফলে দেশের অতিরিক্ত ঝোঁক পড়িয়াছে ইংরাজি শিক্ষার উপর; সংস্কৃত শিক্ষার যারপরনাই অনাদর হইয়াছে। ইহাতেও ব্রাহ্মণের জীবিকা সংগ্রহ করা দুরূহ হইয়াছে। বিজাতীয় শিক্ষার ফলে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ধর্মকর্মে আস্থা অত্যন্ত শিথিল হইয়াছে। তাহাতেও ব্রাহ্মণের জীবিকা বন্ধ। যে সকল জীবিকা অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণের বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্ত্তব্যপালন সহজ হইত, সে সকল জীবিকা প্রায় বন্ধ হওয়াতে, ব্রাহ্মণকে অপর সকল জীবিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে; তাহার ফলে ব্রাহ্মণের নিজধর্ম পালন করা কঠিন হইয়াছে। তথাপি এখনও দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণ আছেন,—নির্লোভ, পরোপকারী, ঈশ্বরে নির্ভরশীল, দারিদ্র্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ। দেশের সুগভীর ঔদাসীন্য সত্ত্বেও, শিক্ষিত লোকের নির্মম বিদ্রূপবাণ সহ্য করিয়াও, অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত এখনও যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ প্রাণপণে প্রাচীন আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক এবং প্রাচীন আদর্শের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতে যদি আবার কখনও সুদিন ফিরিয়া আসে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অত্যুগ্র আলোকের মোহ কাটাইয়া আবার যদি ভারতবাসী প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে নিজের ঘরের জিনিসের যথার্থ আদর করিতে শিখে, তাহা হইলে যে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ আজিকার দুর্দিনে দৈন্যের অন্ধকার এবং বিদ্রূপের শিলাবর্ষণ সহ্য করিয়া বুকের রক্ত দিয়া প্রাচীন ভারতের আদর্শ বাঁচাইয়া রাখিতেছেন তাঁহাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। মহাত্মা গান্ধি পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধী তাহা সত্য; কিন্তু তিনি যে স্বদেশের ত্রুটি নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া যাহা সত্য মনে করেন নির্ভীক ভাবে তাহা প্রচার করেন, ইহা সর্বজনবিদিত। তিনি বলিয়াছেন,

I have not a shadow of doubt that Hinduism owes it all to the great traditions that the Brahmins have left for Hinduism. They have left a legacy for India which every Indian, no matter to what **Varna** he may belong, owes a deep debt of gratitude. Having studied the history of almost every religion in the world it is my settled conviction that there is no other class in the world that has accepted poverty and self-effacement as its lot. * * * Even in this black age, travelling throughout the length and breadth of India, I notice that the Brahmins take the first place in self-sacrifice and self-effacement. * * * I wish to confess too that the Brahmins together with the rest of us have suffered a fall. They have set before India voluntarily and deliberately the highest standard which a human mind is capable of conceiving, and they must not be surprized if the Indian world exacts that standard from them. The Brahmins have declared themselves, and ought to remain the custodians of the purity of our life.

Mahatma Gandhi's speech in Madras at the Seabeach on the 8th April 1921.

অনুবাদ :—আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে হিন্দুধর্মের যাহা কিছু ভাল সে সকলেরই কারণ ব্রাহ্মণগণের গৌরবময় কীর্ত্তিকলাপ। ব্রাহ্মণেরা যে সকল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুর গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া ইহা আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, পৃথিবীর আর কোন শ্রেণীর লোক দারিদ্র্য এবং স্বার্থোৎসর্গ নিজ ভাগ্য বলিয়া বরণ করিয়া লয় নাই। * * * এমন কি বর্ত্তমান অবনতির দিনে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, স্বার্থোৎসর্গ এবং স্বার্থবিলোপ বিষয়ে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। * * * ইহাও আমি স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি যে, আমাদের অন্য সকলের ন্যায় ব্রাহ্মণদেরও পতন হইয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং গভীর চিন্তার পর ভারতের সম্মুখে এমন এক আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, যাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ মানব-মন কল্পনা করিতে পারে না। সুতরাং ভারতের লোকেরা যদি তাঁহাদের নিকট সেই আদর্শ অনুযায়ী আচরণ প্রত্যাশা করে, তাহা হইলে তাঁহাদের আশ্চর্য্য হইলে চলিবে না। ব্রাহ্মণেরা হিন্দুর জীবনের পবিত্রতার রক্ষক বলিয়া নিজদিগকে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের তাহাই হওয়া উচিত।—৮ই এপ্রিল ১৯২১ তারিখে মান্দ্রাজনগরে সমুদ্রতটে মহাত্মা গান্ধির বক্তৃতা।

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে সত্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা মহাত্মাজির জীবনের মূলমন্ত্র। বর্ণাশ্রমধর্ম স্মরণাতীত-কাল হইতে বংশগত। ব্রাহ্মণদের যে গৌরবময় কীর্ত্তি-কাহিনী মহাত্মাজি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা বংশগত বর্ণাশ্রমধর্মের সময় সম্ভব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের যে অবনতির কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহার কারণ বংশগত বর্ণাশ্রমধর্ম নহে; কারণ, তাহা হইলে দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণ তাহার মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত না। সে অবনতি আধুনিক এবং তাহার কারণ প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থা।

ভারত-প্রত্যাগত ইংরেজ মহিলার নিকট ভারতের চাকরদের প্রশংসা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়াছেন; বলিয়াছেন, বংশানুক্রমে চাকর থাকিয়া তাহারা মনুষ্যত্ব-বর্জিত হইয়াছে, নীরবে লাথি-ঝাঁটা সহ্য করে, তাই প্রভুদের এত ভাল লাগে। এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, বোধ হয় ইংরেজ মহিলা ভারতের চাকরদের লাথি ঝাঁটা সহ্য করিবার ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের প্রশংসা করেন নাই—তাহারা বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, কষ্টসহিষ্ণু—এই সকল কথাই বোধ হয় মনে করিয়া বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজের ভৃত্য সচরাচর মুসলমান হয়, বর্ণাশ্রমধর্মী হিন্দু হয় না। সাংঘাই (Shanghai) সহরে একজন শিখ পুলিশ চীনীয়দিগকে অন্যায় ভাবে তাড়না করিয়াছিল, আমেরিকার Nation পত্রে তাহার বিবরণ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং অনুমান করিয়াছেন যে, আমাদের শূদ্ররা বংশানুক্রমিক শূদ্র বলিয়া এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে দ্বিধা বোধ করে না। রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হইয়াছেন যে, শিখদের বর্ণাশ্রমধর্ম নাই। অতএব বংশানুক্রমে শূদ্রত্ব করিয়া শিখদের এরূপ প্রবৃত্তি হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। বিদেশী বেতনভুক সেনা বা পুলিশের লোক (mercenaries) প্রায়ই অত্যাচারী হয়, ইতিহাসে তাহার বহু নিদর্শন আছে,—ইহাও তাহার অপর একটি নিদর্শন। ইহার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মকে দায়ী করা যায় না। হংকঙের (Hong Kong)এর যে পাঞ্জাবী পুলিশ রবীন্দ্রনাথের চক্ষের সম্মুখে একজন চীনীয়কে লাঞ্ছনা করিয়াছিল, সে শিখ কি না রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখেন নাই। খুব সম্ভব সেও শিখ। কারণ, ঐ সকল অঞ্চলে শিখ পুলিশই (প্রায় অবসর-প্রাপ্ত সৈনিকেরা) গিয়া থাকে। ইহার জন্যও বর্ণাশ্রমধর্মকে দায়ী করা যায় না। আর এ সকল দৃষ্টান্ত ক্ষাত্রধর্মের অপব্যবহার—শূদ্রধর্মের নহে। সেনা বা পুলিশে কাজ করা ক্ষত্রিয়ের কাজ,—শূদ্রের নহে। "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং"—পরিচর্য্যা শূদ্রের কাজ, শাসন-করা শূদ্রের কাজ নহে। ইংরেজ সৈনিক বা পুলিশ যে মনোবৃত্তি লইয়া ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করে, শিখ পুলিশ সেইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া চীনীয়দের উপর অত্যাচার করে,—শিখ পুলিশ এবং তাহার প্রভু ইংরেজ যে ভিন্ন জাতীয় তাহা অবান্তর প্রসঙ্গ মাত্র। যাহারা বেতনভুক হইয়া বিদেশে পুলিশ বা সৈনিকের কর্ম করিতে যায়, তাহাদের মনোভাব অস্বাভাবিক ভাবে বিকৃত হইয়া যায়। তাহাদের মনোভাব দেখিয়া দেশের সাধারণ লোকদের মনোভাব নির্ণয় করা উচিত নহে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে হিংস্রভাব অপর দেশে সাধারণ

লোকদের অপেক্ষা কম। আমাদের দেশের সাধারণ লোক অন্য সকল দেশের সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী অভদ্র নহে। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়দের মত পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধি এ বিষয়ে পূর্বোদ্ধৃত বক্তৃতায় বলিয়াছেন,——I ask you to accept the testimony given by Sir Thomas Munro, and I confirm that testimony, that the masses of India are really more cultured than any in the world. অনুবাদ :—"স্যর টমাস্ মনরো যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আমি তাহা আপনাদিগকে গ্রহণ করিতে বলি, —এবং আমি সে সাক্ষ্য সমর্থন করি যে ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর অপর সকল দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অধিকতর সভ্য।" ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণেরা হিন্দুসমাজকে শান্তির দিকে লওয়াইয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু এবং শান্তিশীল সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন।" (সামাজিক প্রবন্ধ ৩৭ পৃঃ) ভূদেববাবু পুনশ্চ বলিয়াছেন, "একজন বহুদর্শী ইংরেজের সহিত এই বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'যদি ছোট লোক হইয়া জন্মিতে হয় তবে ভারতবর্ষের ছোট লোক হওয়াই ভাল। অপর সকল সমাজের ছোট লোকেরা পশুভাবাপন্ন, তাহাদের সহিত তুলনায় ইহারা দিব্য-ভাবাপন্ন।" (সামাজিক প্রবন্ধ) রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন :— From a careful survey and observation of the people and inhabitants of various parts of the country and in every condition of life, I am of opinion that the peasants or villagers who reside at a distance from large towns and head stations and courts of law are as innocent, temperate and moral in their conduct as the people of any country whatsoever. &c.

(Quoted in Mr. P. N. Bose's National Education and Modern Progress. p. 41).

অনুবাদ :—"দেশের বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন অবস্থার লোকদিগকে পর্যাবেক্ষণ করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, যে সকল কৃষক এবং গ্রামবাসী নগর এবং বিচারালয় হইতে দূরে বাস করে, তাহারা যে কোনও দেশের লোক অপেক্ষা কম নির্দোষ, সংযত এবং উন্নত-চরিত্র নহে।" এই সকল বিচক্ষণ ব্যক্তির মত হইতে প্রতীতি হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে শূদ্ররা বংশানুক্রমিক শূদ্র বলিয়া নিরীহ লোকদের উপর দুর্দান্ত এবং অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যথার্থ নহে।

গীতার "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্মো ভয়াবহঃ" এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোথাও বা বাক্যটিকে "স্বধর্মে হননং শ্রেয়" এই ভাবে বিকৃত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, বাক্যটিরও তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে, "ধর্ম্ম অনুশাসনের যে অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা যায়, তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তা'র কোন প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিজধর্ম্ম পালন করিবে, ইহাই গীতার উক্ত বাক্যটির উদ্দেশ্য। অর্থটির মধ্যে বিশেষ কিছু জটিলতা নাই। এই সহজ অর্থই সকলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—ইহাদের কোনও বর্ণের কাজ কি সমাজে অপ্রয়োজনীয়? ব্রাহ্মণের কাজ সমাজকে সৎশিক্ষা দেওয়া, নিজে ধার্মিক হওয়া, এবং সাধারণের মধ্যে ধর্মভাব বিস্তার করা। ক্ষত্রিয়ের কাজ সমাজকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বৈশ্যের কাজ কৃষি বাণিজ্য, শূদ্রের কাজ পরিচর্য্যা। প্রত্যেক বর্ণের কাজই সমাজে প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন 'প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্ করতে হবে' এ কথা কেমন করিয়া উঠে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, চীন ও জাপান যদি য়ুরোপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে, তাহা হইলে ভারতবাসী ইংরাজের ভৃত্য হইয়া চীন ও জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবে, কারণ ভারতবাসী কেবল শিখিয়াছে,— "শূদ্রের বহু যুগের দীক্ষা"—স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। কিন্তু যুদ্ধ করা ত শূদ্রের দীক্ষা নয়, ক্ষত্রিয়ের দীক্ষা; বেতনভুক সৈনিক হইয়া যুদ্ধ করাও ক্ষত্রিয়ের কাজ, শূদ্রের নহে। আরও এক কথা—শাস্ত্র ক্ষত্রিয়কে ন্যায় যুদ্ধই করিতে বলিয়াছে, অন্যায় যুদ্ধ করিতে বলে নাই— ধর্ম্যাৎ হি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে। সকলেই জানেন যে, হিন্দুশাস্ত্র বরাবর বলিয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রেও ন্যায়,

ধর্ম, দয়া, ক্ষমা এ সকল পরিত্যাগ করিবে না। এই সকল শাস্ত্রোপদেশ যে ক্ষত্রিয়রা পালন করিত না, তাহা নহে। প্রত্যুত যুদ্ধের সময়ও হিন্দুবীর এই সকল গুণাবলির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; তাহা দেখিয়া বৈদেশিকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। রাণা কুম্ভ মালব এবং গুর্জ্জরের মিলিত সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া মালবরাজ মামুদকে বন্দী করিয়া চিতোরে আনিয়া উপঢৌকন দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এই কথার উল্লেখ করিয়া Todd বলিয়াছেন, Such is the character of the Hindu: a mixture of arrogance, political blindness, pride and generosity. To spare a prostrate foe is the creed of the Hindu cavalier, and he carries all such maxims to excess.

অনুবাদ :—"হিন্দুর চরিত্র এইরূপ : দর্প, রাজনৈতিক অন্ধতা, অহঙ্কার এবং দয়ার সংমিশ্রণ। পরাস্ত শত্রুকে ক্ষমা করা হিন্দুর ধর্ম, এবং সে এই সকল ধর্মমতকে অতিরিক্ত মাত্রায় অনুবর্ত্তন করে।" রবীন্দ্রনাথ যে কল্পনা করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে হিন্দুর বর্ণ-বিশেষকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছে বলিয়া হিন্দু অন্ধভাবে যুদ্ধ করিতে শিখিয়াছে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না, ইহা যথার্থ নহে। চীন ও জাপান য়ুরোপের সহিত যুদ্ধ করিলে হয় ত বেতনভুক ভারতীয় সৈনিক ইংরাজের হইয়া লড়াই করিতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মের অনুশাসন তাহার কারণ নহে; তাহার কারণ, সকল দেশেই এমন লোক পাওয়া যায়, যাহারা বেতন পাইলে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, সে আজ্ঞা ন্যায় বা অন্যায় তাহা বিচার করিবে না। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে বেতনভুক মুসলমান সৈন্য ইংরাজের ও ফরাসীর হইয়া তুর্কীর বিপক্ষে লড়াই করিয়াছিল—ইহা সকলেই জানে। মুসলমানদের মধ্যে ত জাতিভেদ নাই, তবে এমন হইল কেন? আজ যদি হিন্দুদের জাতিভেদ উঠিয়া যায়, তাহা হইলেই কি ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে বেতনভুক সৈন্য লইয়া যাহার বিরুদ্ধে ইচ্ছা যুদ্ধ করিতে পারিবে না?

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—কথাটিতে খারাপ কিছুই নাই। নিজের ধর্ম, নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে, তাহাতে প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার। ইংরাজিতে যাহাকে বলে to die at the post of duty—মনুও এই কথাই বলিয়াছেন,

ন সীদন্নপি ধর্মেন মনো ধর্মে নিবেশয়েৎ। ৪।১৭১

"কষ্ট এবং অভাবে পড়িলেও শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মপথ কখনও পরিত্যাগ করিবে না।" এই ধরণের কথা Ruskinএর লেখাতেও আছে। তাঁহার Unto this last হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

Five great intellectual professions, relating to daily necessities of life, have hitherto existed,—three exist necessarily in every civilized nation :

The Soldier's profession is to defend it,
The Pastor's, to teach it,
The Physician's, to keep it in health,
The Lawyer's, to enforce justice in it,
The Merchant's, to provide for it,
And the duty of all these men is, on due occasion to die for it,
"On due occasion", namely,
The soldier, rather than leave his post in battle,
The Physician, rather than leave his post in plague,
The Pastor, rather than teach falsehood,
The Lawyer, rather than countenance injustice.

For, truly, the man who does not know when to die, does not know how to live.

মর্ম :—পাঁচ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছে,

সৈনিক,—	তাহার কাজ সমাজকে	রক্ষা করা
ধর্মযাজক,	"	" শিক্ষা দেওয়া
চিকিৎসক,	"	" সুস্থ রাখা,
আইন ব্যবসায়ী	"	সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা
বণিক	"	সমাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা।

এই সকল লোকের কর্ত্তব্য হইতেছে প্রয়োজন হইলে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য প্রাণত্যাগ করা,—

প্রয়োজন হইলে,—অর্থাৎ

সৈনিকের, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করিয়া,
চিকিৎসকের, ব্যাধির স্থান পরিত্যাগ না করিয়া,
ধর্ম্ম যাজকের, মিথ্যা শিক্ষা না দিয়া,
আইনব্যবসায়ীর, অবিচারে প্রশ্রয় না দিয়া,

—কারণ যে মানুষ যথোপযুক্ত সময়ে প্রাণত্যাগ করিতে জানে না, সে বাঁচিতেও জানে না।

Ruskin এখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে কর্ত্তব্যের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন, গীতার "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" সেই আদর্শই প্রচার করিতেছে।

যাহার যে খুসী বৃত্তি অবলম্বন করিলে যে সমাজের কল্যাণ হয় না, এবং কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে তাহা ঠিক করিয়া সেই মত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে যে সমাজ শীঘ্রগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহাও রাশ্‌কিনের মত। এ বিষয়ে তিনি Political Economy of Art প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—National law has hitherto been only judicial ; contented, that is, with an endeavour to prevent and punish violence and crime ; but as we advance in our social knowledge we shall endeavour to make our government paternal as well as judicial ; that is, to establish such laws and authorities as may at once direct us in our occupations, protect us against our follies and visit us in our distress.

অনুবাদ :—এ পর্য্যন্ত আইন কেবলমাত্র বিচার করিয়াছে,—অর্থাৎ সমাজে উপদ্রব এবং পাপে বাধা দিয়া এবং দণ্ড দিয়াই সন্তুষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক জ্ঞান যত বাড়িবে, তত সামাজিক শাসন পারিবারিক শাসনের অনুরূপ হইবে। এরূপ আইন এবং ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহা আমাদের জীবিকার পথ নির্দেশ করিবে, মূর্খতার হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে এবং বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করিবে।

পুনশ্চ রাস্কিন বলিয়াছেন,—the notion of Discipline and Interference lies at the root of all human progress or powef ;—the "Let Alone" principle is, in all things which man has to do with, the principle of Death" [The Political Economy of Art] অনুবাদ :—মানবের সকল প্রকার উন্নতি ও শক্তির মূলে নিয়ম এবং শাসন বর্ত্তমান থাকে। মানবসংক্রান্ত সকল বিষয়েই স্বেচ্ছাচার হইতেছে মৃত্যুর পথ।

রাস্কিনের মতে, কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহা শৈশবেই পরীক্ষা করিয়া স্থির করা উচিত ; এবং তদনুযায়ী তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। রাস্কিন যাহা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে বলিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্র তাহা জন্ম দ্বারা নির্দিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, পিতামাতা এবং পূর্বপুরুষদের মধ্যে যেরূপ প্রবৃত্তি বেশী প্রবল ছিল, সন্তানের সেইরূপ প্রবৃত্তি সহজাত হইবার সম্ভাবনা অধিক, এবং শৈশব হইতে সে যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পালিত হয়, তাহার প্রভাব সেই সকল প্রবৃত্তির অধিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিবার পক্ষে অনুকূল। একটি শিশু বড় হইয়া কোন্ বৃত্তির উপযোগী হইবে—পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হয়। জন্ম এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা (heredity and environment) প্রকৃতি যেরূপ নির্ভুল ভাবে তাহা নির্দেশ করিয়া দেয়, পরীক্ষা দ্বারা সেরূপ নির্ভুল নির্বাচন সম্ভব নহে। হিন্দুশাস্ত্রে প্রকৃতির এরূপ আচরণের যুক্তিসঙ্গত কারণও নির্দেশ করা হইয়াছে। সে কারণ হইতেছে পূর্বকৃত কর্ম্মফল ; যাহার যেরূপ কর্ম্মফল, যেরূপ প্রবৃত্তি, সে তাহার অনুরূপ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। জন্ম একটা অহেতুক ঘটনা নহে। পৃথিবীতে অহেতুক ঘটনা কিছুই ঘটে না। একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন ; Birth is no more an accident than the delivery of a letter to the person whose address is written on the envelope. "পত্রের উপর যাহার ঠিকানা লেখা থাকে তাহার নিকট পত্র পৌঁছান যেমন দৈবাধীন ব্যাপার নহে, জন্মও সেইরূপ দৈবাধীন ব্যাপার নহে।" আর এক বিষয়ে রাস্কিনের প্রস্তাব অপেক্ষা বর্ণাশ্রমধর্ম শ্রেষ্ঠ। সমাজে কতকগুলি অত্যাবশ্যক কাজ আছে ; সেগুলি

সাধারণতঃ হীন কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। মানবকৃত কোন ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের কতকগুলি লোককে হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিলে, অসন্তোষ উৎপন্ন হইবেই,—সে ব্যবস্থা যতই উৎকৃষ্ট হউক। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থাতে সেরূপ অসন্তোষ উৎপন্ন হয় না। কারণ, হিন্দু বিশ্বাস করে যে, সে পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলে যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভগবানের ইচ্ছা যে সে তদনুরূপ বৃত্তি গ্রহণ করিবে। বাস্তবিক সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা এইরূপ বিশ্বাসে সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া আসিতেছে। অথচ ইহাতে যে তাহাদের নৈতিক অবনতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, Sir Thomas Munro এবং মহাত্মা গান্ধির মতে The masses of India are more cultured than any in the world.—"ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর অন্য সকল দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক সভ্য।" পিতৃমাতৃভক্তি, দাম্পত্য প্রেম, সন্তানবাৎসল্য, অহিংসা, ঈশ্বরভক্তি—এই সকল উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুর মধ্যে প্রবলতর। হীন বৃত্তি সত্ত্বেও যে নৈতিক অবনতি হয় না, তাহার কারণ এই যে দরিদ্র লোকেরাও জানে যে তাহাদের নির্দিষ্ট বৃত্তি পালন করিয়াও তাহারা জীবনের যাহা উদ্দেশ্য—ঈশ্বরলাভ, তাহা সাধন করিতে পারে। কারণ ঈশ্বর সমদর্শী,—কোন বৃত্তিকে তিনি হীন চক্ষে দেখেন না। যে কার্য্যই হউক, ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে করা যাইতেছে, এইরূপ মনে করিয়া করিলে, মনের অবনতি হয় না, প্রত্যুত চিত্ত শুদ্ধ হয়।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

"যাঁহা হইতে প্রাণীদের উৎপত্তি, যিনি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, নিজ কর্ম দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলে মানব সিদ্ধি লাভ করে।" শূদ্র যখন অন্য বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে তখন ভাবিবে, সকলেই ত ভগবান হইতে উৎপন্ন, আমি এই পরিচর্য্যা ভগবানেরই করিতেছি—ইহা ত লজ্জার বিষয় নহে, সৌভাগ্যের বিষয় ; দুঃখের বিষয় নহে, আনন্দের বিষয়। এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করিলে চিত্তের অবনতি হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বহস্তে পায়খানা পরিষ্কার করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধি এই কার্য্য করিতে গর্ব অনুভব করেন। হিন্দুর সমাজতত্ত্বের মর্মকথা ইঁহারা অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই ইঁহারা এরূপ আচরণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এরূপ ভাব দেখা যায় না। তাহারা ভাবে,—অন্যের পরিচর্য্যা করা লজ্জাকর,—আমার অন্য কিছু বড় কাজ করিবার সুযোগ নাই বলিয়াই এরূপ করিতেছি। বড় লোকেরা পরিশ্রম না করিয়াও কত রকম সুখভোগ করিতেছে, আমি এত কষ্ট করিয়াও কত কষ্টে দিনপাত করিতেছি। এইরূপ মনোভাব হইলে অসন্তোষ ও মানসিক অবনতি অনিবার্য্য।

কিন্তু হিন্দুধর্ম হিন্দুকে অন্যরূপ ভাষিতে শিখাইয়াছে। সে বলে—

প্রাতরুত্থায় সায়ান্তং সায়মারভ্য প্রাততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব পূজনং তব॥

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত যাহা করি, হে জগন্মাতঃ, সে সকলই তোমার পূজা।

দেবেশ চৈতন্য মায়াদিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে দেবেশ, চৈতন্যময়, হে আদিদেব, লক্ষ্মীকান্ত, বিষ্ণো, তোমরা আজ্ঞাতেই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার প্রিয়সাধন করিবার জন্য সংসার যাত্রা নির্বাহ করিব।

অন্যায় কার্য্য করিবার সময় এরূপ মনোভাব লইয়া করা যায় না ; কিন্তু খুব দরিদ্র ব্যক্তিরও নিজ জীবিকার অনুরূপ কর্ম করিবার সময় এইরূপ মনোভাব লইয়া করা সম্ভব। এই সকল শাস্ত্রোপদেশ কেবল পণ্ডিতের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। যাত্রা, গান, কথকতার মধ্য দিয়া এই সকল মূল্যবান তত্ত্ব নিরক্ষর দরিদ্রের মধ্যেও প্রচারিত হইয়াছে। এজন্য নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও ধর্মভাবের অভাব হয় নাই। তাহাদের মধ্য হইতেও অনেক সাধু মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।

যে সকল সমাজে এরূপ ধর্মানুশাসন নাই, যেখানে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বাধ্য হইয়া হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, সেখানে অসন্তোষ, ঈর্ষা, বিদ্রোহ অনিবার্য্য। সেখানে সামাজিক শান্তি দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার

করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি বলিয়াছেন, "বাধ্য হ'য়ে কাজ করা অপমানকর।" "রাজশাসনে যদি পাকা করা হ'ত তাহ'লেও তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকৃত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনই থামত না।" "ধর্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করারও মধ্যে তা'র একটা আত্মপ্রসাদ আছে" "আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্ম-শাসনের অন্তর্গত ক'রে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ এবং বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে।" "তাতে মানুষকে শান্ত করে" "ধর্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে।" কিন্তু এসকল সত্ত্বেও তিনি বৃত্তি বিষয়ে ধর্মানুশাসনের অত্যন্ত বিরোধী। তিনি আশঙ্কা করেন—এইরূপ ধর্মানু-শাসনের ফলে আচারের চাপে আধ্যাত্মিকতার প্রাণ বহির্গত হয়, এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সুবিধা পাইলেই দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। আমরা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এরূপ হইবার কান কারণ নাই; এবং অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয় নাই।

ভারতবর্ষে কত দিন ধরিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম প্রচলিত আছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। উপনিষদে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। উপনিষদ যে অন্ততঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বে-কার, ইহাতে কাহারও বোধ হয় সন্দেহ নাই। প্রাচীন-পন্থীদের মতে জাতিভেদ ৩০০০ বৎসরের অনেক বেশী দিন ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। কিন্তু জাতিভেদ যে ৩০০০ বৎসর ধরিয়া প্রচলিত আছে, তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করেন না। ভারতের এই তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস সবটাই লজ্জাকর নহে। অতীত ইতিহাসে গৌরব করিবার বিষয় হিন্দুর যথেষ্ট ছিল। উপনিষদ, ষড়দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা,—কালিদাস, ভবভূতি, আর্য্যভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, তুলসীদাস, শ্রীচৈতন্য—কোনারক, ভুবনেশ্বর, এলোরা, অজন্তা, তাঞ্জোর, মাদুরা,—অতীত ভারতের কয়েকটিমাত্র উজ্জ্বল নিদর্শন। ভারতের মুসলমান অধিকারের পূর্বে অন্ততঃ ২৩০০ বৎসর—বংশগত বর্ণাশ্রমধর্ম সত্ত্বেও ধর্ম, দর্শন, কাব্য, গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, বয়ন প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা এবং শিল্পে ভারতবর্ষ যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ ইহা এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম, দর্শন ও কাব্যে তাহারা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, পৃথিবীর কোন যুগে কোন দেশ তাহা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। এই সকল বিদ্যা এবং শিল্পের বংশগত ভাবেই চর্চ্চা করা হইয়াছিল। হিন্দু মনে করে—বংশগতভাবে চর্চ্চা হইয়াছিল বলিয়াই এত উন্নতি হইয়াছিল। যে সকল কারণে সে এইরূপ মনে করে, এই প্রবন্ধের পূর্বভাগে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বংশগত ভাবে বিদ্যা ও শিল্প-চর্চ্চার ফলে উন্নতি হইয়াছিল—কেহ যদি ইহা স্বীকার না-ও করেন, তাঁহাকে অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করিতে হইবে, যে, বংশগত ভাবে বিদ্যা এবং শিল্প-চর্চ্চা হওয়াতে ঐ সকল বিষয়ে উন্নতি লাভের পথে বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। কারণ অন্তরায় হইলে ভারত এত শীঘ্র এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত না।

এরূপ একটা কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, জাতিভেদ প্রথা আছে বলিয়াই হিন্দুজাতির অবনতি হইয়াছে। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া বলেন, তাহা মনে হয় না। কারণ, একটু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পৃথিবীর অপর সকল জাতির তুলনায় হিন্দুজাতির বেশী অবনতি হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। ব্যাবিলনিয়া, কার্থেজ, মিশর ও ফিনিশিয়াতে যে সকল সভ্যতা বিকল্পিত হইয়াছিল, আজ সে সভ্যতা কোথায়? বহু যত্নে মৃত্তিকাস্তরের নিম্ন হইতে খনন করিয়া তাহার যে সকল ক্ষীণ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাদুঘরে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। তাহাদের সমসাময়িক, অথবা তাহাদের অপেক্ষাও প্রাচীন, হিন্দুর সভ্যতা এখনও ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্বে সিন্ধুনদের তীরে দাঁড়াইয়া আর্য্যঋষিগণ যে বেদমন্ত্র গান করিয়াছিলেন, আজিও হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র মন্দিরে এবং বিদ্যালয়ে সে সঙ্গীতের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; প্রাতে এবং সন্ধ্যায় লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ সেই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করেন; উপনয়ন এবং বিবাহাদি সংস্কারে সেই সকল মন্ত্র উচ্চারিত হয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে আশ্রমের পর্ণকুটীরে বসিয়া প্রাচীন হিন্দু ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে

যে সকল মহীয়ান সত্য উপলব্ধি করিয়াছিল, ইংলণ্ড জার্মণি ও ফ্রান্সের মনীষিগণ আজিও বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে তাহার অনুশীলন করিতেছেন। বিজ্ঞানের অত্যুগ্র আলোকচ্ছটায় জগতের আর সকল ধর্ম সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে, কেবল হিন্দুধর্ম হয় নাই; সে যেন ঈষৎ স্মিতবদনে বিজ্ঞানকে বলিতেছে,—বৎস, চরম সত্য নির্ণয় করিতে এখনও দেরী আছে। পরাধীন হইবার পরও ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক চর্চ্চা এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর, নানক, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধি। ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে সত্য, কিন্তু পৃথিবীর আর কোনও জাতি কি হিন্দু অপেক্ষা অধিক দিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে? এতদিন স্বাধীনতা রক্ষা করা দূরের কথা, আর কোনও জাতি হিন্দু জাতির ন্যায় এত দিন নিজ বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারে নাই। যে ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান শক্তি বলিয়া পরিচিত, তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করুন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে জাতি ইংলণ্ডে বাস করিত, সে জাতি আজ কোথায়? Saxonরা আসিয়া ইংলণ্ড অধিকার করিবার পর তাহারা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছে, কিংবা Saxonদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সেই Saxon জাতিই বা কত দিন নিজ বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিল? তাহারা প্রথমে Daneদের দ্বারা, পরে Normanদের নিকট বিজিত হইল এবং ক্রমশঃ Normanদের সহিত মিশিয়া গেল। দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড চারবার বিজিত হইল এবং দুইটি জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। য়ুরোপের অন্যান্য জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও এইরূপ অবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রিটনদের, স্যাক্সনদের, রোমানদের, গ্রীকদের যে ধর্ম ছিল, সে ধর্ম এখন কোথায়? হিন্দু জাতি ২৫০০ বৎসর ধরিয়া স্বাধীন ছিল, ৩।৪ সহস্র বৎসর ধরিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য এবং নিজ ধর্ম রক্ষা করিয়াছে, সুতরাং অপর সকল জাতির ইতিহাসের তুলনায় ভারতের ইতিহাস অধিকতর লজ্জাজনক নহে। মহামতি Todd লিখিয়াছেন,—

What nation on earth would have maintained the semblance of civilization, the spirit or the customs of their forefathers, during so many centuries of overwhelming oppression but one of such singular characters as the Rajpoots? * * * How did the Britons at once sink under the Romans, and in vain strive to save their groves, their Druids or their altars of Bal from destruction! To the Saxons they alike succumbed; they, again, to the Danes; and this heterogenous to the Normans. Empire was lost or gained by a single battle, and the laws and religion of the conquered merged in those of the conquerors. Contrast with these the Rajpoots: not an iota of their religions and customs have they lost through many a foot of land. [Annals of Mewar, Chapter V]

ভূদেববাবু বলিয়াছেন, "কোনও সমাজ অন্য কর্তৃক বিজিত হইলেই যে তাহাকে অপকৃষ্ট বলিতে হয়, তাহা নহে। মূর্খ স্পার্টিয়েরা পণ্ডিত এথিনীয়দিগকে জয় করিয়াছিল, অসভ্য ম্যাকিডোনিয়েরা গ্রীকদিগকে অধীন করিয়াছিল, বন্য তাতারীয়েরাও সুসভ্য চীনীয়দিগকে পরাজয় করিয়াছিল, অসভ্য বর্ব্বরজাতিয়েরা রোম সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, পাণ্ড পাল্যোপজীবী আহমেরা সুসমৃদ্ধ আসাম দেশ অধিকার করিয়াছিল। যে যুদ্ধে হারে সে হীন, এটা গোঁয়ারের কথা, বিচক্ষণ লোকের কথা নয়।" (সামাজিক প্রবন্ধ ৩৫—৩৬ পৃঃ) "ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?" এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"আরবদেশীয়রা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী, যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে তখনই সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরবেরা মিশর ও সিরিয়দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয়বৎসর মধ্যে, পারশ্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণ অধিকার করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিনশত বৎসর ধরিয়া যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই।" পুনশ্চ

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "যখন কোন প্রাচীন দেশের নিকটে নবঅভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থান করে, তখন প্রাচীনজাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি—প্রাচীন য়ুরোপে রোমকেরা, এসিয়ায় আরব্য এবং তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যতদূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্ত্তৃক যত অল্পকাল মধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারশ্য, তুরস্ক এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষে বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খৃঃ পূর্বাব্দে প্রথম রোমকদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খৃঃ পূর্বাব্দে অর্থাৎ ১১০ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্বরোমক বা গ্রীস সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তুরকীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক—যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ ঃ—তাহাই ২৮৬ খৃঃ অব্দে উত্তরীয় বর্বর জাতি কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ প্রথম বর্বরবিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খৃঃ অব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে ৫২৯ বৎসর পরে শাহাবুদ্দিন ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তর ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দিন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্য জাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফল-যত্ন হইয়াছিল গজনীনগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর ভারত অপহরণ করে তাহারা পাঠান বা আফগান। পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্বগত আরব্য এবং তুরকীয়দের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য তুরকী এবং পাঠান এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচশত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।"—বিবিধ প্রবন্ধ—ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?

আমার এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, হিন্দু জাতির কোন দোষ নাই, ইহাদের সব ভাল। হিন্দু জাতির মধ্যে যে পরিমাণে স্বার্থ, দলাদলি, নিরুদ্যম প্রভৃতি প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সে পরিমাণে তাহাদের জাতীয় উন্নতির বাধা পড়িয়াছে। সে সকল দোষ উঠাইয়া দিন এবং তাহার স্থানে নিঃস্বার্থপরতা, ঐক্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি সঞ্চারিত করা হউক। জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ঘৃণা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি যে সকল দুর্নীতি স্থান পাইয়াছে, সে সকল উঠাইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের যৌবন যেমন চিরদিন থাকে না, কালক্রমে জরা বা বার্দ্ধক্য আসে, একটা জাতিরও অবস্থা সেইরূপ চিরদিন সমান থাকে না, কালের প্রভাবে তাহার কখনও উন্নতি কখনও অবনতি হয়। অবনতি হইয়াছে বলিয়াই যে তাহার সামাজিক ব্যবস্থা সব খারাপ এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। পরাধীন জাতির পক্ষে বিজেতার অনুকরণ অনেকটা স্বাভাবিক। সে মনে করে বিজেতার আচার ব্যবহার যাহা কিছু সব ভাল। সে বিজেতার অনুরূপ বেশ পরিধান করিতে ইচ্ছা করে, মাতৃভাষার অনাদর করিয়া বিজেতার ভাষার আদর করে, ধর্ম্ম এবং সমাজ বিষয়েও বিজেতার অনুকরণ করে। তাহার সমাজের ব্যবস্থাগুলি যদি বিজেতার সমাজে না থাকে সে মনে করে সেগুলি বড় খারাপ, সেগুলি নাই বলিয়াই বিজেতৃগণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেগুলি আছে বলিয়াই তাহাদের পরাধীনতা ঘটিয়াছে। এইরূপ বিকৃত দৃষ্টিতে ভাল ব্যবস্থাগুলিও খারাপ বলিয়া মনে হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম হিন্দুসমাজকে যে সুগভীর শান্তি দিয়াছে, আজ আমরা তাহার মূল্য বুঝিতে পারিতেছি না; যখন হারাইব তখন বুঝিব কি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি।

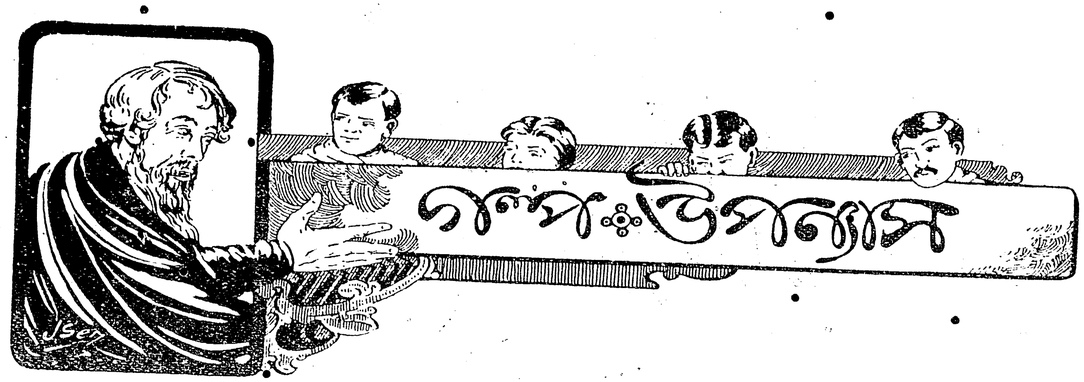

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭

লীলার পীড়া দিন-দিন দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তিন চারি দিন পরে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ডবল নিউমোনিয়া—জীবনের আশা অতি অল্প, কি হয় বলা যায় না।

মিঃ রায়ের আনন্দময় ভবনে শোক ও আতঙ্কের ছায়া দিন দিন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, লীলার জীবনের আশঙ্কায় সকলের চিত্তই কাতর ও সন্ত্রস্ত, দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় মিসেস রায়ের দর্পিত ও উদ্ধত প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি লীলার ঘরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারিতেন না, নিজের ঘরেও শান্তি ছিল না; ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেবল নসদের নিকট হইতে তাহার সংবাদ লইয়া অধীর ভাবে তাঁহার সময় কাটিত। বীণাও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে সর্ব্বক্ষণ তাহার তত্ত্বাবধান করিত।

বাড়ির চাকর-দাসীরা তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত ও ম্রিয়মাণ; তাহারা তাহার বিপদ কাটিয়া যাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা ও নানা দেবস্থানে মানসিক করিয়া বেড়াইতেছিল।

ক্ষান্ত তাহার অতি প্রিয় পরের চর্চ্চা, ও কলহ-বিবাদ ভুলিয়া দিন-রাত্রি লীলার বিছানার পাশে পড়িয়া থাকিত।

২৭

নর্সেরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সে ঘর হইতে বাহির করিতে পারিত না।

কিন্তু লীলার অসুখে যে সর্ব্বাপেক্ষা মনে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাকে সে সমস্ত গোপন করিয়া প্রতিদিনের মতই সহজ ভাবে তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম্ম বজায় রাখিয়া বেড়াইতে হইত।

সে কিরণ। সে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে বীণার নিকট হইতে লীলার সংবাদ জানিয়া যাইত। যে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় তাহার মন অশান্ত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, বাহ্যিক ভাবে তাহা কিছুই প্রকাশ পাইত না। বীণা নিশ্চয় মনে জানিত, লীলার অসুখের ছলে কিরণ তাহারই জন্য এ বাড়ীতে আসে।

অবশেষে এক দিন লীলার জীবনের সঙ্কট মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীতে সকলেই সেদিন কি একটা অতর্কিত আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন,—কখন কি হয়, কখন কি শুনিতে হয়, এইরূপ একটা ভীত-উৎকণ্ঠিত ভাব। সকলে নিঃশব্দে চলা-ফেরা করিতেছে,—জোরে কথাটি কহিবারও সাহস কাহারও ছিল না।

কিরণ সেদিন সব ভুলিয়া সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অনাহারে একাসনে কাটাইয়া দিল। লীলার জীবনের কোন আশা ছিল না, তবু সে এ কথা কিছুতেই মনে আনিতে পারিতেছিল না। লীলার মৃত্যু! অসম্ভব! এ কথা ভাবিতে গেলে একটা তীব্র বেদনা তাহার অন্তরে ঝড়ের মত ঠেলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল।

সমস্ত দিন একই ভাবে কাটিল। দিন-ভোরের কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত যুদ্ধের পর রাত্রি নয়টার সময় ডাক্তারেরা প্রকাশ করিলেন—তাহার সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে; এ যাত্রা সে বাঁচিয়া যাইবে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষান্ত আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে কিরণকে সে সংবাদ দিয়া আসিল। কিরণকে সে বড় ভাল বাসিত।

নিঃশব্দে কিরণের নয়ন হইতেও বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। গভীর কৃতজ্ঞতায় ও পরিপূর্ণ শান্তিতে সে যুক্তকরে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল!

দীর্ঘ চল্লিশ দিনের পর লীলা প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিল! প্রথমে তাহার কিছুই মনে পড়িল না,—শুধু সে বিহ্বলের মত চাহিয়া নর্সদের অচেনা মুখ ও গৃহের সাজ-সজ্জা দেখিতেছিল। একবার সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, কিরণ!

নিঃশব্দে নর্স আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল; কিরণ কে, তাহা সে জানে না; জানিলেও, ডাক্তারের বিশেষ নিষেধ, রোগীর ঘরে নর্স ছাড়া আর কেহ যাইতে পারিবে না। সে শুধু লীলাকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া স্থির হইয়া থাকিতে অনুরোধ করিল। লীলাও গভীর ক্লান্তিতে আবার তখনি ঘুমাইয়া পড়িল।

ইহার পর হইতে অর্দ্ধতন্দ্রাবস্থায় লীলা প্রায়ই দেখিত,—সেদিনের রাত্রির সেই বিজন কক্ষ, মৃদু স্তিমিত আলোক, তাহার সেই রুগ্ন-শয্যার পাশে কিরণের সেই উদ্বেগ-কাতর অবিচল স্থির গম্ভীর মুখ! লীলার শত দোষ সত্ত্বেও তাহার প্রতি কিরণের কি প্রবল স্নেহ; তাহাকে একটু সুস্থ রাখিতে, একটু আরামে রাখিতে তাহার কি একাগ্র প্রয়াস!

ধীরে ধীরে লীলা যতই সুস্থ হইতে লাগিল, ততই তাহার মনে কিরণকে দেখিবার ইচ্ছা অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইত, যেন তাহাদের বিচ্ছেদের পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে!

আর একজনের কথা মনে হইলে সে চঞ্চল হইয়া উঠিত। বেচারা অরুণ! সে হয় ত তাহার এ অসুখের কথা জানেও না! এত দিন তাহাকে না দেখিয়া সে হয় ত তাহাকে আর সব মেয়েদের মতই চঞ্চল ও খামখেয়ালি ভাবিতেছে! সে না গেলে অরুণের যে সবই নষ্ট হইয়া যাইবে! সে ছাড়া আর কে তাহাকে জীবন্ত ও উৎফুল্ল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে!

অরুণের কথা মনে পড়িলেই লীলা ভাবনায় উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিত; সে নিজের মনে জোর করিয়া বলিত, আমায় বাঁচতেই হবে; আমি কখনো মরবো না! যে কাজ আমি আরম্ভ করেছি, আমি না বাঁচলে সে কাজ শেষ করবে কে? এই ইচ্ছার প্রাবল্য ও মনের শক্তি তাহার দুর্ব্বল রুগ্ন শরীরে তড়িতের মত শক্তি সঞ্চার করিত, দিন দিন তাহার উন্নতি দ্রুততর হইতে লাগিল।

লীলার পীড়ার সময় আর এক জন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ করা মিঃ রায়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি এই ঘটনা বাহ্যিক শান্তভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবু তাঁহার গম্ভীর মুখে চিন্তা ও বেদনার ছায়া স্পষ্টই দেখা যাইত। কার্য্যস্থল হইতে আসিয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে লীলার শিয়রে বসিয়া থাকিতেন।

'তুমি আমাদের বড় ভাবিয়ে তুলেছিলে' লীলা সারিলে একদিন সকালে মিঃ রায় তাহার বিছানায় বসিয়া তাহার শীর্ণ হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার জন্য যে ভাবনা হয়েছিল! যা হোক্ এবার খুব শীঘ্র শীঘ্র সেরে উঠবে, কেমন? আমি শীঘ্রই টুর দিতে বেরোব—ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, তুমি গায়ে বেশ বল পেয়েছ! তখন একটা পার্টি দেওয়া যাবে। তোমার অসুখের সময় যে সব বন্ধু-বান্ধব সর্ব্বদা খোঁজ খবর নেওয়া, দেখা-শোনা করেছেন, তাঁদের সব তুমি সে দিন নিজে আদর অভ্যর্থনা করবে—কি বল?'

লীলা এ কথায় বিশেষ তৃপ্তি পাইল না, বরং সে একটু ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আবার তুমি এর মধ্যে বাইরে যাবে? কি যে তোমার এত কাজ, আমি তো কিছু বুঝতে পারি না। তা কবে যাবে? ফিরতেই বা কতদিন লাগবে তোমার?

মিঃ রায় একটু হাসিয়া তাহার উৎসুক মুখের দিকে, চাহিলেন, বলিলেন, কেন বল ত, এ খোঁজ হচ্ছে?

লীলা বলিল, তুমি হাসছ; সত্যি বলছি—তুমি চলে গেলে বাড়ীতে একটুও ভাল লাগে না আমার। বল—কত দিনে ফিরবে?

মিঃ রায়ের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি লীলার পাণ্ডুর গাল দুটি টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, কিছু ভেবো না! আমি যত শীঘ্র পারি, আমার এই ছোট্ট মা-টির কাছে ফিরে আসবো। আমিই কি তোমায় একলা ফেলে বেশি দিন থাকতে পারি?

লীলা আর কোন উত্তর করিল না। সে ক্লান্ত ভাবে চোখ বুজিয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। মিঃ রায় ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে লীলা বলিল, বাবা, কিরণকে আজ সন্ধ্যার সময় একবার পাঠিয়ে দেবে? ডাক্তার এখনো আমায় খালি-খালি একলা থাকতে বলে। আমি যদি আধ ঘণ্টা তার সঙ্গে দুটো একটা কথা বলি, তাতে আমার এমন কি ক্ষতি হবে বল ত?

মিঃ রায় কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, কি দরকার তোমার তাকে লিলি? তুমি এখনো বড় দুর্ব্বল কি না, তাই ডাক্তার—

লীলা বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, না বাবা, না, আমি নিজে একবার তাকে দেখতে চাই। আমার গোটা কতক কথা বলবার আছে।

সে দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তুমি একবারটি তাকে আধ ঘণ্টার জন্য পাঠিয়ে দেবে বল? দেখো তুমি—আমার তাতে কিছুই ক্ষতি হবে না। দেবে তো? বল!

এ আবদার নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা জজসাহেবের ছিল না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা; আচ্ছা; যদি সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে গিয়ে তার দেখা পাই তাহলে পাঠিয়ে দেব! কিন্তু মনে রেখো—বেশি বকতে পাবে না, খবরদার!

২৮

সন্ধ্যার সময় একা বসিয়া লীলা কিরণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার মুখ তখনো একেবারে রক্তশূন্য, সাদা। প্রচুর রুক্ষ কালো চুল দুইটি বিনুনি করিয়া মাথার দুই ধারে জড়ানো। কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ মুখে চোখ দুটি যেন অসম্ভব বড় দেখাইতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কিরণ সেখানে প্রবেশ করিল। সেই মাত্র বিলিয়ার্ড টেবিলে মিঃ রায়ের কাছে লীলার কথা শুনিয়া সে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করে নাই।

মিঃ রায় বলিলেন, লীলা একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তোমার যদি বিশেষ অসুবিধা না হয়, তা হলে বাড়ী যাবার সময় তার সঙ্গে একবার দেখা করে যেও।

অসুবিধা! কিরণের মন সেই মুহূর্ত্তে লীলার কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল! এই আহ্বানটির জন্য সে আজ কত দিন হইতে তৃষিত, পিপাসিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে!

সে খেলা ফেলিয়া সবিনয়ে বলিল, আমি এখনি তার কাছে যেতে চাই! যাব কি?

মিঃ রায় হাসিয়া বলিলেন—এই দেখ; এত তাড়া কিসের? দুজনেই সমান ব্যস্তবাগীশ! তোমার সুবিধামত এক সময় গেলেই হবে! সে জন্য নিজের কাজকর্ম্ম বা আমোদ-আহ্লাদ নষ্ট করা কেন?

আমার এখন কোন কাজ নেই; আর তাকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পাওয়ার চেয়ে আমার কাছে আর অন্য কিছু আনন্দের বিষয় থাকতে পারে না।

কিরণ আর দাঁড়াইল না। নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার ভয় ছিল—বীণা জানিতে পারিলেই, তখনি তাহার সঙ্গে বাড়ী যাইবার আবদার জুড়িয়া বসিবে।

রোগীর ঘরের শেড-ঢাকা স্তিমিত আলোয় কিরণ সেই রাত্রের প্রায় দুই মাস পরে লীলাকে দেখিল,—যেন একটি ঝটিকা-তাড়িত ফুলের মত। শীর্ণ মুখ; তবু সেই মুখে তাহার মনের অদম্য শক্তি ও তেজ পূর্ব্বের মতই অব্যাহত।

আজ আর তাহার কোন সাজসজ্জা ছিল না। তবু কিরণ মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিল—কি সুন্দর!

সে প্রথমে কোন কথা বলিতে পারিল না; শুধু নিঃশব্দে তাহার ক্ষীণ শুভ্র হাতখানি ধরিয়া পাশে বসিল। তাহার এত কথা বলিবার ছিল, কতদিনকার কত বিষয় বলিবার জন্য মনে সঞ্চিত হইয়াছিল যে, সে সময় সে কোন কথাই বলিতে পারিল না।

লীলা খুব সহজ ভাবেই তাহার অভ্যর্থনা করিল। তাহার ব্যবহারে বা কথায় কোনো সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা ছিল না।

সে বলিল—তুমি জান না—একটু জ্ঞান হবার পরই তোমায় দেখবার জন্য আমি কত ব্যস্ত হয়েছিলুম! কত দিন তোমায় ডেকেছি—ওরা কেউ আমার কথা শুনতো না—আজ বাবাকে কত করে বলায় তিনি তোমায় পাঠিয়ে দিলেন।

কিরণ কোন কথা বলিল না—কেবল লীলার মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

তুমি কথা বলছো না কেন? ভাবছো—বেশি বকলে আমার অসুখ হবে? তা নয়; আমি ত এখন বেশ ভালই আছি; খালি দুর্ব্বল বলে চলা-ফেরা করতে পারি না; তুমিও আমার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিলে কিরণ?

লীলার রুক্ষ চুলগুলি কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে কিরণ সস্নেহে বলিল,—সে কথা কি আবার জিজ্ঞেস করতে হয় লীলা? কি করে যে আমার এ সব দিনগুলো কেটেছে, সে তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না।

লীলা প্রীত হইয়া প্রসন্নমুখে বলিল, সে আমি সব জানি। তোমার মত আমাকে আর কেউ এত ভালবাসে না,—এক বাবা ছাড়া আর কেউ নয়; তোমার কাছে কত কথাই যে আমার শোনবার আছে; বুঝেছ ত—কি বলছি আমি? বেচারা অরুণের কথাটাই শোনবার জন্য আমি আরো ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম! সে ভাল আছে ত? আমায় না দেখে সে কি ভাবছে?

সে ভালই আছে! তোমার জন্য সে মনে মনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। আমি তাকে বলেছি—বীণা তার ছোট বোনের অসুখের জন্য বাড়ী ছেড়ে আসতে পারে না। সে তাই বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত মনে আছে।

আহা! বেচারা! কি মন্দ ভাগ্য নিয়েই সে এসেছে! তার কথা মনে হলে আমার যে কি কষ্ট হয়, সে তোমায় আর কি বোলবো! কত বড় মহৎ জীবনটা কি ভাবে নষ্ট হয়ে গেল! কি করে যে তার এই অবশিষ্ট দীর্ঘ জীবনটা কাটবে, আমি তাই ভাবি! তুমি যে ঠিক আমারি মত তাকে ভালবাস, আর তার ব্যর্থ জীবনের দুঃখের কথা আমার মতই মন দিয়ে অনুভব কর, এটা যে আমার কত ভাল লাগে। মানুষের দুঃখ কষ্ট মানুষ হয়ে বুঝবে না, কিম্বা বুঝতে চায় না, এরকম হৃদয়হীন লোকেদের আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না।

কিরণের মন তখন লীলার জন্য ব্যস্ত, মানব-প্রকৃতির তথ্য আলোচনার দিকে তাহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। সে নিজের মনের আবেগে পূর্ণ হইয়া লীলার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

লীলা আপন মনেই বলিতে লাগিল,—আমার এখন নিজেকে কি একলাই মনে হচ্ছে! আরো কত দিনে যে গায়ে একটু বল পাবো, বাইরে যেতে পারবো, তা কিছু বুঝতে পারছি না। দিন রাত একলা থেকে থেকে আর ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই মনে হয়, এ সময় যদি আমার একজন সঙ্গী কেউ থাকতো!

কিরণ তাহার ভাবে-ভরা দীপ্ত দুই চোখ লীলার মুখের দিকে স্থির করিয়া রাখিল!—আমায় যদি বিশ্বাস হয়, তা হলে আমাকে তোমার সমস্ত সুখ-দুঃখের সঙ্গী বলে গ্রহণ করতে পারো! তাহার মনের সমস্ত কথা সে তাহার সেই দীপ্ত দৃষ্টির মধ্য দিয়া বুঝাইতে চাহিতেছিল।

লীলা কিন্তু তাহার কথা বা সে দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিল না। সে ভাবিল, কিরণ তাহাদের অখণ্ড বন্ধুত্বের কথাই বলিতেছে। সে মুগ্ধ হইয়া বলিল, তুমি চিরদিনই আমার প্রতি এত সদয়! কত অবাধ্যতা করেছি, কত দোষ করেছি তোমার কাছে, যখন মনে হয়, তখন ভাবি, আমি তোমার এত স্নেহ পাবার উপযুক্ত নই! তোমার বন্ধুত্ব পৃথিবীর মধ্যে আমার কাছে অমূল্য।

কিরণ ডাকিল—'লিলি'!

সে স্বরে চমকিয়া লীলা তাহার উচ্ছ্বাস বন্ধ করিয়া কিরণের মুখের দিকে চাহিল। তাহার উত্তেজিত মুখ ও জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখিয়া লীলা নিজেও অবাক্ হইয়া গেল!

কিরণ বলিল,—তুমি কি কোন দিনই আমার কথা বুঝবে না লিলি? দেখছো না আমি তোমাকে কত ভালবাসি! কেন শুধু বন্ধুত্ব বলে ভুল করছো? আর কি করে এ কথা তোমাকে বোঝাব বল?

লীলা পাংশুমুখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল! এ কথা যে সে কল্পনায়ও মনে আনিতে পারে না! এ কি অসম্ভব কথা আজ সে শুনিতেছে!

কিরণ বলিল, এখনো বোঝ নি? কত দিন কত

ভাবে তোমায় এ কথা জানাতে চেয়েছি, কিন্তু তুমি কোন দিনই বুঝতে চাওনি! আমিও ভেবেছিলুম, যত দিন নিজ হতে না বুঝবে, তত দিন এ বিষয়ে কথা বলবার কোন দরকার হবে না। কিন্তু আর যে আমি চেপে রাখতে পাচ্ছি না লিলি? আজ তিন চার মাস দূরে থেকে আমার মনের ভাব আমি বেশ বুঝেছি। তুমি জানো না লিলি, আমি তোমায় কত ভালবাসি। তোমায় ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব!

এবার আর বুঝিতে লীলার ভুল হইল না! কিরণের আবেগে উচ্ছ্বসিত আরক্তিম মুখ ও অনুরাগ-দীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে সে প্রথমটা সংজ্ঞাশূন্যের মত নিস্পন্দ হইয়া গেল! পর মুহূর্ত্তেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল! তাহার দুর্ব্বল দেহে এ উত্তেজনা সহ্য হইল না। তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিরণ ক্রমে নিজের মনের উচ্ছ্বাস দমন করিয়া শান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। লীলার অবস্থা দেখিয়া সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। লীলার কম্পন তখনো থামে নাই। কিরণ ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল, মাপ করো লিলি! আজ তোমাকে এ কথা বলা আমার উচিত হয় নি! আমার আরো অপেক্ষা করা উচিত ছিল! এখন তুমি এ কথা ভুলে যাও! ভাল করে সেরে উঠলে, তখন আবার এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো—আমি তোমারই! আমার জীবন নিয়ে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো! যত দিন জীবন থাকবে—আমি তোমার।

লীলা কিন্তু কোন কথা শুনিল না; বিহ্বলের মত অবশ ভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিল।

যেমন শত বৎসরের অন্ধকার গৃহে একটি দীপ-শলাকা জ্বালাইলে তাহার সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়, কিরণের একটি স্পষ্ট কথায় তেমনি লীলা তাহার এত দিনের অজ্ঞাত মনোভাব সুস্পষ্ট রূপে বুঝিয়া ভয়ে বিস্ময়ে মুহ্যমান হইয়া রহিল!

আজ সে বুঝিল, সেও কিরণকে ভালবাসে। কিন্তু হায়! এখন—এখন যে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে! এখন বুঝিয়া আর ফল কি?

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া লীলা নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিল! কি অপূর্ব্ব আনন্দে, কি তীব্র বেদনায় তাহার সমস্ত চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে!

কত দিন কত ভাবে কিরণ তাহাকে এ কথা বুঝাইতে চাহিয়াছে! আজ একে একে সেই সব কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল! কেন সে বুঝিল না—কেন সে জানিল না? যখন সময় ছিল, তখন কেন সে বোঝে নাই! আর আজ? আজ যে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে! আজ বুঝিয়া ফল কি?

কিরণকে হারাইয়া কেন যে সে জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়াছিল, কেন যে তাহার মন নিশি-দিন কিরণের জন্য কাঁদিয়া ফিরিত, এত দিন পরে সে আজ তাহা স্পষ্ট অনুভব করিল! মানুষে এমন অন্ধ হইয়া থাকিতে পারে? আজ সে বুঝিল, কিরণ তাহার অন্তর-বাহির জুড়িয়া রহিয়াছে—সেখানে আর কাহারও স্থান নাই। কিন্তু হায়! এত বিলম্বে! এখন যে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—আর বুঝিয়া ফল কি?

যে কিরণকে সে নারীর প্রেমে অনাসক্ত ও অজেয় বলিয়া জানিত, সে তাহারই একান্ত অনুরক্ত! সংসারে যাহাকে করুণায়, শক্তিতে, স্নেহে, বীরত্বে অসাধারণ বলিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই তাহার বন্ধু, সখা—তাহার চির-নির্ভরস্থল কিরণ—সে তাহাকেই ভালবাসিয়া, তাহাদের মধ্যে বয়সের তারতম্যের প্রভেদ ঘুচাইয়া, তাহাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে? কেন সে বুঝিল না, কেন সে জানিল না—জানিলে কি সে কখনো অরুণের কাছে যাইত?

লীলার মনে পড়িল, এক দিন সে গাহিয়াছিল, 'যদি তুমি প্রাচীন হতে, হে বন্ধু! আমি আমার যৌবন বিসর্জ্জন দিতাম, যাহাতে তোমার বয়সের পার্থক্য আমাকে তোমা হইতে দূরে না রাখিতে পারে।' সেদিনও কিরণ এই গান শুনিয়া কি অনুরাগ-বিহ্বল চিত্তে তাহাকে তাহার মনের কথা জানাইতে চাহিয়াছিল! সে দিন লীলা কিছুই বোঝে নাই! ভবিষ্যতে যে এ গান তাহারই জীবনে সত্য হইবে, তাহা কে জানিত?

লীলা বিবেক-বুদ্ধি ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের তাড়নায় মর্ম্মাহত হৃদয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল।

তাহার জীবনের এই আনন্দময় স্বর্গের দ্বার সে নিজের

হাতে চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়াছে! প্রেম, আশা, আনন্দ, সবই জীবন হইতে চিরবিদায় দিয়া তাহাকে এখন কঠোর কর্ত্তব্যের পথই বরণ করিয়া লইতে হইবে! অন্ধ অসহায় অরুণ! তাহার দুঃখময় জীবনের প্রতি করুণা ও মমতায় স্বেচ্ছায় লীলা তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে! তাহার কাছে সে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ—তাহাকে ত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই!

যে সত্য এত দিন তাহার অজ্ঞাত ছিল, তাহা চিরদিনই অজ্ঞাত রহিল না কেন? লীলার সুপ্ত হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া তাহাকে চিরদিনের মত দুঃখ ও নিরাশায় ভাসাইতে কেনই বা আজ সে সত্য আত্মপ্রকাশ করিল? সে এখন কি করিবে? কিরণকেই বা কেমন করিয়া এত বড় আঘাত সে দিবে?

লীলা কোন দিকে কিছু কূল-কিনারা পাইল না, কেবল বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

তাহার এই কম্পিত ও নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া কিন্তু কিরণের মনে আশার সঞ্চার হইতেছিল। সে তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল,—আমি জানি, তুমি কোন দিন অরুণকে ভালবাস নি, তুমি নিজেকে ভুল বুঝেছিলে, নিজের মন তুমি জানতে না, তুমি আমাকে শুধু ভালবাস! আমারই তুমি! আমার কাছ থেকে কেউ তোমায় নিয়ে যেতে পারবে না! লিলি! মুখ তোল! আমার দিকে ফিরে চাও!

লীলার এই উভয়-সঙ্কটের অবস্থা তাহার দুর্দ্দশার সাক্ষ্য দিতেছিল। সে মুখ তুলিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বুঝিতেছিল, তাহার অন্তর কত দুর্ব্বল। কিরণের চিরপ্রিয় সুন্দর মুখের দিকে চাহিলে সে বুঝি আর তাহার প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে পারিবে না।

শান্ত নীরব সন্ধ্যায় তাহারা দুইজনে কতক্ষণ এমনি নীরবে কাটাইল। মাঠ হইতে প্রত্যাগত ধেনুদলের ঘণ্টার শব্দ ও কুলায়-প্রত্যাগত পাখীদের সেদিনের বিদায়-গীতির কলতান কেবল মধ্যে মধ্যে চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

কতক্ষণ পরে কিরণ চুপি চুপি ডাকিল—'লিলি'!

'কি—বল'?

'একবার বল—'তোমায় ভালবাসি!' একটিবার শুধু—একটিবার বল'!

লীলা বাণবিদ্ধের মত আবার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল! 'কিরণ! এটা কি হাসি-তামাসার মত তুচ্ছ কথা'? সে আর কিছু বলিতে পারিল না। বলিবারই বা তাহার কি আছে? অরুণকে সে ছাড়িতে পারে না। কিরণের এই অগাধ প্রেম ও বিশ্বাসে পূর্ণ হৃদয়কেই বা সে কিরূপে এত বড় আঘাত দিবে? নিজের দুঃখ ভুলিয়া কিরণের জন্যই তাহার প্রাণ কাঁদিতেছিল। কিরণ তাহা বুঝিয়া হৃষ্ট হইল।

তখন সে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য গল্প করিতে লাগিল। অরুণের কথা তুলিয়া সে লীলাকে জানাইল, অরুণ তাহার অদর্শনে অত্যন্ত কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়া আছে। সে লীলার স্থান গ্রহণ করিয়া প্রতি দিনই তাহার পাণ্ডুলিপি তাহাকে পড়িয়া শোনায়। আজকাল সে আর বড় একটা বাহিরে বেড়াইতে যায় না,—দিনের বেলা সর্ব্বক্ষণ তাহারই কাছে কাছে থাকে!

অরুণের কথা উঠিলে লীলা বালিশ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। অত্যন্ত লজ্জিত ও অরুণ রাগে রঞ্জিত সে মুখ! সে কিরণের চোখের দিকে না চাহিয়াই অরুণের সম্বন্ধে কথা বলিতে উদ্যত হইল।

তখন নর্স আসিয়া জানাইল—কিরণের বিদায় লইবার সময় হইয়াছে। প্রথম দিনে এত বেশি কথা বলা উচিত নয়।

কিরণ সেদিনের মত বিদায় লইয়া স্বপ্নাভিভূতের মত গাড়িতে গিয়া উঠিল। নবীন অনুরাগে তাহার চক্ষু তখন জ্বলিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

(১)

ভারতে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের অভ্যুদয়

ভারতে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ সর্ব্ব-প্রথম কোন সময়ে আগমন করেন, তাহা ঠিকমত নির্দ্ধারিত করা যায় না। যতদূর জানা যায়, দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে খৃষ্টানদের সর্ব্বপ্রথম অভ্যুদয় হয়। আরমাণীয়দের ইতিহাস আলোচনা করিয়া জানা যায়, তাঁহারাই প্রথম ঐ প্রদেশে আগমন করেন। ভারতে আগত প্রথম যে উল্লেখযোগ্য খৃষ্টান মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায়, তিনি খ্রীষ্টের প্রেরিত শিষ্য টমাস্ (Apostle Thomas)। ইনি সেণ্ট টমাস্ নামেই অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভাস্‌কোডিগামার ভারতে আগমনের ঠিক ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ৭৮০ খৃষ্টাব্দে যখন ক্রানগানোর প্রদেশে শিউরাম নামে একজন দেশীয় রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি মালাবার উপকূলে আগমন করেন। (১) অন্য একজন ঐতিহাসিক থমাসের ভারত-আগমন-কাল ২০১ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন। তিনি এন্টিয়ক্ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ভারতে আইসেন। এই এন্টিয়ক্ প্রদেশেই যিশু-



ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা—বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন খ্রীষ্টান উপাসনাগার

খ্রীষ্টের অনুগামিগণ প্রথম নিজেদের খ্রীষ্টান নাম ধারণ করেন। ইহার পূর্ব্বে এবেনাস্ (Abenus) নামক এক

(১) History of the Armenians in India.

আইরিশ মিশনারি লঙ্কা দ্বীপে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (২)

প্রথম ইয়োরোপীয় যিনি ভারতে আগমন করেন, তাঁহার নাম সিল্যাক্স (Seylax)। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রথম চেষ্টা হইবার সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার সম্পর্কে কোন কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (৩) থমাস্ ভারতের যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, তথায় বহু সংখ্যক দেশীয়কে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের করোমণ্ডেলে তাঁহার কেন্দ্রস্থান ছিল।

এবসিনিয়ার খ্রীষ্টানানুচর বহু দিন ভারতবর্ষে থাকিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং বহু হিন্দুকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন ও অনেকগুলি উপাসনাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (৪)

মালাবারের মালিয়াপুর নামক স্থানে সেণ্ট্ টমাস্ দ্বারা প্রথমে একটি সিরীয় গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে, তথাকার রাজা প্রথমে এ কার্য্যে বাধা প্রদান করেন, কিন্তু তিনি দৈববলে রাজার স্বৈরতা জয় করেন। ইনি তথাকার ব্রাহ্মণদের অত্যাচার হইতে হিন্দুদের রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। ফলে ব্রাহ্মণদের দ্বারা

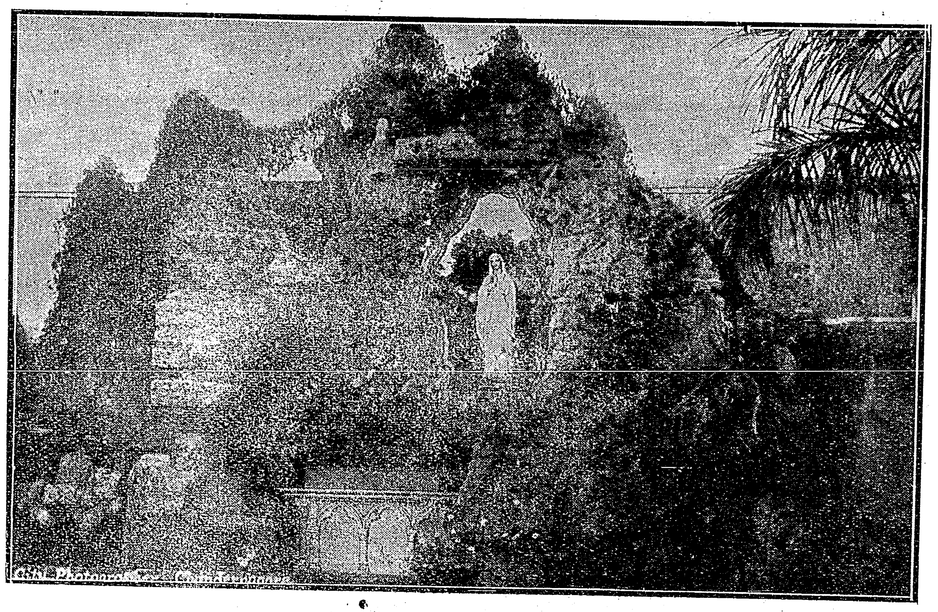

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার ভিতরের দৃশ্য

সেণ্ট্ টমাসের পূর্ব্বেও ভারতে খৃষ্টান ছিল। প্যাণ্টোনাস (Pantonus) নামক এক শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি তাঁহার বহু পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া খৃষ্টান দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিকট হিব্রু ভাষায় লিখিত একখানা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিয়াছিলেন। ফ্রুমেণ্টাস্ (Frumentus) নামক একদল তিনি হত হন। কথিত আছে, সেই সময় তিনি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য এক ছোট পর্ব্বতের কঠিন পাষাণময় বক্ষে নিজ পদাঙ্ক রাখিয়া যান। উহার মাপ লম্বে ষোল ইঞ্চ। উহা এখনও বিদ্যমান আছে।

পোর্টুগিজরা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া সেণ্ট্

(২) The History of India and of the British Empire in the East Vol. I. by E. H. Nolan Ph. D. LL. D.

(৩) The Good Old days of Honourable John Company.

(৪) Promotion of Learning in India by European Settlers. And

The History of India and The British Empire in the East, Vol. I.

টমাসের খৃষ্টান নামে নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহারা সেই সময় এ দেশে বহু খৃষ্টান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে মালবারে খৃষ্টানদের প্রাদুর্ভাব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, সেণ্ট্ টমাস্ দক্ষিণ ভারতে মোট ৩৩০০ খৃষ্টান উপাসনাগার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পোর্টুগালের রাজা তৃতীয় জনের আদেশে, অনুসন্ধান দ্বারা মালিয়াপুরে একটি ভগ্ন ভজনালয়ের মধ্যে সেণ্ট্ টমাসের সমাধি আবিষ্কৃত হয়। তথায় কতকগুলি কঙ্কালাদি পাওয়া যায়। উহা গোয়া নগরীতে লইয়া যাইয়া, তাহার স্মৃতি রক্ষার্থ যে মন্দির নির্ম্মিত হয়, তথায় রক্ষিত হয়। (৫)

বঙ্গেও আরমাণীয়দের আগমন বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়াছিল। জব্ চারনক কলিকাতায় আসিবার ৬০ বৎসর পূর্ব্বে, তাহারা সুতানুটীতে বসবাস করিয়াছিল। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বর্ত্তমান আরমাণী গির্জ্জার পূর্ব্বদিকে প্রায় এক শত গজ দক্ষিণে একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছোট উপাসনাগারে তাঁহারা ভজনা করিতেন। (৬)

বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন খৃষ্ট ধর্ম্মোপাসনার মন্দির হুগলীর ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ (৭)। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে (৮) পোর্টুগীজদের বাঙ্গলায় আগমনের পর, গৌড়ের রাজার প্রীতি উৎপাদনান্তর পাদরি ডি ক্রুজ্ (De Cruz) এর অনুরোধে বাদশা শাহজেহান ৭৭৭ একার নিষ্কর ভূমি পোর্টুগীজদিগের গির্জ্জা নির্ম্মাণার্থ দান করিয়াছিলেন। এই গির্জ্জা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের সময়, অর্থাৎ যে বৎসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দত্ত হয়, সেই বৎসর প্রথম নির্ম্মিত হয়। পরে মোগল কর্ত্তৃক হুগলী আক্রমণের সময়, সম্ভবতঃ ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে উহা বিধ্বস্ত হয় এবং ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মিঃ সোতোর (Mr. Soto) দ্বারা উহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। বাঙ্গলায়

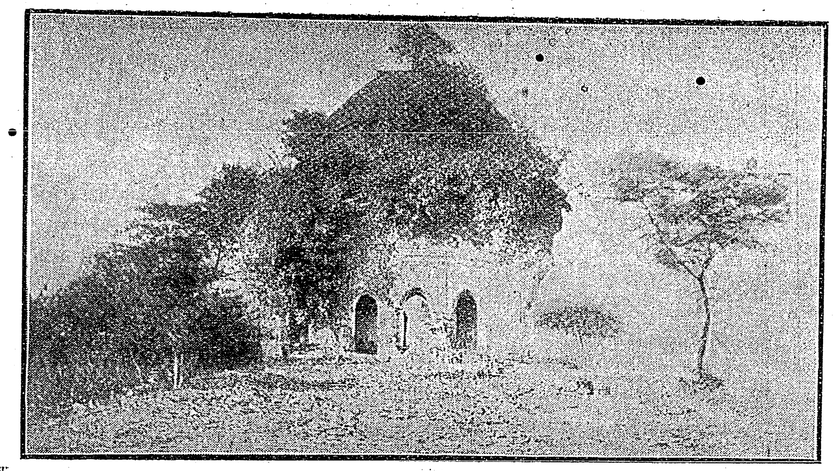

এই হিন্দু মন্দিরটি খ্রীষ্ট উপাসনাগারে পরিণত করা হইয়াছিল—শ্রীরামপুর

ইয়োরোপীয় নির্ম্মিত অট্টালিকার মধ্যেও ইহাই প্রথম। (৯) Notes on the Right bank of the Hooghly নামক নিবন্ধের লেখক বলিয়াছেন, আরমাণীয়েরাই ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম চুঁচুড়ায় গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। এ কথা ঠিক নহে। ওলন্দাজদের নির্ম্মিত একটি অষ্টভুজ গির্জ্জা এখনও চুঁচুড়ায় বিদ্যমান আছে।

কলিকাতায় প্রথম যে গির্জ্জার উল্লেখ পাওয়া যায়, উহা ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে জব্চার্ণক কলিকাতায় আসিবার পর আগষ্টীনিয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টানদের দ্বারা ১০ বিঘা জমির উপর খড় ও মাদুর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময়ে হুগলী ও অন্যান্য স্থানে এই সম্প্রদায়ের বহু খ্রীষ্টান অবস্থান

(৫) Cassell's Illustrated History of India Vol. II, by James Grant.

(৬) Job Charnock the founder of Calcutta and the Armenian Controversy.—The Calcutta Review 1915.

(৭) Calcutta Review, Vol. IV, 1845

(৮) কেহ কেহ বলেন ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ।

(৯) The Portuguese in North India—The Calcutta Review, Vol. V. 1846.

করিতেন। তৎপরে টেঞ্চ (Mrs. Tench) নাম্নী এক মহিলা ১৭০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত গির্জ্জা প্রস্তুত করেন। (১০) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সেণ্ট্ য়্যান্ নামে যে গির্জ্জার উল্লেখ পাওয়া যায়, উহাই উক্ত উপাসনা মন্দির কি না জানি না। উহা বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পশ্চিম পুরাতন দুর্গের পূর্ব্বে ছিল।

কলিকাতায় ইংরাজদিগের কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে, একটি বৃহদায়তন সুন্দর চূড়া-

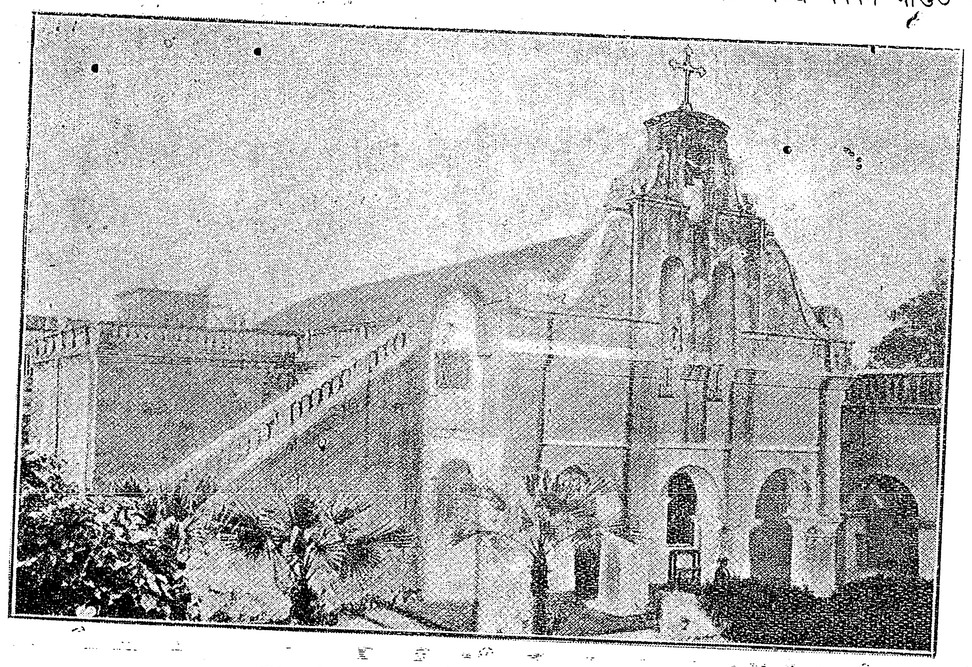

চন্দননগরের পুরাতন গির্জ্জা ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত

বিশিষ্ট গির্জ্জা প্রস্তুত হয়। উহা ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত চাঁদা ও বোর্ট অব্ ডিরেক্টরের ১০০০ পাউণ্ড চাঁদায় নির্ম্মিত হয়। অষ্টাদশ বৎসর পরে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে উহা ভূপতিত হয়। এই ঘটনার ত্রয়োদশ বৎসর পরে কোম্পানির আদেশে উহা পুনর্নির্ম্মিত হয়, কিন্তু ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজের গোলায় পুনরায় ধরাশায়ী হয়। কোম্পানির তদানিন্তন অট্টালিকা-সমূহের তালিকায় উহার মূল্য ধরা ছিল ৫০০০ পাউণ্ড।

মুরশিদাবাদের সিংহাসনে ক্লাইব কর্ত্তৃক নব অধিষ্ঠিত নবাব পর বৎসর এই মুদ্রা প্রদান করেন। উহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে রাজা নবকৃষ্ণ প্রদত্ত ৩০০০ পাউণ্ড মূল্যের জমীর উপর উক্ত টাকা এবং লটারি ও অন্যরূপে সংগৃহীত টাকা হইতে এক গির্জ্জা গঠিত হয়। উহাই সেণ্ট্ জন্ চার্চ্চ নামে অভিহিত। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সমাধা হয়। উহাই তৎকালে রাজকীয় উপাসনা মন্দির ছিল। গভর্ণর ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য স্বতন্ত্র মখমল মণ্ডিত আসবাব প্রভৃতির দ্বারা উহা সজ্জিত থাকিত। এই ভজনালয়-প্রাঙ্গণেই কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণকের সমাধি আছে। (১১) কলিকাতার সেণ্ট পল্ ক্যাথিড্রাল্ বহু কাল পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এ দেশে বহু সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। ডেন্মার্কের রাজা ৪র্থ ফ্রেডরিক কর্ত্তৃক ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম

(১০) The Portuguese in North India—The Calcutta Review, Vol. V. 1846.

(১১) Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I.

প্রোটেষ্টাণ্ট্ মিশনরি প্রেরিত হয়। যে ব্যক্তি প্রথম আইসেন তাঁহার নাম জিগেন্বাল্গ (Ziegenbalg)। তিনি প্রথম করোমণ্ডেলের ট্রাণ্কোয়েবার নামক দিনেমার উপনিবেশে আগমন করেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে একজন ভারতীয়কে খৃষ্টান করিয়া তিনি ইয়োরোপে প্রত্যাবর্ত্তন

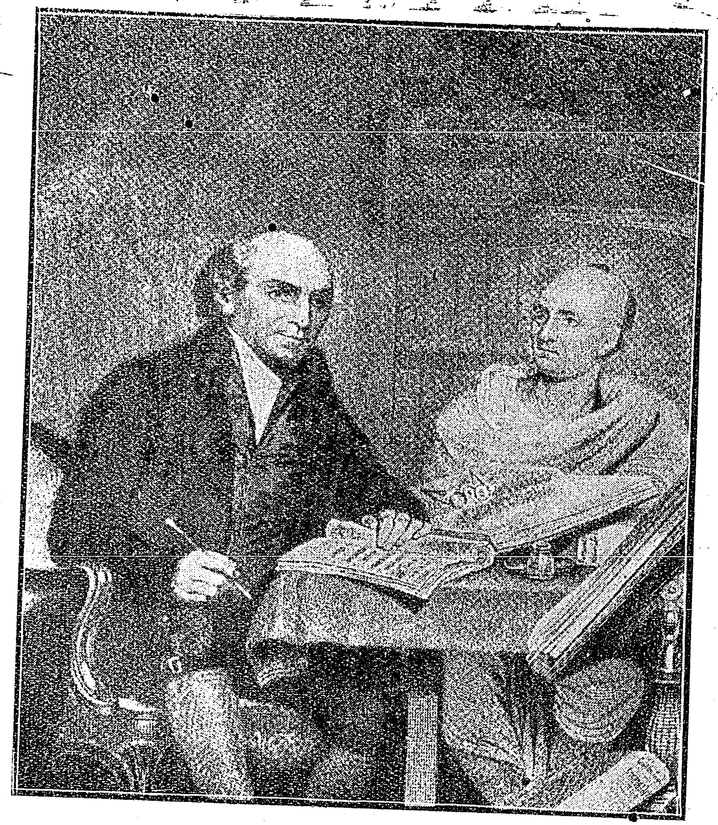

পাদরি কেরি ও তাঁহার হিন্দু পণ্ডিত

করেন। (১২) ইংলণ্ড হইতে ভারতে মিশনারি পাঠাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হন মিঃ উইলবারফোর্স্ (Mr. Wilberforce)। লণ্ডলা কর্ত্তৃক গঠিত জেসুট্ সম্প্রদায়ের জেভিয়ার্ (Monk Francis Xavier) প্রথম ভারতে আসিয়া জেসুট্ মিশন্ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম মোগল দরবারে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব ছিল। আকবরের অনুমতি লইয়া লাহোরে তাঁহারা একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে শাহজেহানের আদেশে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। (১৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও চন্দননগরে জেসুটদের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং উহাদের একটি গির্জ্জাও ছিল। ইহার পূর্ব্বে চন্দন-নগরের দুর্গ মধ্যে সেণ্ট্ লুই নামে একটি দুর্গ ছিল। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বত মিশনের রোম্যান ক্যাথলিক যাজকগণের প্রতিষ্ঠিত একটি গির্জ্জা এখনও গঙ্গার ধারে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ মিশনারি, যিনি বাঙ্গালায় আগমন করেন, তাঁহার নাম কির্নাণ্ডার (John Zachariah Kiernander) 'Kiernandr the Swede' নামেও তাঁহাকে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। ইনি প্রসিদ্ধ মিশনারি কেরির ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সরকারি যাজক-রূপে আগমন করেন। (১৪) ক্লার্ক্ (Mr. Clarke) নামক একজন প্রসিদ্ধ মিশনারি এই সময় আসিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রথম প্রোটেষ্টাণ্ট্ বিশপ মিড্ল্টন্ (Thomas Fanshawe Middleton D. D.) তৎপরে আগমন করেন।

বঙ্গ দেশীয় খ্রীষ্টান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভের সহিত বাঙ্গালায় দেশীয় লোকেদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের কথা জানা যায়। তৎপূর্ব্বে এখানে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

(১২) Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol I.

(১৩) The Portuguese in north India—The Calcutta Review, Vol. V, 1846.

(১৪) Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol.—I.

প্রথম যে বাঙ্গালী হিন্দু খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ পাল। সে ব্যক্তি শ্রীরামপুরের অধিবাসী; জাতিতে সূত্রধর। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর রবিবার প্রাতঃকালে শ্রীরামপুরের গভর্ণর এবং বহু পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ ও হিন্দু মুসলমানের সমক্ষে জাহ্নবীতীরে একটি ঘাটে নির্ব্বিঘ্নে এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। মিঃ কেরি এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গঙ্গাতীরে এই দীক্ষা কার্য্য সাধিত হওয়ায় পাছে কেহ মনে করেন, গঙ্গার পবিত্রতা মনে করিয়াই এই স্থান মনোনীত হইয়াছে, সেই কারণ কেরি সাহেব জনতাকে সম্বোধন করিয়া তখনই বলিয়াছিলেন, গঙ্গার পবিত্রতা তাঁহারা স্বীকার করেন না, উহার জলকে সাধারণ জল বলিয়াই তাঁহারা জানেন। ঐ দিন বৈকালে অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত কার্য্যই বাঙ্গালা ভাষায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এ কার্য্যে বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার ইহাই প্রথম। কৃষ্ণের স্ত্রী কন্যা এবং গোলোক নামক আর এক ব্যক্তিও এই সঙ্গে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন।

এই ব্যাপারে শ্রীরামপুরে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। পরদিন প্রাতে প্রায় দুই সহস্র লোক কৃষ্ণ ও গোলোকের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, উহাদের ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যায়। উহাদের নামে কোন অভিযোগ ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাহাদের কার্য্যের বরং প্রশংসা করিয়া জনতাকে বিক্ষিপ্ত হইতে আদেশ করেন। সাবধানতার জন্য স্থানীয় গভর্ণর—কৃষ্ণ, গোলোক ও মিশনারিদের বাটীতে পাহারার ব্যবস্থা করেন।

পর বৎসর জয়মণি নাম্নী কৃষ্ণের এক শ্যালিকা এবং গোলোকের স্ত্রী কমল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। তৎপরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের প্রথম রবিবারে পীতাম্বর সিংহ নামক একজন ষাইট্ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ কায়স্থ খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পর বৎসর আর তিন জন কায়স্থ ও একজন কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান খৃষ্টান হন। তন্মধ্যে শ্যামদাস নামক এক ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কয়েক মাস পরে তাঁহার বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিতে যাইলে, তথায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ভাগবৎ নামক কোন লোক খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তাহার স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মত্যাগের দিন হইতে বিধবার বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। স্বামীর স্ত্রীকে গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রী তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। এই সময় সুন্দরবনের অন্তর্গত দেহাটা নামক স্থানের কৃষ্ণপ্রসাদ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি নিজ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উহা পদদলিত করেন। এই উপবীত হস্তে লইয়া শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ মিশনারি ওয়ার্ড্ সাহঙ্কারে বলিয়াছিলেন,—"ইহাপেক্ষা মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন রোমের কোন ধর্ম্ম-মন্দিরেও নাই।"

প্রথম দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে বিবাহ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরেই সম্পন্ন হয়। উক্ত ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব খৃষ্টান কৃষ্ণপ্রসাদের সহিত সূত্রধর-বংশোদ্ভব কৃষ্ণের কন্যার খৃষ্ট ধর্ম্মমতে বিবাহ হয়। কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে একটি বৃক্ষতলে এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বিবাহ-

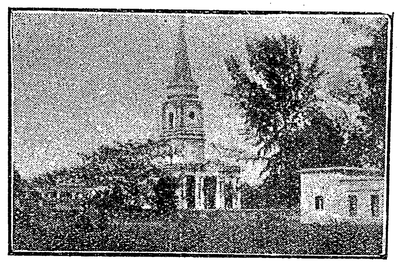

শ্রীরামপুরের পুরাতন দিনেমার উপাসনা-মন্দির

সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সমস্ত বঙ্গভাষায় সম্পন্ন হয়। বর-কন্যা যথারীতি এগ্‌মেণ্ট্ পত্র স্বাক্ষরিত করেন এবং সমবেত মিশনারিগণ সাক্ষী স্বরূপ তাহাতে সহি করেন। বিবাহ উপলক্ষে কৃষ্ণের বাটীতে যে সান্ধ্য-ভোজ হয়, তাহা দেশীয় প্রথাতেই ব্যবস্থিত হইয়াছিল এবং পাদরিরা এই উপলক্ষেই দেশীয় খৃষ্টানের বাটীতে প্রথম ভোজন করেন।

এই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেও আইনের চক্ষে ইহার সারবত্তা সম্বন্ধে মিশনারিদের বিশেষ সন্দেহ ছিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এইরূপ বিবাহ আইন-সঙ্গত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

শ্রীরামপুরেই প্রথম দেশীয় খৃষ্টানের গোর হয়। খৃষ্টান পদ্ধতিতে যে ব্যক্তির প্রথম সমাধি দেওয়া হয়, তাহার নাম গোকুল দাস। এই লোকটি মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। যে স্থানে উহার

গোর দেওয়া হয়, গোকুলের মৃত্যুর মাত্র চারি দিন পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের মধ্যে গোরস্থানের জন্য ঐ স্থান খরিদ করা হয়। গোরের জন্য শবাধারটি কৃষ্ণ নিজ ব্যয়ে শ্বেত মসলিন্ দ্বারা সজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। (১৫)

হিন্দুদের খৃষ্টান করা বিষয়ে মিশনারিরা শীঘ্রই যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সাফল্য দেখিয়া কোম্পানী কালীঘাটে একদল প্রতিনিধি পাঠাইয়া কোম্পানীর নামে ৫০০৲ টাকা পূজা দিয়াছিলেন। (১৬)

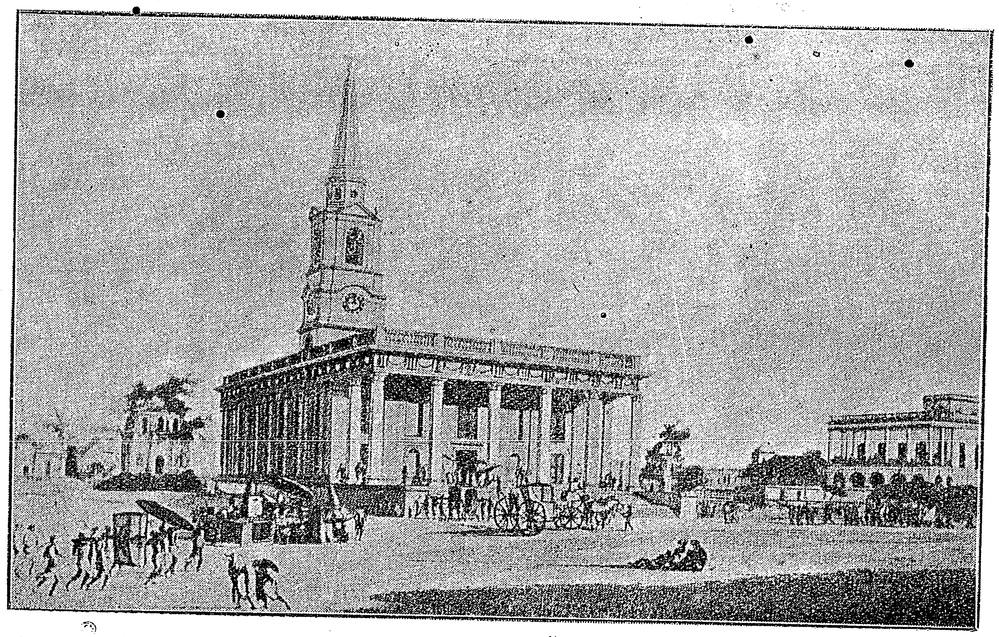

কলিকাতার সেণ্টজন গির্জ্জা—১৮৮ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম আরম্ভ হইতে কতিপয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় মোট কত হিন্দু খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা বলা যায় না; তবে দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা উত্তরোত্তর ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় খৃষ্টানের সংখ্যা মোট ১৩১৩৮ ছিল। তন্মধ্যে দেশীয় খৃষ্টান কতগুলি ছিল, তাহার সংখ্যা পাওয়া যায় না। এই যুগে মুসলমানদের খ্রীষ্টান হওয়ার কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায়, যশোহর হইতে তিন জন মুসলমান খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয় সবিশেষ জানিবার জন্য শ্রীরামপুরে আসিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে দেশীয় লোককে খৃষ্টান করা বিষয়ে এবং খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করিতে রেভারেণ্ড কেরি, মার্শম্যান্ ও ওয়ার্ডের নাম প্রথম আসিয়া পড়ে। কেরি ১৭৯৩ এবং মার্শম্যান্ ও ওয়ার্ড্ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আগমন করেন। হেনরি মার্টিন নামক আর একজন প্রসিদ্ধ মিশনারি ছিলেন। শ্রীরামপুর ইহাঁদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইলেও, ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তাঁহারা বহু স্থানে যাইয়া বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে তাঁহারা বাঙ্গালা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন এবং গ্রন্থাদি তর্জ্জমা করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। তাঁহারা শুধু লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সে সময়ে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। দেশীয় লোকেদের শ্রবণার্থ তাঁহারাই বাঙ্গলা ভাষায় বাইবেলের বক্তৃতা প্রথম আরম্ভ

(১৫) Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol. I. বাঙ্গলায় প্রথম দেশীয় খৃষ্টানদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থ হইতে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

(১৬) Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol. I.

করেন। কলিকাতায় বৌবাজারে যে স্থানে এক্ষণে গির্জ্জা আছে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ৭২৫০৲ টাকা মূল্যে ঐ জমি খণ্ড ক্রয় করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহারা উহাতে একটি বাঙ্গালা নির্ম্মিত করেন। পরে ৩২০০ পাউণ্ড ব্যয়ে গির্জ্জা প্রস্তুত হয় এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ডাক্তার কেরি কর্ত্তৃক উহার দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

তাঁহাদের উদ্দেশ্যের মূলে যাহাই থাকুক, আজিকার বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এই বিস্তৃতির মূলে যে তাঁহাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম বিশেষভাবে নিহিত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ডাক্তার কেরির দ্বারা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বিপুল অর্থ ব্যয়ে নিউটেষ্টামেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ২০০০ খণ্ড প্রকাশ করিতে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬১২ পাউণ্ড। তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ ভস্মসাৎ হইয়া প্রায় ৭০০০ পাউণ্ড ক্ষতি হয়। কিন্তু ইহার সহিত রামায়ণের বাঙ্গালা তর্জ্জমা, একখানি অভিধান ও একখানি তেলেঙ্গা ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি অগ্নিসাৎ হওয়ায় তাঁহারা অধিক ক্ষতি বোধ করিয়াছিলেন। (১৭) বঙ্গ ভাষার প্রথম সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" কেরি ও মার্শম্যানের উদ্যোগে শেষোক্ত ব্যক্তির সম্পাদকতায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। (১৮) দেশীয় বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে তাঁহারা অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনের পর বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা হইতে ৩০ মাইলের মধ্যে তাঁহারা ১১৭টিরও অধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

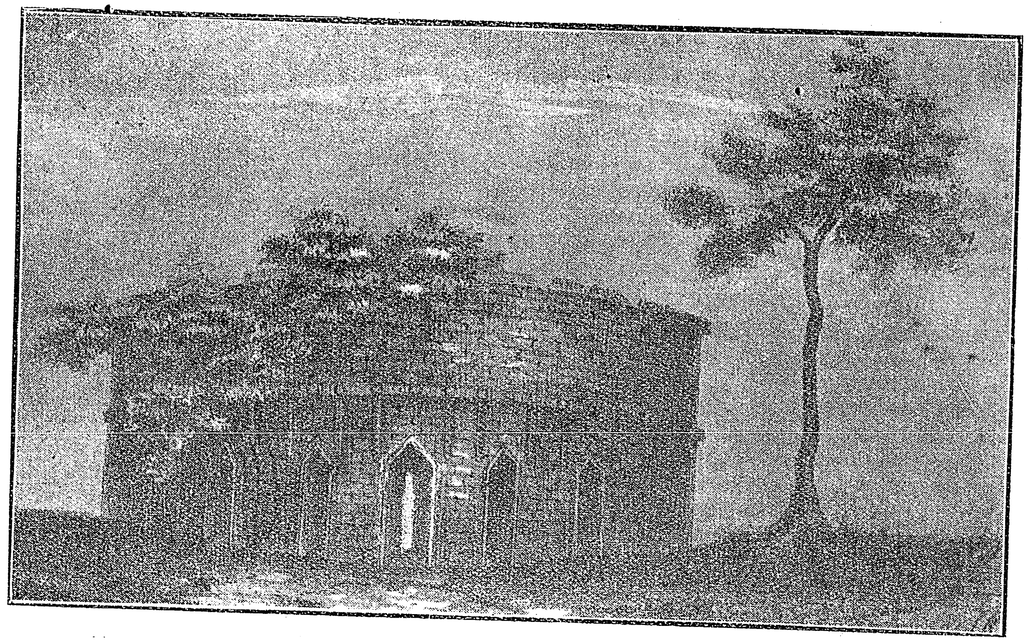

মিলন-মন্দির

শ্রীরামপুরে এই ঘাটীতে কেরি, মার্শম্যান ওয়ার্ড, হেনরি মার্টিন্ প্রভৃতি মিশনারীগণ উপাসনা ও পরামর্শাদির জন্য মিলিত হইতেন।

মিঃ ওয়ার্ডের চেষ্টায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এক শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অনেকগুলি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট কথা—বাঙ্গালায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে শ্রীরাম-

(১৭) Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I.

(১৮) Bengali Literature in the Nineteenth Century গ্রন্থে "দিগ্দর্শন"কে বাঙ্গলার প্রথম সাময়িক পত্র বলিয়াছেন। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রকাশিত বাঙ্গলা সাময়িক পত্রের তালিকা পুস্তকেও "সমাচার দর্পণে"ই নাম পাওয়া যায়।

পুরের এই তিন জন মিশনারিদের মত অন্য কাহারও নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারতে সর্ব্ব-প্রথম যে পুস্তক ছাপা হয়, তাহা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম বিষয়ক একখানি পুস্তক। উহা দক্ষিণ ভারতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হুগলীতে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রায় ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে মিশনারীদের দ্বারাই প্রথম মাদ্রাজে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। (১৯) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

(১৯) Promotion of Learning in India by European Settlers.

মিলন-পূর্ণিমা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(১৭)

নিত্যরঞ্জনের সেবাসঙ্ঘ হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া সৌরীন স্থির করিল, সে মফঃস্বলে গিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবে। সে সেবাসঙ্ঘ আফিসে শুনিয়াছিল, চট্টগ্রামে একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা চলিতেছে এবং ময়মনসিংহেও নিত্যরঞ্জনের দল খুব প্রবল নয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এই দুই স্থানের মধ্যে ময়মনসিংহ বাছিয়া লইল।

ময়মনসিংহে গিয়া সে প্রথমে একটা সভা করিয়া বক্তৃতা করিল। তার পর তারা কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সহানুভূতি সংগ্রহ করিল। সৌরীনের মুখে তার উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির কথা শুনিয়া অনেকেই তাহাকে সাধুবাদ করিলেন এবং কেহ কেহ অর্থসাহায্যও করিলেন।

প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত কয়েকটি কর্ম্মী লইয়া সৌরীন সেবামণ্ডলী স্থাপন করিল। একজন ভদ্রলোক সেবামণ্ডলীর জন্য তাঁর একখানা বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। সেখানে বসিয়া ধীরে ধীরে পরম উৎসাহে সৌরীন কাজের সূত্রপাত করিয়া লইল।

ময়মনসিংহ সহরের উপকণ্ঠবর্ত্তী তিনটি গ্রামে তিনটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সৌরীন ও সেবা-মণ্ডলীর অন্যান্য সভ্য পর্য্যায়ক্রমে গিয়া সেই সব পাঠশালায় পড়াইতে লাগিল। ক্রমে পাঠশালার শ্রীবৃদ্ধি হইল, ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিল, সৌরীন উৎফুল্ল হইল।

পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষাদান কার্য্য ছাড়া সৌরীনের আর একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল। এই পাঠশালা উপলক্ষে তারা গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসী লোকদিগের সহিত পরিচিত হইবে, তাহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হইয়া, তাদের জীবনের প্রকৃত অভাব ও ত্রুটির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করিবে—ইহাই ছিল সৌরীনের প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইল।

এক বৎসর পাঠশালার কাজ করিয়া সৌরীন যে অভিজ্ঞতা লাভ করিল, তার ফলে সৌরীন লোকাল বোর্ডের সাহায্যে গ্রামে ইঁদারা কাটাইয়া জলাভাব দূর করিল, ঔষধ বিতরণ এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া লোকের স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করিল। একবার ভীষণ ওলাউঠার মড়ক যখন চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল, তখন এ তিনটি গ্রাম প্রায় সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইল। কারণ সেই সময় সেবা-মণ্ডলী গ্রামবাসীদের প্রত্যেককে সর্ব্ববিধ সাবধানতা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিল। তার পর প্রত্যেক গ্রামে মণ্ডলীর ছয়জন সভ্যের তত্ত্বাবধানে যুবকদের দ্বারা দল বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সবার উপর তাহারা নজর রাখিতে লাগিল,—কেহ কোনও রকমে যাহাতে সাবধানতার বিধি লঙ্ঘন করিতে না পারে। এই রকম কাজ করিয়া দুই বৎসরে তাহারা স্থানীয় লোকের প্রভূত হিতসাধন করিল।

এই কষ্টসাধ্য কার্য্যে সৌরীনের অর্থবল ক্ষীণ হইয়া আসিল, তার আশ্রমবাসীর সংখ্যা ভয়ানক কম হইয়া গেল। তখন সৌরীনকেও তার মণ্ডলীর কাজ ছাড়িয়া চাঁদা সংগ্রহে নিযুক্ত হইতে হইল। ইহাতে সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপচয় হইল, কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ হইল না। অতি কষ্টে কোনও মতে কাজ চলিতে লাগিল। বাড়ী বাড়ী মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আশ্রমবাসীদের কোনও মতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। সেবাকার্য্য সম্যকরূপে পরিচালন করিবার উপায় হয় না।

অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া দ্বারে দ্বারে সকল মান বিসর্জ্জন করিয়া ভিক্ষা মাগিয়া সৌরীন তৃতীয় বৎসর কার্য্য চালাইল। তার কার্য্যের প্রসার কতকটা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতে হইল। সে আশা করিয়াছিল যে, তিনটি গ্রাম হইতে তার কাজ ছড়াইয়া ক্রমে অন্য গ্রামে সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু সে দেখিতে পাইল, কাজে ঠিক উল্টা দাঁড়াইল। প্রথম ঝোঁকে লোকে তাহাকে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু ঝোঁক কাটিয়া গেলে, তাদের সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা কমিয়া আসিল—তার কাজ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল।

যখন চাঁদার টাকায় আর কাজ চলে না, তখন সৌরীন ভাবিয়া এক উপায় স্থির করিল। সে ভাবিল যে, সে যে কাজ করিতেছে, লোকে তাহা বিশেষ অনুভব করিতে পারিতেছে না। তিনটি নিভৃত পল্লীর নিতান্ত অবনত শ্রমজীবীদের ভিতর সে সামান্য একটু সুবিধা, সামান্য একটু আনন্দ ও সামান্য একটু স্বচ্ছন্দতা আনিয়াছে মাত্র। কাজ করিতে গিয়া সে দেখিয়াছে যে, এইটুকু সফলতা অর্জ্জন করিতে তার কি বিপুল চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু যারা কোনও দিন এই প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য কার্য্য করে নাই, তাদের কাছে এ কাজের প্রকাণ্ডত্ব দেখাইবার তার কোনও আয়োজন নাই। যে দিক দিয়া এ কাজ খুব বড়, সে দিকটা বড় গলায় লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া বলা তার কার্য্য নয়। এ কাজের ভিতর যে তার কর্ম্মীদের প্রকাণ্ড ত্যাগ ও অধ্যবসায় আছে, অশেষ ক্ষুদ্র বিঘ্নের সঙ্গে অক্লান্ত সংগ্রামে যে সাহস ও শৌর্য্যের পরিচয় আছে, সে কথা সৌরীন নিজেও কোনও দিন প্রকাশ করিয়া বলে নাই, তার দলের কাহাকেও বলিতে দেয় নাই।

সে বিবেচনা করিয়া দেখিল যে, এখন পর্য্যন্ত সে এমন কোনও একটা খুব দৃশ্যমান বড় কাজ করিয়া উঠিতে পারে নাই, যাহা লোকে সাদা চোখে দেখিতে পায়। দুই বৎসর ধরিয়া উপদেশ দিয়া, বার বার নিজে লোককে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিয়া, সে এক গ্রামের মুচিদের ইহা বুঝাইয়াছে যে তাদের পানীয় জল যে ইঁদারা হইতে তারা আনে, তার পাশে বসিয়া কাপড় কাচা বা অন্য কোনও নোংরা কাজ করা বিপদসঙ্কুল। এখন তারা ইঁদারা হইতে তফাতে বসিয়া সে সব কাজ করে এবং বাড়ীর ভিতরও নোংরা জল প্রভৃতি যথাসম্ভব দূরে রাখে। এ তো আঙুল দিয়া দেখাইবার মত একটা জিনিস নয়, আর লোকের চক্ষে একটা বড় কাজ বলিয়া দাঁড় করাইবার মত কিছু নয়। এমনি ছোট ছোট কাজ সে অনেক করিয়াছে, কিন্তু তার কোনটিই বিশেষ চমক লাগাইয়া দিবার মত নয়—লোকের কাছে একটা বড় কাজ বলিয়া দেখাইবার মত কিছুই নয়। আর ছোট ছোট কাজকে রঙ্গ চড়াইয়া চটকদার করিয়া লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিবার বিদ্যা বা আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না। কাজেই লোকে যে তার কাজটা খুব বড় করিয়া দেখিয়া মুক্ত-হস্তে অর্থসাহায্য করে না, সে কিছু আশ্চর্য্য নয়। যদি সে ক্রমে এমন একটা কিছু করিয়া তুলিতে পারে, যাতে সবাই বুঝিতে পারিবে যে সত্য সত্য সে একটা প্রকাণ্ড লোকহিতের সূত্রপাত করিয়াছে, তখন তারা তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে।

সে ভাবিতে বসিল—কি উপায়ে এমন একটা কিছু করা যায়, যার হিতকারিতা লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে। একটা কথা সে অনেক দিন হইতেই ভাবিতেছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। একটি গ্রামে প্রায় চল্লিশ ঘর মুচি বাস করে—তাদের দুরবস্থার অন্ত নাই। তারা ঢোল বাজায়, কেউ কেউ সস্তা চটি জুতা বানায়, আর বেশীর ভাগ লোকে ভিক্ষা করিয়া খায়। সে দেখিতে পাইল যে, ময়মনসিংহ নগরে কলিকাতা হইতে অনেক জুতার আমদানী হয়; একটু শিক্ষা ও সংঘবন্ধন এবং মূলধনের সহায়তা পাইলেই, এই মুচিরাই এ সমস্ত জুতা তৈয়ার করিতে পারে। তাহাতে তাহারা বেশ স্বচ্ছন্দে খাইয়া বাঁচিতে পারে। আর একটি গ্রামে যে সকল জোলা বাস করে, তাহাদের সমবায়-বদ্ধ করিয়া কাজে লাগাইতে

পারিলে, তারা অন্নবস্ত্রের কষ্ট পায় না। কোনও রকম উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্য না লইয়াও তারা বেশ স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু তাদের অভাব ঘুচে না, কেন না, প্রথমতঃ, তারা মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত। দ্বিতীয়তঃ, তাদের এমন মূলধন নাই যে, তারা সমস্তক্ষণ কাজ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, কাপড় তৈয়ার হইলেই তাদের বেচিবার চেষ্টায় বাহির হইতে হয় এবং নিতান্ত অভাবের দায়ে অল্প দামে বেচিতে হয়।

সে স্থির করিয়াছিল যে, উভয় স্থলেই অনায়াসে গ্রামবাসীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যদি এই শ্রমজীবীরা মিলিয়া এমন একটা সমবায় বা কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করিতে পারে, যাহা তাহাদিগকে আবশ্যক অনুসারে কাঁচা মাল সরবরাহ করিবে এবং মাল প্রস্তুত হওয়া মাত্র তাহা কিনিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিবে, তবে ইহারা সারা বৎসর ভাল কাজ করিয়া পরম সুখে বাস করিতে পারে। এই স্থির করিয়া, সে তিন বৎসর ধরিয়া কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীদের সহায়তায় ইহাদের ভিতর সেই প্রকার সমবায় গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তিন বৎসরের চেষ্টায়ও সে ইহাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করিয়া উঠিতে পারে নাই। কো-অপারেটিভ সোসাইটি করিবার জন্য যে শিক্ষা ও মনোভাবের প্রয়োজন, তাহা গড়িয়া তুলিতে আরও অনেক দিন লাগিবে, এই স্থির করিয়া সে নিরাশভাবে এই চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, অন্য দিক দিয়া ইহাদের হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছে।

এখন তার মনে হইল যে, এই কাজই তার কর্ত্তব্য। এ কাজ যদি সে ভাল রকম গড়িয়া তুলিতে পারে, তবে লোকের চোখে ইহার উপকারিতা অনায়াসে প্রকাশ হইবে। আর তাহাতে ইহাদের খুব বৃহৎ হিতসাধন করা হইবে। কেন না, ইহাতে ক্ষুধিত, দরিদ্র গ্রামবাসীর পেটে অন্ন পড়িবে, এবং সমবায় গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক উন্নতি হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করা অসম্ভব। সোসাইটি না গড়িয়া ঠিক সমবায়-সঙ্ঘের প্রণালীতে যদি ইহাদের দ্বারা কাজ করান যায়, তবে এই প্রক্রিয়ায় ক্রমে এমন একটা ব্যবস্থা করা যাইবে, যাহা অনায়াসে একটা সমবায়মণ্ডলী রূপে পরিণত করা যাইতে পারিবে।

সে স্থির করিল যে, সেবামণ্ডলী হইতে সে শ্রমিকদিগকে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবে, ও যারা কাজ জানে না, তাহাদিগকে কাজ শিখাইবে। কাপড় এবং জুতা তৈয়ার হইলে সেবামণ্ডলী তাহা তৎক্ষণাৎ নগদ মূল্যে কিনিয়া লইয়া নিজেরা দোকান করিয়া ময়মনসিংহের বাজারে বিক্রয় করিবে। সে হিসাব করিয়া দেখিল যে, ইহাতে দশ হাজার টাকা মূলধন হইলে লাভের সহিত কাজ করা যাইবে। লাভের টাকায় সেবামণ্ডলীর সব কাজ অনায়াসে চলিবে। প্রথমে হিসাব করিয়া সে দমিয়া গেল। এখন সেবামণ্ডলীর নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষার অবস্থা। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দশ টাকা তুলিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়, দশ হাজার টাকা সে পাইবে কোথায়?

কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিল। সে কিছুদিনের জন্য নিজ গ্রামে গেল। সেখানে তার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিল। আট হাজার টাকা লইয়াই সে কাজ আরম্ভ করিল।

গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সে অনেকগুলি তাঁতি জোলা এবং মুচি কারিগর সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে যথারীতি চুক্তি করিল। প্রত্যেকের ঋণ পরিশোধ করিয়া কাঁচামাল সরবরাহ করিল; এবং প্রত্যেকের কাছে যে তৈয়ারী মাল ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া ময়মনসিংহে দোকান খুলিল। দুই চার দিনের মধ্যেই কথাটা জানাজানি হইয়া গেল। সহরের অনেক ভদ্রলোক সেবামণ্ডলীর দোকানে আসিয়া কাপড় ও জুতা কিনিতে লাগিলেন। সৌরীন দেখিয়া তৃপ্ত হইল যে, প্রথম সপ্তাহেই তার প্রায় সাতশ' টাকার মাল বিক্রয় হইয়া গেল।

(১৮)

চার বৎসর পরে দেরাদুন হইতে রেখা পাটনায় আসিয়া চাকরী লইল। সে এখানে চারশ' টাকা মাহিনা পায়; শিক্ষাদানে তার কৃতিত্বের খ্যাতি জন্মিয়াছে।

রেখা বেশ মোটা মাহিনা পায়। তাহা হইতে সে তার মাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠায়। নিজে সে খরচ করে অত্যন্ত কম। সে বোর্ডিং এ থাকে,—মেয়েদের চেয়ে

তার খরচ অতি সামান্যই বেশী। তার কাপড়-চোপড়ের খরচ কিছুই নাই, গয়না সে পরে না, কেবল হাতে ক'গাছা চুড়ী বই তার কোনও গয়নাই নাই। আর সব টাকা সে ব্যাঙ্কে জমা রাখে। সে টাকায় সে সহজে হাত দেয় না।

রেখার সঙ্গেই বোর্ডিংএ থাকিত আর একটী শিক্ষয়িত্রী। তার নাম লীলাবাই, জাতিতে মারাঠি, কিন্তু কলিকাতায় শিক্ষিতা এবং সর্ব্ব বিষয়েই সে বাঙ্গালীর মেয়েরই মত। লীলা দুইশত টাকা মাহিনা পায়,—তার সবই সে আপনার জন্য খরচ করে। তার মত কাপড়-চোপড় গয়নাপত্র স্কুলের কোনও লোকের নাই। লীলার সঙ্গে রেখার অল্প দিনেই বেশ সদ্ভাব জন্মিয়া গিয়াছিল।

এক দিন রেখা বোর্ডিংএর বাগানে বসিয়া ছিল, দুটি মেয়ে তার সঙ্গে এমন ভাবে হাস্য-পরিহাস ও খেলাধুলা করিতেছিল যে, তারা যেন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু—ছাত্রী নয়।

প্রেমদেবী বলিল, "রেখা-দি, সুচরিতা আজ এত হাসছে কেন জানেন?"

সুচরিতা খুব চটিয়া বলিল, "না কখ্খনও না, আমি কিছু হাসছি না; আমি রোজ হাসি।"

রেখা বলিল, "রোজ হাস আর আজ হাসছো না, তারও তো একটা কারণ থাকা চাই? কি বল প্রেমদেবী?"

প্রেম। হাঁ রেখা দি, সত্যি ওর—

সুচ। প্রেমদেবী খবরদার, মিথ্যে করে যা' তা' বলো না আমার নামে। আর আমি তোমাকে কোনও দিন কিছু বলি যদি তবে—

রেখা হাসিয়া বলিল, "তুমি তা' হ'লে আজ কিছু ব'লেছো ওকে। সে কথাটা যদি ও বলে তবে তা' মিথ্যে হ'বে কেমন করে সুচি?"

সু। না দেখুন, রেখাদি, ওর, কথা মিথ্যে।

রে। বা রে, কথা ও বল্লেই না তো মিথ্যে হ'ল কেমন করে? তা প্রেমদেবী, বদ্‌নাম যদি হ'য়েই গেল তবে ব'লেই ফেল না—তা' সে সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হ'ক।

"না, দেখুন, তবে আমি চল্লেম," সুচরিতা উঠিতে গেল। রেখা তাহার হাত ধরিয়া বসাইল এবং সুচরিতাকে কোলের উপর টানিয়া লইল। প্রেমদেবী ইতিমধ্যে বলিয়া ফেলিল, "সামনের রবিবার সুচরিতার বিয়ে, কাল ওকে নিতে আসবে।"

রেখা সুচরিতার মাথাটা বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তাই এত পাগলামি হ'চ্ছিল। তা' বেশ। বেশ। আমার কাছে ব'লতে লজ্জা কি সুচি, আমি যে তোর দিদি। তা তোমার বর কি করেন?"

সুচরিতা চক্ষু নত করিয়া রহিল।

প্রেমদেবী বলিল, "বর ভয়ানক ভাল ছেলে,—এম-এ'তে ফার্ষ্ট হয়ে এবার ফিনান্স পরীক্ষা দিয়েছে।"

কথাটা ছাঁৎ করিয়া রেখার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে যেন ছেঁকা দিয়া দিল। রেখা চমকাইয়া উঠিল—তার মুখখানা এক মুহূর্ত্তে সাদা হইয়া উঠিল। তখনই সে কোনও মতে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "তা বেশ।" আর কোনও কথা বলিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে সে বলিল, "তবে তুই আর আসবি না সুচি?"

সুচরিতা মাথা নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িল। তার মুখে লজ্জার লালিমার ভিতর দিয়া আনন্দ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

রেখা সুচরিতার মুখখানা তুলিয়া ধরিল। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস সে কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "তা হ'লে তোর বুঝি দিল্লী যেতে হ'বে?"

সুচরিতা বলিল "জানি না।"

রেখা বলিল, "বেশ দিদি, আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।" বলিতে বলিতে তার গলা ভার হইয়া আসিল। দুই ফোঁটা জল তার চোখের কোলে চক্ চক্ করিতে লাগিল। রেখা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

রেখা আপনার ঘরে আসিয়া নদীর ধারের জানালার পাশে বসিল। শূন্য উদাস দৃষ্টিতে সে নদীর পরপারের শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল। তার মনের ভিতর প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া গেল, দুই চক্ষু বাহিয়া অবিরত প্রবাহ বহিয়া গেল, সে চক্ষু মুছিবার কোনও চেষ্টা করিল না। যোল

বছরের কচি মেয়ে সুচরিতার মুখের ভিতর যে উদ্বেলিত আনন্দের ছায়া আজ সে দেখিয়াছে, সেই আনন্দ, সেই আশা এক দিন তার অন্তরের দুই কূল ছাপাইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ দারুণ প্রলয়ের সূর্য্য আসিয়া নিমেষে সে আনন্দ-সাগর শুষিয়া লইয়া হৃদয়টাকে মরুভূমি করিয়া দিয়া গেল। সেই দিন মনে পড়িল; মনে পড়িল, সে দিন হইতে সে মরুভূমি তার প্রাণের ভিতর তার প্রচণ্ড তৃষ্ণা লইয়া জ্বলিয়া মরিতেছে,—জীবনে তাহাতে এক ফোঁটা জল পড়িবে না।

সে পাঁচ বৎসরের কথা। কিন্তু পাঁচ বছরে তো তার অন্তরের সে ক্ষত একটুও পুরাতন হয় নাই। সামান্য একটা বাহিরের পরদার আড়ালে সে আঘাত যে এখনও কত তীব্র বেদনায় টন্ টন্ করিতেছে, তাহা সে আজও অনুভব করিল।

যখন সে সৌরীনকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, তখন সে মুখে যাই বলুক, তার ভিতর সব চেয়ে প্রবল মনোবৃত্তি ছিল—অভিমান। সৌরীন যে কেবল কর্ত্তব্যের দায়ে তাহাকে বিবাহ করিয়া বন্ধনকে বরণ করিতে যাইতেছে, এ কথায় তার অন্তরের সকল দর্প সংহত হইয়া তীব্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাই সে তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছিল।

যখন সে দূর দেরাদূনে চলিয়া গেল, তখন তার দর্পের তেজ নরম হইয়া আসিল। তখন সে তার মনের কান্না এই বলিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিল যে, সে সৌরীনের একটা মস্ত উপকার করিয়া আসিয়াছে—তার মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠার পথ বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছে। এ চিন্তায় সে কতকটা শান্তি পাইল; কিন্তু তখন সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অন্তর সৌরীনকে একান্ত ভাবে কামনা করিতে লাগিল। যে স্পর্শ সে কোনও দিন পাইবে না, যে আলিঙ্গন তার বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, যে সম্ভাষণ সে আর শুনিবে না, তারই জন্য তার অন্তর পিপাসিত হইয়া উঠিল। যতদিন তার সৌরীনের সঙ্গ ও তার ভালবাসা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, সে সব দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে মনের ভিতর পুনরাবৃত্তি করিয়া গেল। প্রত্যেকটি প্রণয়-সম্ভাষণে সে নূতন করিয়া পুলকিত হইল, প্রত্যেকটি চুম্বনের স্মৃতি তার রক্তের ভিতর নৃত্যোৎসব লাগাইয়া দিল। সৌরীনের মুখের তত্ত্ব কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া সে আনন্দ লাভ করিত, তার আদর্শে জীবন নিয়মিত করিবার সংকল্প করিত। সৌরীনের বীরমূর্ত্তি, তার চরিত্র-গৌরব, তার অশেষ সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়া সে স্বর্গসুখ লাভ করিত। এই নীরব তপস্যায় তার মনের ভিতর হইতে অভিমান ও অনুযোগের শেষ কণাটুকু পর্য্যন্ত ভস্ম হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল—বিশুদ্ধ মলিমা-শূন্য প্রেমে তার সমস্ত সত্তা আগাগোড়া ভরপুর হইয়া গেল।

সে চলিয়া আসিবার সময় সৌরীনের সঙ্গে কোনও রকম যোগ রাখিয়া আসে নাই। সৌরীন যাতে তার ঠিকানা পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, সেজন্য সে যত্ন করিয়াছিল। সেজন্য মাঝে মাঝে তার ভয়ানক আপশোষ হইত। মনে হইত যে, সংযোগের সূত্র যদি সে রাখিয়া আসিত, তবে হয় তো সৌরীন এক দিন আবার ফিরিয়া আসিত। কে জানে, সৌরীনও হয় তো তাহাকে হারাইয়া তাকে এমনি ভালবাসিতেছে, তার জন্য এমনি হাহাকার করিতেছে! কিন্তু সব চেয়ে বেশী অনুতাপ হইত তার এই ভাবিয়া যে, সে সৌরীনের সংবাদ জানিবার কোনও উপায়ই হাতে রাখিয়া আসে নাই। তার অন্তরের মরু-ভূমির দারুণ জ্বালা শান্ত করিবার জন্য তার প্রেমাস্পদের একটুকু সংবাদ পাইবার উপায়ও সে হাতে রাখিয়া আসে নাই।

প্রথমে রেখা ভাবিয়াছিল যে, সৌরীনের কার্য্য-কলাপের সংবাদ সে খবরের কাগজে জানিতে পারিবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সে বাঙ্গালা দেশের খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াও সৌরীনের কোনও সংবাদই যখন পাইল না, তখন সে হতাশ হইয়া পড়িল। তখন তার মনে পড়িল যে, সৌরীন কোনও দিনই খবরের কাগজে নাম বাহির করা পছন্দ করে না। নিত্যরঞ্জনের দল যে কাগজে নাম বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত, সেজন্য সে তাহাদিগকে কতবার ধিক্কার দিয়াছে। সুতরাং সৌরীনের নাম যে খবরের কাগজে উঠিবে, এ আশা করাই তার অন্যায় হইয়াছে। এদিক সেদিক পত্র লিখিয়া চেষ্টা করিয়াও সে কিছু জানিতে পারিল না। তখন সে কাঁদিয়া ভাসাইল। কত আশঙ্কায় তার মন কাঁপিয়া উঠিল—কিন্তু সে কিছুই করিতে পারিল না।

আজ পাঁচ বৎসর সে সৌরীনকে ছাড়িয়াছে—পাঁচ বছরের পুরাতন স্মৃতি ছাড়া তার আর কোনও সম্বল নাই। সে স্মৃতি তাকে থাকিয়া থাকিয়া দারুণ আঘাত দেয়—কোনও সান্ত্বনা দিতে পারে না। কিন্তু সেই পাঁচ বছরের পুরাতন প্রেম তার অন্তর যে অপূর্ব্ব কোমলতায় ভরিয়া দিয়াছিল, তাহা এই ধ্যান ও স্মৃতিপূজা আরও সুকুমার করিয়া তুলিয়াছিল। তাই রেখার হৃদয় তার ছাত্রীদের দিকে অশেষ স্নেহসম্ভার লইয়া প্রবাহিত হইত—সে প্রত্যেক ছাত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

সেই সব পুরাতন স্মৃতি, সেই নষ্ট স্বর্গ তার মনের ভিতর আজ আবার তোল্‌পাড় করিতে লাগিল। আর সে অবাধে কাঁদিতে লাগিল। যখন লীলা ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রেখা জানিতে পারিল না, তখনও সে কাঁদিতেছিল।

লীলা তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে ভাই, কাঁদছো কেন?"

রেখা সুধু বলিল, "অদৃষ্ট, ভাই।" লীলা স্নিগ্ধ কথা বলিয়া তাহাকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিল, রেখা চক্ষু মুছিয়া গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রেখা বলিল, "দেখ ভাই, স্কুলে মেয়ে পড়াবার কাজের মত এমন হতভাগ্য কাজ আর নেই।"

"কেন ভাই এ কথা বলছো?"

"কেন? তোমার কোনও দিন মনে হয় না?"

"না, আমি তো বেশ সুখে আছি মনে করি।"

"কিন্তু একটুও কষ্ট হয় না তোমার ভাবতে? এই যে প্রতি বছর একদল মেয়ে আমাদের হাতে আসে—দু'বছর আমার কাছে থাকে তারা—তার পর চলে' যায়, আর তাদের সঙ্গে দেখা-শোনাও হয় না। এ দু'বছর তাদের উপর প্রাণের ভালবাসা উজাড় করে' ঢেলে দিচ্ছি—কিন্তু দু'বছরের পর সে কোথায় যায়—কিছু মনে থাকে না। আমাদেরও বোধ হয় থাকতে পারে না।"

লীলা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা এই তো সংসারের নিয়ম। মায়ের কোলে যে মেয়ে আসে, সেও তো চিরদিন থাকে না। কেউ মরে যায়, কেউ বা বিয়ে হ'য়ে চলে যায়—তারা তাদের সংসার, তাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকে, মায়ের খোঁজ ক'জনে নেয়।"

"কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা ক'রছিস ভাই! মা যে মেয়ে পেয়েই সার্থক হ'য়ে যায়, তাকে এতটুকু থেকে এত বড় ক'রে তোলে, তার চেয়ে আর আনন্দ আছে? তার পর যখন তার বিয়ে হয়, তখন মেয়ের চেয়ে মায়ের আনন্দ কি কম? যদি ভাল বরে পড়ে? কিন্তু আমাদের কি? ঠিক দু' বচ্ছরের স্নেহ-সম্বন্ধ, তার পর তার কি হয় না হয় তাও জানি না। এ যেন একটি মায়ের বৎসরে পঞ্চাশটি করে মেয়ে হ'য়ে ঠিক দু'বছর অন্তর তাদের সবগুলি নিঃশেষে মরে' যাওয়া। বছর বছর এমনি হ'চ্ছে আমার। প্রথম যে বচ্ছর আমার ক্লাশের মেয়েরা পাশ করে' চলে গেল, তখন আমার ভয়ানক কান্না পাচ্ছিল। তার পর বছর বছরই যখন এরা যায়, আমার যে কষ্ট হয় কি ব'লবো।"

"এ কষ্ট থাকবে না ভাই, ক্রমে সয়ে' যাবে। আর দু দশ বছর গেলে, মেয়েরা আসবে-যাবে তা' তুমি টেরও পাবে না।"

"তা হয় তো হ'বে। কিন্তু তার মানে কি? তার মানে এই যে, প্রাণের ভিতর আর তখন স্নেহের এক ফোঁটাও অবশিষ্ট থাকবে না। তুমি হয় তো ভাই বুঝতেই পারছো না—আমার কি দুঃখ। তোমার মা আছেন, ভাই-বোন আছে, তোমার বিয়ে হ'বে দু'দিন বাদে, তোমার স্নেহের হাজার আশ্রয় আছে—আমার, আমার এই মেয়েগুলি ছাড়া যে ভালবাসবার মত কিছুই নেই, কেউ নেই।"

রেখার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। লীলা তার মনের কথা বুঝিল না। প্রেমে বঞ্চিত স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় তার এই অস্থায়ী নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল আয়তনে আর তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। তার স্নেহ একটা স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

রেখা তার ক্লাশের মেয়েদের মায়ের মত স্নেহ দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিত। যে দুই বৎসর তারা তাহার কাছে পড়িত, সে দুই বছর তাহাদিগকে সে চারিদিক দিয়া স্নেহের প্রস্রবণে ডুবাইয়া রাখিত। মেয়েরাও সে স্নেহের প্রতিদান দিতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু রেখার ভালবাসার



শিল্পী—শ্রীযুক্ত অশোককুমার সেন

অতৃপ্ত-আশা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

এ আকুল আবেদন তাদের অন্তরে পৌঁছাইত না। সুকুমার শিশু তারা, যখন স্কুল ছাড়িয়া যাইত তখন তাদের স্থায়ী স্নেহ-বন্ধনের আবেষ্টনের ভিতর তারা রেখাদি'র জন্য কোনও একটা বিশিষ্ট স্থান রাখিতে পারিত না। যখনই মেয়েরা নীরব নমস্কারে তার কাছে বিদায় লইয়া গিয়াছে, তখনই রেখার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তার মনের এই বিরাট শূন্যতা, তার স্নেহের এই নির্ম্মম ব্যর্থতায় সে কোনও দিন এত অভিভূত হয় নাই, যেমন সে আজ হইল। এই সুচরিতা মেয়েটিকে রেখা বড় বেশী ভালবাসিয়াছিল। সে যে চলিল, তাহাতে তার ভয়ানক দুঃখ হইতেছিল। সে যে হাসিমুখে জীবনের চরম আনন্দ বরণ করিতে চলিয়াছে, তাহাতে যেন রেখার অভিমানে আঘাত পড়িল,—কি জানি কেন, তার অন্তরে একটা বিশেষ ব্যথার সৃষ্টি করিল। সঙ্গে সঙ্গে Finance Departmentএর কথায় তার মনের ভিতর তার পাঁচ বছরের পুরাতন ব্যর্থতা ও বেদনা জাগিয়া উঠিল। রেখা তাই আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে এই সত্যটা আবিষ্কার করিল যে, তার হৃদয় আর এই অস্থায়ী স্নেহ-বন্ধনে তৃপ্তি-লাভ করিতেছে না,—তার স্নেহের একটা স্থায়ী আশ্রয় চাই। তার হৃদয়ের দিবার সম্পদ এত আছে,—সারাজীবন ভরিয়া দুই হাতে তাহা কুড়াইয়া লইবে এমন একজন কেউ চাই।

[ক্রমশঃ]

বিবিধ-প্রসঙ্গ

মিশর

অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পিএইচ-ডি

মিশর প্রাচীন কাল হইতে ইয়োরোপীয়দের দ্বারা "ইজিপ্ত" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রাচ্যে বাইবেলে উল্লিখিত হামের বংশধর মিসরেইসের নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। আমরাও এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া ইজিপ্তকে বঙ্গভাষায় মিশর বলিয়া অভিহিত করিব।

মিশর প্রথমে স্বাধীন ছিল, তৎপর হিকসস্ (Hyksos) নামক একটি যাযাবর জাতির দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত হয়। হিকসসেরা পাঁচশত বৎসর রাজত্বের পর বিদ্রোহী মিশরীদের দ্বারা তৎদেশ হইতে বিতাড়িত হয়; এবং পরবর্ত্তী সময়ে পারস্য সম্রাট কামবক্স (Cambyses) দ্বারা অধিকৃত হয়। পারস্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মাকিডোনিয়ার বীরবর আলেক্সাণ্ডার ইহা বিজয় করেন ও তাঁহার সেনাপতি টলেমি (Ptolemy) এই স্থলে মাকিডনীয় রাজ্য স্থাপন করেন। ইহারা নিজেদের মধ্যেই বিবাহাদি করিত, মিশর তাহাদের উপনিবেশ মাত্র ছিল। ইহার পর ক্লিয়োপাট্রার সময় রোমানেরা এই দেশ বিজয় করে এবং তাহাদের নিকট হইতে শেষে আরবেরা ইহা বিজয় করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। আরব-বিজয়ের ফলে মিশরের লোকের জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়—তাহারা সর্ব্ববিষয়ে আরবীভূত হয়। এই সকল কারণে বর্ত্তমান কালের মুসলমান-মিশরীরা নিজেদের আরব-বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহার পর ককেসাস পর্ব্বত-সন্নিকটবর্ত্তী সিরকাসিয়া নামক স্থানের দাস যোদ্ধৃবৃন্দের দ্বারা এদেশ বিজিত ও শাসিত হয়। মিশরে এই সিরকাসিয়ানরা (Circassians) মামেলুক নামে অভিহিত হইত। ইহারাও কালে ওসমানলি তুর্কদের দ্বারা বিজিত ও শেষে বিনষ্ট হয়। তুর্কি অভিজাতবর্গই আজ পর্য্যন্ত মিশর শাসন করিতেছে, যদিচ আরবী পাশার বিদ্রোহের পর হইতে তুর্কি ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের মিশরী বলিয়া পরিচয় দিতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ের জাতীয় ভাবের প্রাধান্যে সর্ব্ববর্ণের লোকেরা নিজেদের 'মিশরী' বলিতেছে।

মিশরী জাতির ভাগ্যপটে এবম্প্রকারে ঘন ঘনও আমূল পরিবর্ত্তনের ফলে ও সংমিশ্রণে নানা জাতীয় লোকের (racial elements) তৎদেশে উদ্ভব হইয়াছে। তজ্জন্য সে দেশের বর্ত্তমানের অধিবাসী-দের মধ্যে জীবাকৃতির (racial type) ঐক্য লক্ষিত হয় না। এই দেশে আরবী-ভাষী মুসলমানের মধ্যে উত্তর-ইয়োরোপীয় জাতির লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ ও নিগ্রোর লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাহারও মতে (১) বর্ত্তমান মিশরীদের মধ্যে

১। Lane Poole—Egypt and her People.

অর্দ্ধেক রক্ত আরবজাতি হইতে আগত। আবার অনেকের মতে মিশরীদের নিম্নস্তরে ও গ্রামে প্রাচীন মিশরীয় জাতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বিজাতীয় রক্ত সহরের লোকের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন মিশরী পণ্ডিতের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি অনুমান করেন যে, মিশরীদের মধ্যে শতকরা ৬০ অংশ প্রাচীন জাতির রক্তোদ্ভব, কিন্তু কোন মিশরীই এ কথা স্বীকার করিবে না; তাহারা সকলেই আরব বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিবে! এ বিষয়ে তাহাদের মনস্তত্ত্ব আমাদের দেশের মুসলমানদের ন্যায়! মিশরীদের বাহ্যিক লক্ষণাদি নিরীক্ষণ করিলে অনুমান করা যায় যে, বেশীর ভাগ লোক প্রাচীন হামিতদের বংশধর। তাহাদের মুখের ও মস্তকের গঠন, নিগ্রোর মত কোঁকড়া চুল, মলিন শ্বেতবর্ণ হইতে শ্যামবর্ণ গাত্রের রং, প্রভৃতির প্রাচীন ফ্যারোর সময়ের প্রস্তরের স্থপতি-কার্য্যে খোদিত তৎদেশীয়দের প্রতিমূর্ত্তির সহিত মিল দেখা যায়। এই জন্যই অনেকেই বলেন যে, অজস্র বিপ্লব সত্ত্বেও উক্ত দেশের জল-বায়ুর মধ্যে থাকিয়াও মিশরের প্রাচীন অধিবাসীরা আজ পর্য্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানের ফেলাহিন-গণ (কৃষক) প্রাচীন ফ্যারোর যুগের কৃষকেরই বংশধর। (২)

আর যে সব আরব মিশরে বসবাস করিতেছে, তাহারা যাযাবর অবস্থায় আজ পর্য্যন্ত মরুভূমিতে বাস করিতেছে। তাহাদের আকৃতিই আরব রক্তের পরিচয় প্রদান করে। তৎপর বাকী থাকে কপ্তেরা (copts)। ইহারা মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বের খৃষ্টীয় মিশরীদের অবশিষ্ট অংশ। ইহাদের উৎপত্তির বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ইহাদের প্রাচীন মিশরীদের বংশধর বলিতে চাহেন, কেহ বা মিশ্রিত জাতি বলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহ্যিক আকৃতিতে দক্ষিণ ইয়োরোপীয়দের ন্যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের শারীরিক লক্ষণ কি প্রকারের ছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মিশরের অধি-বাসীদের বৃহৎ হামিত জাতির অন্তর্গত বলিয়া পণ্ডিতেরা গণ্য করেন। প্রাচীন মিশরের জনশ্রুতি অনুসারে তাহারা পুন্ত (Punt) নামক স্থান হইতে আগত। মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন, পুন্ত মিশরের দক্ষিণে কোনস্থানে অবস্থিত ছিল—হয় সোমালী দেশে, না হয় দক্ষিণ আরব দেশে, না হয় উভয় দেশে ব্যাপিয়া একটি দেশে। সেইস্ (Sayce) (৩) বলেন, মিশরীরা পুন্তের লোক। ইহারা আরব হইতে আফ্রিকায় আগত হয়। তিনি সেমিত ও হামিতদের এক বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু ব্রুগস্ (Brugsch) (৪) হারিস তালপত্র (Harris papyrus) পড়িয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পুন্তদেশ আফ্রিকায়; বোধ হয় মিয়সহরমস (Myoshormos karnak) হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য গহ্বর-সঙ্কুল তীরভূমি। এই সিদ্ধান্ত কারণকের মন্দিরে প্রাপ্ত ভৌগোলিক তালিকা দৃষ্টে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ইহাতেই পুন্ত যে আফ্রিকায়, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। নাভিল (Naville), (৫) ডেইর-এল-বাহারির আধুনিক ভূগর্ভ হইতে খনিত পুন্তের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দ্রব্য-সমূহের বিষয় বিচার করিবার কালে কহিয়াছেন "এইসব ভগ্নাবশেষগুলি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার দ্বারা পুন্তদেশের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয়। পুন্তের আফ্রিকার লক্ষণ প্রতিনিয়ত সুন্দররূপে স্থিরীকৃত হইতেছে। আবার মূলার (৬) পুন্তের অধিবাসীদের লক্ষণ বিষয়ে সঠিক সংবাদ দেন। সারগি বলেন ইহা দ্বারা তাহাদের বর্ত্তমানের সোমালীলাণ্ড-কূলবর্ত্তী অধিবাসীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি পুন্ত অধিবাসীদের তথাকথিত ককেসীয় জাতির আফ্রিকান শাখার অন্তর্গত বলেন। আর ইহারা মিশরের সহিত এক বংশোদ্ভব। ডেইর-এল-বহারি প্রস্তরের খোদিত পুন্তের রাজার আকৃতি মিশরী রাজাদের ন্যায় লম্বা ছুঁচোলা (long pointed) দাঁড়ী, হস্তে বুমেরাং (ক্ষেপনাস্ত্র), ও দক্ষিণ পদে অনেকগুলি মল (ring)-পরা আকৃতিবিশিষ্ট। এতদ্ব্যতীত তাহার মুখের গঠনে হামিতের লক্ষণ প্রকাশিত। অন্য দিকে, নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন, আফ্রিকার এই স্থলের অধিবাসীরা—সোমালী হাবসি প্রভৃতি) হামিত জাতির অন্তর্গত। এই জন্যই অনুমান হয় যে প্রাচীন মিশরীরা হামিত মূলজাতি (race) সম্পর্কীয় ছিল।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সব প্রত্ন-সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে পুরাতন সংস্কারগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, পুন্ত দেশ বিষয়ের জনশ্রুতি অতি পুরাতন নহে,—মিশর দেশও প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নূতন প্রস্তর যুগ প্রভৃতি সভ্যতার স্তরের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই নব আবিষ্কর্ত্তাদের নাম ফ্লিনডার্স পেট্রি (Flinders Petrie), ইনি ইংরেজ; আর ডি, মরগান (De Morgan); ইনি ফরাশী। ইঁহারা উভয়ে নিজেদের আবিষ্কারের উপর স্বতন্ত্রভাবে মত প্রকাশ করিয়া এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন যে, মিশরে দুইটা মূলজাতি বসবাস করিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা আফ্রিকার আদিম, অন্যটি এসিয়া হইতে আগত। এই শেষোক্তরাই ফ্যারোদের সভ্যতার বাহক-স্বরূপ ছিল। ইহারা প্রথমোক্ত আদিম ও অসভ্য জাতিকে জয় করিয়াছিল। আবিডস (Abydos) নাকাডা (Naqada) ও বাল্লাসের (Ballas) আবিষ্কারসমূহ এই অভিমতকে আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। নাকাডাতে ইংরেজ আবিষ্কর্ত্তা একটি বৃহৎ সমাধি-স্থল বাহির করিয়াছেন। তাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি দর্শনে অনুমিত হয় যে তাহা ফ্যারো-সভ্যতা হইতে পৃথক। এই সমাধিটি নবপ্রস্তর-যুগের সভ্যতার অন্তর্গত। ইহাতে কতকগুলি

২। Deniker—The Races of man, পৃ ৪৩৫।

৩। Sayce—Races of the old Testament, ch. v, 1891.

৪। Brugsch—Die Altagyptische volkertafeln—fifth congress of orientalists, 1880.

৫। Griffith—Egypt Exploration Fund, Archaeological Report, 1895. ৬। Miller Asien und Europa nach Altagyptischen Deukmadern. 1892.

পিত্তলের দ্রব্য ছিল। কবরগুলি ঐ যুগের ইয়োরোপীয় কবরের ন্যায় অর্থাৎ শবদের হাঁটুগেড়ে বসান ছিল। পেট্রি অনুমান করেন, যে জাতি এই বৃহৎ সমাধিস্থলটি রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা একটি নূতন জাতি। এই জন্য ইনি এই জাতিকে "নবজাতি" (New race) বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই জাতি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০—৩৫০০ বৎসর সময়ে অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের মিশরেয় সাম্রাজ্যের সময়ের মধ্যে আসিয়া মিশর-বিজয়ান্তর হয় তথাকার অধিবাসীদের বিনষ্ট করিয়া না হয় দূরীভূত করিয়া থিবাইড (Thebaid) অধিকার করিয়াছিল। তিনি, দক্ষিণ মিশরে (Upper Egypt) এই যুগে মিশরীয় দ্রব্যের উপস্থিতির অভাবে অনুমান করেন যে, এই "নব-জাতির" রাজত্ব তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল। এই নবজাতি লিবিয় মূলজাতীয় ছিল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পেট্রি ইহাদের করোটি (skull) পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই নব-জাতির করোটিকে ফেদার্ব দ্বারা পরীক্ষিত রকনিয়ার (Rokniar) skullএর সহিত তুলনা করা হইয়াছিল; এবং ফলস্বরূপ দৃষ্ট হয় যে, প্রথমোক্ত খুলি সকল মিশরী skull হইতে capacityতে (ভিতর-কার পরিমাণে) ও নাকের index হইতে বিভিন্ন এবং অন্যপক্ষে আলজিরিয়ার বর্ত্তমান skull সমূহ রকনিয়ার প্রাচীন খুলির সদৃশ; অতএব তাহারা লিবিয় (Libyan) জাতীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ডি মরগান (৭) কিন্তু নাকাডার আবিষ্কারের আলোচনা করিয়া পেট্রি হইতে বিভিন্ন মতে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন "নব জাতিকে" "পুরাতন জাতি" (Old race) বলা উচিত। কারণ ইহারাই মিশরের আদিম অধিবাসী এবং যথার্থ মিশরীদের (ফ্যারোর জাতির) আগমনের পূর্ব্বের জাতি। অন্যপক্ষে ভিদেমান (৮) (Wiedemann) বলেন যে নাকাডা যুগের ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্ম্মবিশ্বাস পরবর্ত্তী মিশরীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; সেই জন্য তিনি নাকাডার জাতি (পেট্রির 'নবজাতি' ও মরগানের 'পুরাতন জাতি') ঐতিহাসিক মিশরীয় জাতি হইতে বিভিন্ন—এই মত গ্রহণ করিতে পারেন না। সারগি, (৯) কবরের প্রথা, লিখন-প্রণালী প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলেন, এই সকল অনুষ্ঠান, যাহা আমরা তথাকথিত আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দর্শন করি, তাহা ঐতিহাসিক মিশরীয় সভ্যতার প্রারম্ভ—ইহা এই আদিম অধিবাসীরা (যাহারা লিবিয় জাতি) ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করে ও নিজেদের উৎপত্তির চিহ্ন পশ্চাতে অতিদূরে রাখিয়া যায়। অর্থাৎ এই আদিম অধিবাসীরাই পরে ঐতিহাসিক জাতি রূপে অভিব্যক্ত হয়। তৎপর তিনি বলেন যে, মিশরীয় ভাষাও আফ্রিকা হইতে উৎপত্তির পরিচায়ক। ম্যাসপেরো (Masparo) সেইস্ প্রভৃতি মিশরীয় ভাষাকে (সেমিতিক) ভাষা-সম্পর্কীয় বলেন; কারণ তাঁহাদের মতে সেমিতিক ও হামিতিক ভাষাদ্বয় একমূল-সম্ভূত। সেইস্ প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন মিশরীয়দের আরবাগত বলেন, তাঁহারা কিন্তু আরবে হামিতভাষার কোন চিহ্ন আবিষ্কার করিতে অক্ষম। অন্যদিকে আফ্রিকায় সাহারা হইতে মরোক্কা পর্য্যন্ত হামিত ভাষার একটি বিশাল শৃঙ্খল বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জন্যই সারগি বলেন, আফ্রিকা ছাড়িয়া আরবে কি প্রকারে হামিতদের উৎপত্তি সম্ভব?

নাকাডা skull সমূহ, যাহা পেট্রি ইয়োরোপে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা টমসন ও থেন (Thomson and Thane) দ্বারা পরীক্ষিত হয়; ফলস্বরূপ তাঁহারা বলেন, "এই খুলীসকল ছোট অথচ লম্বাকার, নাক ছোট ও বেঁকান। এই skull সমূহে গোয়ানাচ জাতির সহিত সাদৃশ্য নাই, কিন্তু আলজিরিয়ানদের সহিত মেলে। ইহা লিবিয়জাতি-মূলক, মিশরী নহে।" (১০)

অন্য পক্ষে ডি, মরগান দ্বারা এল-আমরা হইতে আনীত Skull সকল ফুকে (Fouquet) (১১) দ্বারা পরীক্ষিত হয়। এই এগারটি খুলির মধ্যে দশটি লম্বাকৃতি ও একটি মধ্যমাকৃতি (৭৫, ৫৫ Index)। এই শেষোক্তটিকে তিনি "মিশরীয়" বলেন, আর বাকীগুলিকে এসিয়াগত বলেন। সায়াইনফুর্থ (১২) (Schweinfurth) বিশ্বাস করেন যে, মরগান ও পেট্রি আবিষ্কৃত Skulls মধ্যে মূল জাতীয় প্রভেদ রহিয়াছে। এই জন্য তিনি হামিতদের আরব হইতে আমদানী করিতে চাহেন; আর অন্য জাতিটিকে মহা মিশরীয় সভ্যতা ও লিখন-প্রণালী সমেত মেসোপোটামিয়া উপত্যকা হইতে আনয়ন করিতে চাহেন।

সারগি কিন্তু বলেন ফুকের পরীক্ষা দৃষ্টি করিয়া ইহার সহিত ফ্যারোর যুগের মিশরীয় Skull সমূহের সহিত আশ্চর্য্য হন, এবং সেই সঙ্গে ইহাদের অন্য ভূমধ্যসাগরীয় জাতিসমূহের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যবোধ করেন। এক কথায় তিনি যাহাকে Euratrican species নাম দিয়াছেন, ইহারা তাহারই অন্তর্গত। তৎপর তিনি (১৩) বলেন, average cephalic Indexএর (মাথার Indexএর গড়পড়তার) বিভিন্নতা দেখিয়া দুইটা জাতি সৃষ্টি করা ভুল গণনা। তিনি মাথার গঠনের উপর বেশী জোর দেন। কারণ, তাঁহার মতে একপ্রকারের মাথার গঠন মাপেতে ও Indexএ বিভিন্ন হইতে পারে।

পেট্রি আনীত skullগুলির মাথার indices ৬৫—৮০ পর্য্যন্ত, বেশীর ভাগ ৭০—৭৫ সংখ্যায় পড়ে। মাথার Capacity ১১০০ c-c—১৫০০ c-c পর্য্যন্ত; নাকের index ৫৩.৭। ইহার দ্বারা ইহারা

৭। De-Morgan—Recherches sur les origines del' Egypt (পৃঃ ১৬৭) ৮। ডি, মরগান দ্রষ্টব্য। ৯। The Mediterranean Race, পৃ ১০০।

১০। Naqada and Ballas পৃঃ ৫১—৫৫।

১১। ডি, মরগান দ্রষ্টব্য।

১২। Uberden ursprung der Aegypter" Ver. Berlin S. F. Anth. 19 June, 189 Fi.

১৩। The Mediterranean Raee, পৃঃ ১০৪।

dolichoid (dolichoceppaland mesocephal)—mesorrhive অর্থাৎ লম্বাকৃত মাথা মধ্যমাকৃত নাকসংক্ষণাক্রান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে হামিতদের মধ্যে এই জাতীয় উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূমধ্যসাগরীয় জাতিসমূহ মধ্যে অনেকেই এই লক্ষণাক্রান্ত। সারগি নিজে যে সব মিশরীয় skulls মাপ করিয়াছেন তাহাদের Cranial capacity গড়ে ১,৪৪৫-c-c ; ডি, ব্লাসিও (De Blasio) (১৪) আরও অনেক Skulls মাপিয়াছেন। তিনি average দিতেছেন, ১,৩১৪-৫ যাহা পেট্রির "নবজাতির" সহিত মিলে। আর ফুকের skullগুলিকে সারগি, ellipsoid, pentagonoid, ovoid লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াছেন। পেট্রির skullএতেও তিনি এই লক্ষণ নিরীক্ষণ করেন।

এই সব পরীক্ষা করিয়া সারগি বলেন, অতীত কালের করোটি সমূহের (Skulls) সহিত ঐতিহাসিক কালের করোটির তুলনা করিয়া উভয়েই এক গঠন-সাদৃশ্য ব্যক্ত করে, এই জন্য ইহাদের এক মূল জাতীয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ; আর ডেইর-এল-বাহারির রাজকীয় মমিসমূহ (mummies) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহারাও ellipsoidal, pentagonal, ও beloid গঠন ব্যক্ত করে। এই সব কারণে তাঁহার বিশ্বাস যে আদিম অধিবাসীদের সহিত ঐতিহাসিক মিশরীয়দের মূল-জাতিগত প্রভেদ নাই। উভয়েই ভূমধ্যসাগরীয় জাতি ও আফ্রিকায় উদ্ভূত। (১৫)

আবার ইংরেজ পণ্ডিত C. D. Fawcett (১৬) নাকাডা করোটির biometric পরীক্ষা করিয়া বলেন যে "ঐতিহাসিক যুগের অতীত কালের মিশরীয়দের প্রতিনিধিস্বরূপ নাকাডা করোটি পরীক্ষা করিয়া তাহাদের এক প্রকারের (homogeneous) বলিয়া প্রতীত হয়। কোন কোন লক্ষণে এই করোটিসমূহ অন্য হইতে প্রাচীন বা নিম্নশ্রেণীর (primitive or inferior), অন্য বিষয়ে তাহারা আধুনিক। কতক লক্ষণে তাহারা নিগ্রোদের সদৃশ, আর কতক লক্ষণে তাহারা ইয়োরোপীয়দের সদৃশ। বেশীর ভাগ নাকাডা, থিবান ও বহু কপ্টদের মাথার গঠনের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় কেহ যেন সেই একটা জাতিকেই ৮০০০ বৎসরের ব্যবধানের পর পরীক্ষা করিতেছে! আবার Oetteking (১৭) পুরাতন মিশরীদের মাথার index ৭৩.৭ দিতেছেন। আর বর্ত্তমান মিশরীদের শারীরিক নৃ-তত্ত্ব হিসাবে ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে খারগা (Kharga) Oasis (১৮) এর লোকদের মস্তক লম্বাকৃতি ও নাক মধ্যমাকৃতি ; মাথার index ৭৪-৪ ও নাকের index ৭৬-৬ (৭৭.০), শরীরের দৈর্ঘ্য ১৬৩০৮ (১৬৪.০) সেন্টিমিটার। হার্ডলিক্কা (Hrdlicka) ইহাদের মাপিয়াছেন। আর এমিল স্মিডট (১৯) (Emil Schmidt) বর্ত্তমান মিশরীদের মাথার index ৭৬-৬ (৭৭.০) দিতেছেন। আবার খৃষ্টীয় মিশরীদের (যাহাদের কপ্ট বলে dechantre) তাহাদের (২০) মাথার index ৭৬-. দিতেছেন।

এই বিভিন্ন লোক দ্বারা গৃহীত প্রাচীন, ঐতিহাসিক ও বর্ত্তমান মিশরীদের শারীরিক মাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, মিশরের অতীতের ও বর্ত্তমানের অধিবাসীরা এক মূল জাতি সমুদ্ভূত। মাথার মাপের indexএর যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য যাহা উপরে ধৃত হইয়াছে তাহা বিভিন্নতার সীমার মধ্যেই (range of variation) পড়া সম্ভব।

উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকা

মিশরের নিম্নে নিউবিয়া আবিসিনিয়া, সোমালিলাণ্ড প্রভৃতি দেশসমূহ রহিয়াছে। এই ভূখণ্ডকে হাবসিদের দেশ বলিয়া অভিহিত করা হয়। পূর্ব্বে যে সব আফ্রিকার কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসসমূহ ভারতে আনীত হইত, তাহারা এই সব স্থলের অধিবাসী ছিল। ভারতবর্ষে তাহাদের হাবসী ও সিদ্দি বলা হয়। তাহারা নিগ্রো নয়। "হাবেসি" শব্দ আরবী ভাষা-সম্ভূত, অর্থ—মিশ্রিত। পশ্চিম এসিয়াতে অর্থাৎ মুসলমান দেশসমূহে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় দাসেরা হাবেসি বলিয়া অভিহিত হয়। প্রাচীন কালে নিউবিয়া বা নুবা এবং বর্ত্তমানের আবিসিনিয়াকে এথিওপিয়া (Ethiopia) বলিত। ইহার অর্থ কৃষ্ণকায়ের দেশ। হোমার তাঁহার ইলিয়াডে ও গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ তাঁহার পুস্তকে কৃষ্ণকায় এথিয়োপিয়ানদের উল্লেখ করিয়াছেন। হেরোডোটাস্ এথিওপিয়ান জাতির যে লক্ষণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরদের প্রতিও তাহা প্রযুক্ত হয়। তাঁহার বর্ণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এথিওপিয়েরা কৃষ্ণকায়, মাথার চুল কোঁকড়া, যোদ্ধা ও মাংসপ্রিয়। বর্ত্তমানেও এ স্থলের অধিবাসীদের স্বরূপ তৎপ্রকার।

এই স্থলের উত্তরভাগে বেজারা (Bejas) বা নিউবিয়ানেরা বাস করে। ইহাদের বিভিন্ন কৌমেরা (tribes), যথা বেজারা বিসহারিন, হামরান, হাডেনদোয়া, হালেঙ্গা প্রভৃতি একটির পর একটি করিয়া লোহিত সমুদ্র ও নীলনদীর মধ্যস্থানে প্রথম জলপ্রপাত হইতে আবিসিনিয় উচ্চভূমি পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে বাস করে।

কতকগুলি বেজা কৌমেরা যথা : আবাবদেরা (জনসংখ্যায় প্রায় বিশ হাজার) যাহারা দক্ষিণ মিশরে বাস করে, বেণি-আমেররা যাহারা পূর্ব্বে কতকটা স্থায়ীভাবে বাস করে ও পশ্চিমের জালিনেরা অনেকাংশে আরবী ভাবাপন্ন হইয়াছে, যদিচ এখনও হামিতিক ভাষা ব্যবহার করে। আবার ইহাদেরই পার্শ্বে সেমিটিক ভাবাপন্ন আরবী-ভাষী এথিওপিয়

১৪। Lavarieta umanenell Egitto Aulico 1893.

১৫। "The mediterranean Race."

১৬। C. D. Fawcett in Biometrika vol 1 Oct 1901 to Aug 1902 "Variation and correlation of the Human skulls" পৃঃ ৪৬৪—৪৬৫।

১৭। Martin—Lehrbuch der Anthropologicতে উদ্ধৃত।

১৮। Martinএ উদ্ধৃত।

১৯। ঐ।

২০। Deniker এ উদ্ধৃত।

কৌমেরা বাস করিতেছে, যথা হাবারেরা ও হাসানিয়েরা, যাহারা বায়াদের উচ্চভূমিতে বসবাস করে ও আবুরক্ ও সুক্রিয়েরা ব্লুনীলের দক্ষিণে বাস করিতেছে। (২১)

ইহার পরে আসে আবিসিনিয়া। ইহা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী গুটিকতক কৌমের সমবায় সম্বন্ধে স্থাপিত একটি খ্রিষ্টীয় ষ্টেট। আরবেরা এই বিভিন্ন খ্রিষ্টীয় জাতিসমূহের রাজনীতিক সম্বন্ধে সংযুক্ত ষ্টেটকে ঘৃণার সহিত "হাবেসি" (মিশ্রিত) বলিয়া অভিহিত করিত। "হাবেসি" শব্দের লাটিন রূপান্তরে এই দেশের বর্ত্তমান নাম হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জগতে এই স্থলের ধর্ম্মমণ্ডলীকে "এথিওপিয়ান চার্চ্চ" বলা হয়। আবিসিনিয়ার মধ্যে আমহারিংগা ভাষা (আমহারা ও গডজামে যাহা প্রাচীন আমহারিংগা ভাষা হইতে উদ্ভূত তাহা) জুয়াই হ্রদের পশ্চিমে ও সোয়ার দক্ষিণে এবং হাওয়াসের উৎপত্তি স্থলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কথিত হয়। ডেনিকার বলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসীদের নিম্নস্তর আগাও (Agaw) জাতি (যাহারা এথিওপিয় লক্ষণাক্রান্ত ও হামিটিকভাষী তাহাদের) দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু উচ্চশ্রেণী সমূহ বিশেষভাবে সেমিটিক ভাবাপন্ন। (২২)

আবিসিনিয়ার দক্ষিণে গাল্লা বা ওরোমাজাতি বাস করে। ইহাদের ডেনিকার খাঁটি এথিওপিয় জাতি বলেন। ইহাদের পূর্ব্বে সোমালিজাতি বাস করে। তাহারা সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান যথা জিবুটি অন্তরীপ হইতে আজি-ফিদ্দার সমতলভূমি পর্য্যন্ত স্থলে বসবাস করে। গাল্লাদের উত্তরে আবিসিনিয়া ও সমুদ্রতীরের মধ্যে (জিবুটি অন্তরীপ হইতে হামফিলা উপসাগর পর্য্যন্ত) আফার বা ডানাকিল জাতি বাস করে। ইহারা বেশীর ভাগ ওবক-তাজুরা নামক ফরাশী উপনিবেশের অধিবাসী। শারীরিক লক্ষণে ইহারা সোমালীদের ন্যায়, কিন্তু কমবেশী আরবী ভাবাপন্ন। ডানাকিল জাতির উত্তরে সাহোজাতি বাস করে। ইহাদের নাকি আগাও জাতির সহিত সাদৃশ্য আছে। ইহারা মাসোয়া নামক স্থানের দক্ষিণে থাকে, আর উত্তরে বিভিন্ন ইথিওপিয় কৌমেরা (যাহাদের সমষ্টিভাবে মাসোয়ান (Massowans) বলা হয় তাহারা) বাস করে। (২৩)

এই স্থলে বক্তব্য যে ডেনিকার যাহাদের ইথিওপিয়ান জাতির অন্তর্গত বলিয়াছেন, তাহারা আজকালকার নৃতত্ত্ববিদ্‌দের বিভাগানুসারে হামিটিক মূলজীবজাতির অন্তর্গত, এ কথা প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ আরবী ভাষা-ভাষী ও আরবী-ভাবাপন্ন হইলেও জাতি হিসাবে হামিটিক।

২০। Hartmann—"Die Bedjah" Zeitschrift. f. Ethnologie vol. xi, 1849, P 11 and Virehow Z. F. vo x. 18 and 8 vol x. 18 and 8 ; Denikar—Bull soc, Anthr. Paris 1880 p 594. ২১। Deniker—The Races of Man পৃ ৪৩৬।

২২। Revil, La vallee du Darrar, Paris 1882 ; Sanlethi—Bull Soc Anth Paris 1893 p 4 and 9

শারীরিক লক্ষণে এথিওপিয় বা উত্তরপূর্ব্বের হামিটেরা দীর্ঘাঙ্গ। ২৯ জন আবিসিনিয়েরা মাপেতে ১,৬৬০ মিলিমিটার, ৩৫ ডিনাকিলেরা ১,৬৭০ মি, মি লম্বা। গাত্রবর্ণে Brown বা চকোলেট রংয়ের উপর রক্তিমাভা লক্ষণাক্রান্ত। মাথার গঠন dechantre গৃহীত মাপানুসারে লম্বা indices হইতেছে ৭৫.৭ (=৭৬.০) হইতে ৭৪.১ পর্য্যন্ত। ইহাদের চুল নিগ্রো চুলের ন্যায় কোঁকড়া, লম্বা মুখাকৃতি, নাক সরু, এবং কাহারও বা সিধা ও কাহারও বেঁকান (Convex)। ইহাদের শরীরের গঠন পাতলা ; পায়ের ও হাতের কবজি শক্ত ; লম্বা ও স্নায়ু বিশিষ্ট হস্তপদ (বিশেষতঃ হস্তের অগ্রভাগ) চওড়া কাঁধ ও শরীরের সমভাগটা প্রাচীন মিশরী প্রতিমূর্ত্তির মতন ত্রিকোণ ভাগে গঠিত। শারীরিক গঠন হিসাবে ইহারা সুন্দর জাতি।

এই ভূখণ্ডের জাতি সমূহের শারীরিক মাপের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ডেনিকার নিম্নলিখিত তালিকা দিতেছেন—শরীরের দৈর্ঘ্য হিসাবে ২৫ বেজা ১,৭০৪ মিলিমিটার উচ্চ ; ৫৬ সোমালি ১,৭১৭ মি, মি। মাথার মাপের indexএ ৩৫ ডানাকিল ৭৪.৬। সোমালি পুরুষদের স্কন্ধের দৈর্ঘ্য ২০.০ সেন্টিমিটার (মার্টিনে দ্রষ্টব্য)। টাকার, মাইয়ার ও সেলিগম্যান নিউবিয়ানদের শরীরের দৈর্ঘ্য পুরুষদের জন্য ১৭৩.৫ ও স্ত্রীলোকের ১৫৭.২ সেন্টিমিটার দিতেছেন। হস্তের দৈর্ঘ্য হিসাবে আমহারা পুরুষ আবিসিনিয়েরা ৪৪.৫ সেন্টিমিটার ও সোমালিয়া ৪৫.০ (মার্টিন দ্রষ্টব্য) ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে এই স্থলের কতিপয় জাতি যথা বেজা, সোমালি, নিউবিয়ানেরা শারীরিক দৈর্ঘ্যে অত্যন্ত লম্বা পুরুষ ; ও মাথার গঠনে তাহারা লম্বাকৃতি।

রাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতি

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম-এ

ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতি

(৩)

দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির মূলস্তম্ভ-স্বরূপ কতিপয় প্রধান প্রধান দলিল ষ্টুয়ার্ট-বংশীয় নৃপতিগণের আমলে সম্পাদিত হইয়াছিল। টিউডর-বংশীয় ও ষ্টুয়ার্ট-বংশীয় রাজগণের আমলেই পার্লামেণ্টের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। বিশেষতঃ এই সময়েই হাউস্ অফ্ লর্ড্‌স্ ও হাউস্ অফ্ কমন্‌স্ পার্লামেণ্টের এই দুই বিভাগ ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। প্রধমতঃ যাজক সম্প্রদায়ের ও ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যে সমুদায় লর্ড রাজ-আহ্বান প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারাই হাউস্ অফ্ লর্ড্‌স্ বিভাগে যোগ দান করিতেন। যে সকল লর্ডকে আহ্বান করা নৃপতি সঙ্গত মনে করিতেন, তাঁহারাই আহূত হইতেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে এইরূপ ঘটিতে লাগিল, যে লর্ড

একবার পার্লামেণ্টে আহূত হইতেন, তিনি চিরকালই রাজ-আহ্বান প্রাপ্ত হইতেন ; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার স্থলে আহূত হইতেন। যাজক সম্প্রদায়স্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ আর্চ-বিশপ-বিশপ ও এবটগণ আহূত হইতেন। ক্রমে ক্রমে ভূম্যধিকারি সম্প্রদায়স্থ লর্ডগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। টিউডর আমলের প্রারম্ভে হাউস্ অফ্ কমন্স্ বিভাগে প্রায় তিনশত সভ্য ছিলেন। ক্রমে ক্রমে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতে থাকে। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য ইংলণ্ডের সহিত ওয়েলস্ প্রদেশ যোগ করা হয়।

যাহা হউক, এই সময়ে পার্লামেণ্টের যথেষ্ট উন্নতি সংঘটিত হইলেও পার্লামেণ্টের উপর টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট-রংশীয় রাজগণের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। নৃপতিগণ আবশ্যকস্থলে পার্লামেণ্টকে বাদ্ দিয়া প্রিভি-কাউন্সিলের নামমাত্র অনুমতি লইয়া Proclamation বা ঘোষণাপত্র-সমূহ জারি করিতেন, এবং সেই সকল ঘোষণাপত্র আইনের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কখন কখন আইন রদ করিবার ক্ষমতাও তাঁহারা দাবি করিতেন। এই সময়ের শাসনকার্য্য পরিচালনের একটি বিশেষত্ব আছে ; টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট আমলে কাউন্সিলের দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। এই সকল কাউন্সিলের মধ্যে প্রিভি কাউন্সিল সর্ব্ব-প্রধান ; পার্লামেণ্ট্ কাউন্সিলে বিরাট জনসঙ্ঘ থাকায় নৃপতি কতিপয় সভ্যকে বাছিয়া লইতেন। পার্লামেণ্টের সভ্যগণই প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য হইতেন বটে, কিন্তু পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহাদিগের কোন দায়িত্ব থাকিত না। প্রথমতঃ এই কাউন্সিল হইতে নৃপতি উপদেশ গ্রহণ করিতেন ; কিন্তু প্রথম দুইজন ষ্টুয়ার্ট্ নৃপতির আমল হইতে এই কাউন্সিল সমুদায় শাসনকার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে ইহাই নৃপতির প্রতিনিধি-স্বরূপ ছিল। সমুদায় শাসন-কার্য্যই কাউন্সিল পরিদর্শন করিত, এবং ঘোষণাপত্র ও আদেশসমূহ বাহির করিত। এই কাউন্সিলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয় ভাবে পরিগণিত হইত। তৎকালে ইংলণ্ডেশ্বর ইহার সভাপতি থাকিতেন। এই প্রিভি কাউন্সিল হইতে অন্যান্য কতিপয় কাউন্সিলের উদ্ভব হইয়াছিল।

এই স্থলে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ক্ষুদ্র সভার দ্বারা গোপনে রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনের সুবিধা হইয়া থাকে। বৃহত্তর সভায় এই সুবিধা থাকে না। বহুসংখ্যক সভ্যের একতা রক্ষা করিয়া ত্বরায় কার্য্য সম্পাদন করা দুষ্কর হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রিভি কাউন্সিলের উৎপত্তি। ক্রমশঃ প্রিভি কাউন্সিলও বৃহত্তর আকার ধারণ করিতে থাকে। এই হেতু প্রিভি কাউন্সিল হইতে আর একটী ক্ষুদ্রতর সভার সৃষ্টি হইল, এবং কালে এই ক্ষুদ্রতর সভাই ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িল। এই ক্ষুদ্রতর সভাই ক্যাবিনেট্ বা মন্ত্রিসভা। দ্বিতীয় চার্লসের আমল হইতেই এই ক্যাবিনেটের উৎপত্তির সূত্রপাত। তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে হুইগ্ ও টোরি এই দুই রাজনৈতিক দলের লোকই ক্যাবিনেটে স্থান পাইতেন। অতঃপর উইলিয়ম হুইগগণের মধ্য হইতে বিশিষ্ট লোক লইয়া ক্যাবিনেট গঠন করেন। হানোভার বংশের প্রথম রাজা প্রথম জর্জ্জের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব হয়। নৃপতি নিজে ইংরাজি জানিতেন না, এবং ইংলণ্ডীয় রাজনীতি বিষয়েও তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই হেতু ওয়ালপোলের হস্তেই তিনি সমুদায় ভার অর্পণ করিতেন। ওয়ালপোলই ইংলণ্ডের প্রথম প্রধান মন্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ক্যাবিনেটের দ্বারা শাসন-বিষয়ক নিম্নোক্ত প্রথাসকল সংস্থাপিত হইয়া পড়িল ; ক্যাবিনেটের সভ্যগণ হাউস্ অফ্ লর্ডস্ অথবা হাউস্ অফ্ কমন্সের সভ্য হইবেন ; একবিধ রাজনৈতিক মত তাঁহারা অবশ্যই অবলম্বন করিবেন। হাউস্ অফ্ কমন্সের অধিকাংশ সভ্যের মত তাঁহাদের অনুকূলে থাকা চাই। হাউস্ অফ্ কমন্সের নিকট তাঁহাদের একযোগে দায়িত্ব থাকিবে ; অর্থাৎ যদি কোন একজন মন্ত্রীর অভিমত হাউস্ অফ্ কমন্সের নিকট অমান্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই এককালে পদত্যাগ করিবেন ; এবং তাঁহারা সকলেই প্রধান মন্ত্রীর অধীনে থাকিবেন। এই সকল বিষয়ই আধুনিক ক্যাবিনেট-গভর্ণমেণ্টের মূলমন্ত্র স্বরূপ। বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ক্যাবিনেটের কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তিনজন বা চারজন সভ্যের দ্বারা একটী ক্ষুদ্রতম সমর-ক্যাবিনেট সংগঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতদ্বৈধ সমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ; এবং সকল-দলের লোক লইয়াই সভা গঠিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডীয় শাসনপদ্ধতি বলিলে আমরা কি বুঝিব, এক্ষণে দেখা যাউক্। কোনও একখানি নির্দ্দিষ্ট দলিল পাঠে ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতি অবগত হওয়া যায় না। বহু পৃথক্ পৃথক্ উপকরণের দ্বারা এই শাসন-পদ্ধতি গঠিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখা যায় কতকগুলি আইনের দ্বারা এই শাসন-পদ্ধতি স্বীয় আকার পরিগ্রহ করিয়াছে ; The Bill of Rights, the Act of Settlement. the Habeas Corpus Aets, The Libel Act, the Reform Acts, the Septennial and Quinquennial Acts, the Elections Acts, the Parliament Act of 1911 প্রভৃতি আইন উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ Magna Charta এবং the Petition of Right,—এই দুইটী দলিল উক্ত শাসন-পদ্ধতির সর্ব্বপ্রধান মূলস্তম্ভ স্বরূপ। এতদ্দ্বারা শাসন-ব্যাপারের পদ্ধতিসমূহ বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, কতকগুলি লিখিত ও অলিখিত সাধারণ আইনের বিষয় রহিয়াছে। চতুর্থতঃ, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বহুসংখ্যক সন্ধি ও আন্তর্জাতিক এগ্রিমেণ্টসমূহ রহিয়াছে। এতৎসমুদায় ব্যতীত শাসনপদ্ধতি-সংক্রান্ত বহু প্রথা ক্রমে ক্রমে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে ; তৎসমুদায় লিখিত আইনে পরিণত হয় নাই।

যাহা হউক, পার্লামেণ্টে অবস্থিত রাজাই গ্রেটব্রিটেনের আইন-প্রণয়ন বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা। ইংলণ্ডেশ্বর, হাউস্ অফ্ লর্ড্স্ ও হাউস্ অফ্ কমন্স্, এই তিনই হইল ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতির কর্ত্তা। ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক পার্লামেণ্ট আহূত হইয়া থাকে। পার্লামেণ্ট্ বসিবার অন্ততঃ বিংশতি দিবস পূর্ব্বে প্রিভি কাউন্সিলের পরামর্শ অনুসারে নৃপতি সভ্যগণকে আহ্বান করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্টের

প্রাগুক্ত দুইটী বিভাগ সম্বন্ধে এক্ষণে বিশেষ বিশেষ কথা বিবৃত হইতেছে। হাউস্ অব লর্ডসের উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পাঁচ শ্রেণীর সভ্য এই বিভাগে স্থান পাইয়া থাকেন :—১। রাজবংশজাত প্রিন্স্ সকল। ২। পুরুষানুক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত লর্ডগণ। ৩। স্কটিশ লর্ডগণ। ৪। আইরিস লর্ডগণ। ৫। স্বকীয় পদগৌরবে যাঁহারা লর্ড হইয়াছেন, তাঁহারা। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লর্ড্গণ পুরুষানুক্রমে অধিকার ভোগ করেন্ নাই। এই সমুদায় লর্ড আবার দুই প্রকারের আছেন ; (ক) আইনজ্ঞ লর্ডগণ, ও (খ) যাজক সম্প্রদায়স্থ লর্ডগণ। হাউস্ অফ্ লর্ড্স্ ইংলণ্ডে আপীলসংক্রান্ত চরম বিচারালয় ; এই হেতু সর্ব্বপ্রধান আইনজ্ঞগণকে লর্ডপদে উন্নীত করিয়া এখানে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। আর আধুনিক কালে যাজক-সম্প্রদায়স্থ লর্ড বলিলে আর্চ্চবিশপগণ ও ইংলণ্ডের চার্চ্চের কতিপয় বিশপগণকে বুঝিতে হইবে। সভ্যগণ অবশ্য একবিংশতি বা তদধিক বর্ষ বয়স্ক হইবেন। বদ্মাইস্ বা দেউলিয়াগণকে হাউস্ অফ্ লর্ডসে স্থান দেওয়া হয় না।

গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের জেলা, নগর, ও ইউনিভার্সিটি সকল হইতে হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্যসমুদায় নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। নির্ব্বাচনকারী ভোটারগণ-সংক্রান্ত নিয়মসমূহ অতীব জটিল। বর্ত্তমান কালে ১৯১৮ সালের the Representation of the People Act দ্বারা নির্ব্বাচন বিষয়ক নিয়মসমূহ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই আইনের দ্বারা বহু লক্ষ ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই আইনের দ্বারাই ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে রমণীগণ ভোটের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনকারী পুরুষগণ অন্ততঃ একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক হইবেন এবং নির্ব্বাচনকারিণী রমণীগণ অন্ততঃ ত্রিংশ বর্ষ বয়স্কা হইবেন। বিদেশী লোক, দেউলিয়া, পাগল, বদ্মাইস, বোকা ও অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণের ভোট প্রদানের অধিকার নাই। লর্ডগণেরও ভোট নাই। হাউস্ অফ কমন্সের যে সমুদায় সভ্য বেতনভোগী নহেন, তাঁহারা বার্ষিক চারিশত পাউণ্ড করিয়া পাইয়া থাকেন। হাউস্ অফ্ লর্ডসের সভ্যগণ বেতনভোগী নহেন। নূতন পার্লামেণ্ট্ বলিলে বুঝিতে হইবে নূতন হাউস্ অফ্ কমন্স্ গঠিত হইল। পার্লামেণ্ট্ ভঙ্গ করা বলিলে বুঝিতে হইবে হাউস্ অফ্ কমন্স্ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল এবং পুনরায় নূতন ভোট গ্রহণ করা হইবে। এম, পি (মেম্বর অফ্ পার্লামেণ্ট্) বলিলে হাউস্ অফ্ কমন্সের মেম্বরগণকে বুঝায়। হাউস্ অফ্ লর্ডসের সভ্যগণ ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়েন না। ইংলণ্ডেশ্বর পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন এবং ভঙ্গ করেন। গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের চান্সেলরগণ রিটার্ণিং অফিসারগণের উপর নির্ব্বাচনের হুকুম জারি করেন, এবং তৎসমুদায় অফিসার ১৮৭২ সালের ব্যালট্ য়্যাক্ট অনুসারে নির্ব্বাচন ব্যাপার সম্পাদন করেন। উক্ত অফিসারগণই নির্ব্বাচনের তারিখ ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নোটিশ দেন। নির্ব্বাচনের দিনে প্রার্থিগণের নামোল্লেখ হয় ; এবং যদি মাত্র একজন প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাচিত হইলেন এইরূপ ঘোষিত হয়। যদি একাধিক প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে ভোটের দিবস নিরূপিত হয়। গোপনে ব্যালটের দ্বারা ভোট সম্পাদিত হয়। নির্ব্বাচনের খরচা সচরাচর অত্যধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। প্রার্থী যে দলের অন্তর্ভুক্ত, কখন কখন সেই দলের টাকা হইতে ঐ খরচা দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই প্রার্থী নিজে সেই ব্যয়ভার বহন করেন। তাই বলিয়া তিনি বেশী পরিমাণ খরচ করিয়া তাঁহার ভোট সংগ্রহের সুবিধা করিয়া লইতে পারেন না। ব্যালট্ য়্যাক্ট ও ১৮৮৩ সালের The Corrupt and Illegal Practices Act-এর দ্বারা ঘুষের প্রথা এবং ভোটারগণের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার যতদূর সম্ভব নিবারিত হইয়াছে। ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টের স্থিতিকাল খুব বেশী হইলে সাত বৎসর পর্য্যন্ত নিরূপিত ছিল ; ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট্ য়্যাক্ট অনুসারে পাঁচ বৎসর সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পার্লামেণ্টের কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহকল্পে বহু কমিটী গঠিত হইয়া থাকে। পার্লামেণ্ট্ হাউস্ লণ্ডনের ওয়েষ্ট্মিনষ্টরে অবস্থিত। পার্লামেণ্ট্ খুলিবার সময় বিশেষভাবে আদব-কায়দা পালিত হইয়া থাকে। সভ্যগণ প্রথমতঃ তাঁহাদিগের নিজেদের হাউসে একত্র হইয়া থাকেন। অতঃপর সাধারণ সম্প্রদায়ের সভ্যগণ হাউস্ অফ্ লর্ড্সে গমন করেন। তথায় লর্ড্ চ্যান্সেলর তাঁহাদিগকে একজন Speaker বা বক্তা নিয়োগ করিতে বলেন। তাঁহারা বক্তা নির্ব্বাচন করিয়া লর্ডগণের নিকট প্রত্যাগমন করেন এবং সেখানে ইংলণ্ডের লর্ড্ চ্যান্সেলরের দ্বারা বক্তার নিয়োগ অনুমোদন করিয়া লন। তার পর সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রাচীন কাল হইতে লব্ধ অধিকারগুলি স্বীকৃত হইয়া থাকে, এবং তদনন্তর উক্ত সম্প্রদায়ের সভ্যগণ নিজেদের হাউসে গমন করিয়া থাকেন। অতঃপর শপথ গৃহীত হয়। পরদিবস নৃপতি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার পর পার্লামেণ্টের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়। স্পিকার, সার্জেণ্ট্ য়্যাট আর্মস্, চ্যাপ্লেন প্রভৃতি হাউস্ অফ্ কমন্সের প্রধান কর্ম্ম করেন। পূর্ব্বকালে হাউস্ অফ্ কমন্স্ কেবল দরখাস্তই করিত, এবং একজন বক্তার দ্বারা তাঁহাদিগের দরখাস্ত করা হইত। এই কারণে—এই বক্তানিয়োগ-প্রথা বরাবর চলিয়া আসিতেছে। কোন বহুদর্শী সভ্যই এই পদে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তিনি ঐ হাউসের সভাপতি হয়েন, নিয়ম কানুনের ব্যাখ্যা করেন, যাহা স্থিরীকৃত হইল তাহা ঘোষণা করেন, যাহা আদেশ দেওয়া হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করেন এবং সভ্যগণকে অনেক বিষয়েই পরামর্শ দিয়া থাকেন।

১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট্ আইন অনুসারে সর্ব্বপ্রকার আইন প্রণয়ন বিষয়ে হাউস অফ্ কমন্স্ই সর্ব্বপ্রধান ; বিশেষতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন বিষয়ে এই হাউস্ই সর্ব্বেসর্ব্বা। হাউস্ অফ্ কমন্সের কার্য্যসমূহ সম্পাদনের যে সমুদায় নিয়ম আছে, তাহা অতীব জটিল। সাধারণ সভ্যেরা মোটামুটি নিয়মগুলি মাত্র জানিয়া রাখেন। বিশেষভাবে জানিতে হইলে 'বক্তার' পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। বক্তাই সমুদায় কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দেন ; কেহ অসঙ্গত বলিতেছেন এইরূপ বোধ হইলে তিনি তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কোন একটী

আলোচনা বন্ধ করিবারও নিয়মাবলী রহিয়াছে। যাহা হউক, হাউস্ অফ্ লর্ড্‌সেও এতাদৃশ নিয়ম সমুদায় রহিয়াছে। প্রত্যেক হাউসের সভ্যগণেরই কতিপয় অধিকার আছে। প্রধান প্রধান অধিকারগুলি নিম্নে বর্ণিত হইতেছে (১) মেম্বরগণকে গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় না। সেসনের সময় ব্যাপিয়া এবং সেসনের পূর্ব্ব ও পরে চল্লিশ দিবস ধরিয়া তাঁহারা এই অধিকার ভোগ করেন। (২) বক্তৃতার স্বাধীনতা; অর্থাৎ পার্লামেণ্টে তাঁহারা যে বক্তৃতা করিবেন তাহার জন্য পার্লামেণ্ট্ ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহাদের দায়িত্ব থাকিবে না। (৩) ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট যাইবার অধিকার। লর্ডগণ ব্যক্তিগত ভাবে এবং সাধারণ সম্প্রদায়ের সভ্যগণ একযোগে এই ক্ষমতা উপভোগ করেন। সভ্যগণকে জুরির কার্য্য করিতে হয় না; তবে সাক্ষ্য দিতে হয়। হাউস্ অফ্ লর্ড্‌সের কোন সভ্য রাজদ্রোহ বা বদমাইসির মোকদ্দমায় পড়িলে হাউস্ অফ্ লর্ড্‌সেই তাঁহার বিচার হইবে। দেওয়ানী মোকদ্দমায় তাঁহারা গ্রেপ্তার হইতে পারেন না। আরও নানাপ্রকার সুবিধা ও অধিকার তাঁহারা ভোগ করেন।

মন্ত্রিসভার কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রিসভাই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক বিষয়ে যে দল প্রবল থাকে, সেই দলের লোক লইয়াই এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। উভয় হাউসের সভ্যই মন্ত্রিসভায় স্থান পান। প্রধান মন্ত্রী এই মন্ত্রিসভার কর্ত্তা। সাধারণ সম্প্রদায়ের আস্থা যতকাল তাঁহার উপর থাকে, ততকাল তিনি এই পদে থাকেন। যাহা হউক, মন্ত্রিসভা গঠনের প্রথা এই প্রকার:—হাউস্ অফ্ কমন্‌সে যে দল প্রবল থাকে, তাহার নেতাকে ইংলণ্ডেশ্বর ডাকিয়া পাঠান, এবং তাঁহাকেই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলেন। যদি সেই নেতা বিবেচনা করেন যে, তাঁহার গঠিত মন্ত্রিসভায় হাউস্ অফ্ কমন্‌সের আস্থা থাকিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার নিজদলের লোক হইতে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আরম্ভ করেন; অবশ্য তিনি সেই দলের প্রধান লোক গুলিকেই বাছিয়া লন। তাঁহাদের দ্বারা দলের কতটুকু কি উপকার হইয়াছে, তাঁহাদের বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা কিরূপ, এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় মন্ত্রিসমূহের পদে তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিবেন কি না, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই তিনি লোক পছন্দ করেন। যাঁহাদিগকে তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাঁহাদের নাম তিনি নৃপতির হস্তে প্রদান করেন। তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়া গেল। মন্ত্রিসভায় যে যে মন্ত্রিপদ থাকে, সময়ে সময়ে তাহার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়া থাকে। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত মন্ত্রিসমূহ ছিলেন:—প্রধান মন্ত্রী (তিনি সচরাচর রাজকোষের প্রধান লর্ড) প্রধান বিচারপতি, রাজকোষের কর্ত্তা, পাঁচজন ষ্টেট্ সেক্রেটারী (স্বদেশীয় ব্যাপারের ষ্টেট্ সেক্রেটারী, বৈদেশিক ব্যাপারের ষ্টেট্ সেক্রেটারী, উপনিবেশসমূহের ষ্টেট্ সেক্রেটরী, যুদ্ধের ষ্টেট্ সেক্রেটারি ও ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী), লর্ড প্রিভি সিল, কাউন্সিলের সভাপতি, নৌবলের প্রধান লর্ড, স্থানীয় শাসন-সমিতির সভাপতি, শিক্ষা-সমিতির সভাপতি, ল্যাঙ্কাষ্টারের চ্যান্সেলর, কার্য্য-সম্পাদন সমিতির সভাপতি, পোষ্টমাষ্টার জেনারল, স্কটলণ্ডের সেক্রেটারী এবং আয়ারলণ্ডের প্রধান সেক্রেটারী। এই ঊনবিংশটি মন্ত্রীর সম্মিলনে মন্ত্রিসভা গঠিত। তবে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বিবেচনা অনুসারে মন্ত্রিপদ বৃদ্ধি করিতেও পারেন, আবার কমাইতেও পারেন। বিগত যুদ্ধের সময় মন্ত্রিসভাটী বৃহত্তর বলিয়া বোধ হওয়ায়, পাঁচজন মন্ত্রীর সম্মিলনে একটী ক্ষুদ্রতর সমর-মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ১৯১৮ সালেও সমর-মন্ত্রিসভা চলিয়াছিল। প্রথমতঃ হাউস্ অফ্ কমন্‌স্ মন্ত্রিসভার আনুগত্য করিতেছিল। অতঃপর হাউস্ অফ্ কমন্‌সের সহিত মন্ত্রিসভার মতদ্বৈধ ঘটিতে লাগিল। যাহা হউক, প্রধান মন্ত্রী সেই সমর-মন্ত্রিসভা শেষ করিয়া ফেলা সঙ্গত মনে করিলেন, এবং পুরাতন প্রথায় একটী নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। কোন বিষয়ে প্রস্তাব করিতে হইলে সেই বিষয় যে মন্ত্রীর হস্তে রহিয়াছে, তিনিই তদ্বিষয়ে প্রস্তাব করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই প্রস্তাবের জন্য মন্ত্রিসভা একযোগে দায়ী। বাস্তবিক পক্ষে হাউস্ অফ্ কমন্‌সের নিকট মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব রাখিয়া থাকে, এবং মন্ত্রিসভার হাত দিয়াই হাউস্ অফ্ কমন্‌স্ সমুদায় বিষয়ে আধিপত্য করিয়া থাকে; কিন্তু এই মন্ত্রিসভার ক্ষমতাসমূহ আইনের দ্বারা স্বীকৃত নহে। আইনের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এই মন্ত্রিসভার সভ্যগণ প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ১৯০৫ সালে প্রধান মন্ত্রীর পদ আইনের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর পদের বেতন নাই। তবে তিনি একটী বেতনের পদ গ্রহণ করেন; সাধারণতঃ First Lord of the Treasuryরূপে তিনি কার্য্য করেন। মন্ত্রিসভার কার্য্যাবলী গোপনে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে এই মন্ত্রিসভার যে সকল মিটিং হইত, তৎসমুদায়ের কার্য্য-বিবরণ রাখা হইত না। যুদ্ধের পর হইতে কার্য্য-বিবরণ রক্ষা করা হইয়া থাকে; এবং বাহিরের লোকদিগের সহিতও অনেক বিষয়ে পরামর্শ করা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, মন্ত্রিসভার হস্তে সকল বিষয়ের ক্ষমতা থাকিলেও, হাউস্ অফ্ লর্ডস্ চরম বিচারালয় হইলেও, এবং হাউস্ অফ্ কমন্‌স্ মন্ত্রিসভাকে নিজের আধিপত্যাধীন রাখিলেও, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইংলণ্ডেশ্বরই তৎসমুদায়ের শীর্ষস্থানীয়; তাঁহার নামেই সমুদায় শাসন-কার্য্য সম্পাদন করা হইয়া থাকে। আর বিচার বিষয়েও তিনিই সকল বিচারের মূলস্বরূপ, বিচারালয়সমূহে তাঁহার নামেই সব বিচার করা হইয়া থাকে। তাঁহারই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহক ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাত দিয়া পরিচালনা করা হইয়া থাকে; এবং বিচার বিষয়ক ক্ষমতা বিচারালয়সমূহের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে নৃপতির নামে যে সমুদায় ক্ষমতা রহিয়াছে এবং তৎসমুদায় কার্য্যতঃ যেভাবে পরিচালিত করা হইয়া থাকে, এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিলেই, ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতি বুঝিতে পারা যাইবে। দেখিতে গেলে ইংলণ্ডেশ্বরের ইচ্ছাতেই পার্লামেণ্টের অস্তিত্ব। তিনিই সভ্যগণকে আহ্বান করিয়া থাকেন; আবার ইচ্ছা করিলে তিনি পার্লামেণ্ট্

ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন। তিনি ঘোষণা প্রভৃতি জারি করিতে পারেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার মন্ত্রিসমূহের পরামর্শ অনুসারেই এই সমুদায় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে; আর এই মন্ত্রিগণের সমষ্টিই মন্ত্রিসভা, সুতরাং সকল বিষয়েই মন্ত্রিসভার আধিপত্য রহিয়াছে বলিতে হইবে। নৃপতির অসংখ্য কার্য্য-নির্ব্বাহক ক্ষমতা রহিয়াছে, আইন-সকল কার্য্যে পরিণত হইতেছে কি না তৎপ্রতি তিনিই লক্ষ্য রাখিবেন। বড় বড় পদগুলিতে লোক নিযুক্ত করা তাঁহারই কার্য্য। জজ প্রভৃতি কয়েকটী বড় বড় পদের কথা বাদ দিলে, অবশিষ্ট সব কর্ম্মচারীকেই তিনি সরাইয়া দিতে পারেন। ব্যয় বিষয়ক ক্ষমতাও তাঁহারই হস্তে। অপরাধীকে তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমাও করিতে পারেন। তিনিই লর্ড সমুদায় সৃষ্টি করেন, এবং সম্মানের উপাধিসমূহ প্রদান করেন; মুদ্রা প্রস্তুত করার আদেশও তিনিই দিয়া থাকেন। নৌ-সৈন্যের এবং স্থলপথের সৈন্যের তিনিই সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। তিনিই রাজ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ অন্য দেশীয় রাজগণের সহিত প্রয়োজনানুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। দূতসমূহ তাঁহার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া থাকেন। তিনি চার্চসমূহের কর্ত্তা; কিন্তু কার্য্যতঃ মন্ত্রিসভা নৃপতির এই সমুদায় কার্য্যের জন্য দায়ী। ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির একটী মূল মন্ত্র এই যে রাজা কর্ত্তৃক কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য আচরিত হইতে পারে না। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, ইংলণ্ডেশ্বরের নামে যে সমুদায় কার্য্যই কৃত হউক না, মন্ত্রিগণ সব কার্য্যের নিমিত্তই দায়ী থাকিবেন। বর্ত্তমানকালে দেখিতে গেলে রাজার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিকার এই রহিয়াছে যে, তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই করা হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে এই অধিকারের খুবই মূল্য রহিয়াছে; রাজার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বহু কার্য্যের উপরই ঘটিতে পারে। রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া তাঁহার মন্ত্রিসমূহের সহিত তিনি আলোচনা করিতে পারেন এবং যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরামর্শ বা উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন, অথবা সতর্ক করিয়া দিতে পারেন।

ছাত্র-স্বাস্থ্য

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় হঠাৎ মনে হইল—আমাদের দেশের ছাত্রেরাই ভগ্নস্বাস্থ্য, না জগতের সর্ব্বত্রই এই অবস্থা? এবং সেই সঙ্গে মনে প্রশ্ন উঠিল—আমাদের দেশের ছাত্রেরা কাহার সম্পত্তি—ক্ষমা করিবেন. ছাত্রেরা জীবিত ও প্রাণশক্তি বহুল হইলেও, কথাটা ঐ ভাবেই আমার মনে উঠিয়াছিল! এরূপ চিন্তা অকারণে বা অকস্মাৎ আমার হৃদয় অধিকার করে নাই—অর্থাৎ খোস খেয়ালের বশে ঐরূপ চিন্তা করি নাই—পাঁচ রকম দেখিয়া শুনিয়া গভীর মনোবেদনার বশবর্ত্তী হইয়াই ঐরূপ দুর্ভাবনায় পড়িয়াছিলাম। আমি আমার স্বর্গগত পিতামহ বা মাতামহ কাহাকেও দেখি নাই; তবে পিতামহের অন্তিমশয্যার একখানি অস্পষ্ট আলোক-চিত্র দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, মরণেও তাঁহার বিরাট দেহের গরিমা লুপ্ত হয় নাই। তাহার পরে আমার পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় বিশালকায় না হইলেও বিপুল-বক্ষঃ ও পুষ্ট অস্থিবিশিষ্ট দেহধারী ছিলেন। ক্রমাগত ৪৫ বৎসর কাল ডায়াবিটিজ বা মধুমেহ নামক কালরোগে ভুগিয়াও, প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে, রক্ত-আমাশয় ব্যারামে, হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। অর্থাৎ আমাশয়ের ন্যায় একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা না ঘটিলে, তিনি আরো বেশী দিন জীবিত থাকিতেন। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি অতীব সুন্দর ছিল - তিনি মৃত্যুর ৪।৫ দিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে সাহিত্য-সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আমি—না তাঁহার মত দেহ, না তাঁহার মত স্বাস্থ্য পাইয়াছি। আবার আমার পুত্র, এই বয়সেই (২২ বৎসর বয়সে) চশমাধারী ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত—বেচারী সুধু নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে, আজ দাঁড়াইয়া আছে! এই যে চার পুরুষের স্বাস্থ্যের হিসাব দিলাম, ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এক এক পুরুষ আমাদিগের গত হইতেছেন, আর স্বাস্থ্য ও আয়ু হিসাবে আমরা যেন ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতেছি! এই কথাটি যে সুধু আমারই বংশে প্রযোজ্য, তাহা নহে। কালান্তর, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পল্লীগ্রামবাসীদের কথা বলিতে পারি না; সহরবাসী সকল হিন্দু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বংশেই, এই একই কথা—জাতি বিষয়ে আমরা ক্রমশঃই স্বাস্থ্যে, আয়ুতে, সহিষ্ণুতায়, কর্ম্মকুশলতায়—যে বিষয়ে ভাবি, সকল বিষয়েই ধ্বংসের মুখে যাইতেছি। আশা করি, মুসলমান ভ্রাতাদিগের সংসারে এই ভয়াবহ দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় না।

এই যে ধাপে ধাপে আমাদিগের দুর্গতি ঘটিতেছে, এই কথা সত্য কি মিথ্যা, কতকটা এই কথাটি প্রমাণ করিবার জন্যই, আমি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১০০০ ছাত্রের স্বাস্থ্য স্বয়ং চারমাস পরিশ্রম করিয়া, নির্ণয় করি। নির্ণয়ের ফল অতীব শোচনীয়। আমাদের দেশের বালকেরা ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসী বালকদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত কমিশনের রিপোর্টের দ্বাদশ খণ্ডে তাহা পাইবেন। উক্ত শোচনীয় ফলাফলের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। তৎকালে "ভারতবর্ষ", "অমৃতবাজার", "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট", "নায়ক" প্রভৃতি সংবাদপত্রেও তথ্যগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে খুব কম লোকেই মন দিয়াছে।

আমার আন্দোলন বৃথায় যায় নাই। আমার আন্দোলনের ফলে আজ বিশ্ববিদ্যালয়, বেঙ্গল হেল্‌থ্ ডিপার্টমেণ্ট, কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ড এ দিকে দৃষ্টি দিতেছেন—ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেছেন। আমি ছাত্র-পরীক্ষাকালীন কয়েকটি মূল সূত্র ধরিয়া কাজ করিয়াছিলাম; বর্ত্তমান কর্ম্মীরা "লেফাফা দুরস্ত" রাখার মত কায করিতেছেন; কলেজে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা আজ কলেজে পড়েন, তাঁহারা আর ২।৪ বৎসর পরে যখন সংসারী হইবেন, তখন তাঁহাদিগের দেহের কথা

ভাবিবারও সময় থাকিবে না। খুব অল্প বয়সে ছাত্রদিগের শারীরিক বা মানসিক কোনও ত্রুটি থাকিলে, সেই বয়সেই তাহার প্রতিবিধান করা যায়। এই জন্যই প্রাইমারী ক্লাসের, মাইনর ক্লাসের ও হাইস্কুলের অর্থাৎ ৬।৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, যত ছাত্র আছে, তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাই উচিত এবং পরীক্ষা করিয়া, যদি কোনও দোষ ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ভাল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে ছাত্রের চোখের দৃষ্টি কম, তাহাকে একজোড়া চশমা দেওয়া কর্ত্তব্য; যাহার বুকের দোষ বা দুর্ব্বলতা আছে, তাহাকে মাঠের মাঝে গাছতলায় ক্লাস করিয়া পড়ান উচিত ইত্যাদি।

কিন্তু যদি ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া, তাহাদের স্বাস্থ্যঘটিত দোষ ত্রুটির অন্ততঃ আংশিক প্রতিকার না করা যায়, তাহা হইলে পরীক্ষা করিয়া কোনও ফল নাই। উক্তরূপ নিষ্ফল পরীক্ষা কিছুদিন করার পরে কি পরীক্ষক, কি ছাত্রমণ্ডলী ও তাহাদিগের অভিভাবক সকলেই বিরক্ত হইয়া পড়িবেন।

তদুপরি, বিষয়টি অত্যন্ত বিরাট। এ দেশের বিজাতীয় গবর্ণমেণ্ট এ যাবৎ শিক্ষাকার্য্যে কখনই যথেষ্ট ব্যয় করেন নাই এবং বোধ হয় করিবেনও না। এমন স্থলে, স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যয়, আবার তাহার উপরে ত্রুটি সংশোধনের গুরু ভার কে বহন করিবে? কাযেই, এই নিষ্ফল কর্ম্ম করিয়া লাভ কি? যেহেতু এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর, এ দেশের ছাত্রেরা কাহারো সম্পত্তি নহেন। এমন কি পিতামাতারও নন। সন্তান হিসাবে তাঁহারা স্ব স্ব বাপ-মায়ের কাছে থাকেন বটে এবং তাঁহাদেরই অর্থে স্কুলের বেতন ও ঘরে প্রাইভেট মাষ্টারের বেতন যোগান বটে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ বিশাল বাঙ্গালাদেশে, কয়জন পিতা-মাতা, নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন? জিজ্ঞাসা করি, কোন্ পিতা নিজ সন্তানের শিক্ষার গতি, ক্রম বা উন্নতি প্রত্যহ না হউক, মাসেও একবার লক্ষ্য করেন? তাঁহারা অর্থ যোগান, পুত্রগণকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন, আর বৎসরান্তে ক্লাস প্রমোশনের সময়ে আনন্দ চিত্তে অথবা বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে সম্বৎসরের পাঠের ফলাফল শুনেন মাত্র। শিক্ষার্থী হিসাবে কয়টি বালক নিজ পিতামাতার যত্ন বা চেষ্টার দাবী করিতে পারে? এদেশে, বর্ত্তমান সময়ে যতক্ষণ না বাড়ীর কেহ শয্যাগ্রহণ করে, ততক্ষণ তাহার স্বাস্থ্যের কথা সে বাড়ীর কাহারো মনে থাকে না; কাযেই ছেলে রুগ্ন কি স্বাস্থ্যবান্, তাহার চোখ কাণ ঠিক আছে কি না, এ বালাই কখনো পিতামাতার হয় নাই। যদি আস্ত মানুষটার সম্বন্ধেই এই উদাসীনতা, তখন ছাত্রের মনোবৃত্তি কোন্ অভিমুখে ধাবিত, কোন্ ধারায় তাহার প্রতিভা বিকশিত অথবা তাহার শিক্ষার কোন্ দিক আল্‌গা বা কাঁচা আছে, সে কথার চিন্তা অনেক দূরে!!! এটা একটা মস্ত সত্য কথা যে, আমাদের দেশের ছেলেরা গড়াইয়া-গড়াইয়াই বড় হয়—অর্থাৎ পিতামাতার রীতিমত যত্ন পায় বলিয়া বড় হয় না, পিতামাতার রীতিমত অযত্ন সত্ত্বেও বড় হয়!!! Our children grow, because of, but inspite of, their parents. কাযেই, যদি বালকেরা নিজ পিতামাতার ঐকান্তিক যত্নে বঞ্চিত হয়, তবে আর কাহার কি দায়? এই ত নিজ পিতামাতার সম্বন্ধ; দ্বিতীয়তঃ সমাজের কথা ধরুন। আজ হিন্দুর সমাজ বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই; আছে সমাজের প্রেতমূর্ত্তি। কাজেই, বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র সম্বন্ধে সমাজেরও কোন দায়িত্ব নাই। পূর্ব্বে সমাজ সুশিক্ষিত অধ্যাপকগণকে বৃত্তি দ্বারা সংসার সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ রাখিতেন; অধ্যাপকেরা তৎ-পরিবর্ত্তে সমাজের হইয়া মানুষ গড়িতেন। যদি খাঁটি নিজ গণ্ডী ছাড়াইয়া সমাজের বাহিরে দৃষ্টিপাত করি, তবে ছাত্র সম্বন্ধে ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে গবর্ণমেণ্টকে ধরুন; গবর্ণমেণ্টের চিরকালই টাকার টানাটানি; তাহার উপরে বড় বড় বাড়ী তৈয়ারী করিতে, ও তাহার আসবাব যোগাইতে, বড় বড় মাহিয়ানাওয়ালা ডাইরেক্টর ও ইন্‌স্পেক্টর যোগাইতে, এবং ছাত্রদিগের প্রতি বন্ধনের শৃঙ্খল দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে গবর্ণমেণ্টের না থাকে হাতে টাকা, না থাকে ভাবিবার সময়। তাহার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ধরুন। তাঁহারা ইংরাজ সরকারের রাজকার্য্য চালাইবার জন্য উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার, হাকিম, কেরাণীকুল তৈয়ারি করিবার ৭৫ বৎসরের সনাতন কলটির কর্ণধার হইয়া আছেন। সেই ৭৫ বৎসরের জীর্ণ প্রথার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিবার সাহসও নাই, ক্ষমতাও নাই এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় বোধোদয়ের "ঈশ্বরের" মত ছাত্রদিগের অবস্থা চক্ষে দেখিতেও পান না, কর্ণে শুনিতেও পান না! ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার সময়ে আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম "আপনার প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দায়িত্ব কতটুকু? ইহার উত্তর যাহা পাইয়াছিলাম, আজও আমার উষ্ণ দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে আকাশে বাতাসে হা হা করিয়া ঘুরিতেছে:—

(১) বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-মন্ত্রী।
(২) ডাইরেক্টর অফ্ পাব্‌লিক্ ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সান।
(৩) " " " হেল্‌থ্।
(৪) সার্জ্জন জেনারেল উইথ্ দি গবর্ণমেণ্ট।
(৫) রেজিষ্ট্রার, বিশ্ববিদ্যালয়।
(৬) কলিকাতা কর্পোরেসনের চেয়ারম্যান।

ইঁহারা সকলেই কথাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন! আর আজ মামুলি ধরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে মুক্তকণ্ঠে ও বাষ্পাকুলনেত্রে জানাইতে হইতেছে যে, তাঁহারা বে-ওয়ারীস্, তাঁহারা না ঘরকা, না পরকা। অথচ এই ছাত্রগণই সকল দেশে সকল কালে সকলেরই আদরের পাত্র!

আমি দুইটি কথা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম—প্রথমটি—আমাদের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য কেমন? এবং দ্বিতীয়টি—ছাত্রেরা কাহার সম্পত্তি। এবং জানিলাম যে স্বাস্থ্য-হিসাবে আমরা ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে যাইতেছি এবং জানিলাম যে পথিপার্শ্বে ত্যক্ত এই ছাত্রেরা কাহারো আপনার নহে!!!

এমন অবস্থায় ছাত্রদিগেরই বা কি কর্ত্তব্য এবং আমাদিগেরই বা কি কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্যের কথা বলিতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্য কথা

বলিতে হয়; কিন্তু ইংরাজের রাজত্বে ছাত্রদিগের উপরে যেরূপ কড়া ও বিষময় দৃষ্টি এবং ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট্, হষ্টেল প্রভৃতির নাগপাশ এত দৃঢ় যে, আমরা তাহাদেরই চাপে অবশ হইয়া পড়িতেছি। সে সকল কাহিনীর উল্লেখমাত্র করিবার অধিকার আমাদিগের আছে—প্রতিকার করিবার ক্ষমতা নাই।

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, একযোগে অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং নিম্নোক্ত চারি পক্ষীয় লোকের সহযোগিতা সফল করিয়া, তবে উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সেই পক্ষগণ এই:—

(১) সরকার বা গবর্ণমেণ্ট পক্ষ।
(২) বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষ।
(৩) সমাজ।
(৪) ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি পক্ষ।

আজ আমরা আমাদের স্বকীয় সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিয়াছি। কাযেই, এখন ইংরাজের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আশ্রয় করা ছাড়া আমাদের উপায় নাই। আমাদের সমাজ নাই, আর সে দেবচরিত্র, সর্ব্বত্যাগী একনিষ্ঠ শিক্ষার সাধক নাই, আর শিক্ষার মর্য্যাদা নাই, আদর্শ নৈতিক চরিত্রের গৌরব নাই; নাই সমাজের বন্দোবস্ত, নাই শিক্ষকগণকে নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যাচর্চ্চা করিবার সুযোগ দান—নাই সরলতা, নাই সন্তোষ। অত্যন্ত নিরাশায় পড়িয়াই, এই দুঃখের কাহিনী বলিয়া ফেলিলাম।

এখন ছেলেরা লেখাপড়া শেখে—বাপ-মা শিখান বলিয়া। বাপ-মা ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শিখান জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিক এবং পরহিতব্রতী হইবে বলিয়া নয়, ভবিষ্যতে ছেলেরা দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সুখে থাকিবে বলিয়া—তাহাতে সমাজের কিছু সুবিধা অসুবিধা থাকে তাহা মৃতপ্রায় সমাজ বুঝুক। তবেই কথাটা দাঁড়াইল এই যে—লেখাপড়া শিখানর উদ্দেশ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য—গাড়ী ঘোড়া চড়িবার সুবিধা লাভ করিবার জন্য—অর্থোপার্জ্জনের জন্য।

আদর্শটা এত খাটো বলিয়াই—যেখানে ভিক্ষা মিলিবে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার্থীগণকে তাহাদেরই দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন হয়; অর্থাৎ যে-যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে, ইংরাজের দ্বারে হাত পাতিয়া "ভবান্ ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া দাঁড়াইয়া, তার স্বরে চীৎকার করিতে হয়—সেই বিদ্যাই শিখে। কাযেই—ইংরাজের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ই আমাদের পরম ও চরম গতি। সেটা গতি কি অগতি করিয়াছে তাহা এখন আমরা বেশ বুঝিতেছি। কাযেই আমাদের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, ছাত্রদিগকে দুই দলে বিভাগ করিয়া লইতে হইবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র।

আজ হঠাৎ আবার "জাতীয়" বিদ্যালয়ের কথা তুলিতেছি কেন? সে ধৃষ্টতার অনেক রকম-ফের ত হইয়া গিয়াছে। আমার কেন'র উত্তর এই যে, ইংরাজী নাম পাল্টাইয়া, অথচ ষোল-আনা ইংরাজীর অনুকরণে, ছদ্ম ইংরাজী বিদ্যালয়কে জাতীয় বিদ্যালয় বলিতেছি না; আমার বলিবার উদ্দেশ্য—দেশের লোকের ষোল-আনা কর্ত্তৃত্বে, দেশের জল-হাওয়া ও সমাজ ও ধর্ম্মানুসারে যে যে বিদ্যালয় ছিল বা গঠিত হইবে, সেইগুলিকেই জাতীয় বিদ্যালয় বলিতে চাহি। যতদিন সেরূপ বিদ্যালয় না হইবে, সহস্র তথাকথিত মুখস-পরা ইংরাজী ধরণের স্বদেশী বিদ্যালয়েও ততদিন কিছুই করিতে পারিবে না। অথচ, শিক্ষাটা জাতীয়ভাবে না হইলে আর আমাদের ভদ্রস্থতা নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেমিক ও জাতীয় শিক্ষালয়ভুক্ত—মোটামুটি এইভাবে ছাত্রগণকে দল বিভক্ত করিয়া না লইলে কোনও কায করা যাইবে না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই আসে যে, গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় মামুলি ইউনিভার্সিটির উচ্চশিক্ষা যেমন দিতেছেন তাহাই দিন, কারণ, চাকুরী-জীবীরা তাহাকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইবে। বাকি যাবতীয় ছাত্রকে লইয়া মোটামুটিভাবে শিক্ষা দিবার জাতীয় ব্যবস্থা হউক। তজ্জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং দেশের গণ্যমান্য লোকেরা ভার লউন। কিন্তু এ দেশের ছাত্রদিগের চুলের মুঠি যেরূপ ও কায়েমীভাবে গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিয়াছেন, তাহাতে অন্ততঃ প্রথম প্রথম গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা ভিন্ন জাতীয় শিক্ষার মূল পত্তন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

যাহা হউক—ছাত্রগণকে, শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে, দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়ার সময় আসিয়াছে। এবং ছাত্রগণের সংঘবদ্ধ হইবার সময়ও আসিয়াছে। অর্থাৎ একযোটে, ছাত্রগণকে নিজ নিজ প্রাপ্য দাবী করিতে হইবে এবং একযোটে দেশের লোককে ছাত্রদিগের বিষয়ে ষোল আনা অবহিত হইতে হইবে। আমাদিগকে জাতি হিসাবে, শিক্ষার আদর্শকে বড় করিতে হইবে, জাতি হিসাবে শিক্ষাকার্য্যে মনো-যোগী হইতে হইবে; সরকারের উপরে সাদার দিয়া স্রোতে গা ভাসাইলে আর চলিবে না। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ-বচন আছে—যা'র বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম নেই। ছাত্রেরা শিক্ষার জন্য ব্যস্ত—কিন্তু কি শিখিবে, কতটুকু শিখিবে, কি ভাবে শিখিবে—সে কথা তাহারা ভাবে না—যেহেতু কেহ ত আমাদিগকে নিজ নিজ স্বার্থ বিষয়ে ভাবিবার অবসরও দেয় নাই! আবার আমাদের দেশের অভিভাবকেরাও এতটাই দাসমনোবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়াছেন যে, তাঁহারাও তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার ভার তাঁহাদের মনিব ইংরাজের হস্তে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তাই আজ এ দেশের মেয়েরাও মাতৃতত্ত্ব শিশুতত্ত্ব না শিখিয়া হিষ্টি, লজিকে সুপণ্ডিতা হইয়া, অকালে হয় ক্ষয়কাশ বা সূতিকায় প্রাণ হারান। সেই কারণেই, এ দেশের ছেলেরা বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়াও ঢাক ঢোল বাজাইয়া বর সাজিয়া বিবাহ করিতে যাইতে লজ্জাবোধ করে না।

তাই উপায় হিসাবে আবার বলি—এ দেশের লোকেরা সর্ব্বপ্রথমে জাগুন—তাঁহারা জাগিয়া একযোটে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে রফা করুন—যে, যাহারা তথাকথিত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে চাহে, তাহারা তাহাই করুক—বাকী শতকরা ৯০ জন ছাত্র যাহাতে মানুষ হইয়া সংসারে বেড়াইতে পারে এমনভাবে মোটামুটি শিক্ষালাভ করুন। আমি চাহি না যে, কেরাণী সৃষ্টিকারী সুধু স্কুল-

ফাইনাল পরীক্ষাই আমাদের আদর্শ হউক। আমাদিগের কায আমাদিগকেই করিতে হইবে—নিজের বোঝা নিজেকেই বহিতে হইবে—অপরের স্কন্ধে তাহা তুলিয়া দিলে চলিবে কেন? এই ভাবে ও এই হিসাবে, শিক্ষাকে জাতীয়তা ভাবে ভূষিত করিতে হইবে। এই হইল আমাদিগের প্রথম কায। অর্থাৎ বাঙ্গালীজাতি যদি তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে মানুষ করিতে চাহে, তবে বাঙ্গালীর প্রথম কর্ত্তব্য—প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কর্ত্তব্য—যাহাতে শিক্ষাকার্য্যে আমাদের ষোল আনা কথা বলিবার অধিকার থাকে, তাহাই করা।

যে দিনে আমরা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙ্গালীই, দেশের শিক্ষাকার্য্যে অবহিত হইব, সেই দিনেই আমরা ছাত্রগণকে বেশ বুঝিতেও দিতে পারিব যে তাহারা আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা—আমাদের সর্ব্বস্ব ধন। এ ভাব জাগাইতেই হইবে। এখানকার মত ভাব রাখিলে—ছাত্ররা শিক্ষককে মানিবে না, শিক্ষকও ছাত্রকে প্রীতির নজরে দেখিবেন না—ছাত্ররাও অভিভাবককে মানিবে না। এখনো সময় আছে—আমাদের বাছাদিগকে আমাদিগকেই বুকে তুলিয়া লইতেই হইবে।

আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—যদি কখনো সে সুদিন আসে—ছাত্র ও তাহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া একযোটে যথাবিধি ব্যবস্থা করা। যাহাতে ছাত্রেরা দেহে বলিষ্ঠ, জ্ঞানে গরীষ্ঠ ও নৈতিক বলে সমুন্নত হয়—সকলে মিলিয়া সে ব্যবস্থা করিয়া জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিব।

কিন্তু যতদিন সে সুদিন না আসে.—যতদিন গবর্ণমেণ্ট বজ্রমুষ্টিতে ছাত্রগণকে আকর্ষণ করিয়া রাখেন—ততদিন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? এবার তাহাই কতকটা আভাষে বলিব।

আমাদের দেশে এখন সবচেয়ে বড় অভাব জ্ঞানের অভাব। তাহার পরে—স্বাবলম্বনের অভাব—তাহার পরে স্বাস্থ্যের (দৈহিক ও নৈতিক) অভাব। এই তিনটি অভাব মোচন না করিতে পারিলে, জাতিহিসাবে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার। জ্ঞানের অভাব দূর করিবার উপায় নির্দ্দেশ আমাদের করিয়াছি—কায করা কত দিনে সম্ভবপর হইবে, তাহা ভগবানই জানেন—কারণ, সকলই কাল-সাপেক্ষ। স্বাবলম্বন শিক্ষা কতকটা জাতীয় শিক্ষার মুখাপেক্ষী। যদি দেশের ছেলেদের চাকুরী-প্রীতি, বিলাসিতা ও বিদেশী মোহ কতকটা নষ্ট করা যায়, তাহারা মোড় ফিরিবে—আপনার পায়ে আপনি ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে। যে শিক্ষা ছাত্রগণকে আত্মস্থ করে না, যে শিক্ষা লালসা ও বাসনায় ইন্ধন যোগায়, যে শিক্ষায় মন প্রবল ও একটানা বেগে শুধু বহির্মুখীই হয়, সে শিক্ষা পরমুখাপেক্ষী ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না। ইহার উল্টা দিকে স্রোত বহাইতে হইলে, জাতীয় শিক্ষায় প্রবর্ত্তনা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু সে কত দূর?

কিন্তু এই নিরাশাময় মহানিশায় কিছু খদ্যোৎ-আলো দেখা যাইতেছে। আমরা এমন একটা কায করিতে পারি, যাহার জন্য কাহারও অনুগ্রহ বা সাহায্য আমাদিগের প্রয়োজন হয় না। সেটি—স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ গঠন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্বাস্থ্যহিসাবে আমরা ক্রমশঃই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছি। স্বাস্থ্যরক্ষা কতকটা ব্যক্তিগত চেষ্টা সাপেক্ষ, কতকটা রাজসাহায্য সাপেক্ষ। দেশের জল নিকাশের ব্যবস্থা, সুপেয়ের ব্যবস্থা, জঙ্গল কাটান, হাজা মজা নদী কাটান প্রভৃতি ব্যয় ও সময় সাধ্য কাযগুলির জন্য আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতেই হইবে। কিন্তু নিজ দেহকে বলিষ্ঠ ও সুস্থ রাখিতে শুধু আমার ব্যক্তিগত চেষ্টাই যথেষ্ট। আমি এই চেষ্টার কথাই বলিতেছি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন ৬ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক এক সহস্র কলিকাতার বাঙ্গালী ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি, তখন বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের দেশের পুরুষ ছাত্রেরা বিলাতের পুরুষ ছাত্র এবং মার্কিণদেশীয় মেয়ে ছাত্রীদের অপেক্ষা স্বাস্থ্যে হীন! এ বড় লজ্জার কথা—এ লজ্জা দূর করিতেই হইবে।

এ লজ্জা দূর করিবার একমাত্র উপায়—রীতিমত ব্যায়াম-চর্চ্চা করা। আমার পিসামহাশয় পঠদ্দশায় বড়িষা-বেহালা হইতে নিত্য হেয়ার স্কুলে যাতায়াত করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই বাঙ্গালা দেশেই বড়লোকের ছেলেরা কুস্তি ও লাঠি খেলা শিখিতেন। আর আজ সে সকল ঘুচিয়া গিয়াছে। আমরা মেয়েলী ঢংটাকে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি। আমরা বেশ-ভূষায়, চুল কাটায়, চলনে বলনে, গলার আওয়াজের ভঙ্গীতে সকল বিষয়েই মেয়েলীয়ানার দিকে ঢলিয়া পড়িতেছি। যুবকেরা তাস দাবা ও গালগল্প এবং বালকেরা লুডো ক্যারম্ প্রভৃতি কুড়েমি—খেলায় মাতিয়া আছে। এরূপ করিলে আর চলিবে না!

সন্তরণ, ডন-বৈঠক, ডাম্বেল—মুগুর ভাঁজা, কুস্তি, লাঠিখেলা, বক্‌সিং জ্য—জ্যুৎসু—দৌড়ান, লাফান, কপাটি পাটিখেলা প্রভৃতি কোনটাতেই অর্থব্যয় নাই বলিলেও হয়—কাজেই ওগুলো ছোটলোকেদের কসরতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফুটবল, লনটেনিস, হকি, ব্যাডমিণ্টন—এ সকল খেলায় বড়মানুষি দেখান যায়—কাযেই বর্ত্তমান সময়ে যুবকদিগের ঐ দিকেই ঝোঁক বেশী। কিন্তু যতলোক ফুটবল খেলা দেখে বা রাতদিন ফুটবল খেলার কথায় মাতে—তাহার এক সহস্রাংশ লোকও ত সে খেলা খেলে না! আজ যে জাতীয় তরুণদিগের আনন্দধ্বনি "হিপ্ হিপ্ হুরে," হইয়া পড়িয়াছে সে জাতি আত্মস্থ না আত্মবিস্মৃত? যে জাতি পল্লী ছাড়িয়া সহরেই বাস করিতে ভালবাসে, যে জাতি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া পিতামাতাকে ইংরাজীতে পত্র লেখে, যাহারা দেশী ভাষা, বেশ, ব্যবহার এমন কি আনন্দধ্বনিও ভুলিয়া যাইতেছে—সে জাতি—সে ছাত্রজাতি—আজ কোন্ মুখে চলিয়াছে তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

ছাত্রদিগের অপরাধ কি? তাহাদের পিতৃ-পিতামহ অতি দীন আদর্শে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা করেন—হীন স্বার্থের ও ভোগের পথে ঠেলিয়া দেন; তাহাদের সমাজ আজ নীরব; তাহাদের দেশ আজ বিজাতীয় বিলাস-লালসায় ষোল আনা মাতিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের শিক্ষা আজ সর্ব্বতোভাবে বহির্মুখী—আজ তাহারা আত্মস্থ হয় কিসের জোরে?

কিন্তু তাহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে ত চলিবে না! ছাত্রদিগকে স্ব স্ব হিত চিন্তা করিতেই হইবে—কেহই তাহাদিগের হইয়া ভাবিবে না, কেহই তাহাদিগের স্বাস্থ্য গড়িয়া দিবে না, কেহই তাহাদিগকে "মানুষ" করিবার পথে ঠেলিয়া দিবে না। আজ যদিও বা "ছাত্র" বোধে কেহ দয়া করিয়া তাহাদিগকে হিতোপদেশ দেন—ছাত্ররা স্মরণ রাখিবেন যে, আর দুচার বৎসর পরে, যখন তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিবেন, তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বোঝা আপনাকে বহিতে হইবে—তখন একটু সহানুভূতি সূচক "আহা"ও কেহ বলিবে না। আজ যে ভগ্ন স্বাস্থ্য রুগ্ন শীর্ণ দেহ, দুর্ব্বল চক্ষু বা বক্ষোদেশ লইয়া লেখাপড়া করা চলিতেছে—সংসারে ঢুকিয়া, ছেলে-পুলেদের ব্যারাম পীড়া, নিজের দৈহিক দুরবস্থা প্রভৃতি যখন চাপিয়া ধরিবে,—আজ হাঁপানি, কাল ক্ষয়কাশ,—এই রকমে সংসারে যখন "জের-বার" হইবে—তখন কেহই ফিরিয়া তাকাইবে না। তখন অনুতাপ আসিবে—"কেন সময় থাকিতে শরীরটাকে শোধরাইবার ব্যবস্থা করি নাই—কেন দেহটাকে কর্ম্মঠ করি নাই"—ইত্যাকার নিষ্ফল রোদনই তখন সার হইবে!

তাই বলিতেছি হে ছাত্রগণ, আজ এই মুহূর্ত্ত হইতেই নিজ নিজ দেবতা স্মরণ করিয়া শপথ করুন—"আজ হইতেই দেহের প্রতি যত্ন করিব—আজ হইতেই এই দেহকে কর্ম্মঠ করিব।" কারণ, স্মরণ রাখিবেন যে, যতক্ষণ গতর, ততক্ষণ আদর। সুধুই কি তাই? "বলং বলং বাহুবলং"—যতক্ষণ নিজে চেষ্টা না করিবেন, ততক্ষণ কোন কাযই কেহ করিয়া মাথা কিনিবে না। তাহা ছাড়া, আরো একটা কথা আছে—সে কথাটা আমরা যে কেন ভুলিয়া যাই তাহা জানি না। এই দেহ—এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ—শ্রীভগবানের মন্দির। জীর্ণ, ভগ্ন, অপরিষ্কার মন্দিরে ভগবানকে অতি বড় মূর্খও রাখে না। এই দেহকে কাযেই দৃঢ় ও কর্ম্মঠ করিতেই হইবে। সুধু যে রুটি রোজগারের জন্য গায়ের বল চাই, তাহা নহে—সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহ হইলে, সে ব্যক্তির মনও দৃঢ় হয়। যাহার শরীর দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত তাহারই মন দুর্ব্বল। কাযেই দেহ সুস্থ ও সবল থাকিলে, মনও সবল হয়—অর্থাৎ, সংযম করিবার ক্ষমতা বাড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যে, রুগ্ন ব্যক্তিরা অত্যাচারী ও অসংযমী। এই জন্য মনের উপরে আধিপত্য করিবার জন্যও—ষড়রিপুকে দমন করিবার জন্য—প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের জন্যও দেহকে সুস্থ ও সবল করা চাই—"নায়মাত্মা বলহানের লভ্যঃ"—এই জন্যই এই ঋষি বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া, তপ জপ করিয়া, ব্রহ্মকে যে সে লাভ করিতে পারে না—কারণ ছাদ দেখিলে ছাদে উঠার কায হয় না—সিঁড়ি চাই। সেই সিঁড়ি হইতেছে—শরীর গঠন, মনকে তৈয়ারি করা। সেই জন্যই আবার বলি—বাঙ্গালীর ঘরের ছেলেরা বাঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী—ধর্ম্মকে আশ্রয় কর। ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইলে, মনকে গড়িতে হইবে; মনকে গড়িতে হইলে, শরীরকে গড়িতে হইবে।

কাযেই, আমরা বেশ বুঝিলাম যে, যদি আমরা ভবিষ্যতে সংসারে সুখে বিচরণ করিতে চাই, তাহা হইলেও আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য শরীরকে তৈয়ারি করা; আর যদি আমরা যুগযুগান্তরের সাধনা করা হিন্দুর বাঞ্ছিত পথে চলিতে চাই—তাহা হইলেও দেহকে গড়িয়া তুলিতেই হইবে! দেহকে গড়িয়া তুলিতে হইলে ধন চাই না—মন চাই। মানুষ হইতে হইলে তাহার জন্য সাধনা করিতে হইবে—সে সাধনা দেহকে লইয়া। আজ হইতে, প্রত্যেক ঘরে ঘরে ছাত্রেরা নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম চর্চ্চায় মন দাও—এ জাতির ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল হইবে! ব্যায়াম সম্বন্ধে নিয়ম কানুন লইয়া আমি সময় ক্ষেপ করিব না—আমি বারবার বলিয়াছি—আবার বলিতেছি—এবং যতদিন জীবিত থাকিব ততদিনই বলিব—হে বাঙ্গালী, তোমার ভবিষ্যৎ তোমার বাহুর উপরে নির্ভর করিতেছে।

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলোপ যখন ব্যস্ত হইয়া মৃদুলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিলো তখন অনন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলো না। সে তাহার মটো করিয়া লইয়াছিলো—Strike the iron while it is hot! লোহার মতন কঠিন মৃদুলার মন অন্তরতাপে তপ্ত থাকিতে থাকিতে তাহাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী গঠন দিয়া লইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া অনন্ত কোর্ট হইতে দ্বিপ্রহর বেলাতেই ফিরিয়া বাড়ীতে আসিলো। আহুতি জিজ্ঞাসা করিলো—এতো সকাল-সকাল চলে' এলে যে?

অনন্ত মনের হাসি মুখে চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলো—শরীরটা বেশ ভালো নেই।

অনন্ত স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াইয়া একবার মৃদুলার কাছে যাইবার সুযোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া মনের মধ্যে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলো; যতোই বিলম্ব হইয়া যাইতেছিলো ততোই সে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলো। অবশেষে তিনটার সময় তাহার সুযোগ মিলিলো; আহুতি ভিক্টোরিয়া ক্রসের অ্যানা লম্বার্ড্ উপন্যাস পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলো। স্ত্রী নিদ্রায় অচেতন হইয়াছে দেখিয়াই অনন্ত সন্তর্পণে পা

টিপিয়া টিপিয়া সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া মলয়ের অন্তঃপুরে গিয়া উপস্থিত হইলো। সে মৃদুলার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দ্বার-লম্বিত পর্দ্দার এপার হইতে ডাকিলো—বৌদিদি, ঘুমুচ্ছেন নাকি?

মৃদুলা ঘুমাইতেছিলো না। সে বিলোপের আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া মুহূর্ত্ত গণিতেছিলো এবং অশ্রুধারায় তাহার মুখ প্লাবিত হইতেছিলো। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলো মলয় কবে তাহাকে ভালোবাসার কি কথা বলিয়াছে, কবে কেমন করিয়া তাহাকে আদর করিয়াছে, কবে তাহার দৃষ্টি পত্নীর দিকে প্রণয়াবেশে রঙীন হইয়া তাকাইয়াছে! এই সমস্তের সহিত তাহার পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তন কিছুতেই মৃদুলা খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিলো না। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলো না যে মানুষ কি এতো শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, অথবা নিজের প্রকৃত প্রকৃতি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অমন একাগ্র তন্ময় প্রণয়ের অভিনয় ও ভাণ করিতে পারে? অনন্ত 'বৌদিদি' বলিয়া ডাকিতেই তাহার চিন্তায় বাধা পড়িলো, সে চমকিয়া উঠিলো, মনে করিলো বিলোপ আসিয়াছে বুঝি। সে তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিলো; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই 'ঘুমুচ্ছেন নাকি?' প্রশ্নের ঢং ও স্বর শুনিয়াই সে বুঝিতে পারিলো যে প্রশ্নকর্ত্তা বিলোপ নহে, অনন্ত। তাহার ত্বরা করিবার প্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়া গেলো। প্রথমে সে মনে করিলো সে সাড়া দিবে না, অনন্ত তাহাকে ঘুমন্ত মনে করিয়া ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু অনন্ত আবার যখন গলা-খাঁখারি দিয়া ডাকিলো—"বৌদিদি! এখনো ঘুমুচ্ছেন?" তখন সে আর সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলো না, সাড়া না দিলে অসভ্যতা করা হইবে বলিয়াই সে সাড়া দিলো—"না ঘুমুই নি, যাচ্ছি……" মৃদুলা চোখ মুখ মুছিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলো।

অনন্ত মৃদুলার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলো যে সে কাঁদিতেছিলো এবং কেনো যে কাঁদিতেছিলো তাহা অনুমান করিতেও তাহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইলো না। সে মৃদুলাকে বলিলো—বৌদিদি, চোরের উপর রাগ করে' ভুঁয়ে ভাত খেয়ে লাভ কি? শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ! এ তো আমাদের শাস্ত্রেরই সুবচন! মানুষে মানুষে সম্পর্ক তো আয়নায় মুখ দেখা, যে যেমন মুখভঙ্গী করবে সে তেম্নি পাল্টা জবাব পাবে। মলয়-বাবু যে-রকম আচরণ করছেন, আপনিও ঠিক অম্নি করুন দেখি, তা হলেই মলয়-বাবু দুদিনেই সায়েস্তা হয়ে যাবেন, ঢিট হয়ে যাবেন। আপনি ওঁকে দেখান তো যে আপনি আমার অনুরাগিণী হয়েছেন, এম্নি দেখ্বেন যে ওঁর এমন হিংসা হবে যে উনি আপনাকে চোখের আড় কর্তে পার্বেন না। আমি আপনাকে যেদিন দেখেছি সেইদিনই আমার মনপ্রাণ আপনাকে সমর্পণ করেছি। আপনি আমাকে যা বল্বেন আমি তাই কর্বো। আজ বিকালবেলা চলুন না নিজের চোখে মলয়-বাবুর কীর্ত্তি দেখে আস্বেন—শ্রেয়সীর বাড়ীর কাছে আপনি গাড়ীতে বসে' থাক্বেন, আর মলয় বাবু সেই বাড়ীতে ঢুক্বেন আপনি স্বচক্ষে দেখ্বেন……

মৃদুলা অবাক্ হইয়া অনন্তর সমস্ত কথা শুনিতেছিলো এবং তাহার মনের উপর দিয়া বিরুদ্ধ চিন্তার ঝড় বহিয়া যাইতেছিলো—ক্ষণিকের জন্য একবার তাহার মনে হইলো রবি-বাবুর মানভঞ্জন গল্পের নায়িকা গিরিবালার মতন সেও কি স্বামীর অনাচারের প্রতিহিংসা অনাচার করিয়া লইবে? অমনি তাহার সর্ব্ব দেহমন সঙ্কুচিত হইয়া অশুচিতার ভয়ে ও ঘৃণায় বলিয়া উঠিলো—ছি! অনন্তর প্রস্তাবে তাহার সহিত গিয়া স্বামীর কুচরিত্রের চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতেও একবার ঈষৎ ইচ্ছা মনের মধ্যে উঁকি মারিতেই তাহার মনে হইলো যে ব্যক্তি নিজের মুখে পরস্ত্রীর সম্মুখে প্রণয় প্রকাশ করিতে পারে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া একাকিনী তাহার সহিত বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। এই কথা মনে হইতেই মৃদুলা গম্ভীর ভাবে "না" বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলো।

মৃদুলাকে পলায়নোদ্যত দেখিয়াই অনন্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া সাম্নে ঝুঁকিয়া খপ্ করিয়া মৃদুলার হাত চাপিয়া ধরিয়া একটু নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া বলিলো—বৌদিদি, আপনি চলে' যাবেন না, আমি আপনাকে এমন ভালো বেসে ফেলেছি যে তেমন ভালোবাসা কখনো কেউ কাউকে বাসে নি……

মৃদুলা দৃষ্টি হইতে অগ্নিময়ী জ্বালা অনন্তর মুখের উপর হানিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলো—হাত ছাড়ুন, অসভ্য বর্ব্বরের মতন ব্যবহার কর্বেন না……

অনন্ত মৃদুলার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলো—আপনি

আমার হাত থেকে বা মন থেকে কিছুতেই ছাড়িয়ে যেতে পার্বেন না—

'প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।'

এমন সময় বিলোপ সিঁড়ি হইতে দালানে উঠিয়াই দেখিতে পাইলো অনন্ত মৃদুলার হাত ধরিয়া কোমল স্বরে প্রণয়সূচক কবিত্ব করিতেছে! সে এই ব্যাপার দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলো—তাহার হৃদয়-মন্দিরের দেবীপ্রতিমা যেনো বিধর্ম্মীর অত্যাচারে চূর্ণ অপবিত্র হইয়া পড়িলো! পাছে মৃদুলার দাম্পত্যজীবনে ঈষৎ কলঙ্ককালিমার রেখাপাত হয় এই ভয়ে সে নিজের প্রাণপূর্ণ প্রণয় লইয়া কখনো তাহার সম্মুখে আসিতে সাহস করে না, আর সেই মৃদুলা কিনা পরপুরুষের হাত ধরিয়া প্রণয় নিবেদন নির্ব্বাক্ হইয়া অপ্রতিবাদে শুনিতেছে! বিলোপের সমস্ত অন্তর ব্যথিত পীড়িত লজ্জিত হইয়া হায় হায় করিয়া উঠিলো! এক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া এতো কথা ভাবিয়া লইয়াই স্থির করিলো এখানে তাহার দাঁড়াইয়া এই অদর্শনীয় ব্যাপার দেখা ও অশ্রাব্য কথা শোনা উচিত নয়; তাহার অতর্কিত আগমন উহাদের দুজনের কেউ জানিবার পূর্ব্বেই তাহাকে পলায়ন করিতে হইবে, নতুবা মৃদুলা লজ্জা পাইবে! খানিক পরে সে নীচে হইতেই ডাক দিয়া মৃদুলাকে সতর্ক করিয়া উপরে আসিবে।

বিলোপের আগমন মৃদুলা ও অনন্ত টের পায় নাই; একে বিলোপ পায়ের শব্দ করিয়া চলা অসভ্যতা মনে করে বলিয়া সন্তর্পণে সমস্ত পা পাতিয়া চলে এবং পায়ের ডগার উপর মাত্র ভর দিয়া সিঁড়িতে উঠে, তাতে আবার তাহার জুতার তলা রবারের; কাজেই তাহার আগমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারেই হইয়াছিলো।

অনন্তর কবিত্ব শুনিয়া মৃদুলার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিতেছিলো; কিন্তু সে একবার চেষ্টা করিয়াই বুঝিয়াছিলো অনন্তর বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্তিলাভের জন্য বল প্রকাশ করিয়া কোনো ফল হইবে না; চীৎকার করিয়া চাকর-দাসীদের ডাকিয়া জড়ো করিতেও তাহার অপমান বোধ হইতেছিলো; তখন সে নিজের সতীত্বতেজ এবং অনন্তর মনুষ্যত্ব ও ভব্যতার উপর নির্ভর করিয়াই আপনাকে মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলো; সে দৃপ্ত স্বরে বলিলো—আপনাকে এতোদিন ভদ্রলোক বলে' জান্তাম…

এই কথা বলিতে বলিতে মৃদুলার মনে হইলো তাহার চাকর-দাসীদের কেউ তাহার এই দুরবস্থা দেখিতেছে না তো! এই কথা মনে হইতেই সে মুখ ফিরাইয়াই দেখিলো বিলোপ চোরের মতন সঙ্কুচিত ভাবে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছে। বিলোপকে পলায়নোদ্যত দেখিয়াই মৃদুলা বুঝিতে পারিলো বিলোপ কী ভুল করিয়া সেখানে আসিয়াও কোনো সাড়া না দিয়া পলায়ন করিতেছে! বিলোপ যে মনে করিয়াছে মৃদুলা দ্বিচারিণী ইহাতে সে ব্যথিত ও লজ্জিত হইলেও সেই সময় বিলোপকে দেখিয়া তাহার সাহসও হইলো এবং সে সাহায্যের সম্ভাবনা দেখিয়া মনে বিশেষ আশ্বাসও অনুভব করিলো।

বিলোপ সিঁড়ির এক ধাপ নামিয়াই যেই শুনিলো যে মৃদুলা রুষ্ট স্বরে অনন্তকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলো—"আপনাকে এতোদিন ভদ্রলোক বলে' জান্তাম……" অমনি তাহার চিত্ত চম্কাইয়া উঠিলো; সে ভাবিলো—তাহা হইলে আমি যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহা তো মিথ্যা! অমনি তাহার হৃদয়-মন্দিরের চিত্তপীঠের উপর দেবীপ্রতিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বমহিমায় উদ্ভাস্বর হইয়া উঠিলো। তাহার এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবার জন্য সে পিছন দিকে মুখ ফিরাইতেই মৃদুলার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি সম্মিলিত হইলো; সে দেখিলো মৃদুলার মলিন ভয়-ব্যাকুল মুখ সতীমহিমায় জ্বলজ্বল করিতেছে!

বিলোপের দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি সম্মিলিত হইবা মাত্র মৃদুলা আগ্রহের সহিত তাহাকে ডাকিয়া বলিলো—দাদা, এই বাঁদরটার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন!…

বিলোপ সিঁড়ির দুই ধাপ নামিয়াছিলো। সে ফিরিয়া এক লাফে দুই ধাপ ডিঙাইয়া দালানে উঠিলো এবং দ্রুতপদে অনন্তর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে অবরুদ্ধ ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপিয়া রূঢ় ব্যঙ্গের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলো—এই বাঁদরটি কোন্ পশুশালার?

মৃদুলার ও বিলোপের কথার আঘাতে চকিত হইয়া অনন্ত মুখ ফিরাইয়াই বিলোপকে দেখিলো—লম্বা-চওড়া কৃষ্ণকায় জোয়ান হনহন করিয়া তাহার দিকে আসিতেছে!

ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেলো! মৃদুলার বিবাহের পর এই অল্প কয়দিনের মধ্যে বিলোপ মাত্র একবার তাহাদের বাড়ীতে সন্ধ্যার পর আসিয়াছিলো, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্য; তাই অনন্ত কখনো বিলোপকে দেখে নাই এবং তাহাকে চিনিতো না।

বিলোপের প্রশ্নের উত্তরে মৃদুলা বিরক্ত স্বরে বলিলো—ইনি এই পাশের বাড়ীটাকেই পশুশালায় পরিণত করেছেন!

বিলোপের আবির্ভাবে অনন্তর মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেলেও সে শুষ্ক মুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলো—স্ত্রীলোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ! যেই ধরা পড়ে' গেছে আর অমনি হয়ে পড়্লেন পরম সতী! কিন্তু এই সতীপণা আমার তো আর জান্তে বাকী·····

বিলোপের বজ্রমুষ্টির এক ঘুষি অনন্তর মুখের উপর পড়িয়া তাহার বাক্‌রোধ করিয়া দিলো এবং বিলোপকে দেখিয়া অনন্ত যে একটুও ভয় পায় নাই তাহাই দেখাইবার জন্য সে মৃদুলার হাত ছাড়ে নাই; কিন্তু বিলোপের ঘুষির ধাক্কায় সে ঠিক্‌রাইতে ঠিক্‌রাইতে দূরে গিয়া কোনো মতে টাল সাম্‌লাইয়া দাঁড়াইলো, কখন যে কেমন করিয়া তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া মৃদুলার হাত ছাড়িয়া গিয়াছিলো তাহা সে জানিতেও পারিলো না। তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতেছিলো, দৃষ্টি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলো; সে সাম্‌লাইয়া কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই বিলোপ তাহার ঘাড় ধরিয়া এক ধাক্কায় চৌকাঠ ডিঙাইয়া তাহাকে তাহার বাড়ীর মধ্যে চালান করিয়া দিয়া বলিলো- ফের যদি এই চৌকাঠ কোনোদিন ডিঙিয়েছো তো তোমাকে আস্ত রাখ্‌বো না।

অনন্ত ঠিক্‌রাইতে ঠিক্‌রাইতে নিজের বাড়ীর মধ্যে গিয়া থামিতে পারার পূর্ব্বেই বিলোপ সশব্দে ধড়াস করিয়া উভয় বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী দরজা বন্ধ করিয়া হুড়্‌কা লাগাইয়া দিলো।

অনন্তকে তাহার বাড়ীর মধ্যে চালান করিয়া দিয়া বিলোপ যেই ঘুরিয়া মৃদুলার মুখের দিকে তাকাইলো, অমনি মৃদুলা স্বামীর প্রতি অভিমানে, বিলোপের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, অনন্তর কুৎসিত আচরণে অপমানিত হওয়ার ক্ষোভে এবং বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার আশ্বাসে পূর্ণ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলো, এবং তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুখ ঢাকিলো।

বিলোপ মৃদুলার ক্রন্দন দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বিরক্তি-মিশ্র অনুযোগের স্বরে বলিলো—এমন বানর-প্রকৃতি লোকের সঙ্গে মলয় সংস্রব রাখে কেনো আর এদের প্রশ্রয়ই বা দেয় কেনো!

মৃদুলা বিলোপের সমবেদনায় সান্ত্বনা পাইয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলো—আজকাল ওঁর এই রকম সব লোকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছে! আমার মান-মর্য্যাদার দিকে দেখ্‌বার অবসর তাঁর আর নেই। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, আমাকে এই নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার কর্‌তে হবে·····

বিলোপ বলিলো—তার জন্যে আর ভাবনা কি? আমি এখনই একটা ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে এনে দু-বাড়ীর মাঝখানের দরজাটায় কাঠ দিয়ে স্ক্রু আঁটিয়ে দিচ্ছি। আর মলয়কে বলে'·····

ইতিমধ্যে মৃদুলা সম্বৃত হয়ে স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলো—আমি এ বাড়ীতে আর থাক্‌বো না, থাক্‌তে পার্‌বো না, এখানে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।·····

বিলোপ অবাক্ হইয়া মৃদুলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলো! মৃদুলা বলিতে লাগিলো—আমি বাবার কাছে পুরীতে যাবো। আপনি আজ এখনই যদি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন তো ভালো হয়; আপনিই ঘট্‌কালি করে' আমার বিয়ে দিয়েছিলেন!·····

মৃদুলার কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন মৃদু তিরস্কার বিলোপ বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলো নিশ্চয় মৃদুলা ও মলয়ের মধ্যে কোনো দাম্পত্য কলহ হইয়া থাকিবে এবং সে সম্বন্ধে শাস্ত্রবচনে তাহার বিশেষ বিশ্বাস ছিলো বলিয়া সে স্থির করিয়া লইলো যে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া শীঘ্রই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। তাই সে মৃদুলার তিরস্কারে কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিয়া বলিলো—ঘট্‌কালি করে' বিয়ে দিয়েছিলাম আমি, আমিই আবার সালিসী মকদ্দমায় আপোষ নিষ্পত্তি করে' দেবো! আমি চিরকাল আপনার দুজনের মধ্যে মিলন-সাধন হাইফেন হয়ে থাক্‌বো!

মৃদুলা বিলোপের রসিকতায় হাসিতে পারিলো না; মুখ কালো করিয়া থাকিয়াই দৃঢ়স্বরে বলিলো—আপনি

নিয়ে যেতে যদি না পারেন তা হলে আমাকে একলাই যেতে হবে!

বিলোপ মৃদুলার দৃঢ়তা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলো; সেও গম্ভীর হইয়া বলিলো—আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাবো! কিন্তু গাড়ী তো সেই রাত ৮টার সময়·····

মৃদুলা পুনরায় দৃঢ় স্বরে বলিলো—গাড়ী যখনই ছাড়ুক, আমি এ বাড়ী থেকে এখনই বেরুবো, ষ্টেসনে গিয়ে বসে' থাক্‌বো, তবু এ বাড়াতে থাক্‌তে পার্‌বো না। আপনি সঙ্গে যান ভালো, নয় তো আমি একলাই যাবো।·····

মৃদুলার কেবলই মনে হইতেছিলো পাঁচটার সময় মলয় আপিস হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া নিবারণের সঙ্গে শ্রেয়সীর বাড়ীতে যাইবে! বারবনিতার গৃহে স্বামীর অভিসার মৃদুলা কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাই সে বিলোপকে আপনার দৃঢ় সঙ্কল্পের শেষ কথা শুনাইয়া দিয়া তাহাকে কোনো কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই নিজের চাকরকে উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলো—রুক্মী!··· একখানা গাড়ী কি ট্যাক্‌সি চট্ করে' ডেকে নিয়ে এসো তো·····

বিলোপ মৃদুলাকে নীরব হইতে দেখিয়া বলিলো—তা হলে আমি একবার বাসায় গিয়ে আমার জামা কাপড়·····

মৃদুলা বলিলো—ষ্টেসনে যাবার পথে নিয়ে নেবেন, অথবা পুরীতে গিয়ে আমি কিনে আনিয়ে দেবো·····

এই দৃঢ়তার পর বিলোপের বক্তব্য আর কিছুই থাকিলো না।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিলো—ট্যাক্‌সি আসিয়েসে।

মৃদুলা ভৃত্যকে বলিলো—ঐ ঘরে একটা ব্যাগ আর বিছানা বাঁধা আছে, গাড়ীতে তুলে দাও·····

বিলোপ বুঝিলো মৃদুলা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলো। সে কেবলই ভাবিতেছিলো একবার কোনো-রকমে মলয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ব্যাপার কি জানিতে পারিলে ভালো হইতো। তাই সে সময় কাটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলো—ব্যাপারটা কি হয়েছে আমাকে যদি বল্‌তেন·····

মৃদুলা সিঁড়িতে নামিতে নামিতে বলিলো—পুরীতে গিয়ে সব বল্‌বো। এখন বল্‌তে পার্‌বো না।

বিলোপ অগত্যা মৃদুলার অনুসরণ করিলো।

মৃদুলার ভৃত্য ঘরের ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলো—মাইজী, খাবারের বাক্স ঔর জলের কুঁজাভি যাবে?

বিলোপ যদি সঙ্গে যায় তাহা হইলে তাহার আহারের জন্য মৃদুলা লুচি তরকারী তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিলো। ভৃত্যের প্রশ্নের উত্তরে মৃদুলা বলিলো—হ্যাঁ; এক জায়গায় যা আছে সব নিয়ে আয়·····

মিনিট পাঁচেক পরেই মৃদুলা ও বিলোপকে লইয়া মোটর-গাড়ী উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিলো।

সাড়ে চারটার সময় মলয় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মৃদুলাকে খুঁজিলো। কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অথবা তাহার অবস্থানের কোন চিহ্ন না দেখিয়া সে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ রে, তোর মাইজী কোথায়?

ভৃত্য তাহাকে সংবাদ দিলো—মাইজী বিলোপবাবুর সাথে বেরিয়ে গিয়েসেন।

মলয় মনে করিলো মৃদুলা বায়োস্কোপে যাইতে চাহিয়াছিলো এবং সে লইয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া মৃদুলা হয়তো বিলোপকে ডাকাইয়া আনিয়া বায়োস্কোপে গিয়াছে। মৃদুলা যে নিজের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইয়াছে ইহাতে সে সুখীও হইলো এবং সে যে মৃদুলার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে নাই ও মৃদুলাকে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছে ইহাতে সে দুঃখিতও হইলো।

মলয় দেখিলো খাবার ঘরে তাহার জলখাবার ঢাকা রহিয়াছে। সে সেই খাবার খাইয়া, নিবারণকে সঙ্গে লইয়া শ্রেয়সীর বাড়ীতে গিয়া ফটকের কাছে উপস্থিত হইতেই দ্বারবান্ রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলো—নেই বাবু নেই, বাইজীকা সাথ মুলাকাৎ নেহি হোগা!

মলয় দ্বারবানের হুঙ্কারে দমিয়া না গিয়া বাড়ীর দালানে উঠিয়া বলিলো—আমরা তো আর জোর করে' দেখা কর্‌তে যাচ্ছি না। তুমি শুধু বাইজীকে গিয়ে খবর দিয়ে এসো যে মলয়-বাবু এসেছে।

দ্বারবান্ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলো—কোন্ বাবু? মালাই-বাবু?

মলয়ের নিজের নামটার হিন্দুস্থানী উচ্চারণে কবিত্বের রাজ্য হইতে ঔদরিক রাজ্যে অর্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটিতে দেখিয়া

অত্যন্ত হাসি পাইলো; সে হাসি চাপিয়া বলিলো—হাঁ, মালাই বাবু বল্‌লেই হবে। আর তুমি যে কষ্ট করে' আমার নামটা বয়ে নিয়ে যাবে তার জন্যে তুমি কিছু মালাই খেয়ো... ..

মলয় দ্বারবান্‌জীর হাতে পাঁচটি টাকা গুঁজিয়া দিলো।

হাতের মুঠার মধ্যে অনেকগুলি টাকার সমাগম অনুভব করিয়া শ্রীল শ্রীযুক্ত হনুমান্‌প্রসাদ চৌবে মহারাজ খুসী হইয়া নিজের টুলটা মলয়ের কাছে রাখিয়া সম্ভ্রমের সহিত বলিলো—আপ্ বৈঠিয়ে বাবু, বৈঠিয়ে।

তাহার পর সে মলয়ের সঙ্গীকেও কিছু একটা বসিতে দেওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে চক্ষু সঞ্চালিত করিতে লাগিলো।

মলয় তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিলো—থাক, আমাদের দর্‌কার নেই, তুমি খবরটা দাও গে—মলয়-বাবু···

দ্বারবান্‌জী যাইতে যাইতে মলয়কে আশ্বাস দিয়া বলিয়া গেলো—হাঁ, হাঁ, ইয়াদ হ্যায়, মালাই-বাবু·····

দ্বারবান্ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মলয় নিবারণকে বলিলো—চলো আমরা ওর পিছন-পিছন যাই·· যদি দেখা কর্‌তে না চায়...তার চেয়ে আমরা একেবারে গিয়ে উপস্থিত হই···তুমি তো একদিন এসেছিলে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলো—তা পার্‌বো·····

"তবে চলো" বলিয়া মলয় দ্বারবান্ যে পথে বাড়ীর ভিতর গিয়াছে দেখিয়াছিলো সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলো।

সিঁড়ির কাছে উপনীত হইয়াই দেখিলো শ্রেয়সী তাহার স্রস্ত অবগুণ্ঠন মাথায় তুলিয়া দিতে দিতে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দ্রুতপদে রূপ-তরঙ্গের ন্যায় সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতেছে। সে সিঁড়ির উপরে থাকিতেই মলয়কে দেখিয়াই আবেগভরা স্বরে বলিয়া উঠিলো—দাদা, তুমি এই নরককুণ্ডে কেনো এসেছো?

মলয় তৎক্ষণাৎ বলিলো—আমার পথভ্রান্ত বোনটিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে' দিতে·····

শ্রেয়সী ছুটিয়া নামিয়া আসিয়া মলয়ের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলো এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলো—দাদা, তুমি আমার গুরু বন্ধু, তোমার পায়ের ধুলো নেবারও আমার আর ক্ষমতা নেই। নইলে তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌তাম আমি বড় দুঃখে অসহ্য কষ্ট পেয়ে এই পথে এসেছি! আমার এই মাতৃভক্ত স্বামী যখন কিছুতেই তার পত্নীকে রক্ষা কর্‌বার সাহস সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌লে না, তখন নিরুপায় হয়েই·····

মলয় ব্যথিত হইয়া বলিলেন—জানি বৌমা জানি, নিবারণ তার ভুল বুঝে প্রায়শ্চিত্ত করেছে; সে তোমাকে খুঁজে খুঁজে যে-সব জায়গায় বেড়িয়েছে তাতে তার মিথ্যা কলঙ্কে দেশ ছেয়ে গেছে; তার মাও তাকে ঘৃণা করেন। তুমি ফিরে চলো·····

শ্রেয়সী মাটিতে মলয়ের পায়ের কাছে বসিয়া থাকিয়াই বলিলো—তুমি যদি আদেশ করো তবে···

মলয় দৃঢ় অথচ মমত্বময় স্বরে বলিলো – হ্যাঁ আমি বল্‌ছি, আমি জামিন হচ্ছি, তোমার পত্নীর মর্য্যাদা কখনো ক্ষুণ্ণ হবে না, নিবারণ···

শ্রেয়সী চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলো—তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। এই জন্যে তুমি এলে কেনো? একখানা চিঠি লিখে দিলেই তো হতো...

মলয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলো—আমি তো তোমাকে দুখানা চিঠি লিখেছিলাম, তার জবাব না পেয়েই তো .....

শ্রেয়সী ঘাড় নাড়িয়া বলিলো—আমি তো একখানা চিঠিও পাইনি।.....তুমি বস্‌তে পারো এমন শুচি স্থান বা আসন এ বাড়ীতে একখানাও নেই···তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই বিদায় দিচ্ছি। তোমার এই পায়ের ধুলো দিয়ে আমার জীবনের সমস্ত পাপ ঘসে' দূর করে' দিয়ে আজ থেকে আমি আবার পবিত্র হবো.....

মলয় বলিলো—তোমাকে না নিয়ে তো আমরা বিদায় হবো না.....

শ্রেয়সী বিব্রত কাতর হইয়া বলিলো—কিন্তু থিয়েটার-ওলাদের সঙ্গে যে আমার কন্‌ট্র্যাক্‌টের চুক্তি লেখাপড়া করা আছে.....

মলয় বলিলো—তা থাক। যদি তাদের বলে' কয়ে' চুক্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারি তো ভালোই, না হয় তো তুমি তোমার চুক্তির মেয়াদ পর্য্যন্ত নিবারণের বাসা থেকেই·····

শ্রেয়সী মাথা নত করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলো; একবার অপাঙ্গে নিবারণের ম্লান উৎসুক মৌন মুখের

দিকে তাকাইলো; তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলো—তবে চলো · কিন্তু আমাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে নিয়ে যেয়ো ··

এতো শীঘ্র যে মলয় শ্রেয়সীকে সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে সক্ষম হইবে তাহা সে বা নিবারণ কেহই ভাবে নাই; সফলতার আনন্দে উভয়ের মুখই উজ্জ্বল হইয়া উঠিলো। তাহারা গাড়ীতে চড়িতে চলিলো।

গাড়ীর পা-দানীতে পা দিয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় শ্রেয়সী বাড়ীটার দিকে একবার ফিরিয়া দেখিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া মলয়কে বলিলো—বাড়ীর জিনিস পত্তরগুলো নিলাম করিয়ে বাড়ীভাড়া আর চাকর-দাসীদের মাইনে চুকিয়ে যা বাঁচ্‌বে গরিব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিয়ো।

মলয়ও শ্রেয়সীর অভ্যস্ত বিলাসের জীবনকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার বেদনায় ব্যথিত হইয়া কোমল স্বরে বলিলো—তোমার ইচ্ছা অনুসারেই সব করা যাবে·····

শ্রেয়সী সিঁড়ির নীচেই মলয়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়াছিলো বলিয়া দ্বারবান্‌জী হনুমানপ্রসাদ সিঁড়ি হইতে আর নামিবার সুবিধা পায় নাই; সে শ্রেয়সীকে মলয়ের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলো; বিস্ময়ে তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিলো এবং ময়ূরের পেখমের মতন ঊর্দ্ধে ছড়াইয়া চওড়া করিয়া তোলা গোঁফজোড়া ঘন ঘন কম্পিত হইতে-ছিলো! শ্রেয়সী যে বেশে নীচে নামিয়া আসিয়াছিলো সেই সামান্য সাধারণ বেশেই গৃহত্যাগ করিয়া গেলো, কোনো প্রসাধন পারিপাট্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিলো না, ইহাতেই তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিলো না!

মলয় যখন শ্রেয়সীকে নিবারণের বাসায় রাখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে পারিলো তখন রাত্রি ১০টা। তখনও মৃদুলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসে নাই দেখিয়া মলয় একটু চিন্তিত হইলো, আবার বিলোপের সঙ্গে গিয়াছে বলিয়া ব্যস্তও হইলো না; সে ভাবিতে লাগিলো মৃদুলারা যদি বায়োস্কোপে গিয়া থাকিতো তাহা হইলে তো নয়টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিতো; পথে গাড়ীতে আসিতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই তো? এই আশঙ্কা মনে উদয় হইতেই মলয় তাহার ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলো—তোর মাইজী কোথায় গেছেন কিছু বলে' যান নি?

ভৃত্য বলিলো—না; আমাকে শুধু বল্‌লেন একটা গাড়ী কি ট্যাক্‌সি ডাকিয়ে আন্; আমি ট্যাক্‌সি ডাকিয়ে আনে দিলাম;.. তার পর হামাকে বল্‌লেন—ঘরে ব্যাগ বিছানা আছে, গাড়ীমে চড়িয়ে দে···

মলয় আশ্বস্ত ও উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলো—ব্যাগ বিছানা নিয়ে গেছে?

ভৃত্য বলিলো—আজ্ঞে; হামি জিগিস কর্‌লাম যে খাবার বাক্‌স্ আর জলের কুঁজাভি কি দিবো? তিনি বল্‌লেন—হাঁ, এক জায়গাসে যো আছে সভ নিয়ে আইসো···

মলয় নিশ্চিন্ত হইলো; ব্যাগ বিছানা খাবার জল লইয়া যখন গিয়াছে তখন কোথাও দূরে গিয়াছে; রাত্রে ফিরিতেও পারে, নাও পারে। অতএব সে মৃদুলার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া না থাকিয়া ভৃত্যকে বলিলো—ঠাকুরকে খেতে দিতে বল্·····

মলয় নিশ্চিন্ত হইলেও তাহার মন কৌতূহলে পীড়িত হইতে লাগিলো মৃদুলা তাহাকে না বলিয়া কোথায় যাইতে পারে? সে তাহাকে বায়োস্কোপে লইয়া যায় নাই বলিয়া বোধ হয় অভিমানে মৃদুলা তাহাকে চিন্তিত করিবার এই ফন্দি করিয়াছে! কিন্তু সে তো একটুও চিন্তিত হইলো না যখন সে জানিতে পারিয়াছে বিলোপকে সঙ্গে করিয়া সে গিয়াছে! মৃদুলার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া মলয় মনে মনে হাসিতে লাগিলো।

বিলোপ মৃদুলাকে লইয়া হাবড়া ষ্টেসনে গিয়াও স্থির হইতে পারিতেছিলো না, তাহাদের গৃহত্যাগের সংবাদ মলয়কে জানাইবার জন্য তাহার মন চঞ্চল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলো, সে অস্বস্তি বোধ করিতেছিলো। সে মৃদুলাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিনী মহিলাদের বিশ্রামকক্ষে বসাইয়া জিনিষপত্র তাহার কাছে রাখিয়া মলয়ের সন্ধান করিতে গেলো। সে ষ্টেসন হইতে টেলিফোন্ করিয়া জানিলো মলয় তখনও বাড়ীতে ফিরিয়া আসে নাই এবং সে তাহার আপিসেও নাই। বিলোপ মৃদুলার বিশ্রামকক্ষের দ্বারপ্রান্তে ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইয়া খুঁজিতে লাগিলো যদি কোনো চেনা লোককে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহাকে দিয়া মলয়কে সংবাদ দিবার চেষ্টা করিবে। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই তাহার মনে হইলো অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; আবার সে টেলিফোন্ করিলো; শুনিলো মলয় বাড়ীতে আসিয়াছিলো, কিন্তু

আসিয়াই বাহির হইয়া গিয়াছে! বিলোপের মন, এই সুযোগটি হারাইয়া হায় হায় করিয়া উঠিলো; সে নিজের নির্বুদ্ধিতাকে শত ধিক্কার দিতে দিতে মলয়ের ভৃত্যকে জানাইয়া রাখিলো—আটটার আগেই যদি বাবু বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন তবে যেনো তাহাকে সে খবর দেয় যে তিনি যেনো তৎক্ষণাৎ হাবড়া ষ্টেসনে আসেন। এই সংবাদ মলয়ের ভৃত্য মলয়কে বলিতে পারে নাই, কারণ সে যখন মাইজীর গৃহত্যাগের বর্ণনা সবিস্তারে করিতেছিলো তখন তাহার বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়াই তাহার প্রভু তাহাকে আদেশ করিয়াছিলো "ঠাকুরকে খেতে দিতে বল্।" এই আদেশ পালন করিতে গিয়া বিলোপের আদেশ পালন করা তাহার ঘটিয়া উঠে নাই; এবং তাহার প্রভুকে বিলোপ আটটার আগে হাবড়া ষ্টেসনে যাইতে বলিয়াছিলো, সেই সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এজন্যও সে অসময়ে ঐ সংবাদ দেওয়ার কোনো বিশেষ আবশ্যকতা যে আছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

বিলোপ মৃদুলার বিশ্রামকক্ষের সম্মুখে চঞ্চল ভাবে পদচারণা করিতে করিতে প্রতিমুহূর্ত্তে আশা করিতে লাগিলো এইবার হয় তো মলয় আসিবে এবং সে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটাইয়া দিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলো। ষ্টেসন আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মৃদুলা বিশ্রাম কক্ষের দ্বারোপান্তে আসিয়া পদচারী বিলোপকে বলিলো—ট্রেনের সময় হয় নি? দেখ্‌বেন, ট্রেণ ফেল করিয়ে দেবেন না।

বিলোপ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুলার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিলো—ভয় নেই, ট্রেণ ফেল হবে না; এখনো দেরী আছে; আমি বার্থ্ রিজার্ভ্ করে' এসেছি·····

মৃদুলা আবার বিশ্রামকক্ষের মধ্যে আপনার অনন্ত দুর্ভাবনার তলায় ডুবিয়া গেলো।

ট্রেণের সময় ক্রমশঃই অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিলো; বিলোপের ব্যস্ততা ততো বাড়িতে লাগিলো। যাহাকে সে ভালোবাসে সেই প্রিয়তমা রমণীকে লইয়া একাকী সে সুদূর দেশে যাইবে! মৃদুলা তাহার মনের ভাব হয় তো জানে, হয় তো বা জানে না; কিন্তু তাহার উপর উহার আস্থা তাহাকে মুগ্ধ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলো; কিন্তু মৃদুলা বন্ধুপত্নী হইলেও তাহার স্বামীর জ্ঞাতসারে তাহার সম্মতি-ক্রমে মৃদুলাকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিতে যাইবার গুরু দায়িত্ব সে কতকটা নিরুদ্বিগ্ন ভাবেই গ্রহণ করিতে পারিতো; যদিও মলয় তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, এবং মলয় তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করে, তথাপি সে তাহার অজ্ঞাত-সারে তাহার স্ত্রীকে লইয়া দূর দেশে প্রস্থান করিতে বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলো; যদি সে মৃদুলাকে ভালো না বাসিতো তাহা হইলে হয় তো তাহার মন এতো চঞ্চল হইতো না; কিন্তু তাহার ভালোবাসা তাহাকে নিশ্চিন্ত হইতে দিতেছিলো না, তাহার আত্মবিশ্বাস শিথিল করিয়া দিতেছিলো।

গাড়ী ছাড়িবার সময় যখন আসন্ন হইয়া আসিলো এবং মলয় তখনও আসিয়া পৌঁছিলো না, তখন বিলোপ মলয়কে সমস্ত সংবাদ জানাইয়া এক দীর্ঘ টেলিগ্রাম করিলো; তাহার মর্ম্ম এই যে মৃদুলার আহ্বানে সে মলয়ের বাড়ীতে গিয়াই দেখিলো যে পাশের বাড়ীর ভাড়াটিয়া এক পুরুষ পুঙ্গব মৃদুলাকে আক্রমণ করিয়াছে ও মৃদুলা উহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে আত্মমোচনের চেষ্টা করিতেছে; বিলোপ সেই লোকটাকে তাহার বাড়ীতে তাড়াইয়া মৃদুলাকে মুক্ত করিয়া দিতেই মৃদুলা গৃহত্যাগ করিয়া পুরী যাইতে উদ্যত হইলো; কাজেই বাধ্য হইয়া সে সঙ্গে চলিয়াছে।

মলয় আহারাদি করিয়া যখন শয়ন করিয়াছে তখন সে এই টেলিগ্রাম পাইলো। অনন্তর আচরণের পরিচয় পাইয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেলো এবং ক্রোধে সে অধীর হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলো; তাহার দুর্দ্দম বাসনা হইতে লাগিলো অনন্তকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ডাকিয়া আচ্ছা করিয়া পিটিয়া শিক্ষা দিয়া দেয়; কিছুক্ষণ অস্থির চরণে সঞ্চরণ করিতে করিতে তাহার মনে হইলো—বিলোপ তাহাকে অমনি ছাড়িয়া দিবার পাত্র নয়, সেই উহাকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে নিশ্চয়। এই কথা মনে হইতে তাহার মন অনেকটা স্থির হইলো। তখন আবার তাহার মনে পড়িলো শ্রেয়সী তাহাকে বলিয়াছে সে তাহার একখানা চিঠিও পায় নাই; অথচ দুখানা চিঠিই ডাকে দিবার ভার লইয়াছিলো অনন্ত! অনন্তর কোনো সয়তানী মৎলব ছিলো বলিয়া দারুণ সন্দেহে মলয়ের মন পূর্ণ হইয়া উঠিলো। সে দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারিলো না। (ক্রমশঃ)

লক্ষহীরা

এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ কথানাট্য

মন্মথ রায় এম-এ

চন্দনদত্ত।

—এই তার অতিথিদের অভ্যর্থনা-কক্ষ।

অদিতি।

—অথচ আজ আমি এই প্রাসাদের সম্মুখ দিয়েই কতবারই না যাতায়াত করেছি!···আমার মনেই হয় নি, আমি ধারণাই কর্ত্তে পারি নি যে এ প্রাসাদ রাজপ্রাসাদ না হয়ে···

চন্দনদত্ত।

—কোন বারবিলাসিনীর প্রণয়ের পণ্যশালা হতে পারে!

অদিতি।

—আমি ভেবেছিলুম এ রাজপ্রাসাদ!

চন্দনদত্ত।

—বিদেশী সকলেই এমনি ভুল করেছে। রাজপ্রাসাদের চাইতেও এ প্রাসাদ সুন্দর। এ প্রাসাদ অনুপম।···এই প্রাসাদ দেখে রাজার হিংসা হওয়াতে···রাজা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এই প্রাসাদেই দিবস যামিনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহন করেন!

অদিতি।

···রাজকার্য্য?

চন্দনদত্ত।

—এই সুন্দরীর চরণপদ্মে অর্ঘ্যদান। রাজার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই সুন্দরী।

অদিতি।

—পৃথিবী সুন্দর হ'ত, আরো সুন্দর হ'ত,···সংসার সার্থক হ'ত, যদি এই প্রেম বিবাহের ফুলটি হয়ে ফুটে উঠ্‌ত!

চন্দনদত্ত।

···পৃথিবী সুন্দর হয় নি, আরো কুৎসিত হয়েছিল, সংসার অসার্থক হ'ল···যেদিন এই প্রেম বিবাহের বন্ধনে কারারুদ্ধ হ'ল!"—এই নারী এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে! তার নিজের মুখেই শুনেছি সে যুগে যুগে মানবের প্রেয়সী প্রিয়া,···কিন্তু···পত্নী নয়। সে কথা যাক্।··· তোমার স্বামী কি ঘুমিয়েই আছেন?

অদিতি।

—হাঁ, ঘুমিয়েই রয়েছেন।···কেন, লক্ষহীরা দেবীর কি দর্শনদানের সময় উপস্থিত?

চন্দনদত্ত।

—না, এখনো সে প্রাসাদে ফিরে আসে নি। সে যখন ফিরবে, রাজপথ জয়-ঘণ্টায় মুখরিত হবে। সে প্রত্যহ রাজার সঙ্গে বৈকালে নদীবক্ষে নৌকা-বিহারে যেয়ে থাকে। ঐ ··প্রাসাদ-শীর্ষেও প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল!···ঐ সন্ধ্যাদীপের আলোতে প্রাসাদগাত্রের লক্ষহীরা ঝল্‌মল্ কচ্ছে!·· জানো, এই লক্ষহীরার প্রাসাদ হ'তেই এর অধীশ্বরীর নাম লক্ষহীরা দেবী?

অদিতি।

—হীরা আজ আমি এই প্রথম দেখলুম!···

চন্দনদত্ত!

—অদিতি! তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না। তুমি তোমার রুগ্ন স্বামীকে সারাটি দিন পিঠে বহন ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ! ঝোলাটি না হয় এখন নামাও···

অদিতি।

···না।···তাতে তিনি জেগে উঠ্‌তে পারেন!···এখন আর অনর্থক জাগা'বো না। জাগ্‌লেই তাঁর আগুন জ্বলে উঠ্‌বে···ব্যথাটা আজ বেশী বলছিলেন, আজ সারাটি দিন বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

চন্দনদত্ত।

—কিন্তু তোমারো বিশ্রাম আবশ্যক ভগিনি!

অদিতি।

…উনি ঘুমো'চ্ছেন!…আমার এত ভালো লাগছে!… ঘুমের মধ্যে ওঁর আর কোন ব্যথা বোধ নেই!…শুধু এই শান্তিটুকু উনি পান সেই জন্যই আমি কত কামনা করি!… ওঁর এই শান্তিতে আমার মনে হচ্ছে আমিই যেন ঘুমিয়ে পড়েছি!…আমার আর এতটুকু অবসাদ নেই!…আমি যেন স্বপ্ন দেখছি লক্ষহীরা দেবী ওঁকে গ্রহণ করেছেন!… ওঁর ঘুমন্ত মুখে কি হাসি ফুটে উঠেছে?…আমার এত ভালো লাগছে!

চন্দনদত্ত।

ঘুমিয়ে থাকা ভালো।…স্বপ্ন দেখা আরো ভালো!… আমার ঘুম হয় না!…কতকাল স্বপ্ন দেখি না!…তোমার স্বামীর সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ…গলিত কুষ্ঠ, ঘা…পূঁজ।…আমারো মনে অমনি জ্বালা!…কিন্তু, আমার চোখে ঘুম নেই!

অদিতি।

…আমিও সারাটি দিন সারাটি রাত্রি প্রায় চেয়েই থাকি!…চেয়ে না থাক্‌লে মাছি পোকার দৌরাত্ম্য হতে ওঁকে রক্ষা কর্ত্তে পারি না! হাঁ, আমি ওঁর পানে চেয়ে চেয়ে রাত কাটাই!…সে আমার বেশ লাগে…আমি ওঁর ঘুম মনে মনে প্রাণে প্রাণে অনুভব করি!…উনি তা পারেন না। ঘুম যে সুন্দর; সে কি ঘুমিয়ে অনুভব করা যায়?

চন্দনদত্ত।

গুরুদেব যখন তোমাদের ভার আমার হাতে আজ সঁপে দিলেন, তখন তোমার পরিচয়ে বলেছিলেন তুমি দেবী। আমি আজ সাক্ষাৎ দেবী দর্শন করলুম!

অদিতি।

না, আমি দেবী নই। আমিও তাঁরই মন্ত্র-শিষ্যা।… আপনি আমার গুরুভ্রাতা।…দেবীই যদি হ'তুম, তবে কি উনি এত কষ্ট পান?…তাই যদি হ'তুম, তবে আমার মনের চক্ষুতে ওঁর যে রূপ-টি দেখে আমি মুগ্ধ, সেই রূপ-টি ওঁর দেহে ফুটিয়ে বল্‌তুম দেখ তুমি কত সুন্দর!…লক্ষহীরা দেবীকে দেখে উনি পাগল হয়েছেন, আমার-দেওয়া ওঁর সে রূপ দেখ্‌লে ঐ লক্ষহীরা দেবীই আজকে ওঁর জন্য আমারি মতো পাগল হ'তেন!…হাঁ, হ'তেন, আমি জোর গলাতেই সে কথা বল্‌তে পারি।…না, না, আমি দেবী নই। দেবী হ'লে কি দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে, দাসীবৃত্তি ক'রে, কোন দিন না খেয়ে, কোন দিন শুধু জল খেয়ে লক্ষহীরা দেবীর দর্শনী শত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ কর্ত্তে হয়?

চন্দনদত্ত।

তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ…বড়ই ভাবিয়ে তুলেছ। …আমার বড় ভয় হচ্ছে!…আমি শুধু প্রার্থনা কর্ছি, তোমার স্বামীর খেয়াল চরিতার্থের জন্য তোমার এই দেহ পাত সফল হোক্…সার্থক হোক্…

অদিতি।

ওঁর খেয়াল!…কিন্তু খেয়াল তো আমারো কম নয়! শত স্বর্ণমুদ্রা ওঁকে লক্ষহীরা দেবীর চরণে দর্শনী দিতে হবে …সে তো আমার আঁচলেই বাঁধা রয়েছে!…এলেই খুলে দেব।…কিন্তু, তারপর কি দেখ্‌ব!…দেখ্‌ব, উনি রোগ-যন্ত্রণা ভুলে গেছেন! মনের আনন্দে লক্ষহীরা দেবীর গান শুনছেন! তাঁর নৃত্য দেখছেন! একটি রাত্রির জন্য আমার ঐ দরিদ্র-নারায়ণ রাজরাজেশ্বরীর সেবা পাচ্ছেন!… আনন্দে ওঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে!..আর আমি? …আমি…আমি চুরি ক'রে আমার দেবতার সেই আরতি দেখ্‌ব!

চন্দনদত্ত।

…কিন্তু অদিতি! আমার বড় ভয় হচ্ছে!…ভগবান তোমার এই অপূর্ব্ব সেবা, অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠা জয়যুক্ত করুন!

অদিতি।

আপনি বার বার ঐ সেবা আর নিষ্ঠার কথা ব'লে আমাকে অবাক্ করছেন!…শুনুন! আপনি এই বয়সেই সংসার-বিরাগী হয়ে ভালো করেন নি! আপনি বিবাহ কর্লে, আমারি মতো আর একটি নারী সেবা ক'রে সুখী হ'ত, ভালোবেসে ধন্য হ'ত। সেই যে আনন্দ-দান, সে তো আপনার কম পুণ্য হ'ত না ঠাকুর!

চন্দনদত্ত।

আমার কথা থাক্ অদিতি!…হাঁ, সে থাক্।…তুমি শত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করেছ বল্‌লে। কিন্তু, লক্ষহীরা দেবীর দর্শনী এক শত এক স্বর্ণমুদ্রা।

অদিতি।

সে কি!…তবে উপায়?…আমি যে শত স্বর্ণমুদ্রার কথাই শুনেছিলুম!

চন্দনদত্ত।

তবে সে তুমি ভুল শুনেছ।

অদিতি।

…সর্ব্বনাশ!

চন্দনদত্ত।

…কিন্তু আমি সে কথা ভাবছিনে!…আমি ভাবছি—

অদিতি।

—বেশ, আমি এক শত এক স্বর্ণমুদ্রাই দেব। আমি আর এক স্বর্ণমুদ্রা এখনি নিয়ে আসছি…হাঁ, আমি আন্‌তে পার্ব্ব…সেই সজ্জাকরের কথায় আমি তখন সম্মত হইনি,… …এখন হব।…আপনি দয়া করে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি যথাশীঘ্র ফিরে আসব। সেই সজ্জাকর আমাকে এক স্বর্ণমুদ্রা দেবে…

চন্দনদত্ত।

শোন অদিতি—

অদিতি।

না, আর কোন কথা নয়।

চন্দনদত্ত।

…চলে গেল!…পতিভক্তির ঐ গঙ্গাকে গোমুখীতে রুদ্ধ করা দেবতারও অসাধ্য।…পৃথিবী ধন্য হোক্…সংসার পবিত্র হোক্…সমাজ শিক্ষা লাভ করুক!…কিন্তু, কী আশা ঐ নারীর!…অথবা…দুরাশা?…লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দর্শনী দিলেও সেই যৌবন-মদ-মত্তা লক্ষহীরা ঐ কুষ্ঠরোগীকে দর্শন দান করবে না।…আমি তাকে চিনি, জানি।…কিন্তু তবু গুরুর আদেশ—,…ঐ…তার জয়ঘণ্টার জয়-ধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছে!…ঐ…ঐ…সে!…পাশে রাজা!…ঐ…রাজা সোপানপথে দ্বিতলে বিশ্রাম-কক্ষে উঠে গেলেন!…সে একা এখানে আস্‌ছে…কত দিন পরে আজ তাকে দেখ্‌ছি!… আজো তার ঐ রূপচ্ছবি আমাকে মুগ্ধ কর্ছে! কি অপরূপ ঐ রূপ?—কিন্তু, কিন্তু, আজ তার মুখখানি অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে আবৃত কেন?…না, না,…মুখের ঐ অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর দেবী!

লক্ষহীরা।

—জানি, এ স্পর্দ্ধা শুধু এক তোমারি হ'তে পারে।… কিন্তু, হে সন্ন্যাসীপ্রবর! হে যোগেশ্বর! সুন্দরীর মুখপদ্ম-দর্শন সন্ন্যাসের কোন্ স্তর? যোগের কোন্ অঙ্গ?

চন্দনদত্ত।

তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে……

লক্ষহীরা।

কিন্তু…সে আজ নয়……

চন্দনদত্ত।

আমি সে দিন না এসে আজ এলুম!

লক্ষহীরা।

আজ আর তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই!

চন্দনদত্ত।

কিন্তু তোমাকে আজ আমার প্রয়োজন আছে!

লক্ষহীরা।

শোন! আমি তোমার উপদেশ শুনব না। আলাপ কর্ত্তে পার, কিন্তু, দোহাই তোমার, উপদেশ দিয়ো না।

চন্দনদত্ত।

—…এসো, গল্প করি…

লক্ষহীরা।

সে মন্দ হবে না, কিন্তু, সাবধান…নীতিমূলক গল্প কছ বুঝ্‌লেই, আমি শপথ করে বলছি…উপর হ'তে রাজাকে নীচে আনিয়ে, তোমারি চোখের সম্মুখে, দুইজনে একপাত্রে সুরাপান করে…মাতাল হব!…হাঁ…!

চন্দনদত্ত।

আমি তাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হব না।…কিন্তু, তোমার স্বরে সে উচ্ছ্বাস কই? তোমার চোখে মুখে অবসাদের আভাস পাচ্ছি!…কেন?…কুশলে আছ তো?

লক্ষহীরা।

……অর্থাৎ……দোকানদারি কেমন চল্‌ছে, এই কথা তো?…

চন্দনদত্ত।

দোকানদারি!

লক্ষহীরা।

সাধুভাষায়, গণিকাবৃত্তি।

চন্দনদত্ত।

—তাতে তোমার জয়জয়কার! ঐ লক্ষহীরা তার জ্বলন্ত বিজ্ঞাপন, আর উপরে প্রতীক্ষমান রাজা তার জয়-নিশান!…কিন্তু, আমি তো সে কথা জিজ্ঞাসা করি নি! আমি তোমার কুশল প্রশ্ন করেছিলুম!

লক্ষহীরা।

গণিকার জন্য অতখানি দরদ কি সংসার-বিরাগী সাধুর শোভা পায়?

চন্দনদত্ত।

ভেবে দেখ···একদিন তুমি আমার···একান্তই আমার ছিলে! তোমার আত্মা, তোমার সত্বা, তোমার দেহমনের সকল সম্পদ আমার অধিকারে ছিল! পুরোহিত অগ্নি সাক্ষী রেখে ঘোষণা করেছিল আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী!

লক্ষহীরা।

···মানুষ তখনো সভ্য হয় নি। অসভ্যদের মধ্যেই 'স্ত্রী' পুরুষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল।···বিবাহের অনুষ্ঠান পুরুষের সেই সম্পত্তি-লাভ ঘোষণা কর্ত্ত। বর্ত্তমান কালে বিবাহ আদিমযুগের সেই অসভ্য প্রথার স্মৃতি।

চন্দনদত্ত।

···তবু ভালো, সেই স্মৃতিটুকুও বিস্মৃত হও নি!

লক্ষহীরা।

—না, তা হইনি বটে!...ঐ স্মৃতিটুকুর মূল্য আছে। ঐ স্মৃতিটুকু আছে বলেই আজ পরিমাণ কর্ত্তে পারি যুগ হ'তে যুগান্তরে আমরা কতখানি এগিয়ে চলেছি!...কিন্তু আমি আর পার্চ্ছি নে, বড়ই ক্লান্ত মনে হচ্চে।···বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে,···এই জ্যোৎস্নায় আমার পদ্ম-কুঞ্জ স্নিগ্ধ শান্তিতে লুটিয়ে পড়েছে!···যাবে?

চন্দনদত্ত।

না।

লক্ষহীরা।

কোন আবেদন আছে?

চন্দনদত্ত।

আছে।

লক্ষহীরা।

নিবেদন কর...

চন্দনদত্ত।

এক হতভাগ্য তোমার রূপ দেখে মোহার্ত্ত হয়েছে।

লক্ষহীরা।

—লক্ষহীরার রূপ দেখে লক্ষ হতভাগ্য কামার্ত্ত হয়েছে!

চন্দনদত্ত।

—কিন্তু এর বিশেষত্ব আছে···

লক্ষহীরা।

···উন্মত্ততা? না···বিকার? না···আত্মহত্যার জন্য সাভিমানে ছুরিকা গ্রহণ?...কি?

চন্দনদত্ত।

তুমি তা শুন্‌লে শিউরে উঠবে!

লক্ষহীরা।

···কি?···বিষভক্ষণ? না···জলে ঝম্পপ্রদান?

চন্দনদত্ত।

সে কুষ্ঠ রোগী। গলিত কুষ্ঠ! সর্ব্বাঙ্গে ঘা, পূঁজ!

লক্ষহীরা।

—হাঁ..., বিশেষত্ব আছে বটে!···তা আমাকে কি কর্ত্তে হবে?

চন্দনদত্ত।

তুমি ঐ হতভাগ্যকে গ্রহণ করে তাকে আদরে আলিঙ্গনে অভিষিক্ত কর্ব্বে।

লক্ষহীরা।

হাঃ হাঃ হাঃ!

চন্দনদত্ত।

কল্পনা কর এ সেই আদিম অসভ্য যুগ। মানুষ তখন কামকে জয় কর্ত্তে শেখে নি। মনে কর আমি স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী। আমার সর্ব্বাঙ্গে ঐ গলিত কুষ্ঠ হয়েছে...।

—নারী!...তখন?

লক্ষহীরা।

হাঃ হাঃ হাঃ!

চন্দনদত্ত।

ও অট্টহাস্য শ্মশানেই শোভা পায় নারী! যখন শ্মশানে ঘুরে বেড়াই, তখন আমি নিজেই ঐরূপ অট্টহাস্যে শৃগাল শকুনিকে চমকিত করে মরার মাথার খুলি কেড়ে নি!...সে যাক্।···মণিমালিনীকে মনে পড়ে?

লক্ষহীরা।

একদিন সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল বটে! হাঁ, যোগ্যা প্রতিদ্বন্দ্বিনীই ছিল!

চন্দনদত্ত।

রাজা তাকে কি ভালোই না বেসেছিল! সেই প্রেমের দৌলতে কত কবি কত কাব্যই না রচনা করেছে!

লক্ষহীরা।

আমরা রয়েছি বলেই তো কবি রা বেঁচে আছে!

চন্দনদত্ত।

একদিন রাজা আলিঙ্গনকালে লক্ষ্য কর্‌ল তার প্রিয়তমা সেই প্রেয়সীর কপোলের চর্ম্ম কুঞ্চিত...

লক্ষহীরা।

চন্দনদত্ত! তারপর?

চন্দনদত্ত।

তার পরদিনই লোল-চর্ম্ম মণিমালিনীর সকল মণিমাণিক্য আঁধার করে নগরীর আর একটি কুটীরে লক্ষহীরা জ্বলে উঠ্‌ল।...সেই হতে তুমি "লক্ষ-হীরা!"

লক্ষহীরা।

চন্দনদত্ত! আমার সুরা-পানের সময় এসেছে···আমাকে ক্ষমা কর···

চন্দনদত্ত।

কিছুদিন পর, আমি শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখলুম একটি গলিত শব নিয়ে শৃগাল আর শকুনিতে কি নিদারুণ যুদ্ধ!···সহসা মনে পড়ে গেল তোমাদের নিয়ে মানুষে মানুষে যুগে যুগে এমনি লড়াই-ই হয়েছে বটে!...যাক্··· খোঁজ নিয়ে পরে জানতে পারলুম···মণিমালিনী···

লক্ষহীরা।

সুরা! সুরা! সুরা আনো, পেয়ালা আনো!

চন্দনদত্ত।

শুনলুম বারবিলাসিনী বারবনিতা মণিমালিনীর শবদাহের জন্য নগরীর লক্ষ নাগরিকের একটি নাগরও মোহার্ত্ত বা কামার্ত্ত হয় নি!

লক্ষহীরা।

চন্দনদত্ত! চন্দনদত্ত!

চন্দনদত্ত।

সত্যি!···হাঁ···, কোন কুষ্ঠরোগীও না!

লক্ষহীরা।

[চক্ষু মুদিত করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন···] উঃ উঃ·····[সহসা] হাঃ হাঃ হাঃ···আমি কি মাতাল হয়েছি! আমি কি পাগল!···এ যে স্বপ্ন!··· দুঃস্বপ্ন! [কপালের ঘাম মুছিয়া]···কে তুমি?

চন্দনদত্ত।

আমি চন্দনদত্ত। আমি তোমার সেই আদিম অসভ্য যুগের স্বামী।

লক্ষহীরা।

—সে যুগের স্বামীরা স্ত্রী নিয়ে কি কর্ত্ত?

চন্দনদত্ত।

—সম্পত্তি রূপে পরম আদরে রক্ষা কর্ত্ত। ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ কর্ত্ত। সভ্যতাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য, মানবের জয়-যাত্রায় সৈন্য সরবরাহ কর্ব্বার জন্য বংশবৃদ্ধি কর্ত্ত, বংশরক্ষা কর্ত্ত। ভালোবাস্‌তো। জীবনযাত্রার বিষ এবং মধু, সুখ এবং দুঃখ সমভাগে ভাগ করে নিয়ে জীবন-যাত্রাকে সহজ সরল সুন্দর সার্থক কর্ত্ত। পরস্পরে, পরস্পরের অক্ষমতার দিনে, পরস্পরকে সাহায্য কর্ত্ত, সেবা কর্ত্ত, শুশ্রূষা কর্ত্ত, লালন পালন ভরণ পোষণ কর্ত্ত। জরাতে, বার্দ্ধক্যে, এবং মৃত্যুতেও কেউ কাউকে পরিত্যাগ কর্ত্ত না। তাদের শবদেহ সৎকার কর্ত্তেও লোকের অভাব হ'ত না। মৃত্যুর পরও, তাদের জন্য, মর্ত্ত্যে, চোখের জল পড়তো!

লক্ষহীরা।

উপদেশ! উপদেশ! !···তুমি আমাকে তোমার সদুপদেশ শোনাচ্ছ! আমি আমার শপথ রক্ষা কর্ব্ব। আমি এখনি আমার মদের ভাণ্ডারীকে ডাক্‌ব···

চন্দনদত্ত।

—ক্ষণেক অপেক্ষা কর···।···শোন নারী, একদিন তুমি কামদেবের মন্দিরে আলুলায়িতা-কুন্তলা হয়ে বেদীমূলে প্রণাম করছিলে! পাশেই ছিলুম আমি। মুগ্ধনেত্রে আমি তোমার সেই কৃষ্ণ কেশদাম দর্শন করছিলুম।

লক্ষহীরা।

—সে তো প্রণাম নয়···সে আমার কৃষ্ণ কেশদামের বিজ্ঞাপন।···আমরা যে ঐ ছলেই ফাঁদ পাতি!···কিন্তু সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে।

চন্দনদত্ত।

কেন?

লক্ষহীরা।

তুমি আমার পাশে ছিলে আমি জানতুম না। প্রণাম করছি, এমন সময় পাশে এক অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনলুম।

আমি চমকে উঠে তাকাতেই তোমাকে দেখলুম !···ভাবলুম আর্ত্তনাদ স্বাভাবিক। তবু, এক সুযোগে তোমাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। তুমি কিন্তু কারণ বললে না !

চন্দনদত্ত।

হাঁ, বলিনি। কিন্তু, আজ কি বলব ?

লক্ষহীরা।

বল·····

চন্দনদত্ত।

···না ; থাক্।

লক্ষহীরা।

আমার লতাকুঞ্জে চারুদত্ত এক মর্ম্মর ঝর্না প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জ্যোৎস্না রাত্রে সেই ঝর্নার নৃত্য ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে। স্বপ্ন-মধুর সেই দৃশ্য !···যাবে ?

চন্দনদত্ত।

—না।···আমি তোমার পরিণাম ভাবছি !

লক্ষহীরা।

আবার পরিণামের কথা ?···না, আমি রাজাকে ডাকি··· সুরা আর পানপাত্র আসুক !

চন্দনদত্ত।

যে মুহূর্ত্তে রাজা এই কক্ষে পদার্পণ কর্ব্বেন সেই মুহূর্ত্তে·····

লক্ষহীরা।

হাঁ, সেই মুহূর্ত্তে···?

চন্দনদত্ত।

আমি সেদিন কেন আর্ত্তনাদ করে উঠেছিলুন, তার কারণ বলব !

লক্ষহীরা।

সে তো বেশ ভালো কথা !···এই, কে আছিস !··· রাজাকে ডেকে আন্···

চন্দনদত্ত।

যে মুহূর্ত্তে রাজা এই কক্ষে পদার্পণ কর্ব্বেন সেই মুহূর্ত্তে আমি বল্‌ব···

লক্ষহীরা।

বেশ, তখনো না হয় ব'লো, এখনো না হয় একবার বলো !···ওগো, বলো না শুনি !···কি বল্‌বে তুমি রাজার কাছে ?

চন্দনদত্ত।···

—বল্‌ব "দেবী ! তোমার ঐ অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর।"

লক্ষহীরা।

—ও হো—হো— ! [আর্ত্তনাদ করিয়া কৌচে লুটাইয়া পড়িলেন।]

চন্দনদত্ত।

ভয় নেই।···তোমার অসভ্যযুগের সেই স্বামী তোমাকে হাত ধরে···যেখানে জরামৃত্যুর ভয়ে মানুষ কেঁপে ওঠে না, যেখানে লোলচর্ম্মের বা তোমার ঐ অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠন-অন্তরালে লুক্কায়িত সেই এক গুচ্ছ শুক্ল কেশের জন্য আশঙ্কা নেই উদ্বেগ নেই,···আমি তোমাকে আমার সেই সংসারাশ্রমে নিয়ে যাব। তুমি আমার পুনর্ভূ বধূ হবে। আমার বধূকে অবগুণ্ঠন দিয়ে তার শুক্ল কেশ লুকিয়ে রাখতে হবে না। সংসারে কেশ যত শুক্ল হয়, প্রেম তত শুভ্র হয়। তোমার ঐ শুক্ল কেশ-গুচ্ছ, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় যে কত দীর্ঘকালের···তারই সুপ্রাচীন সাক্ষী। হে আমার যুগ-যুগান্তব্যাপী প্রেমের স্মারক-চিহ্ন !···ভয় কি ? ক্ষোভ কেন ?

লক্ষহীরা।

আমার হাত ধর···! আমায় নিয়ে চল···

চন্দনদত্ত।

—কিন্তু, তার পূর্ব্বে তোমাকে দিয়ে দাম্পত্য প্রেমের আর একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে রেখে যেতে চাই। পতিভক্তি যে কত উচ্চে উঠ্‌তে পারে যদি তা দেখাতে চাও, দেখ্‌তে চাও···, তবে, আমার সেই অনুরোধটি রক্ষা কর···

লক্ষহীরা।

বল···শীঘ্র বল···। তুমি যা বল্‌বে···আমি তা-ই কর্‌ব। তুমি আমায় নিয়ে চল···তুমি আমায় নিয়ে চল···

চন্দনদত্ত।

—নিয়ে যাব, আজই, এই রাত্রিতেই।···কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমাকে সেই কুষ্ঠ রোগীর সর্ব্ব কামনা পূর্ণ কর্ত্তে হবে···

লক্ষহীরা।

তাতে কার কি লাভ ?

চন্দনদত্ত।

সংসারের লাভ ! সংসারাশ্রমে···পতিভক্তির এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা !

লক্ষহীরা।

সে তুমি ভালো জানো। কিন্তু দেহমনের এই দোকান-দারি হ'তে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। সাজ সজ্জা ক'রে, মুখে রং মেখে, শুভ্র কেশগুচ্ছ অবগুণ্ঠনে ঢেকে ঢেকে আমি এত ক্লান্ত, এত শ্রান্ত···যে···আমি তাই মদ ধরেছি ! কোথায় তোমার সেই কুষ্ঠরোগী ? শেষ কর ..ইতি কর। আঃ···তার পর মুক্ত জীবন ! তোমার সেই শান্তস্নিগ্ধ সংসার ! সেখানে আবার আমি সেই বধূ টি ! যৌবন গেল, তাতে কি বা এল গেল ! স্বামি ! প্রভু ! প্রিয় !··· সত্যি ?···আমার যে আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। কোথায় তোমার সেই কুষ্ঠ-রোগী ? আমি আমার বিলাস কক্ষেই চললুম···তুমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে দাও !···হাঁ শেষ হোক্, ইতি হোক্।—তুমি এইখানেই আমার জন্য অপেক্ষা কর··· যেমন যুগে যুগে ক'রে এসেছ ! আমি ফিরে এলে তোমার চরণ দুখানি এগিয়ে দিয়ো···হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ো···

চন্দনদত্ত।

চলে গেল মনে হচ্ছে রাত্রি-শেষে চন্দ্রমা অস্ত গেল। তার পরই কি নবজীবনের প্রভাত-সূর্য্য উঠ্‌বে !···ও কে আসে ?···অদিতি ?···হাঁ, অদিতি।—অদিতি ! ভগিনি ! সার্থক তোমার স্বামিসেবা ! সার্থক তোমার নিষ্ঠা !··· লক্ষহীরা তোমার স্বামীকে গ্রহণ কর্ত্তে সম্মত হয়েছেন··· কিন্তু, এ কি !

অদিতি।

কি ভদ্র ?

চন্দনদত্ত।

তোমার কেশপাশ কই ? তুমি মুণ্ডিত-মস্তক কেন ভগিনি ?

অদিতি।

সজ্জাকর কালই বলেছিল···কিন্তু হাত দিয়েও তো ওঁর পা ধুয়ে তৃপ্তি পেতুম না, পাখা দিয়ে বাতাস ক'রেও আশ মিট্‌তো না ! ওঁর পা ধুয়ে মাথার চুল দিয়ে পা মুছে দিয়েছি, মুখে চোখে বাতাস করেছি ! তাই সজ্জাকরের স্বর্ণমুদ্রার প্রলোভনেও আমি ভুলি নি !···কিন্তু আজ এল আমার সব চাইতে বড় পরীক্ষা ! সে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হ'য়ে এলুম !··· এই আমার হাতে সজ্জাকরের স্বর্ণমুদ্রা·····

চন্দনদত্ত।

আজ যদি সত্যযুগ হ'ত, তবে তোমার ঐ মুণ্ডিত মস্তকে স্বর্গ হ'তে পুষ্প-বৃষ্টি হ'ত ! কিন্তু, সে যাক্।···আর বিলম্ব নয়···দর্শনী সে নেবে না···সে তার বিলাস কক্ষে তোমার স্বামীর প্রতীক্ষা করছে।···ঐ সোপান-পথ দিয়ে উঠে নির্ভয়ে তোমার স্বামীকে সেখানে রেখে এস···

অদিতি।

ওগো ! জাগো ! জাগো !

···জাগো-গো, জাগো !

* * * *

চন্দনদত্ত।

সবাই চলে গেল ! পড়ে রইলুম আমি ! সে সত্যই বলেছে যুগে যুগে আমি তার জন্য এমনি করেই প্রতীক্ষা করেছি ! আজ আমার সেই প্রতীক্ষার অবসান হবে ! ...অদিতি ! দেবি ! তুমিই আজ আমাদের এই নব জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছ ! তোমার পাতিব্রত্যের ভিত্তির উপর লক্ষহীরার নূতন সংসার গড়ে উঠুক...যুগে যুগে সীতা সাবিত্রীর মত তোমার জয়গান হোক্···কে !···তুমি !

লক্ষহীরা।

হাঁ, আমি। জয়গান হবে কার ?

চন্দনদত্ত।

জয়গান হবে সতীর !···জয়গান হবে তোমার ··তুমি রাজরাজেশ্বরী হয়েও অদিতির অলৌকিক পাতিব্রত্যকে জয়-মণ্ডিত করেছ তাঁর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীকে আলিঙ্গন দিয়ে···

লক্ষহীরা।

না···না···না ..

চন্দনদত্ত।

সে কি !

লক্ষহীরা।

এই বা কি ! সঙ্গে তার স্ত্রী ! স্ত্রী নিজে দেহপাত ক'রে স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করেছে তার স্বামীর কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌তে ! এই তোমাদের সতী ? এই 'সংসারের আদর্শ ?' ···তুমি সরে দাঁড়াও—তুমি চলে যাও...আমি বমি করব ! .. রাজা কোথায় ? সুরা কই ? পেয়ালা আনো...ঢালো !



সেকালের-শিক্ষা

শ্রীনির্ম্মলা দেবী

আমার লেখা, সেকালের গৃহিণীদিগের গৃহস্থালী, ও রোগ-চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলি "ভারতবর্ষে" স্থান পাইয়া প্রকাশ হওয়াতে অনেকে আমায় উৎসাহ দিয়াছেন। এ সকল আলোচনার মধ্যে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই,—যাঁহাদের চরণতলে এই সব ব্যবস্থা শিক্ষা ও শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহাদেরই শিক্ষা মত অশিক্ষিতা বঙ্গবধূ আমি আবার সেই সেকালের শিক্ষা ও সভ্যতার কথা আপনাদের জানাইতে সাহস করিলাম। আমি এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, সেকাল বলিয়া আমার কথা সেই খনা লীলাবতী, গার্গীযুগেরও নয়, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের কি পরের কথাও নয়। আমাদের ঠাকুরমাতা ও দিদিমাতা প্রভৃতির সময়ের ৬০।৭০ বৎসরের প্রাচীনাদের কথাই বলিতেছি। আজকাল আমাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় প্রত্যেক সহরেই, একাধিক বালিকা স্কুল আছে, কলিকাতার ত কথাই নাই। যেমন এখনকার মেয়েদের তুলনায় আমরা অশিক্ষিতা, তেমনই আমাদের সেকালের প্রাচীনাদের মধ্যে, কাহারও বা অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না; যদি বা তাঁহারা অতি কষ্টে একটু আধটু রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন, তবুও একালের তুলনায় তাঁহাদের অশিক্ষিতাই বলা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, দূরদর্শিতা, সভ্যতা, এখনকার শিক্ষিতা মহিলাদের অপেক্ষা কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যাশিক্ষার প্রধান গুণ বিনয়, নম্রতা, ভব্যতা ইত্যাদি। এখনকার ইংরাজী বাংলা প্রভৃতি লেখাপড়া শিক্ষার গুণে, উল্লিখিত গুণগুলি, সেকালের নিরক্ষরা প্রাচীনাদের অপেক্ষা আমাদের বৃদ্ধি পাইয়াছে কি? বরং মনে হয়, এ গুণগুলি তাঁহাদেরই বেশী ছিল। এই থেকেই মনে হয়, এ সমস্ত শিক্ষার সাধনা বি-এ, এম-এ পাশের উপর নির্ভর করে না, বংশ ও পিতা মাতার স্বভাব ও শিক্ষার ব্যবস্থায় বিনয়, নম্রতা, ভব্যতা, সততা শিক্ষা হয়। যদি প্রাচীনাদের উপযুক্ত পুত্র-কন্যাগণ, পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে ও তাঁহাদের উপদেশ পালনে তৎপর হন, তবে আবার তাঁহাদের পুত্র-কন্যারা উক্ত শিক্ষা অনুযায়ী চলিতে শিক্ষাও করেন, বুড়ো বুড়ীর কথা অগ্রাহ্য করিবার শক্তিও তাঁহাদের থাকে না। যদি বা স্বভাব ও বয়সদোষে একটু আধটু ব্যতিক্রম দেখা যায়, অল্প বয়সেই সুধরাইবার সুযোগও পিতা মাতা পান। গৃহের শিক্ষাই আসল শিক্ষা; আর বালক-বালিকার কোমল অন্তরে যাহা গাঁথা হয়, বয়সেও তার প্রভাব কম থাকে না। আমাদের বাল্যকালে খৃষ্টান মিসনরা টিচারেরা এটিকেট্ শিক্ষা দিতেন,—দেখ মেয়েরা, মাননীয় কেহ স্কুলে আসিলে তৎক্ষণাৎ বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া

তাঁহাকে সম্মান করিবে, হাসি পাইলে মুখে হাত দিয়া উচ্চ হাসি নিবারণ করিবে, কাহাকেও দেখাইয়া অপর সহচরীর কানে কানে কোনও কথা ফিস্ ফিস করিয়া বলিও না; সে মনে করিবে, তাহার নামেই বলিতেছ ইত্যাদি। এখন কথা এই, যাঁহারা আমাদের মঙ্গলের জন্যই শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিতা (অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ পাশ); কিন্তু আমাদের ঘরেও নিরক্ষরা প্রাচীনাদের নিকট উহারই অনুরূপ শিক্ষা পাইতাম। ইহা হইতেই সেকালের সভ্যতার ধারা পাওয়া যায়, তাঁহাদের শিক্ষা ও ভব্যতার দুএকটী উদাহরণ দিতে চেষ্টা করিলাম। অবশ্য বালক ও বালিকার শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। বালিকাকে কালে শ্বশুরালয়ে যাইয়া পরের মন যোগাইতে হয়; যাহাতে বংশের সুনাম ও নিজের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থাই সেকালের গৃহিণীরা করিতেন। আমরা উপদেশ পাইতাম,—কোনও পূজনীয় সম্মানার্হ লোকের আগমনকালে উচ্চ জায়গায় (বা চৌকি খাট, চেয়ার ইত্যাদি) যদি বসিয়া থাক, তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে আসন দিবে, ও পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। স্থান কাল ও গুরু-বিশেষে অঞ্চল দিয়া স্থান মার্জ্জনা করিয়া আসন পাতিবার শিক্ষা পাইতাম, গলায় অঞ্চল দিয়াও প্রণাম করিতে হইবে। আবার যখন নববধূবেশে শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে যাইবে, সেখানে শাশুড়ী ননদ, ও বড় যায়ের অনুমতি ব্যতীত যে কোনও আগন্তুক অতিথি, ও আত্মীয়ার সহিত কথা না বলিয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া মৌন থাকিও; তবে তাঁহাদের উপযুক্ত আসন, জল, পান ইত্যাদি দিতে ত্রুটী করিও না। যদি গুরুজন অন্যায়ও বলেন বুঝিতে পার, তবুও প্রতিবাদ করিবে না। বাল্যকালে, তাঁহারা ভয় দেখাইয়া নীতি শিক্ষা দিতেন। আহার-কালে পা ছড়াইয়া বসিও না, দূরদেশে বিবাহ হইবে; থালা নাড়িও না, স্বামীর সহিত ঝগড়া হইবে; পা নাচাইও না, অলক্ষণ; গা দুলাইও না; উচ্চহাস্য করিও না; উচ্চস্বরে কথা বলিও না, গলা মোটা হইবে; পান খাইও না, তোতলা হইবে। আহারের পর বসিয়া আঁচাইবে, ধীরে ধীরে কুলকুচা করিবে (পাছে কাহারও গায়ে ছিটা লাগে)। প্রাতঃকালে বাসিমুখ না ধুইয়া দন্ত পরিষ্কার না করিয়া জলখাবার খাইতে পাইবে না। ভাল করিয়া মাথায় ও গায়ে তেল মাখিয়া স্নান করো, নাভিদেশে পায়ের তলায় নখের মাথায় তেল দাও, ইত্যাদি। কলা বৌয়ের মত অবগুণ্ঠন কেহই এখন পছন্দ করেন না, নববধূরাও সকলের সহিত কথাবার্ত্তাও বলেন, এখনকার গৃহিণীরাও ইহাতে তত দোষ মনে করেন না। ঘোমটা টানা এখন হাসির কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে (বিশেষ সহরে)। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, কেন, সেকালের দূরদর্শী বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা বধূকে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে রাখিতে বাধ্য হইতেন। এ প্রথা হইতেও তাঁহাদের মঙ্গল কামনা ও ভব্যতা শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখিতে পাইবেন। কথাটী একটু বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। সহর কলিকাতার কথা একটু স্বতন্ত্র, এখানে এমন স্থান অধিকাংশ আছে যে বাটীর পার্শ্বে অপর বাটীর লোকের বিপদেও অনেকে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন;—কিন্তু অন্যান্য সহরে, বিশেষ পল্লীগ্রামে, কাহারও বাটীতে নববধূর আগমনে, বিশেষ করিয়া তাহারই রূপ-বর্ণনা ও গুণ-আলোচনাই সকল সময় চলিতে দেখা যায়। সে অবস্থায়, সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা বধূ, কাহাকে কেমন সম্মান প্রদর্শন করিবে, কে কি চরিত্রের লোক তাহা বুঝেও না; হয় ত বা কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে, কাহাকেও বা ন্যায্য প্রাপ্য আদর, সম্মান সহকারে কথা বলিতে পারিবে কি না, অথবা একদেশ হইতে আগতা বধূ অন্য দেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কি বলিয়া বসিবে; তাহাতে বধূর নিন্দার প্রসারটা বৃদ্ধিই পাইবে; হয় ত বা বালিকা-সুলভ চপলতায় কোন হাসির কথায় উচ্চহাস্য করিয়া ফেলিবে। ইহা অপেক্ষা অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বধূকে তাঁহারা নিরাপদে রাখাই শ্রেয় মনে করিতেন। ধোপানী, নাপিতনী, কাহারও বাটীর আগন্তুক দাসীর সহিতও কথা বলা নিষেধ ছিল। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদেরই এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া নিন্দা প্রচারের সুবিধা বেশী। এখন বলুন দেখি, এ ব্যবস্থাগুলি, তাঁহারা কি মন্দ করিতেন? অবশ্য পরে বধূরা দুই তিন পুত্র কন্যার জননী হইলে অনেকের সহিত কথা কহিবার অনুমতি ও সুবিধা পাইতেন। ইহাও সুব্যবস্থা—কেন না নববধূর আগমন-কালে, প্রথম প্রথমই নবাগতার নিন্দা সুখ্যাতিটা বেশী প্রচার হইতে থাকে; পুরাতনে সে সব আলোচনা অধিক থাকে না। প্রথম



সেকালের-শিক্ষা

শ্রীনির্ম্মলা দেবী

আমার লেখা, সেকালের গৃহিণীদিগের গৃহস্থালী, ও রোগ-চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলি "ভারতবর্ষে" স্থান পাইয়া প্রকাশ হওয়াতে অনেকে আমায় উৎসাহ দিয়াছেন। এ সকল আলোচনার মধ্যে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই,—যাঁহাদের চরণতলে এই সব ব্যবস্থা শিক্ষা ও শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহাদেরই শিক্ষা মত অশিক্ষিতা বঙ্গবধূ আমি আবার সেই সেকালের শিক্ষা ও সভ্যতার কথা আপনাদের জানাইতে সাহস করিলাম। আমি এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, সেকাল বলিয়া আমার কথা সেই খনা লীলাবতী, গার্গীযুগেরও নয়, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের কি পরের কথাও নয়। আমাদের ঠাকুরমাতা ও দিদিমাতা প্রভৃতির সময়ের ৬০।৭০ বৎসরের প্রাচীনাদের কথাই বলিতেছি। আজকাল আমাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় প্রত্যেক সহরেই, একাধিক বালিকা স্কুল আছে, কলিকাতার ত কথাই নাই। যেমন এখনকার মেয়েদের তুলনায় আমরা অশিক্ষিতা, তেমনই আমাদের সেকালের প্রাচীনাদের মধ্যে, কাহারও বা অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না; যদি বা তাঁহারা অতি কষ্টে একটু আধটু রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন, তবুও একালের তুলনায় তাঁহাদের অশিক্ষিতাই বলা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, দূরদর্শিতা, সভ্যতা, এখনকার শিক্ষিতা মহিলাদের অপেক্ষা কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যাশিক্ষার প্রধান গুণ বিনয়, নম্রতা, ভব্যতা ইত্যাদি। এখনকার ইংরাজী বাংলা প্রভৃতি লেখাপড়া শিক্ষার গুণে, উল্লিখিত গুণগুলি, সেকালের নিরক্ষরা প্রাচীনাদের অপেক্ষা আমাদের বৃদ্ধি পাইয়াছে কি? বরং মনে হয়, এ গুণগুলি তাঁহাদেরই বেশী ছিল। এই থেকেই মনে হয়, এ সমস্ত শিক্ষার সাধনা বি-এ, এম-এ পাশের উপর নির্ভর করে না, বংশ ও পিতা মাতার স্বভাব ও শিক্ষার ব্যবস্থায় বিনয়, নম্রতা, ভব্যতা, সততা শিক্ষা হয়। যদি প্রাচীনাদের উপযুক্ত পুত্র-কন্যাগণ, পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে ও তাঁহাদের উপদেশ পালনে তৎপর হন, তবে আবার তাঁহাদের পুত্র-কন্যারা উক্ত শিক্ষা অনুযায়ী চলিতে শিক্ষাও করেন, বুড়ো বুড়ীর কথা অগ্রাহ্য করিবার শক্তিও তাঁহাদের থাকে না। যদি বা স্বভাব ও বয়সদোষে একটু আধটু ব্যতিক্রম দেখা যায়, অল্প বয়সেই সুধরাইবার সুযোগও পিতা মাতা পান। গৃহের শিক্ষাই আসল শিক্ষা; আর বালক-বালিকার কোমল অন্তরে যাহা গাঁথা হয়, বয়সেও তার প্রভাব কম থাকে না। আমাদের বাল্যকালে খৃষ্টান মিসনরী টিচারেরা এটিকেট্ শিক্ষা দিতেন,—দেখ মেয়েরা, মাননীয় কেহ স্কুলে আসিলে তৎক্ষণাৎ বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া

তাঁহাকে সম্মান করিবে, হাসি পাইলে মুখে হাত দিয়া উচ্চ হাসি নিবারণ করিবে, কাহাকেও দেখাইয়া অপর সহচরীর কানে কানে কোনও কথা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিও না; সে মনে করিবে, তাহার নামেই বলিতেছ ইত্যাদি। এখন কথা এই, যাঁহারা আমাদের মঙ্গলের জন্যই শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিতা (অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ পাশ); কিন্তু আমাদের ঘরেও নিরক্ষরা প্রাচীনাদের নিকট উহারই অনুরূপ শিক্ষা পাইতাম। ইহা হইতেই সেকালের সভ্যতার ধারা পাওয়া যায়, তাঁহাদের শিক্ষা ও ভব্যতার দুএকটী উদাহরণ দিতে চেষ্টা করিলাম। অবশ্য বালক ও বালিকার শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। বালিকাকে কালে শ্বশুরালয়ে যাইয়া পরের মন যোগাইতে হয়; যাহাতে বংশের সুনাম ও নিজের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থাই সেকালের গৃহিণীরা করিতেন। আমরা উপদেশ পাইতাম,—কোনও পূজনীয় সম্মানার্হ লোকের আগমনকালে উচ্চ জায়গায় (বা চৌকি খাট, চেয়ার ইত্যাদি) যদি বসিয়া থাক, তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে আসন দিবে, ও পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। স্নান কাল ও গুরু-বিশেষে অঞ্চল দিয়া স্থান মার্জ্জনা করিয়া আসন পাতিবার শিক্ষা পাইতাম, গলায় অঞ্চল দিয়াও প্রণাম করিতে হইবে। আবার যখন নববধূবেশে শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে যাইবে, সেখানে শ্বাশুড়ী ননদ, ও বড় যায়ের অনুমতি ব্যতীত যে কোনও আগন্তুক অতিথি, ও আত্মীয়ার সহিত কথা না বলিয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া মৌন থাকিও; তবে তাঁহাদের উপযুক্ত আসন, জল, পান ইত্যাদি দিতে ত্রুটী করিও না। যদি গুরুজন অন্যায়ও বলেন বুঝিতে পার, তবুও প্রতিবাদ করিবে না। বাল্যকালে, তাঁহারা ভয় দেখাইয়া নীতি শিক্ষা দিতেন। আহার-কালে পা ছড়াইয়া বসিও না, দূরদেশে বিবাহ হইবে; থালা নাড়িও না, স্বামীর সহিত ঝগড়া হইবে; পা নাচাইও না, অলক্ষণ; গা দুলাইও না; উচ্চহাস্য করিও না; উচ্চস্বরে কথা বলিও না, গলা মোটা হইবে; পান খাইও না, তোতলা হইবে। আহারের পর বসিয়া আঁচাইবে, ধীরে ধীরে কুলকুচা করিবে (পাছে কাহারও গায়ে ছিটা লাগে)। প্রাতঃকালে বাসিমুখ না ধুইয়া দন্ত পরিষ্কার না করিয়া জলখাবার খাইতে পাইবে না। ভাল করিয়া মাথায় ও গায়ে তেল মাখিয়া স্নান করো, নাভিদেশে পায়ের তলায় নখের মাথায় তেল দাও, ইত্যাদি। কলা বৌয়ের মত অবগুণ্ঠন কেহই এখন পছন্দ করেন না, নববধূরাও সকলের সহিত কথাবার্ত্তাও বলেন, এখনকার গৃহিণীরাও ইহাতে তত দোষ মনে করেন না। ঘোমটা টানা এখন হাসির কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে (বিশেষ সহরে)। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, কেন, সেকালের দূরদর্শী বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা বধূকে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে রাখিতে বাধ্য হইতেন। এ প্রথা হইতেও তাঁহাদের মঙ্গল কামনা ও ভব্যতা শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখিতে পাইবেন। কথাটী একটু বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। সহর কলিকাতার কথা একটু স্বতন্ত্র, এখানে এমন স্থান অধিকাংশ আছে যে বাটীর পার্শ্বে অপর বাটীর লোকের বিপদেও অনেকে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন;—কিন্তু অন্যান্য সহরে, বিশেষ পল্লীগ্রামে, কাহারও বাটীতে নববধূর আগমনে, বিশেষ করিয়া তাহারই রূপ-বর্ণনা ও গুণ-আলোচনাই সকল সময় চলিতে দেখা যায়। সে অবস্থায়, সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা বধূ, কাহাকে কেমন সম্মান প্রদর্শন করিবে, কে কি চরিত্রের লোক তাহা বুঝেও না; হয় ত বা কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে, কাহাকেও বা ন্যায্য প্রাপ্য আদর, সম্মান সহকারে কথা বলিতে পারিবে কি না, অথবা একদেশ হইতে আগতা বধূ অন্য দেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কি বলিয়া বসিবে; তাহাতে বধূর নিন্দার প্রসারটা বৃদ্ধিই পাইবে; হয় ত বা বালিকা-সুলভ চপলতায় কোন হাসির কথায় উচ্চহাস্য করিয়া ফেলিবে। ইহা অপেক্ষা অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বধূকে তাঁহারা নিরাপদে রাখাই শ্রেয় মনে করিতেন। ধোপানী, নাপিতনী, কাহারও বাটীর আগন্তুক দাসীর সহিতও কথা বলা নিষেধ ছিল। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদেরই এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া নিন্দা প্রচারের সুবিধা বেশী। এখন বলুন দেখি, এ ব্যবস্থাগুলি, তাঁহারা কি মন্দ করিতেন? অবশ্য পরে বধূরা দুই তিন পুত্র কন্যার জননী হইলে অনেকের সহিত কথা কহিবার অনুমতি ও সুবিধা পাইতেন। ইহাও সুব্যবস্থা—কেন না নববধূর আগমন-কালে, প্রথম প্রথমই নবাগতার নিন্দা সুখ্যাতিটা বেশী প্রচার হইতে থাকে; পুরাতনে সে সব আলোচনা অধিক থাকে না। প্রথম

আসিয়া যে সৌভাগ্যবতী বধূ প্রতিবেশীর সুখ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হয়, তাহার সম্বন্ধে সকলেরই একটা ভাল ধারণা থাকিয়া যায়; তারপর বেশী আঁটাআঁটী না করিলেও চলে। আমরা বাল্যে শিক্ষা পাইতাম, শ্বশুরালয়ে প্রাতঃকালে উঠিয়া শয্যাত্যাগ-কালে স্বামীকে প্রণাম করিয়া গৃহের বাহিরে আসিবে,—এবং শ্বশুর, শ্বাশুড়ি ও গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিবে। পুরাতন দাসী একটু মুখরা হয়; যদি সে-রকম দাসী তোমায় কোন কথা বলে, ও তিরস্কারও করে, তবু দাসী মাত্র ভাবিয়া তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে যাইও না। ইহাদের নিকটে অনেকে বধূর দোষ-গুণ শুনিতে পায়। পুরুষ চাকর, ও পাচকের সঙ্গেও কথা বলা নিষেধ ছিল। সেকালের গৃহিণীদের ভব্যতা সভ্যতা ত ছিলই, আর বিনয়, নম্রতা এই সব গুণগুলি আমাদের অপেক্ষা তাঁহাদেরই বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়। এ কথা বলিলাম, ইহা হইতে যেন কেহ না মনে করেন যে, আমি বলিতে চাহিতেছি—সেকালে সকলেরই এই গুণগুলি ছিল, একালের শিক্ষিতা মেয়েদের কাহারও এ গুণ নাই। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, একালে অনেক বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াও আমাদের মধ্যে সকলের যে গুণ থাকে না, সেই গুণ, নিরক্ষরা কিম্বা অক্ষর-মাত্র-পরিচয়-জ্ঞানবিশিষ্টা প্রাচীনারা অনেকেই সহজে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এখন অনেক মেয়ে নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা দেখাইতে গিয়া শ্বশুরবাটীর অপ্রিয়া হন। "আমি কাহাকেও ভয় করি না" এ ভাবটী এখন অনেক স্থলে দেখা যায়। সেকালের প্রাচীনারা এইটী পছন্দ করিতেন না। এই বিংশ শতাব্দীর এটিকেটের তুলনায় সেকালের সভ্যতা ও শিক্ষা খাপ না খাইলেও, তাঁহাদের অসভ্য বলা যায় না। তাঁহাদের স্মৃতিশক্তি কিরূপ ছিল বিবেচনা করুন। এখন প্রত্যেক গৃহেই বাংলা লেখাপড়া-জানা মহিলা আছেনই। ঘরে পাঁজী থাকিলে, কোন্ দিন কি তিথি, কি বার, পড়িয়া দেখিলেই জানিতে পারেন; কিন্তু তখন ত সকলে পড়িতেও পারিতেন না; এক দিন কোন তিথি জানিয়া, বরাবর ঠিক মুখে মুখে হিসাব রাখিতেন, আবার তিথির হ্রাস বৃদ্ধির জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া ঠিক রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। আবার কোন্ তিথিতে কি খাওয়া উচিত কি অনুচিত, বিদ্বান পুরুষ অপেক্ষা সেই নিরক্ষরাদের নিকটেই সঠিক সংবাদ পাইতে পারিবেন। তা ছাড়া সংসারের খুঁটী, নাটী, তুক্, তাক্, কোন্ পূজার কয়খানি নৈবেদ্য, বিবাহের সময়ে দেশ-ভেদে গোত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহার, সমস্ত খবরই তাঁহাদের নিকট পাইবেন। এখনকার গৃহিণীদেরও এই সব বিষয়ে এখনও সেই অশীতিবর্ষীয় প্রাচীনাদের নিকট ব্যবস্থা লইতে ছুটিতে হয়।

সংসার চালানোর মিতব্যয়িতা ও খুঁটী নাটী বিষয়ে এবং কোন্ মাসে, কি বারে, কি তিথিতে কি কি আহার করিতে নাই, একেবারে যে ঠিক রাখা কত দূর কঠিন কাজ, এখনকার অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন না। আমাদের একে মনে থাকে না, আর যদিই বা থাকে, ও-সব অবহেলার যোগ্যই মনে করি। এখন অনেক সুধী বিদ্বান পণ্ডিত, শাস্ত্রকার, ডাক্তার, বৈদ্য, আমাদের সেই প্রাচীনকালের আহার-বিহারে শত সাবধানতা, শরীরের পক্ষে উপকারী বলিয়া নূতন করিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এই যে ফাল্গুন, চৈত্র মাসে নিমপাতা খাওয়া খুবই উপকারী, ইহা ত তাঁহারা অনেকদিন পূর্ব্বেই জানিতেন, আর পুঁথী পাঁজী না দেখিয়াই ব্যবস্থা দিতেন। বলিতে শুনিয়াছি, জ্যৈষ্ঠ মাসে বেল খাইও না, বসন্তের প্রকোপ যে সময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; করলা, উচ্ছে খাও। আমার পিত্রালয় মুর্সিদাবাদ জেলায় বরাবর বসন্ত রোগটী অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বেশীই হইয়া থাকে; ওলাউঠাও খুব বেশী। ৩০ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও আমার বৃদ্ধা ঠাকুরমাতা, বসন্তের সময় হরিতকীর আঁটি আমাদের সকলের হাতে বাঁধিয়া দিতেন। তা ছাড়া ঐ সময়ে আমাদের সকলের অঞ্চলে এক টুকরা কর্পূর বাঁধিয়া, সেইটী মধ্যে মধ্যে আঘ্রাণ লইবার হুকুম করিতেন। ভাতের সঙ্গে তিন চারিখানি লেবুর ফালি সকলকে খাইতে দিতেন;—এখনকার বিচক্ষণ ডাক্তারেরাও এ ব্যবস্থার শুভফল স্বীকার করেন। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি, তাঁহারা শুধু গৃহস্থালী গুছাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, গো-সেবা, ছোট রকম তরি-তরকারীর বাগানের দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইত। আমাদের একটী পাতিলেবুর গাছ ছিল; তাহাতে কিছুদিন একটী ফুল কিম্বা লেবু হইতে দেখি নাই। আমার ঠাকুরমাতা অনেকদিন দেখিয়া একদিন চাকরকে দিয়া, গাছের লম্বা লম্বা ডগ্‌গুলি কাটাইলেন। বলা বাহুল্য, গাছটী বেশ বড় ও সতেজ ছিল। পরে বড় বড়

অসংখ্য ইটের টুকরা (ঢিল) কাপড়ের পাড় দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া গাছের ডালে ডালে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দিলেন। তাহাদের ভারে গাছটী খানিক নুইয়া পড়িল। তাঁহার এই কাজে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—ছয়মাসের মধ্যে গাছটী একেবারে ফুলে ভর্ত্তি হইয়া গেল, এবং সেই লেবু গাছে বার মাসই লেবু ফলিতে লাগিল।

সেকালের গৃহিণীরা যে এখনকার গৃহিণীদের অপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন, সে কথা একবার বলিয়াছি। আমার মনে হয়, আমাদের এখনকার মেয়েদের তুলনায় তাঁহাদের মেধা, স্মৃতিশক্তিও বেশী ছিল। আমরা এখন যতই ইংরাজী বাংলা বিদ্যায় পারদর্শী ও শিক্ষিতা হই না কেন, তবু মনে হয় বিদ্যার গুণে জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইলেও তাঁহাদের মত সংসারের সব বিষয় মনে রাখিয়া নানারূপ ব্যবস্থা করিতে পারি কই।

আমরা সেকালের গৃহিণীদের তুলনায় মুখস্থ-বিদ্যায় অধিক শিক্ষিতা হইতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের সময় ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষার সুবিধা ও রীতি পদ্ধতি ছিল না বলিয়াই তাঁহারা বেশী লেখাপড়া জানিতেন না। আমরা শিক্ষালাভ করিলেও ভগ্নস্বাস্থ্য ও নানা জটিল রোগে ভুগিয়া কার্য্যকরী শক্তি হারাইয়া ফেলি, এবং অল্পেই বিরক্ত হইয়া নানা ভ্রমে পতিত হই। আরও, অল্পবয়সে অনেকগুলি সন্তানের মাতা হইয়া সাংসারিক বুদ্ধি ও গৃহস্থালী গুছাইবার ক্ষমতাও থাকে না। অভিজ্ঞা গৃহিণীদিগের পরামর্শও বোধ হয় অন্তরের সহিত সকলে গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত, রোগের নানাবিধ টোট্‌কা-টুট্‌কী ঔষধ, উদ্ভিদবিদ্যার পুঁথি না পড়িয়াই সে বিষয়ে সহজ জ্ঞান, গো-সেবা দেব-সেবা, অতিথি-বৎসলতা, ভব্যতা, শিক্ষা ইত্যাদির কথা শুনিলে ও দেখিলে কি স্বতই মনে হয় না যে তাঁহারা শিক্ষিতা, না আমরা বেশী শিক্ষিতা? সেকালের গৃহিণীদিগের নামে আরও একটী অনুযোগ এখন শুনিতে পাই। তাঁহারা নাকি স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন দেখিলেই "বেহায়া" আখ্যা দিয়া তাহা নিবারণের চেষ্টা করিতেন। এখন দেখা যাক্, কথাটা কি? সত্য বটে, একালের ন্যায় সর্ব্বসমক্ষে স্বামীর সম্মুখে বসিয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করা ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুগৃহে স্বপ্নের অগোচর ছিল। দিনমানে ও সন্ধ্যাকালে, স্বামীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎও কঠিন ছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তাহার ভিতর সবই দোষের ছিল, ইহা বলা যায় না; তখনকার পদ্ধতি, প্রতিবেশীদিগের নিন্দা ভয় ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের তত দোষ দেওয়া যায় না। গৃহের বধূর নিন্দা শুনিতে কাহারও ভাল লাগে না। এখনকার অবাধ-মিলনে যে ভালবাসা, প্রেম, শ্রদ্ধা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থাপিত হয়, তখনকার সেই নির্জ্জন রাত্রিতে অবগুণ্ঠনবতী বেপথুমতী বধূ দীপহস্তে ধীরে ধীরে অভিসারিকারূপে ভীত চকিত দৃষ্টি মেলিয়া সাবধানে স্বামীর সন্নিধানে গমন করিলেও, প্রেম, শ্রদ্ধার অভাব ঘটিত না;—দিনমানে সদাসর্ব্বদা নববধূ স্বামীর সহিত মিলিত থাকিলে ননপ্রণয়ের মধুর মোহ, বেশী দিন থাকিতে পারে না। সুলভ অপেক্ষা দুর্লভ দ্রব্যেই লোকের আকাঙ্ক্ষা বেশী হয়। গোপন জিনিসের মোহময় মাদকতা বেশী, এ কথা বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "চোখের বালি"তে মহেন্দ্র ও আশার দিবারাত্রি অবাধ মিলনকালে, ক্রমশঃ অস্বস্তি ও তৃতীয় মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই যে সমস্ত দিন দুইটী উন্মুখ অন্তর পরস্পর পরস্পরের আশা-কামনায় কাটাইয়া ঈপ্সিত মিলন যে কত সুখের, কত আনন্দের, তাহা আমাদের কালে দেখিতে না পাইলেও বুঝিতে পারি। এমন কথা আমি বলিতে চাহিতেছি না, এবং যেন কেহ মনে না করেন, সেকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভাব ছিল, এখন তাহা হয় না। না, এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য তাহা নহে। তবে সেকালের গৃহিণীদের ইহাতে তত দোষ না ধরাই আমার কথা। কেহ কেহ এই হইতে এবং আরও নানা কারণে, তখনকার শ্বাশুড়িরা বউকাঁটকী ছিলেন, এ অপবাদও দেন। এ কথায় বলি, ভাল আর মন্দ, এই কথাটী ও জিনিসটী সর্ব্বকালে, সর্ব্বযুগেই আছে; সেকালেও যেমন "দজ্জাল" শ্বাশুড়িও ছিলেন, আবার মাতৃসমাও ছিলেন, অনুসন্ধান করিলে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিছু কষ্ট না পাইলে কথায় কথায় কেরোসিনে পুড়িয়া মরা পদ্ধতিটী আজ কাল প্রচলিত প্রথার মত দাঁড়াইত না। তবে একালের মেয়েরা যে অসহিষ্ণু, এই পুড়ে-মরা ব্যাপার হইতে তাহাও বুঝা যায়। সর্ব্বশেষে আমার নিবেদন, কোন ভগিনী ও পাঠকবর্গ যেন না মনে

করেন যে,আমি সেকালের শিক্ষা, ও সভ্যতা লইয়া যে সামান্য কথা তুলিয়াছি,ইহাতে একালের মেয়েদের নিন্দা করিতেছি। না, তাহা আমি করিতে বসি নাই। বরঞ্চ এই কথা জানাইতে গৌরব অনুভব করিতেছি যে, একালে যাঁহারা নানারূপ শিক্ষায় নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির সুবিধা পান, তাঁহাদের বিনয়, নম্রতা, উদারতা, সভ্যতা, প্রভৃতি গুণগুলি থাকা ত কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের কথা নহে, বরং ইহার বিপরীত ভাব দেখিলে মুখস্থ বিদ্যা ও শিক্ষার দোষের কথা স্বতঃই মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু নিরক্ষরা বা কোনও স্থলে অক্ষরমাত্র পরিচয়-জানা, প্রাচীনা গৃহিণীদিগের উচ্চ শিক্ষার অনুরূপ জ্ঞান, সহজ বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতিশক্তি সভ্যতা, ভব্যতার বিষয় অনুধাবনপূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিলে, তাঁহাদেরই বংশের কন্যা বধূ আমরা, আমাদের সকলেরই কি গৌরব বোধ হইতে পারে না ?

রামকৃষ্ণ

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

হে রামকৃষ্ণ পরমহংস
মুগ্ধ ভারত এসেছে আজ,
ঢালিতে তোমার পূত চরণে
স্নিগ্ধ-ভকতি-কুসুম-লাজ।
তোমার উজল মূরতি-আলোকে
দীপ্তি উঠিছে ফুটি'
পুঞ্জিত যত সুপ্তির ঘোর
পরশে তাহার টুটি
শিক্ষা তোমার শিষ্য যেদিন
ফুটাল সাগর-তীরে
স্তব্ধ বিশ্ব, হীরক কিরীট
শোভিল ভারত-শিরে
জ্ঞানের পুণ্য-নিঝর-ধারায়
রচিলে স্বর্গ মর্ত্ত্য-মাঝ
ধন্য ধরণী বন্দি তোমারে
ধন্য তুমিও হে রাজরাজ।

(২)

নবীন যুগের হে গুরু সাধক,
বিশ্ব প্রণত তোমার দ্বারে
সঙ্গীত তব ঝঙ্কারে আজি
মহামানবের হৃদয় তারে,—
উঠেছিল যাহা এক দিন হেথা
শাক্য-কণ্ঠে করুণ সুরে
উঠেছিল পুনঃ শঙ্কর গানে
গম্ভীর তানে জগৎজুড়ে
উঠিল যে গান নিমাই-কণ্ঠে
তৃপ্ত করিয়া সবার মর্ম্ম,
সিক্ত ধরণী মুক্তি গাথায়
লভিল সে মহান 'প্রেম-ধর্ম্ম'।

(৩)

ভারতের সেই দূর প্রাক্তনে
উঠেছিল যত মধুর সুর
শত লাঞ্ছনা অত্যাচারের
বহ্নি শিখায় গেছিল দূর,
কোন্ সে সুদূর প্রাঙ্গণ হ'তে
উদিলে হে দেব, ভারতে দীন,
শুনাতে আবার মধুর ছন্দে
তুলে নিলে তব মুরজ বীণ।
উদ্ভাসি তব কণ্ঠে মধুর
মিনার-মঠের সাম্যগান
গীতোপনিষদ্-খৃষ্ট-বুদ্ধ
একই গাথায় বেদ কোরাণ।
কঠিন দুরূহ দর্শন যত
প্রাঞ্জল করি তোমার তুলি
ব্যাস-পাতঞ্জল-গোতম-কনাদ
জৈমিনী-কপিল দেখাল খুলি।
দখিণেশ্বর মন্দির তলে
স্নিগ্ধ পঞ্চবটীর মূলে
শিখালে নবীন যুগের ধর্ম্ম
চির-পবিত্র জাহ্নবী-কূলে!

(৪)

হে রামকৃষ্ণ পরমহংস
রিক্ত ভারত দৃপ্ত আজ
ভক্তি-অর্ঘ্য-দীপ্ত-রাগ
ঢালিছে চরণে কুসুম-লাজ।

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

অগ্রহায়ণ মাস। তখন রাত্রি ১১টা কি আরও বেশী হইবে। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কেবল ঝিঁঝিঁ পোকা তার সেই চির-পুরাতন একঘেয়ে তারস্বরে আঁধারের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কাঁদিতেছে না গাহিতেছে কে জানে! খড়দহ বাঁড়ুজ্যেপাড়ার একটা ভাঙ্গা ইট-বার-করা একতলা পুরানো বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে দিতে একটা লোক নিম্নস্বরে ডাকিল—"কলি, ও কলি"। চতুঃপার্শ্বে গাছ-গাছড়া, লতায় পাতায় ঢাকা ঠাসাঠাসি অন্ধকারের মধ্যে জোনাকী পোকার হাট বসিয়াছে।

দরজাটার গায়ে একটা ভাঙ্গা রক। দেয়ালে কতক-গুলো ঘুঁটে দেওয়া আছে। তাহার একটু উঁচুতে একটা এক হাত-প্রমাণ ভাঙ্গা জানালা, আধখানা ভেজানো এবং বাকীটা একটা ছেঁড়া চট দিয়া ঢাকা হইয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইতেছিল একটা ক্ষীণ আলোক্-রেখা ও মৃদুকণ্ঠের করুণ সুর।

যে ডাকিতেছিল তার আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া ছিল একখানা চেক শালে। লোকটার বয়স বেশী নয়, মাত্র ২২।২৩ বৎসর হইবে, তবে তার চেহারাটী তাহাকে তার বয়স হইতে অনেকখানি আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। ভিতরে কাহারো সাড়া না পাইয়া সে বিরক্ত ভাবে দুই দরজার ফাটলে মুখ লাগাইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—ও কুলীন পিসি! শুনতে পাচ্চ না?

ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিল—কে?

আমি ধীরে, দরজা খোল।

একটী প্রদীপ হস্তে একজন বিধবা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রে ধীরু এত রাত্রে? লোকটা দরজার ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, হ্যাঁ—মাধু-খুড়ো মল্লেনপুর গেছে কলির জন্যে পাত্র ঠিক করতে। আজ রাত্রে ফিরবে না, বরং ২।১ দিন দেরীও হতে পারে। তাই আমায় খবর দিতে বলে গেছে।

বৃদ্ধা কহিল—তা দাদা রাত্তিরে না গিয়ে কাল সকালেও ত যেতে পারতো।

ধীরু বাধা দিয়া কহিল, ওগো না-না—খুড়ো সন্ধ্যাবেলায়ই গেছে। খবরটা আমায় দিতে বলেছিল সকাল সকাল—তা আর আমি পেরে উঠিনি। হরির মার জ্বরটা বিকারে দাঁড়িয়েছে কি না, তাই ডাক্তারকে ডাকতে শুকচরে গিছলুম।

"আহা বুড়ী আছে বলে' তাদের সংসারটা বজায় আছে রে! বুড়ী এখন ভালয় ভালয় এ যাত্রা রক্ষে পেলে হয়! হ্যাঁ পাত্র কোথায় বলছিলি?"

পাত্র হচ্ছে মল্লেনপুরের জমীদার জগদীশ মুখুজ্যে। সম্প্রতি তার বউ মারা গেছে। আজ বিকেলে নোড়-তলায় আমরা যখন বসে আছি, তখন কথায় কথায় কলির বিয়ের কথা উঠতেই, শিরোমণি কাকা এই সম্বন্ধের কথা বল্লেন। —জান ত, কাকা হচ্ছে তাদের কুলপুরোহিত। বাবু আবার আজ কালের মধ্যেই মহালে চলে যাবেন কি না, তাই মাধু-খুড়ো আজই শিরোমণি কাকাকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

বৃদ্ধা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—পাত্রের বয়স কত?

ধীরু একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, হ্যাঁ বামুণের পাত্রের আবার বয়সের একটা হিসেব-নিকেশ আছে না কি? ও ৪০।৫০ কিছুতেই বাধে না পিসি! কাঠামটা দাঁড়িয়ে থাকা পর্য্যন্ত—

বৃদ্ধা বাধা দিয়া কহিল—তবু ত তার একটা বয়স আছে।

—তা আর এমন কি—ধর না ৫০।৫৫ হ'তে পারে। তবে এ বিয়ে যদি হয় পিসি, কলির খুব বরাত-জোর বলতে হ'বে। বুঝলি কলি, একেবারে জমিদার-গিন্নী। তখন আমাদের তুই চিনতে পারলে হয়।

১৫।১৬ বছরের মেয়েটী ছিন্ন লেপখানা গায়ে জড়াইয়া তক্তার উপরে বসিয়া একটা উঁচু কাঠের উপর স্থাপিত

প্রদীপের আলোকে কি একখানা বই পড়িতেছিল। হঠাৎ সে হাসিবার ভঙ্গীতে মুখ তুলিয়া কহিল, সাফ্···এইবার তোমরা নিশ্চিন্ত হলে ধীরুদা.....কলি একেবারে জমিদার-গিন্নী! তোমার খেয়াল মেটাবার পয়সার জন্য আর কারুকে জ্বালাতন হতে হবে না! সে ভারটা আমিই নেব।

দেখছ পিসি, কলির কথা শুনছ! আমার পয়সা জোগাবেন উনি!—কেন রে?

কলি ওরফে কল্যাণী হাসিয়া কহিল—বাঃ রে, তুমি আমার এতখানি উপকার করছ, আর আমি তোমার কিছুই করব না বুঝি?

ধীরু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিল—তার মানে?

কল্যাণী তেমনি হাসিয়া কহিল—তার মানে হচ্ছে যে সকালে তোমার পিসী পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে হরি ভট্চাযের কাছে কেঁদে বলছিলেন যে, ধীরের জ্বালায় অস্থির হয়েছি। যে টাকা কয়টা ছিল, সে তা নয়ছয় করে উড়িয়ে দিল। মুখে আগুন ওর লেখাপড়া শেখায়। কোথায় দু পয়সা রোজগার করবে তা নয়—

ধীরু বাধা দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, আমি উড়িয়ে দিয়েছি? এই কথা বলেছে পিসি?—আচ্ছা দেখছি, ভজিয়ে দিতে হবে কিন্তু। ওঃ, আমার মা হলে সে কি এমনি পাড়ায়-পাড়ায় মিথ্যা নিন্দা করে বেড়াতে পারত?—আবার বলা হয় আঁতুড় থেকে মানুষ করেছি। ও সবাই সমান!

কল্যাণী মৃদুহাস্যে বলিল, বাঃ গো, লোকের বল্লেই বুঝি বড় দোষের হয়? বেটাছেলে রোজগার করবে না কিছু না—কেবল এ-আড্ডায়,সে আড্ডায় ঘুরে বেড়াবে, কার কি হল, এই সব বাজে কাজে—

বাধা দিয়া ধীরু কহিল, হ্যাঁ, হ্যাঁরে!—ধীরে আড্ডা দেয়, নেশা করে, চোর, জোচ্চোর, বদমাইস—তাকে আর তোরা বাড়ীতে ঢুকতে দিস্ না—ব্যস্—তাহলেই ত হ'ল? আমিও আর আস্‌ছি না—দুম দাম শব্দ করিয়া খটাস্ করিয়া দরজা খুলিয়া ধীরু একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। পশ্চাতে উচ্চ হাসির সঙ্গে কল্যাণীর স্বর ভাসিয়া আসিল, ও ধীরুদা শোন, যেও না—সব মিথ্যা কথা;—কিন্তু ধীরেন সে কথা কাণে না তুলিয়া ছেলেদের দম দেওয়া কলের গাড়ীর মত আঁকিয়া বাঁকিয়া আপনার মনে চলিয়া গেল।

দিগম্বরী কহিলেন, কেন ওকে রাগাস্ বলি। একে ও অভিমানী, হয় ত রাগ করে আর আসবে না।

কল্যাণী মৃদুহাস্যে কহিল, হ্যাঁ আসবে না আবার!

মা বলিলেন—যা দরজা বন্ধ করে আয়! কল্যাণী দরজা বন্ধ করিয়া আসিলে তাহার মা বলিলেন—আজ আর পড়ে না! আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়্।

কল্যাণী ছেঁড়া রামায়ণখানার পাতাগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল কেন সে ধীরুকে সে কথা বলিল! যদি সত্যই ধীরুদা আর তাহাদের বাড়ী না আসে! তা কি ধীরুদা পারে? আমার কথায় সে রাগ করে না। কিন্তু কেন?—এই কেনর মীমাংসা কল্যাণীর মনের মধ্যে উঁকি মারিতেই কল্যাণী লজ্জায় তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ চাপা দিল ও শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

ধীরু ঘোষেদের পুকুর ধার দিয়া অন্যমনস্কভাবে চলিয়াছে। একটা লোক অন্ধকার ভেদ করিয়া হন্ হন্ করিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া যাইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—কে?

লোকটা কহিল, "আমি হরি বাগ্দী!"

"হরে?—এত রাত্রে এদিকে কোথায় চলেছিস্ রে?"

আর দাদাঠাকুর—অদেষ্ট! মতেটা মরে গেছে।

ধীরু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, সে কি রে! কখন? দুপুরেও দেখে এসেছি একটু ভাল—এরি মধ্যে—বলিস্ কি রে?

হ্যাঁ, বিকেলের দিকটায় ভেদবমি কমে গেল; কিন্তু ছট্‌ফটানি বাড়তে লাগল। তারপর কাতরাতে কাতরাতে ব্যস্—হয়ে গেল!

তাই ত! বেচারার ত কেউ নেই-ও আর! তা' হলে—

কি করব দাদাঠাকুর, হাতেও একটা পয়সা নেই—আর এত রাত্রে কাউকে জোটাতেও পারছি না—থাকবার মধ্যে আমি আর ভজা ব্যাটা!

সে ত কাণা!···তাকে দিয়ে কি হবে?

কি আর করি···তাকেই মড়ার কাছে বসিয়ে রেখে আমি লোক খুঁজতে বেরিয়েছি! মরেছে বলে কি আর তার গতি না করলে চলে, তুমিই বল না দাদাঠাকুর!

ধীরু অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "না—তা কি করে চলে?"

তা দেখ না—যদুর কাছে গেলাম, সে বলে—তার পরিবার পোয়াতী, সে যাবে না। নিধে হাড়িকে ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গলাম, তার মা বেরিয়ে বল্লে, সে নেশা করে পড়ে আছে। কি করি বল ত দাদাঠাকুর! নেহাৎ একসঙ্গে নেশাটা আশটা করতুম বুঝলে কি না, তাই তার গতিটা করলে—

ধীরু বাধা দিয়া কহিল, হ্যাঁরে, তোদের দলের আর কেউই এল না!

"না দাদাঠাকুর, কেবল রাখালের ভাই সোমরা যাবে বলেছে!

তা হলে ধর তুই, সোমরা আর আমি এই তিনজনে মিলে নিতে পারব না রে?—খুব পারা যাবে কি বলিস্?

হরি বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, বল কি, তুমি যাবে কি দাদাঠাকুর। কাওরার মড়া—জেতে বাগ্দী—তুমি হলে বামুণ—

ধীরু বাধা দিয়া কহিল, নে থাম্—গঙ্গা নাইলেই ত সব শুদ্ধ। তাতে আবার কি?

মাথা নাড়িয়া হরি কহিল, তুমি কি ক্ষেপেছ দাদাঠাকুর! সে কি হয়! কাল তাহলে গাঁয়ে তোমায় একঘরে করবে।

ধীরু বিরক্ত ভাবে কহিল, তুই চুপ কর না বাপু, সে হয় না হয় আমি বুঝব! এখন কাঠের জোগাড় করা যায় কি করে?

কাঠের দুঃখু কি দাদাঠাকুর! তার দরজায় এখনও ঘোষেদের আমগাছের চেলা ঢিপি দেওয়া রয়েছে। একটা ছেড়ে দশটা মড়া পোড়াও না। আর কাট চেলাই করবার দাম ঘোষেদের কাছে মতের পাওনা আছে।

চল্ তাহলে, আর দেরী করে কাজ নেই···বাড়ীতে একবার···না থাক্‌গে—চল!

কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ধীরু দ্রুতগতিতে চলিল, বিস্ময়বিমুগ্ধ হরিবাগ্দী তাহার অনুসরণ করিল।

২

যাহারা বিশ্বের অবজ্ঞাত, পরিত্যক্ত, ভগবান যেন বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের প্রাণগুলাকে পাথরের মত শক্ত করিয়া দিয়া সকলের অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা সহ্য করিবার দুর্জ্জয় ক্ষমতা প্রদান করেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, জগতের কাছে এত নির্ম্মমতা পাইয়াও এই পাষাণ প্রাণই নিজের বক্ষ নিংড়াইয়া, জগতের উপর স্নেহের মন্দাকিনী বহাইয়া দিয়া যায়।

ধীরু ছেলেটি সেই দলের। ছেলেবেলায় মা বাপ হারাইয়া দাদাদের অভিভাবকতার গণ্ডীর ভিতর সে যখন একঘেয়ে জীবনটার মধ্যে কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইল না, তখন সে নিজেকে ভিন্ন পথে চালিত করিল। এই ছন্নছাড়া জীবনটার মধ্যেই রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শের অনুভূতি পাইতে চেষ্টা করিল। লোকে বলিল, "ভবঘুরে", "লক্ষ্মীছাড়া", "হতভাগা" আরও কত কি; কিন্তু কোন শ্লেষ-বিদ্রূপই এই খেয়ালের একটানা স্রোতে ভাসমান জীবন-তরণীখানাকে কূলে ভিড়াইতে পারিল না। লাঞ্ছনা, পীড়ন, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখের "ছি ছি" "ঘৃণা" অপর্য্যাপ্তভাবে খরচ হইলেও ধীরুর কিন্তু কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তাহাকে দেখিলে এখন কেহ বলিতে পারিবে না যে, এই ছেলেটিই এক দিন ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে ছিল, বরাবর পরীক্ষায় প্রথম পুরস্কার পাইয়া আসিয়াছে। তাহার ধীর, নম্র স্বভাবে সে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। সে বালকে আর এ-যুবাতে আজ কত প্রভেদ; কোন দিন যে কোন সামঞ্জস্য ছিল—এ কথা অতিবড় মনস্তত্ত্ববিদও আজ বলিতে পারিবে না!

নাথু পালের শ্মশানঘাটে বসিয়া মতি কাওরার শবদাহান্তে ধীরু আজ এই কথাটাই ভাবিতেছিল, সংসারে কেহ কখন চিরদিন বাঁচিয়া থাকে না; তখন কেন মানুষ আপনার আপনার করিয়া মরে! কেনই বা নিজেকে লইয়া এতখানি বিব্রত হয়!—এই ত! কাল যে দেহটার ভিতর একটু প্রাণের সাড়া ছিল, তখনো মানুষ বলে যা'কে সম্বোধন করা চলত, আজ তার জীবন-চিহ্ন জগৎ থেকে মুছে গেল! এতকাল যে প্রাণটা আশা-আকাঙ্ক্ষায় জড়িত থেকে একটা দেহকে আশ্রয় করে মায়া, মমতা, ভালবাসা নিয়ে তার ভিতর লুকিয়ে ছিল, এতকালের বসবাস একদিনে ভেঙ্গে দিয়ে দেহটাকে ফেলে সে কোথায় পালিয়ে গেল! তখন চিতার আগুন নিভিয়া আসিতেছে।

ধীরু উঠিয়া কলসী করিয়া গঙ্গার জল আনিয়া চিতার উপর ঢালিয়া দিল। হরি বাগ্দী ও সমরু যাহারা ধীরুর সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা মদ খাইয়া গায়ের ব্যথা মারিতে বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কেবল ধীরু দাহ শেষ না হওয়া

পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। আহা, বেচারী নিঃসহায় মতি কাওরা! কলেরা রোগে মরেছে বলে কেউ তার কাছে এলো না, ছুঁলে না, দাহ করলে না! অথচ এই মতি যতদিন বেঁচে ছিল, সে লোকের এমনি বিপদে ছুটিয়া গিয়া বুক দিয়া পড়িত! রাত্রির আঁধার, দুর্য্যোগ কোনও দিনই তাকে তার কর্ত্তব্য থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি'।

আর আজ!—কেহ তার নামটীও আর মুখে আনিবে না। এই ত মানুষ,—আর এই তার জীবনের পরিণাম! ধীরু হঠাৎ যেন নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ ভাবিয়া একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিল সেই স্থানটা, যেখানে মতিকে সে দাহ করিয়াছে। কোথায় সে? তার স্মৃতি যে শুধু দগ্ধ, অর্দ্ধ-দগ্ধ কয়েকখানা কাষ্ঠখণ্ড ও একটী ভগ্ন মৃৎভাণ্ডের সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়া জীবনকে পরিহাস করিতেছে মাত্র! একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরু সেস্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন ঘাটের পাড়ে অন্যমনস্কভাবে নামিয়া পড়িল।

আজ চতুর্দ্দশীর গঙ্গা। জোয়ার মা জাহ্নবীর বুকখানাকে কানায় কানায় ফুলাইয়া তুলিয়াছে। উদাস ঢেউগুলি একের পর আর একটা স্তবকে স্তবকে গম্ভীরভাবে গড়াইয়া চলিয়াছে, একটা উন্মাদনা লইয়া। কিসের এ আকুলতা? ধীরু যন্ত্রচালিতের মত এক পা, দুই-পা করিয়া গঙ্গায় নামিল। ঝুপ ঝুপ করিয়া কয়েকটা ডুব দিয়া কোঁচার কাপড়ে মাথা এবং গা মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিল। তাহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, মাথার চুলগুলি রুক্ষ, মুখখানা শুষ্ক, বিবর্ণ।

বাটীতে ঢুকিতেই পিসিমা দয়াদেবী চীৎকার করিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে ধীরে! তোর জ্বালায় কি গলায় দড়ি দেব রে?

ধীরু বিস্মিতভাবে কহিল, কেন পিসি, আমি কি করেছি?

দয়াদেবী কপাল চাপড়াইয়া কহিলেন,—আমার মাথা আর মুণ্ড করেছ।

ধীরু উদাসভাবে কহিল, তাই নাকি।—যাক্ গে, তুমি এখন একখানা কাপড় দেবে আমায় পরতে।···না এই ভিজে কাপড়েই থাকতে হ'বে?

বামুণের ছেলে হয়ে কি না তুই শেষে কাওরার মড়া পুড়িয়ে এলি? সারা রাত বসে আমি ভেবে মরছি, তোর কি প্রাণে একটুও দয়া মায়া নেই! দেবু বলেছে তোকে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেবে!

সেই মুহূর্ত্তেই ধীরুর মধ্যম ভ্রাতা দেবেন্দ্র প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া ধীরুকে দেখিয়া বিদ্রূপকণ্ঠে কহিলেন, এই যে পিসী, রাত কাটিয়ে তোমার গোপাল ফিরে এসেছেন দেখছি!

দয়াদেবী চুপ করিয়া রহিলেন। দেবেন ধীরুকে কহিল, শোনহে, ছোটবাবু, আমি বড় কত্তাকেও কাল বলেছি, দিন দিন তুমি যে রকম বেড়ে উঠছ তাতে এ বাড়ীতে তোমার আর যায়গা হবে না।

ধীরু কহিল, তার মানে? বল্লেই হল আর কি? কোথায় যাবো?

দেবেন বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল। ধীরুর মুখের কাছে হাত পাকাইয়া কহিল, কথার ওপর কথা! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব তা' জানিস্? স্বত্ব দেখাতে এসেছে··· বেরো এখুনি বাড়ী থেকে, নইলে—দেবেন ধীরুর দিকে ক্রুদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেই দয়াদেবী তাড়াতাড়ি তা'র সম্মুখে আসিয়া উভয় হস্তে দেবেনের হাত দুখানি ধরিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে কহিলেন, আহা, করিস্ কি দেবু—

মেজবৌ সত্যবালা এতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, এবার ঘাড় বাঁকাইয়া স্বামীকে কহিল, দেখ্‌লে ত ভায়ের মেজাজ, শুনলে ত কথা! আমরা ত পরের মেয়ে—তোমার ভাইকে দেখতে পারি না, তোমাদের ঘর ভাঙ্গতে এসেছি,—এখন ভাই কেমন দাদার মান রাখলে? বেশ হয়েছে!

সত্যবালার কথা শুনিয়া ধীরু তাহার নত মুখখানি ঈষৎ তুলিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত দৃষ্টিতে সত্যবালার দিকে চাহিতে, সত্যবালা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, কটমট করে চাইছ যে, মারবে না কি?

দয়াদেবী দুঃখিতভাবে কহিলেন, তুমি থাম না মেজ-বৌমা।

সত্যবালা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, থামব কেন পিসী, হয়েছে যদি, ভাল করেই তা'হলে হ'ক! চিরদিন যে তোমার ছোট ভাইপো সকলকে হেনস্তা করে বুক ফুলিয়ে বেড়াবেন—কেন বল ত? এবার একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাক্।

এ সব কি কথা বউ-মা?

দেবেন কহিল, হ্যাঁ পিসী, মেজ-বউএর সঙ্গে যখন কারুর বনে না, তখন যে যার আলাদা হলেই ভাল! আমি একটু শান্তি চাই! রোজ রোজ আমার আর সহ্য হয় না। আমি দাদাকেও বলেছি যে আমি আলাদা থাকবো। আমার কারুর সঙ্গে থাকা আর পোষাবে না।

দয়াদেবী গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, সেটা কি ভাল হ'বে দেবু? সংসারে কোথায় না ঝগড়া-ঝাঁটি হয়। বড়গাছেই বেশী ঝড় লাগে যে বাবা। আর লোকেই বা কি বলবে! বল্‌বে বাপ মরতে পাঁচ বছরও গেল না, ভায়ে ভায়ে আলাদা হয়ে সংসারটা নষ্ট করলে—

দেবেন বাধা দিয়া কহিল, লোকের যা' খুসী তা' বলুক, আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না! তোমরাও বল যে পরিবারের কথা শোনে, আরও যা ইচ্ছা তাই বল! আমি ও রাস্কেলের মুখও দেখবো না, একটা কানা কড়িও দোব না। ওর যা' খুসী করুক।

দয়াদেবী আর কোন কথা কহিলেন না, দুঃখবিজড়িত দৃষ্টিতে দেবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। এমন সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্র আসিয়া কহিল, কি হে দেবু, সকালবেলা এত চেঁচামেচি কিসের?

সত্যবালা অন্তরালে সরিয়া গেল।

দেবেন হাত নাড়িয়া কহিল, দেখ না, পিসী ধীরুর হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছেন।

দয়াদেবী রাগতস্বরে কহিলেন, কথাটা কি ঠিক হল দেবু?

দেবেন রুক্ষস্বরে বলিল, না আমার সবই অন্যায়। তোমরা আমায় রেহাই দাও না বাপু! আমি কারুর সঙ্গে আর থাকব না, থাকব না, থাকব না।

দয়াদেবী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, সে ভয় আমাকে দেখাচ্ছিস্ কি রে? আমি কি তোদের বাড়ী চারটী ভাতের পিত্যেশে পড়ে আছি? আমার যা সংস্থান আছে—আর না থাক্‌লেও একটা পেট কাশীতে ভিক্ষে মাগলেও চলে যাবে! তোর মা আবাগী যদি ঐ শত্তুরকে আমার গলায় ফেলে দিয়ে না মরত তবে আমি আজ তোদের বাড়ীর মাটী কামড়ে থাক্‌ব কেন? দয়াদেবীর বুকের কাছে একটা ক্রন্দন ঠেলিয়া উঠিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। আঁচলে চক্ষু মুছিয়া ধীরুর দিকে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, দেখ্ হতভাগা, যদি ঘেন্না পিত্তি তোর থাকে, যদি মানুষ হোস্, আর একদণ্ড থাকিস্ না এখানে। যেখানে দু' চোখ যায় চলে যা। তুই ব্যাটাছেলে, একটা পেটের ভাবনা কি!—আমার যা অদৃষ্টে আছে তাই হ'বে—চক্ষু মুছিতে মুছিতে দয়াদেবী গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেবেন একটু মৃদু হাসিয়া রাজেন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে কহিল, দেখলে দাদা ব্যাপারটা, শুনলে পিসীর কথা! এমন কি সহ্য করা যায়, না সহ্য করা উচিত?

রাজেন্দ্রনাথ বিমর্ষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আজ আবার কি হ'ল?

দেবেন তা'র দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নাচাইতে নাচাইতে কহিল, কি না হচ্ছে কবে? সংসারের খবর ত কিছু রাখ না, সে সবে তোমার দরকারও নেই। যাক্ সে সব কথা, রোজ রোজ আর আমার এত বকাবকি ভাল লাগে না। পারব না আমি এত হাঙ্গামা পোহাতে, আমার কি দায়।—প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দেবেন সিঁড়ি বাহিয়া খট্ খট্ শব্দে উপরে চলিয়া গেল, থামের অন্তরাল হইতে সত্যবালাও তাহার অনুসরণ করিল।

বৃক্ষের উচ্চশিরে আরোহণ করিয়া হঠাৎ দৃষ্টি নত করিলে প্রাণটা যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে, দেহটার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করে, রাজেন্দ্রনাথের অবস্থাও তদ্রূপ হইল। রকের উপরে বসিয়া পড়িয়া সম্মুখে পূজার দালানের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল অতীতের কত কথা!

এই ব্রাহ্মণ-প্রধান খড়দহ গ্রামের মধ্যে তাহাদের পিতা ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ই ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য;—বিদ্যায়, সম্মানে সে অঞ্চলে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। একদিন এই বাটীর প্রাঙ্গণে দোল, দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা, সত্যনারায়ণের সিন্নি প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য উপলক্ষে কত লোক প্রসাদ পাইয়াছে; এই চণ্ডী-মণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া প্রাতঃকালে কত ব্রাহ্মণ-বালক চীৎকার করিয়া কলাপ, মুগ্ধবোধ, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে বিদ্যাপীঠ মুখরিত করিত, আজ সেই স্থানগুলি গদাই মালী, নবীন খানসামা, ছিদাম রাখাল প্রভৃতি লোক দ্বারা অধিকৃত। পাঠ-মন্দির ছাগল-কুকুরের থাকিবার স্থান, ঠাকুরদালানে বাদুড় ও চামচিকা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! সাক্ষীগোপাল শালগ্রামশিলা সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাকালে কয়েকখানি বাতাসার ভোগে তুষ্ট থাকিয়া তাঁহার পাষাণ প্রাণের জাগ্রত পরিচয় দিতেছেন—কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

রুষ্ট রাজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ধীরুর বিবর্ণ মুখের দিকে পড়িতেই তাঁহার গা জ্বলিয়া উঠিল। ওই হতভাগাই যত অনিষ্টের মূল। সে যদি ভবঘুরে না হয়ে, সংসারের কোন কাজে লাগিত, অন্ততঃ দেবুর ও মেজবউএর মন যোগাইয়া চলিত—তা হইলেও কথা ছিল। তা নয়, মুখে মুখে জবাব, কারুকে কেয়ার নাই, রাত কাটাইয়া ইয়ারকি দিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোই তাহার কাজ! এ অত্যাচার তাহার সহ্য করিবে কে? রাজেন্দ্রনাথ তীব্র কণ্ঠে কহিল, কোথায় ছিলি কাল সারারাত?

ধীরু নির্ব্বিকার কণ্ঠে কহিল, শ্মশানে—

কারণ?

মতি কাওরা কলেরা হয়ে মরেছে কি না—

বাধা দিয়া রাজেন্দ্রনাথ কহিল, আর তুই হতভাগা বুঝি তার সৎকার করে এলি? বামুণের ছেলে হয়ে হাড়ি, ডোম, কাওরার মড়া পুড়িয়ে আজকাল বুঝি মুদ্দফরাসের কাজ হচ্ছে?

ঈষৎ হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া ধীরু কহিল, মড়ার আবার জাত কি দাদা? আর নাইলেই ত সব শুদ্ধ!

তোর শাস্ত্রে! তুই মস্ত বড় পণ্ডিত হয়েছিস্ কি না? গুণের মধ্যে ত কথায় কথায় তর্ক করা, আর দিন রাত ইয়ারকি দিয়ে বেড়ান! ঘর-সংসারের একটা কাজ দেখা নেই, কি করে দু'পয়সা আনতে পারবি সে চেষ্টা নেই—কে তোকে আজন্ম এমন করে বসিয়ে খাওয়াবে? আজ শুন্‌লি ত মেজবাবুর কথা, এখন বেড়া ঘুরে পথে পথে···আমি কি কর্ব্ব? রাজেন্দ্রনাথ মুখ গম্ভীর করিয়া বহির্ব্বাটীর দিকে চলিল।

ধীরু পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—বড় দা' শোন···

রাজেন্দ্রনাথ তাহার দিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই কহিল—শুনে আর কি করব—আমার কিছু সাধ্য নেই। তোমার হয়ে ত দেবুর সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারি না।

ধীরু সেই খানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে চেষ্টা করিল, কেন এমন হইল? তার অপরাধটা কোথায়? কিন্তু একটার পর একটা গ্রন্থি খুলিতে গিয়া দেখিল যে সূত্রটা এমন বিশ্রী জটিল ভাবে পাক খাইয়া গিয়াছে যে, তাহা হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নাই। মাথা নীচু করিয়া ধীরু ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শৃঙ্খল

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

কেন গো দিয়াছ মোরে এমন শৃঙ্খল?
তোমারি সৃজিত বিশ্ব আনন্দ-সঙ্গমে
ছুটিয়াছে, মোরে কেন করেছ অচল?
আমি যে ফুটিতে চাই বিশ্বের মরমে
নির্ম্মল বাসনারূপে, প্রেমের নয়নে
আমি যে জ্বলিতে চাই চঞ্চল আবেশে
চকিত দৃষ্টির মত, বিরহ-বেদনে
আমি যে জাগিতে চাই বেদনার রসে
অভিষিক্ত অশ্রুর মতন! বল নাথ
আমারে দিয়াছ কেন এমন শৃঙ্খল!
আমি যে জাগিতে চাই জীবনের রাত
তব সাথে, সাধিবারে বিশ্বের মঙ্গল
আমি যে ফুটিতে চাই করুণা স্বরূপে,
নীরব হৃদয়মন ভরি চুপে চুপে!

ব্রহ্ম-প্রবাসের চিত্র

শ্রীগণেশচন্দ্র মৈত্র, বি-এস্‌সি

ব্রহ্ম-প্রবাসের চিত্রগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে; সেইজন্য আমার 'ব্রহ্ম-প্রবাসের চিত্র'কে চিত্র হিসাবে গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইব।

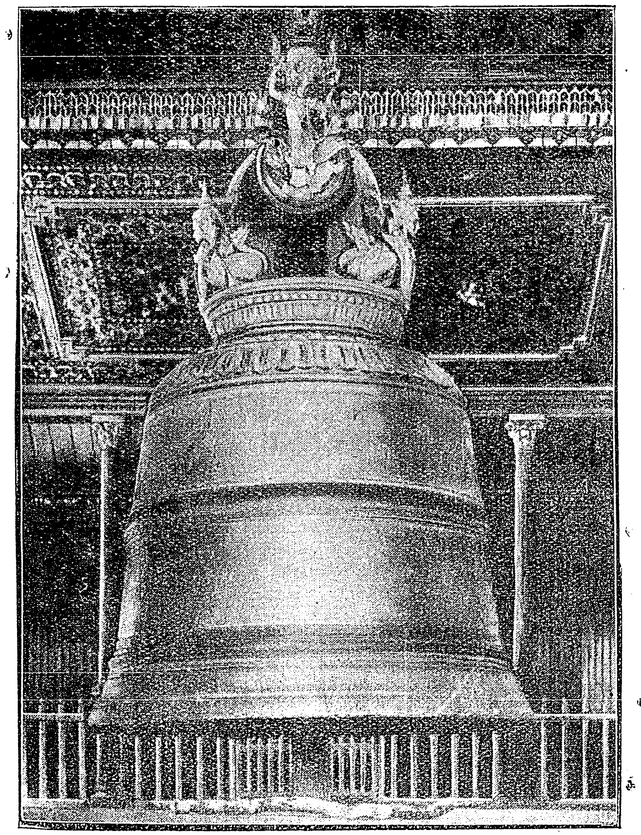

The Great Bell—Shwe Dagon Pagoda
(সোয়ে ড্যাগন প্যাগোডা-মধ্যস্থ বৃহৎ ঘণ্টা)

স্থানে স্থানে সামান্য মন্তব্য মাত্র প্রকাশ করিয়া, আমি চিত্রগুলি প্রদর্শনের দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়াছি; সুতরাং সর্ব্বোচ্চ।

চিত্রে প্রদর্শিত ঘণ্টার ব্যাস প্রায় ৪ ফিট ও উচ্চতা ৭ ফিট এবং ওজনও প্রায় ২০।২৫ মণ। এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, কোন বিদেশী এই ঘণ্টা একবার বাজাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেও তাঁহাকে এখানে অন্ততঃ আর একবার আসিতেই হইবে। এই কিম্বদন্তীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে রীতিমত প্রমাণাদি না থাকিলেও, কয়েকটী স্থলে আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, কোনও কোনও ভদ্রলোক এ দেশের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াও ২।১ বৎসরের মধ্যে পুনরায় এখানে আসিয়াছেন;—বলা বাহুল্য আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে তাঁহারা এই ঘণ্টা বাজাইয়াছিলেন।

এ দেশটাকে যে Land of Pagodas বা প্যাগোডার দেশ বলে, তাহা পাঠকমণ্ডলীকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। নিম্ন প্রকাশিত ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানের কতিপয় বিখ্যাত প্যাগোডার চিত্র হইতে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। শুনা যায় এখানে এমন কোনও গ্রাম নাই যেখানে অন্ততঃ একটি প্যাগোডাও নাই। বড় বড় সহর মাত্রেই বহুসংখ্যক প্যাগোডা তন্মধ্যে পেগানের প্যাগোডার সংখ্যাই নাকি



Bell Pagoda—Bhamo (ভামোর ঘণ্টাকৃতি প্যাগোডা)

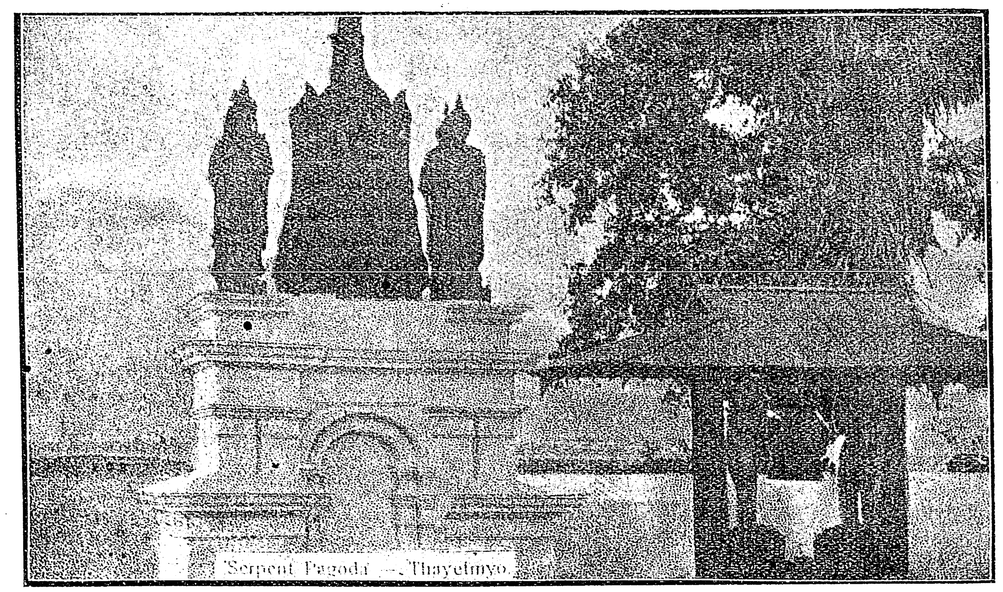

The Serpent Pagoda—Thayetmyo. (থায়েট্‌মিওর সর্পাকৃতি প্যাগোডা)

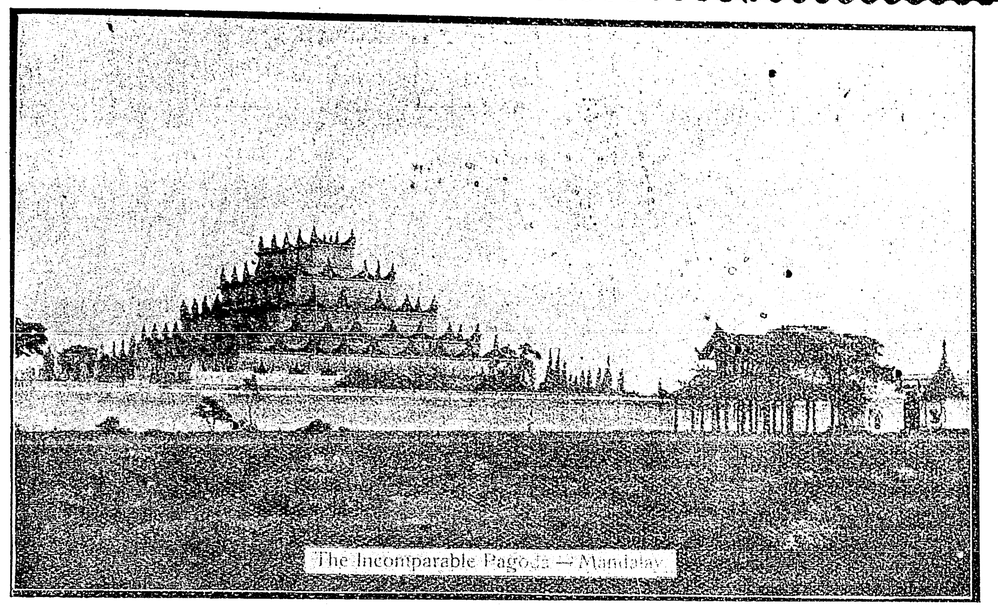

The Incomparable pagoda—Mandalay. (মান্দালয়ের অতুলনীয় প্যাগোডা)

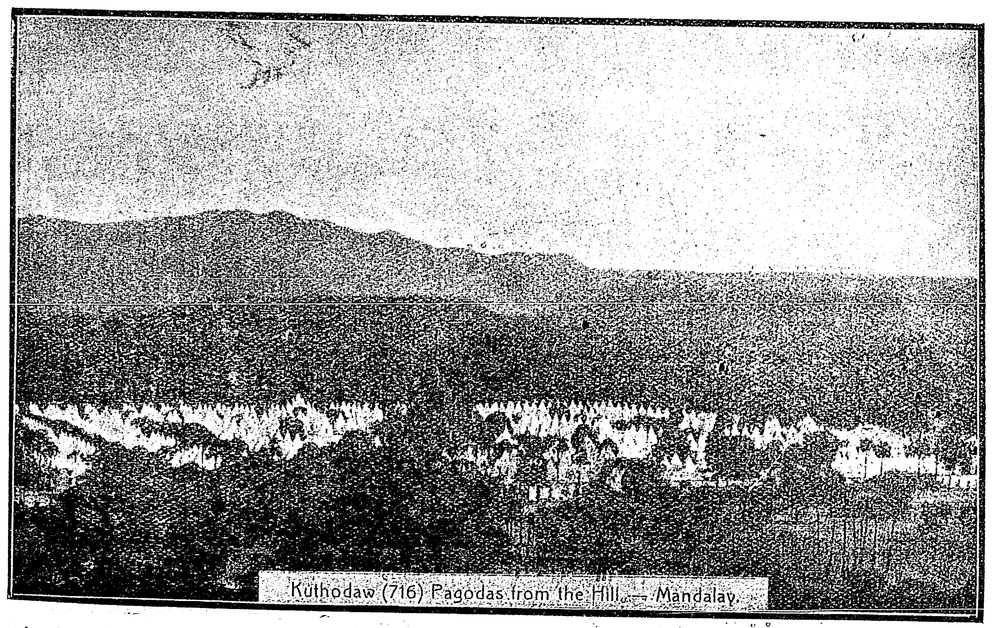

Kuthodaw (716) pagoda from the hill—Mandalay. (পাহাড়ের উপর ৭১৬টি প্যাগোডা—মান্দালয়)

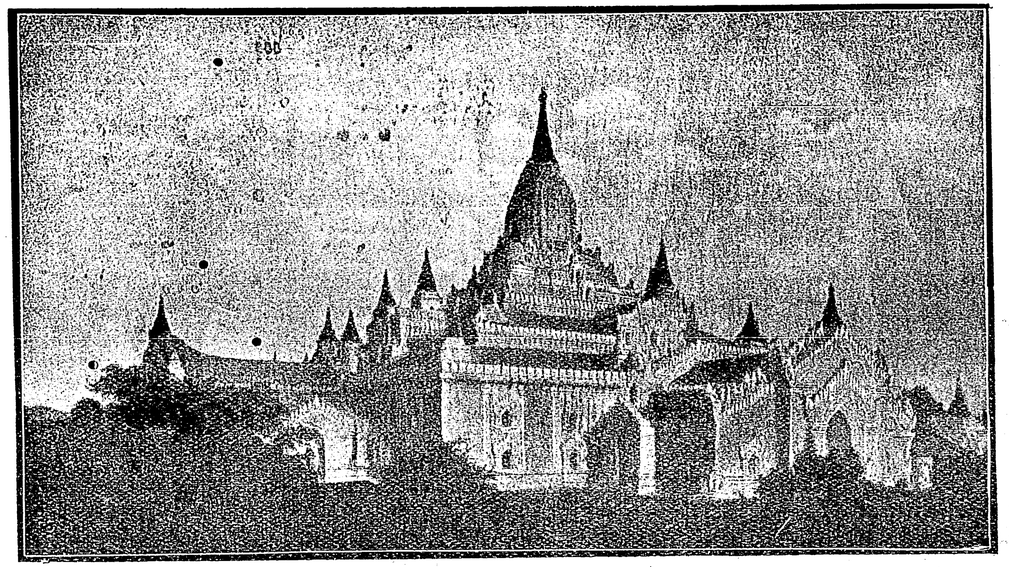

Ananda pagoda—Pagan (পেগানের আনন্দ প্যাগোডা)

আনন্দ বুদ্ধদেবের একজন খুব ভক্ত শিষ্য ছিলেন; তাঁহারই নাম-অনুযায়ী এই প্যাগোডার নামকরণ হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়।

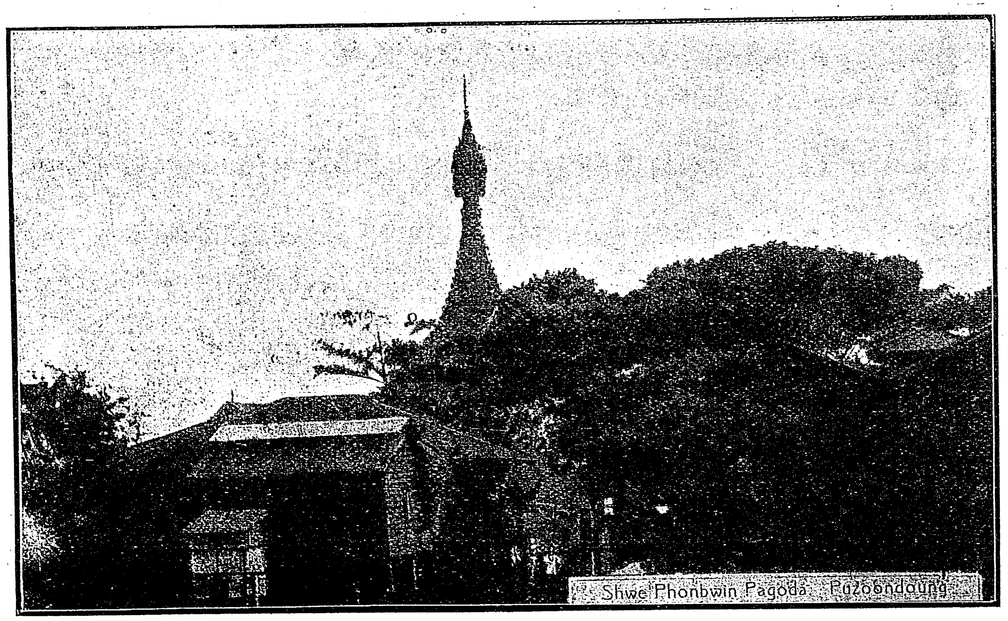

Shwe Phon Buin pagoda—Pajundang. (সোয়ে ফন্ বুইন্ প্যাগোডা—পজুনডং)

ব্রহ্মভাষায়, সোয়ে অর্থে সুবর্ণ, ফন্ অর্থে গৌরব এবং বুইন্ অর্থে উন্মুক্ত করা। যুক্তভাবে ইহার অর্থ সুবর্ণময় গৌরবের পথ-উন্মুক্তকারী। পালিভাষায় সোয়ে অর্থে মহান্ (Sublime) ফন্ অর্থে শ্রী (glory); সংযুক্ত অর্থে যাহার দ্বারা মহান্ শ্রী প্রচারিত হয়। সাধারণতঃ কোনও রাজা তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময় অথবা কোনও অপ্রত্যাশিত ধন লাভের পর এই সব প্যাগোডা নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন, এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়। কাজেই এই প্যাগোডার নামের দুইটি অর্থ করা যাইতে পারে;—প্যাগোডা-নির্ম্মাতার গৌরব-প্রকাশকারী অথবা সেই মহান্ বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব প্রচারকারী।

সভ্যতার অঙ্গ মোটরকার হইতে আরম্ভ করিয়া, ওয়াটার প্রুফ্, কোমরের বেল্ট্, মেঞ্জার গার্ডার প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য, এমন কি রোগশয্যায় আইস্ ব্যাগ, হট্ ওয়াটার ব্যাগ প্রভৃতি, সকল বিষয়েই আজকাল রবারের সমধিক প্রয়োজন। মধ্যে রবারের বাজার নরম হইয়া যাওয়ায় বাগানগুলির তাদৃশ যত্ন ছিল না, এখন হঠাৎ ইহার মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় আবার পূর্ণোদ্যমে এখানে রবারের চাষ চলিতেছে এবং বাগানগুলিও নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে।

ভিক্টোরিয়া পার্কটি রেঙ্গুনের চিড়িয়াখানার (Zoological

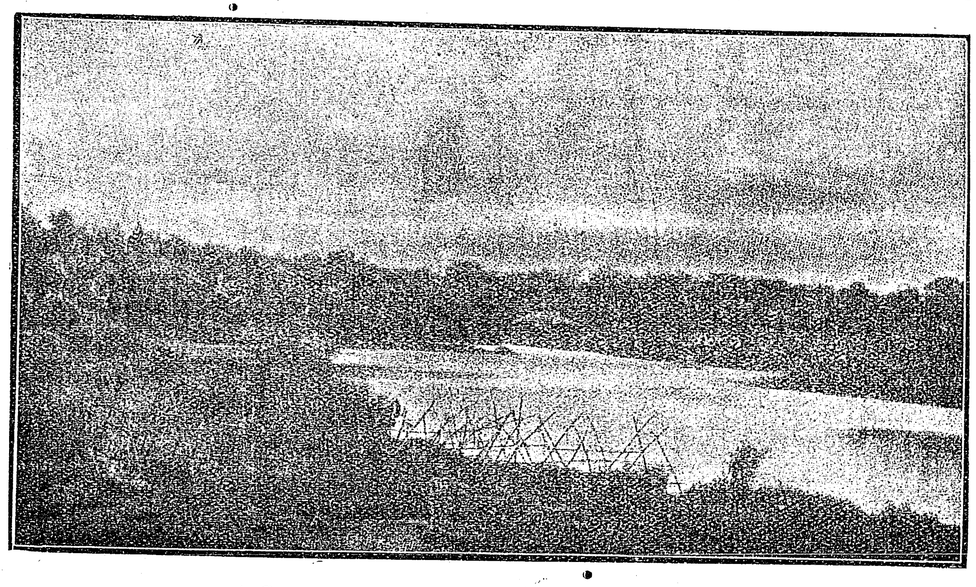

A Scene on the Twante Rubber Estate
(টোয়ান্টে রবার ক্ষেত্রের একটী দৃশ্য)

ব্রহ্মদেশ মালয় রাজ্যের ন্যায় রবার উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। এখানে বহুসংখ্যক রবারের ক্ষেত আছে। রবারের ক্ষেত একটি দেখিবার জিনিষ। সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ রবার গাছগুলির শোভা অতি সুন্দর। রবার বর্ত্তমান যুগের একটি লাভজনক ব্যবসায়। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার প্রচলন এবং বাণিজ্য পণ্য হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা আজকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক

Gardens) অভ্যন্তরে। বেড়াইবার এমন সুন্দর ও মনোরম পার্ক্ ড একটা দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় পার্কটি চিড়িয়াখানার ভিতরে অবস্থিত হওয়ায় প্রবেশের মূল্য দুই আনা না দিলে আর এ সুবিধাটুকু উপভোগ করিবার উপায় নাই।



Victoria Park—Rangoon (ভিক্টোরিয়া পার্ক— রেঙ্গুন)



Myingyan—Upper Burma. (মিইঞান সহরের দৃশ্য)



King Theebaw's Monastery—Mandalay. (ব্রহ্মরাজ থিব প্রতিষ্ঠিত মঠ—মান্দালয়)

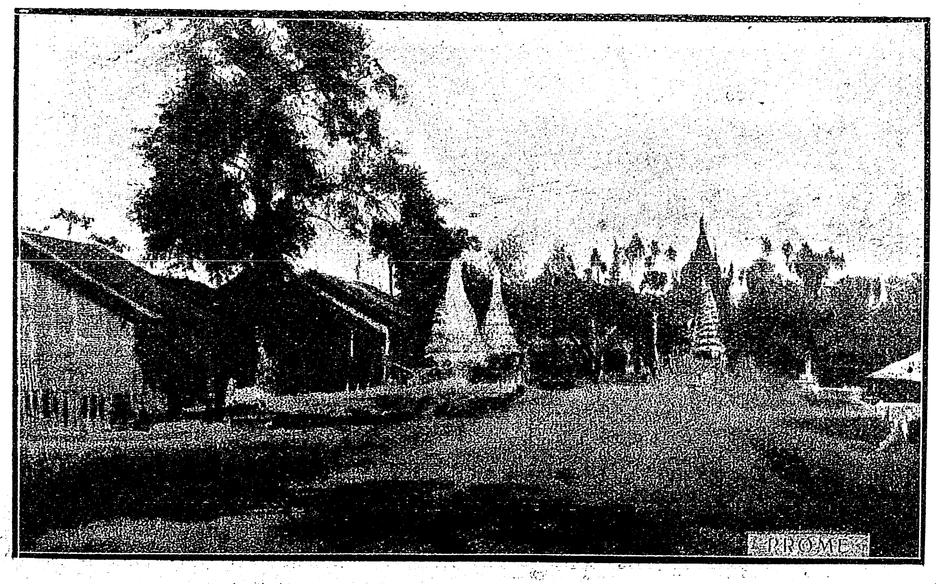

প্রোমের সাধারণ দৃশ্য

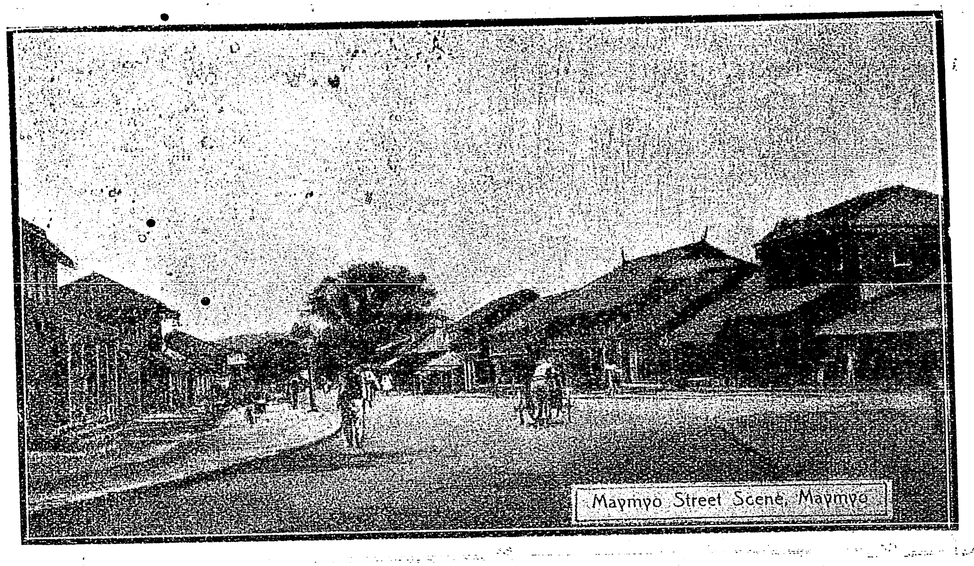

Maymyo Street Scene, (মেমিও রাজপথের দৃশ্য) ·

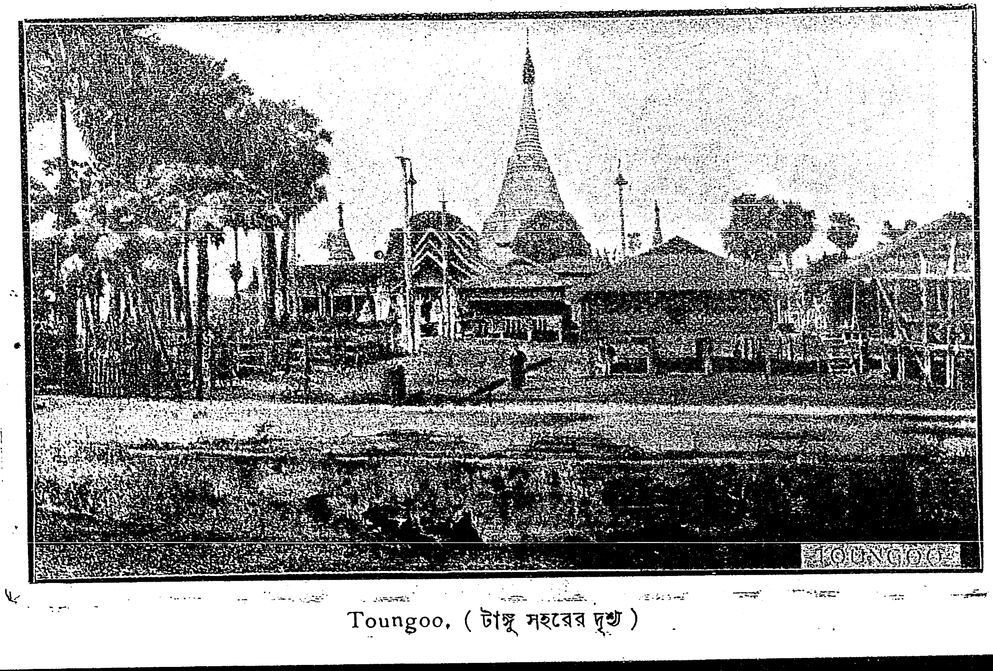

Toungoo, (টাঙ্গু সহরের দৃশ্য)

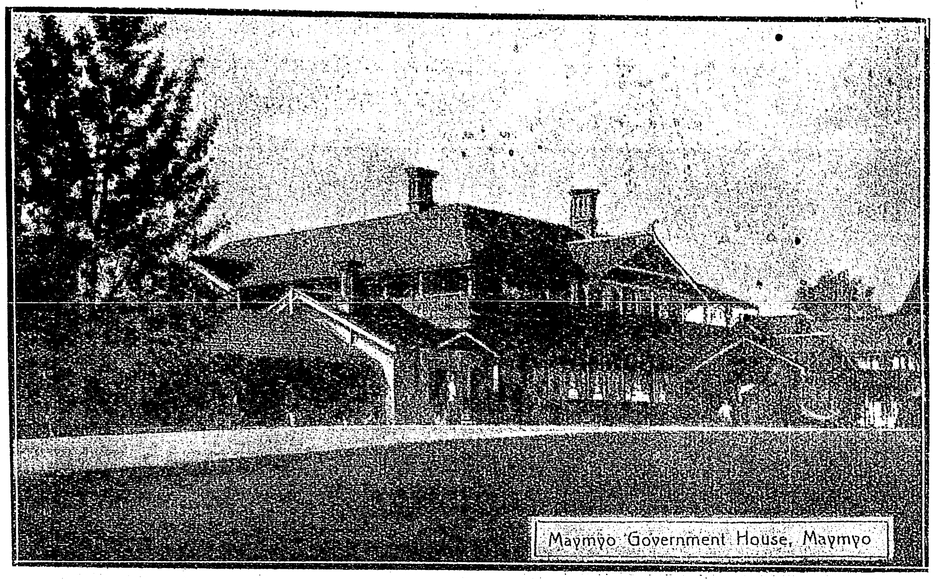

Maymyo Government House. (মেমিও লাট-প্রাসাদ)

বাঙ্গালার লাটবাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস যেমন দার্জ্জিলিংএ, ব্রহ্মের লাটবাহাদুরের গ্রীষ্মাবাসও সেইরূপ মেমিওতে ; কারণ মেমিও সহরটি পাহাড়ের উপর, কাজেই শীতপ্রধান।

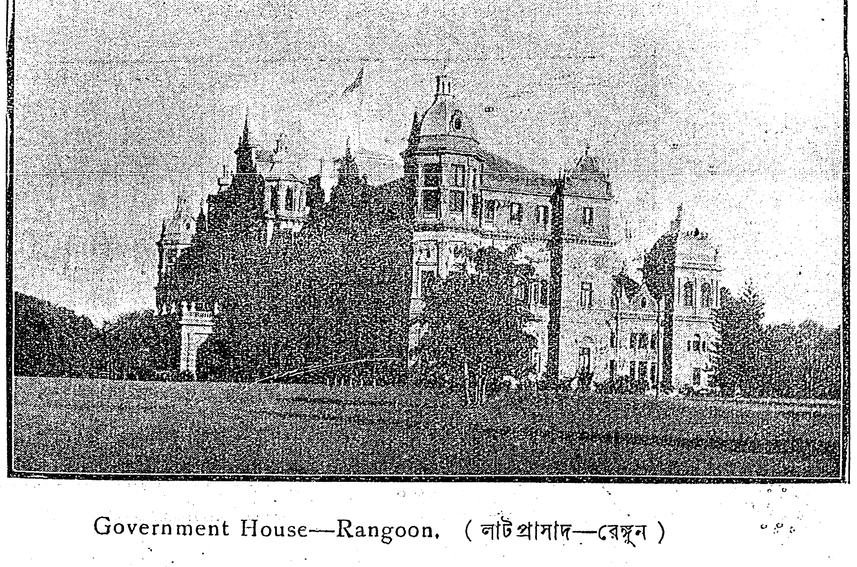

Government House—Rangoon. (লাটপ্রাসাদ—রেঙ্গুন)

নঙ্ ড জী অর্থে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দুই বা ততোধিক প্যাগোডা একই স্থানে পাশাপাশি নির্ম্মিত হইলে, যেটি সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হয়, তাহাকে ইহারা "নঙ্ ড জী" আখ্যা দিয়া থাকে। এই প্যাগোডাটি বৃহৎ সোয়ে ড্যাগন

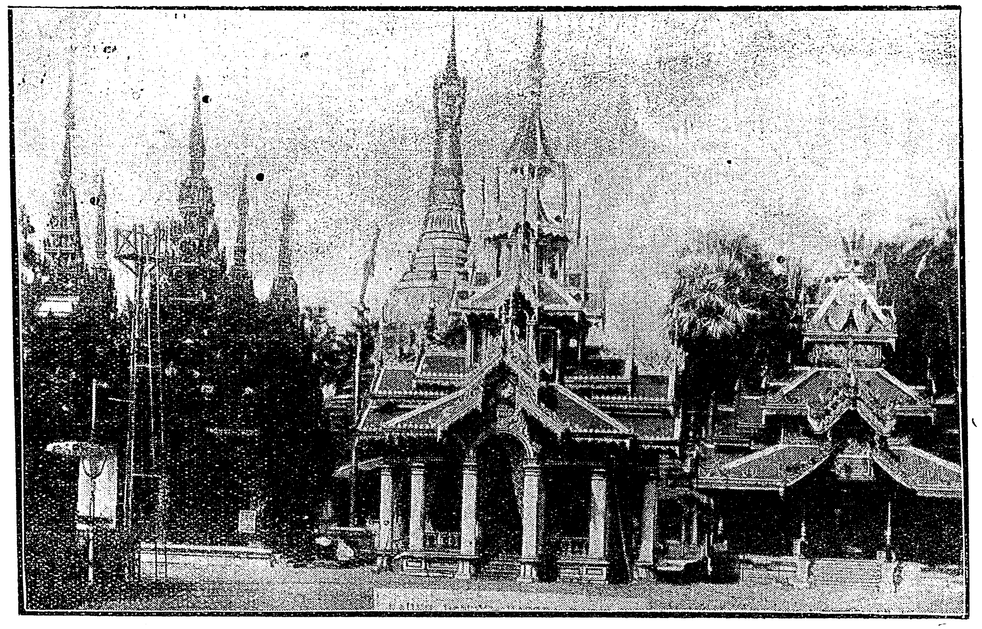

Naung Daw Gyi Pagoda—Rangoon. (নঙ ড জী প্যাগোডা, রেঙ্গুন)

প্যাগোডা-অঙ্গনে অবস্থিত এবং ইহা সোয়ে ড্যাগনের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই নঙ্ ড-জী নামে অভিহিত। প্রবাদ আছে যে ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশবাসী "তাপুসা ও ফলিকা" (Tapussa and Phalika) নামক দুই জন ধনী ব্যবসায়ী ব্রহ্ম-দেশাভিমুখে আগমনকালে পথিমধ্যে বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহার নব প্রচারিত ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া বুদ্ধদেবের আদেশানুসারে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহারাই বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর সেই মহাপুরুষের কেশরাশি, জ্ঞানদন্ত ও কণ্ঠাস্থি এই তিনটি চিহ্ন (relics) আনয়ন করিয়া এই সুবৃহৎ বিবিধ কারুকার্য্য-শোভিত বহুমূল্য প্যাগোডা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইতিহাসে কিন্তু মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার সাধিত হওয়া এবং



St. Paul's Institute—Rangoon. (সেণ্ট পল বিদ্যালয়—রেঙ্গুন)

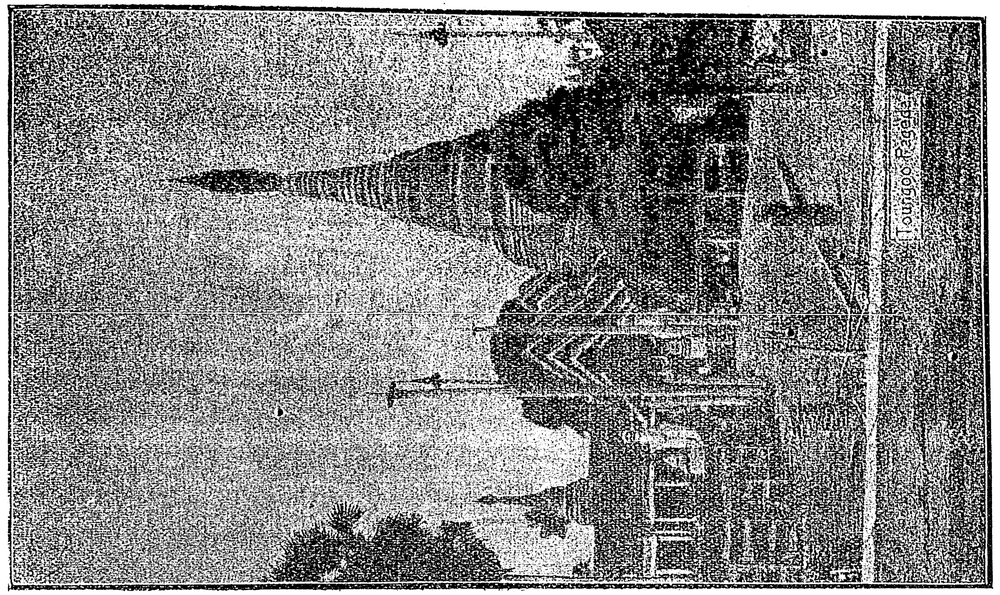

Toungoo pagoda (টাঙ্গু প্যাগোডা)

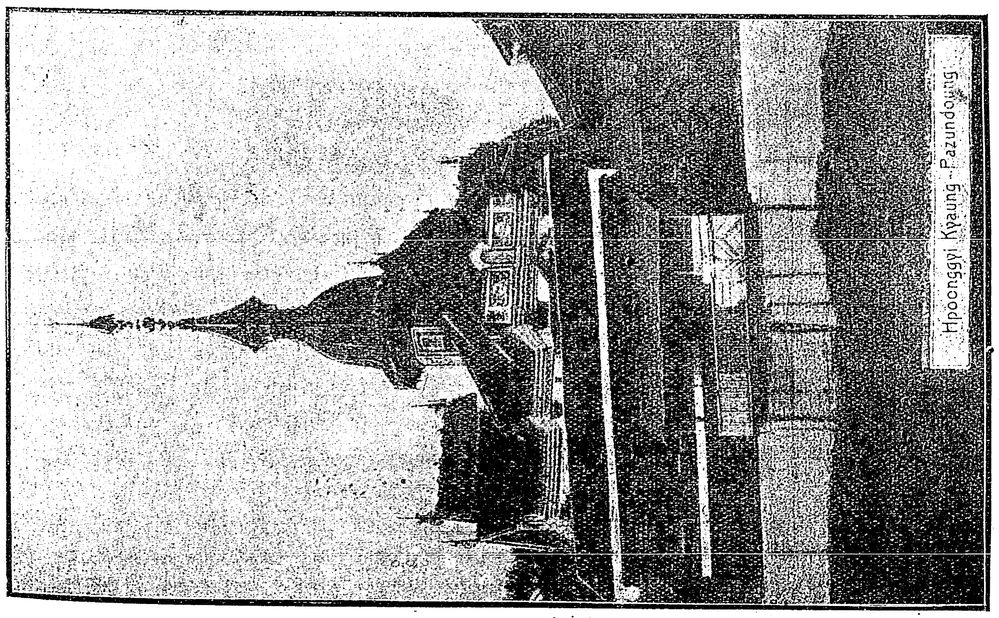

Hpoongyi Kyaung—Pazundaung. (বেদ্ধ ভিক্ষুগণের আশ্রম—পজুনডং)

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মাধিপতি আলম্ পায়ার (Alamng Paya) সময়ে এই প্যাগোডা নির্ম্মিত হওয়ার কথা জানা যায়। সমগ্র ব্রহ্মদেশের মধ্যে এরূপ প্যাগোডা আর দ্বিতীয় নাই। এই প্যাগোডার চূড়ায় একটী সুবর্ণময় বল আছে এবং তাহা এত মণিমাণিক্য-খচিত যে ঐ বলটি নির্ম্মাণ করিতে নাকি ৫৪০০,০০০৲ চুয়ান্ন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

চ্যং এ দেশের বিশেষত্ব। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাস করেন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রহ্মবাসীগণ কোন্ অতীত যুগ হইতে, যাঁহারা ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করেন তাঁহাদের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আসিতেছেন। এই আশ্রমগুলিকে চ্যং বলা হয়। ব্রহ্মদেশের প্রধান বিশেষত্ব এই যে এদেশবাসী নর নারীগণের মধ্যে কেহই একেবারে নিরক্ষর নহেন। ইহার প্রধান কারণ এই সব চ্যং। ইহা গৌণভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার স্থল। প্রতি ব্রহ্ম বালক-বালিকা নিকটবর্ত্তী চ্যংএ বৌদ্ধ শ্রমণদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করে। আর ইহাই বোধ হয় এই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবাসের সর্ব্বোচ্চ দান। এই চ্যংএর অধিবাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ স্বদেশবাসীর আতিথেয়তার উপর নির্ভর করিয়াই জীবন যাপন করেন এবং ব্রহ্মবাসীরাও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের গৃহজাত উৎকৃষ্ট খাদ্যসম্ভার এই সব ফুঞ্জিদের উপহার দিয়া আপনাদের ধন্য মনে করেন। উষার অরুণালোকের সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্রহ্মপল্লীর নিকটে প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সারি সারি হরিদ্রা-বসন-পরিহিত ব্রহ্ম ফুঞ্জিবৃন্দ আপন আপন ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে চলিয়াছেন। এই দৃশ্য আমাদের নয়নসমক্ষে কোন্ এক অতীত বৌদ্ধযুগের শ্রমণ শ্রমণিদের সুমধুর স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গীত *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

You can not look upon a great man however imperfectly without gaining something by his contact...Carlyle.

চৈত্রের নির্ম্মল প্রভাত। বেলা নটা। আশে পাশে গাছপালার মধ্যে শিহরণের মর্ম্মরশব্দের সঙ্গে প্রভাতের রূপালি রৌদ্রালোক-স্নাত গাছের সবুজ রূপ এক বিচিত্র বারতা বহন ক'রে আন্‌ছিল।

রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ সাম্‌নের অশ্বত্থ গাছের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন: "আমি একজন মহা কুঁড়ে লোক হে। তবে সেটা কি রকম কুড়েমি জানো? মুটে মজুরের সারাদিন খেটে খুটে অজস্র নিদ্রার জড়তার কুড়েমি নয়। আমার হচ্ছে বাদশাহী কুড়েমি—rich কুড়েমি।" ব'লে অলস ভাবে আরামকেদারাটিতে হেলান দিয়ে তাঁর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু পরে বল্‌লেন: "অথচ আমাকে যে পরিমাণ খাটতে হ'য়েছে সেটা অনেক সময়ে আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না হে। সৃষ্টির এটা একটা বিচিত্র অসঙ্গতি-দোষ। যার যেটা ভালো লাগে না তাকে দিয়েই বিধাতা সেটা চুটিয়ে করিয়ে নেন, নয় কি?"

একটা ভৈরবী গাইলাম। "বাবুল মোরা নইয়ার ছুটা যায়।" বল্‌লাম: "গানটি বরোদার ফৈয়াস খাঁর কাছে শেখা—লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে যখন ইংরাজরাজ সিংহাসনচ্যুত ক'রে গত শতাব্দীর শেষভাগে মেটেবুরুজে পাঠিয়ে দেয় তখন তিনি ঠুংরি ভৈরবীতে এই করুণ গানটি রচনা ক'রে গেয়েছিলেন।" গানটির ভাবার্থ: "পিতা আমার সবই যেতে বসেছে, তাই এখন ডুলি নিয়ে এসো আমি চিরপরিচিত যা-কিছু তাদের কাছ থেকে বিদায় নিই।"

* গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে আলিপুরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই আলোচনা হয়। মাসখানেক পরে কবিবরকে এ রিপোর্টটি শোনাই ও তিনি অনুমোদন করেন যে তাঁর বক্তব্যের প্রতি সুবিচারই করা হ'য়েছে ও এ আলোচনা আমি প্রকাশ করতে পারি।

কবিবর গানটি শুনে খানিক চুপ ক'রে বল্‌লেন: "আচ্ছা দেখ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যে ভৈরবীটি তুমি গাইলে সেটার ধারা হচ্ছে অজস্র বিস্তারের—বিকাশের। অর্থাৎ একটা রাগিনী সম্বন্ধে তোমার যা-কিছু বল্‌বার আছে তার—সবটা না হোক্—অনেকখানি তুমি নিজের কল্পনা ও ধ্যান অনুসারে ফুট ক'রে তুল্‌লে। কিন্তু এই ভৈরবীকে অন্য একটা বিশেষ ভাবেও দেখা যেতে পারে। যেমন দেখ ভৈরবী ঠাটের ও গঠনপ্রকৃতির একটা নির্দ্দিষ্ট রস থাক্‌লেও তার সমগ্র রূপটিকে বাদ দিয়েও আমরা তার বিশেষ বিশেষ রূপের উপরই দৃষ্টি রেখে সেই সেই রসকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারি। যেমন দেখ ঐ অশ্বত্থ গাছ আর ঐ দেখ পাশের বটগাছ। প্রতি গাছই উদ্ভিদের পর্য্যায়ে পড়ে বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও কি বলা চলে না যে উদ্ভিদের সংজ্ঞার মধ্যে পড়া সত্ত্বেও অশ্বত্থ গাছের এক বিশেষ রূপ ও বটগাছের এক বিশেষ রূপ? তেম্‌নি ভৈরবীর মধ্যে ভৈরবীর একটা বিশেষ রস থাক্‌লেও নানা গায়ক নানা গানে সে রসের কমবেশি এদিক ওদিক করতেই পারেন। নয় কি?"

আমি বল্‌লাম: "তা ত বটেই। ধরুন না কেন, ধ্রুপদের খাম্বাজের মধ্যে খাম্বাজের যে বিশেষ রসটি বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠে ঠুংরির খাম্বাজের মধ্যে সে রসটি ঠিক্ সেভাবে ফুটে উঠ্‌তে পারে না। অন্য একটা রস দেখা দেয়।"

কবিবর বল্‌লেন: "আচ্ছা বেশ। কিন্তু গাইয়েরা কোনও গান বিশেষ রাগিনীতে গাইবার সময়ে তার কোনও বিশেষ বিকাশটির দিকে কি এ ভাবে দৃষ্টি রাখেন? অর্থাৎ প্রতি ভৈরবীতেই ভৈরবীর রূপটি সমগ্রভাবে ফুটিয়ে না তুলেও তার একটা বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় এ কথা কি তাঁরা সজাগ ভাবে উপলব্ধি করেন?"

আমি বল্‌লাম: "সজাগভাবে করেন কি না জানি না।—তাঁদের সে শিক্ষা ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা বোধ হয় নেই। কিন্তু তবু বড় গুণী সব ভৈরবীই এক রকম ভাবে গান না। টপ্পায় "নজরা দিলবাহার" এক রকম ভাবে গান ও ঠুংরিতে "বাজুবন্দা খুলি খুলি যায়" অন্য ভাবে গান। কাজেই আপনি যে-কথাটার উপর জোর দিচ্ছেন সেটার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা যে কিছুই জানেন না তা নয়।"

কবিবর খুসি হ'য়ে বল্‌লেন: "তাহ'লেই হ'ল। এই সম্পর্কে দুচারটে কথা আমি তোমাকে বল্‌তে চাই। শোন। তুমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাল যে প্রবন্ধটি পড়ছিলে তার মধ্যে একটা কথা তুমি ঠিক্ ধ'রেছ। অর্থাৎ প্রতি বড় আর্টের মধ্যে একটা অনন্তসম্ভাবিতা বা inevitability আছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই। আমি যে কথাটা তুল্‌লাম সেটার আলোচনা করতে করতে এ কথাটা বোধ হয় বেশি ক'রে বোঝাতে পারব।

"ব্যাপারটা কি জান? আর্ট মানেই হচ্ছে সীমার মধ্যে একটা অসীম সৌন্দর্য্যের পরশ দেওয়া। যে-মুহূর্ত্তে অশরীরীকে শরীরী হ'তে হয় সে-মুহূর্ত্তে তাকে সীমাকে স্বীকার করতেই হয়। তানালাপ সম্বলিত গানেও গায়ক এ সীমাকে অস্বীকার করেন না ব'লেই ভৈরবীতে ভৈরবীর একটা বিশেষ রূপ ফুটে উঠ্‌তে পেরেছে যেটা খাম্বাজের বিশেষ রূপটির চেয়ে পৃথক। এটা বোঝা সহজ। কিন্তু এখন আমি চাই প্রতি রাগের বৈশিষ্ট্যটিকে আরও individuality দিতে। অর্থাৎ আমি বল্‌তে চাই এই কথা যে প্রতি রাগের বৈশিষ্ট্যটি এমনভাবে সংহত করা যেতে পারে যাতে করে ঐ রাগে রচিত পৃথক্-পৃথক্ গানে তার রাগটির গুটিকয়েক পৃথক্ পৃথক্ রস আমাদের মনে একটা নির্দ্দিষ্ট তৃপ্তি দিতে পারে। যেমন ধর, ভৈরবীকে এমন ভাবে গাওয়া যায় যাতে ক'রে তার মধ্যে মিনতির কাছাকাছি একটা ভাবই বিশেষ ক'রে ফুটে উঠ্‌বে। আবার অন্য একটা বিশেষ কাঠামে ঐ ভৈরবীই হয়ত বৈরাগ্যের একটা আবেদন জানাবে। কিম্বা হয়ত বিরহব্যথার ভাব জাগাবে। এখন ধর দশটা ভৈরবীর মধ্য দিয়ে ভৈরবীর এই রকম দশটি ভাব মূর্ত্ত করে তুলে ধরা যেতে পারে। * কিন্তু প্রতি ভৈরবী গাইবার সময়ে গায়কের দেখ্‌তে হবে সে ঐ দশটির মধ্যে কোন্‌টি প্রকাশ করতে চাইছে। কারণ কোনও একটি বিশেষ ভৈরবী গানের মধ্যে যে বিশেষ ভাবটি প্রকাশ করা গুণীর উদ্দেশ্য সে ভৈরবীটির মধ্যে অন্য নয়টির একটী ভাবও

* আমি ফরোয়ার্ডে একবার এই কথা লিখেছিলাম। তার উত্তরে একজন গতানুগতিক ওস্তাদিপন্থী চটে গিয়েছিলেন যে আমি হিন্দু সঙ্গীতের কিছুই জানি না ব'লেই এমন হাস্যকর কথা বল্‌তে সাহসী হয়েছি, যেহেতু প্রতি রাগের রস একটির বেশী হ'তেই পারে না। এখন হাস্যাস্পদ কে তা সাধারণের বিচার্য্য।

তার সমষ্টি জাতীয় শিল্পের ধারার একটা বৃহৎ রূপ দেখাতে পারে। একটু আগেই তুমি বল্‌ছিলে না যে আমাদের আজকের উচ্চসঙ্গীত আজকাল নিষ্প্রভ প্রাণহীন হ'য়ে প'ড়েছে, যেজন্য শরৎ চাটুয্যে মহাশয় তোমার কাছে কোনও ওস্তাদের গান্ শুন্‌তে যাবার আগে শঙ্কাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন যে তিনি গান আরম্ভ করলে থামেন কি না? এর কারণ কি জানো? কারণ এই যে আমাদের আজকের গাইয়েরা স্রষ্টা শিল্পী (creatirve artists) নন। আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি যে তানসেন তাঁর দরবারী কানাড়ায় কানাড়ার যে একটা বিশেষ মূর্ত্তি দিতে পেরেছিলেন তাঁর বংশধরগণ সে রূপের Spiritটি ধরতে পারেন নি। তাই তাঁরা অভ্যাসবশে প্রতি রাগের ঠাট ও নিয়মকানুন জেনে ও তাকেই একান্তভাবে মেনে রাগটি বজায় রেখে অনন্তকাল ধ'রে গান গাওয়াকেই তাঁদের কৃতিত্বের চরম মানদণ্ড ব'লে মনে ক'রে বসেন। তাঁরা এটা করেন যে এটা শক্ত তা ব'লে নয়। তাঁরা এটা করেন শুধু এই জন্যে যে এটা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ এজন্য অভ্যাসের খাঁজে চল্‌লেই হয়, অপরিচিত পথের সন্ধান নেবার দরকার হয় না; এবং জানই ত অভ্যাস বশে কোনও কাজ কত সহজ হ'য়ে যায়। তাই অনন্তকাল সময় না নিয়েও প্রতি গানে রাগের একটা সমাহিত সৌন্দর্য্য বিকাশ করতে পারা ঢের কঠিন। সেটা পারেন কেবল তাঁরা যাঁরা স্রষ্টা শিল্পী, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ অনুকারক মাত্র নন। স্রষ্টা শিল্পী সীমার মধ্যেই ভূমার মহিমা উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেন। অন্ধ অনুকারকেরা করতে পারে শুধু তাঁর ধাতকে নকল—তাঁর সে সহজ অনুভূতির তারা ধার ধারে না। কারণ একটা গানের ঠিক্ Spiritটি যে কি সেটা বুঝে সেই Spiritটি বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারা কল্পনা ও সত্য অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে—যে-রকম লোক আমাদের ওস্তাদদের মধ্যে আশা করা আজ বিড়ম্বনা। এককথায় আজ তারা creative artist নয় ব'লেই আমাদের সঙ্গীত এখন চলৎশক্তিহীন হ'য়ে প'ড়েছে। দেখ না কেন গত কয়েক শতাব্দীতে আমাদের মধ্যে সঙ্গীতে নতুন কোনও বিকাশই হয় নি, এক ভজনে ছাড়া। ভজনে যে হ'য়েছিল তার কারণ সেটার উদ্ভব হ'য়েছিল ঠিক্ স্থান হ'তে।" ব'লে কবিবর নিজের হৃদয়ের দিকে নির্দ্দেশ কর্‌লেন।

আমি বল্‌লাম: "এ সম্বন্ধে আমার কেবল একটি মাত্র বল্‌বার কথা আছে যা নিয়ে ইতিপূর্ব্বে আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ হ'য়েছে এবং সে আলোচনা প্রকাশিতও হ'য়েছে। * তাই সে-সব যুক্তির পুনরুত্থাপন আজ আর করবার ইচ্ছে নেই। কেবল আজ আপনারই একটি বিশেষ গান আপনাকে গেয়ে শুনিয়ে দেখ্‌তে চাই আপনি এখনও আপনার সেই পূর্ব্বমতটিই সত্য মনে করেন কি না। আমি এ গানটি গেয়ে শুনিয়ে আপনাকে সাধ্যমত এইটে দেখাবার প্রয়াস পাব যে প্রতি গানের individuality বজায় রাখবার একমাত্র পন্থা তার সুরের কাটামটিকে অনড় অচল ক'রে গাওয়া নয়, তার উপায় হচ্ছে—গুণী সে সুরটিকে যে ভাবে গ্রহণ করেন সেই ভাবেই নিজের মতন ক'রে তাকে প্রকাশ করা। বস্তুতঃ আপনার রচনাকে মানুষ কখনই ঠিক্ আপনার মতন গ্রহণ করতে পারে না। রোমাঁ রোলাঁ আমায় একটা চিঠিতে বড় সত্যি কথা লিখেছিলেন যে একজন কখনই অপরের চিন্তা বা আর্ট হুবহু ধরতে পারে না; তা থেকে সে নিজের যতটুকু আবশ্যক ততটুকু গ্রহণ করে—দরকার হ'লে সেটা সৃষ্টি করে নেয়—ও বাকিটুকু বর্জ্জন করে।" †

"যাক্, এখন গানটির প্রসঙ্গে আসা যাক্। গানটি হচ্ছে আপনার 'শেষবর্ষণের' 'হে ক্ষণিকের অতিথি'। শেষবর্ষণ অভিনয়ে গানটি যখন কোরাসে শুনেছিলাম তখন এক দিক্ দিয়ে যেমন সুরের রচনাভঙ্গীটি আমার ভাল লেগেছিল, অপর দিক্ দিয়ে তেম্‌নি আমাকে একটু নিরাশ হ'তেই হ'য়েছিল যে সে গাওয়ার ধরণে এ গানটিকে যথেষ্ট সঞ্জীবিত ক'রে তোলা হয় নি। তাই আমি নিজে গানটি একটু নিজের মতন ক'রে গেয়ে থাকি যে ভঙ্গী অনেক সঙ্গীতানুরাগীকেও আনন্দ দিয়ে থাকে, যদিও সম্ভবতঃ আপনার মতাবলম্বীদের কাটাছাঁটা ভাবে গাওয়ার ধরণই বেশি ভাল লাগ্‌বে। এ মতভেদের আশু মীমাংসা বোধ হয় সম্ভব নয়, এক সময়ের

* বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, সঙ্গীত শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† Je suis trop certain que personne ne comprend vraiment l'art et la pensee d'un autre. Il en prend ce qui lui convient, ce qu'il veut d'avance (au besoin meme il l'invente) et il laisse le reste. চিঠির তারিখ—৩১.৭.২২

বিচারেই তা হ'তে পারে। তাই আমি বলি এই কথা যে বেশ, আপনার হুবহু সুরটা আপনারা বজায় রাখুন, আমরাও আমাদের নিজেদের মতানুসারে গানটি নিজের মতন ক'রে গাইতে থাকি। আমার মনে হয় যে এ স্বাধীনতা আমাদের থাকা উচিত—যখন কেউই জোর ক'রে বল্‌তে পারে না যে আপনারাই ঠিক আমরাই ভ্রান্ত। অবশ্য আপনার-দেওয়া সুরের বদল সদল করতে যাবার বিপদ আছে একথা আমি মানি। কিন্তু একথার উত্তর আমি ইতিপূর্ব্বে দিয়েছি যে বিপদের সম্ভাবনা আছে এ যুক্তি-বলে কোনও আদর্শকে ছোট মনে করা চলে না। আমি মানি যে প্রতি রচনার interpretationএর একটা সীমা থাকেই থাকে যেটা লঙ্ঘন করলে তার রসের ব্যত্যয় ঘটে। কিন্তু মুস্কিল এই যে কোথায় যে এ সীমানা টান্‌তে হবে সেটা নির্ভর করতে পারে—এক গুণীর সহজ রসবোধের ক্ষমতার ও সূক্ষ্ম সৌষ্ঠবজ্ঞানের ওজনের ওপর—আপনার নির্দ্দেশ বা আপত্তির ওপর নয়।"

ব'লে আমি 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটি নিজের মতন ক'রে গাইলাম—অবশ্য কবিবরের সুরের কাঠামটি বজায় রেখে। গানটি শেষ হ'লে বল্‌লাম: "এখন আমি আপনার অকপট মত চাই গানটির রসের এতে হানি হ'ল কি না। নিন্দা করলে আমি ব্যথা পাব মনে করবেন না, কেন না আপনার সুরের ওপর হস্তক্ষেপ করা যে আপনার ভাল লাগ্‌বে না এটা আর যাই হোক্ না কেন অস্বাভাবিক যে নয় এটা নিশ্চিত। তাই আপনার অনুমোদন না পেলে আমি আপনাকে দোষ দেব না বা মর্ম্মাহতও বোধ করব না। কেবল আজ আমি জান্‌তে চাই এই কথাটি যে আমার ও অনেক সঙ্গীতানুরাগীর কানে যখন এ-ভাবে গাওয়া আপনার ঢঙে গাওয়ার চেয়ে বেশি ভাল লাগে তখন কেমন ক'রে আপনিই বা জোর ক'রে বল্‌তে পারেন যে গায়ককে তা সত্ত্বেও তার সত্য অনুভূতির কণ্ঠরোধ ক'রে হুবহু আপনার সুরের পদাঙ্কই অনুসরণ করতে হবে?" *

* রোমাঁ রোলাঁ পূর্ব্বোক্ত পত্রে আর একস্থলে বড় সুন্দর লিখেছিলেন: "ললিতকলার মানে এ নয় যে স্রষ্টা তাঁর নিজের ভাবরস হুবহু অপরকে গলাধঃকরণ করিয়ে দেবেন। স্রষ্টা সৃষ্টি করেন—বপন করার জন্যে। সব সৃষ্টিই যেন একটা প্রসবের কাজ; প্রসূতি আগে থেকে জান্‌তে পারে না কি রকম সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সে যায় শুধু জীবনের বীজ ছড়িয়ে।" (On n'ecrit pas une œuvre. d'art, On ne cree pas pour imposer sa pensee On creep oural semen.)

কবিবর বল্‌লেন: "ঠিক্ তা আমি কখনও বলি না। প্রতি গানের সুরভঙ্গীর মধ্যে একটা elasticity আছে এ কথা কোন্ কলাবিৎ না জানেন? তোমার মুখে আমার এ গানটি আমার আজ সত্যিই খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু সেটা এই জন্যে যে তুমি আমার সুরভঙ্গীর সেই elasticity-টুকুর সীমাটি লঙ্ঘন কর নি। অবশ্য কোথায় ও কেমন ক'রে যে সীমা লঙ্ঘন করা হয় তা আগে থেকে বলা যায় না মানি। কিন্তু প্রতি গান শোন্‌বামাত্র বোঝা যায় সে গানে সীমাটি লঙ্ঘন করা হ'ল কি না। ঢাকায় এবার আমি এক জমিদারের স্ত্রীর মুখে আমারই দু একটি গান হিন্দুস্থানী ঢঙে গাইতে শুন্‌লাম যা আমার ভারি চমৎকার লাগ্‌ল। কই, সে ক্ষেত্রে আমি ত জোর ক'রে বলিনি যে না, তাকে গানগুলি হুবহু আমার ঢঙেই গাইতে হবে? আমি অন্যায় আবদার কর্‌বই বা কেন?

আমি বল্‌লাম: এ ভরসা আপনার কাছ থেকে পেয়ে একটু আশ্বস্ত হ'লাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে এ আংশিক নিষ্পত্তির নজীর যে আপনার সুরের মাছিমারা অনুকরণ-পন্থীদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে এতটা আশা করার দুঃসাহস আর যারই থাকুক না কেন আমার যে নেই এটা নিশ্চিত।

অবশ্য মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু—মাফ করবেন—এঁরা আমাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবার জন্যে যে-সব যুক্তির সাহায্য নেন সে-সব খুব সুযুক্তি ব'লে বোধ হয় না। এঁরা বলেন যে যেহেতু সুরটি আপনার দেওয়া সে-হেতু অপরের তাতে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকারই থাক্‌তে পারে না। এ কথাটা আমার নিতান্তই arbitrary মনে হয়, অথচ তাঁরা একে এতই স্বতঃসিদ্ধ গোছের মনে ক'রে থাকেন যে তাঁদের বল্‌তে ইচ্ছে হয় যে মানুষের অভিজ্ঞতা বহুবার ঠেকে শিখেছে যে আজ কোনও-কিছু স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মনে হচ্ছে ব'লেই বলা চলে না যে বস্তুতঃ সেটা সত্য। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন থিওরির উত্থান্ পতনের ইতিহাস যাঁরা একটু ভেবে দেখেছেন তাঁরা একথা জানেন।

প্রকাশ করবার চেষ্টা করলে আর্টের ঐ inevitability নীতিটির ব্যত্যয় ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। এই কথাটা গায়কের মনে রাখা দরকার। এটা কঠিন। এবং কঠিন ব'লেই ওস্তাদেরা দেড় ঘণ্টা ধ'রে রাগটির সমস্ত রূপ প্রকাশ করতে বেশী উৎসাহী হয়ে পড়েন। তোমাকে যদি দেড় ঘণ্টা সময় দেই তাহ'লে তুমি ভৈরবীর মধ্যে হয় ত নানা সৌন্দর্য্য দেখাতে পারবে। কিন্তু যদি তোমাকে বলি দশমিনিটের মধ্যে ভৈরবীর শুধু একটা facet বা বিশেষ আবেদন—ধর অনুরোধের কাছাকাছি একটা ভাব—ফুটিয়ে তোল দেখি; কিন্তু দেখো অনুরোধের আবেদনের মধ্যে যেন ভৈরবীর বৈরাগ্যের আবেদন এনো না। তখনই দেখ্‌বে ওস্তাদ প্রভু মহা বিপদে প'ড়ে যাবেন।

এটা হচ্ছে এক শ্রেণীর গানের বাণী। এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। কেন না কানাড়া গাইতে বললেই যে সব সময় গুণীকে কানাড়ার আপাদমস্তক বর্ণনা সুরু করতে হবে তার কোনও মানে নেই। একজন গুণী বল্‌তে পারেন আমি অমুক কানাড়া গানের মধ্য দিয়ে কানাড়ার উদাস ভাবটিই শুধু ফুটিয়ে তুল্‌ব। অবশ্য সে এই কথা বল্‌বামাত্র কানাড়াকে আরও সীমাবদ্ধ কর্‌ল। কিন্তু বলেছিই ত যে সীমাকে স্বীকার করা আর্টের ফুটে-ওঠার একটা প্রধান সর্ত্ত। কেউ যদি কানাড়ার এ বিশেষ রূপটি শুনে বলেন বেশ হ'ল কিন্তু আমার এতে তৃপ্তি হ'ল না আমি আরও চাই—তাহ'লে সেটা কিরকম হ'ল জান? ধর, গল্প বল্‌তে বল্‌তে আমি শেষ কর্‌লাম শেষে হতাশ রাজপুত্র যখন হতাশার চরম সীমায় পৌঁছেছেন তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ তাঁর বাঞ্ছিতা রাজকন্যাকে দেখ্‌তে পেয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলেন। এতে কয়েকজন শ্রোতা মহা উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করে বস্‌লেন,: 'তারপরে কি হ'ল? তার পর রিয়ে হ'ল ত?' আমি তাহ'লে তাঁদের বল্‌তে পারি যে তার পরে কি হ'ল আমি বল্‌তে চাই না। কিন্তু এ কথায় তাঁরা খুসী হলেন না। যদি আমি এই রকম কথা ব'লে শেষ কর্‌তাম: 'তার পর পুরুত এল বাদ্যি বাজল দীপালোকিত কক্ষে রাজকুমার সোণার কাটি দিয়ে জিয়োনে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌লেন, তাহ'লে সেদিনকার গল্পে হয় ত পূর্ব্বোক্ত শ্রোতৃবৃন্দ হাঁফ ছেড়ে বল্‌তেন: "আঃ, বাঁচলাম, এই ত চাই। কিন্তু আপনার সেদিনকার গল্পটার মধ্যে এ সম্পূর্ণতার রস পাই নি।" গল্পের শ্রোতার এরকম আপত্তি যেমন ন্যায়সঙ্গত নয়, গানের শ্রোতার প্রতি গানের তানালাপের অজস্রতা না-পাওয়ার দরুণ আপত্তি করাও তেম্‌নি যুক্তিসঙ্গত নয়।

আমি তারপর আমার "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ" শীর্ষক প্রবন্ধটির বাকী অংশটুকু প'ড়ে শোনালাম। * তাতে আমি একজায়গায় লিখেছিলাম এই কথা যে আমাদের উচ্চ-সঙ্গীতের বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ এ নয় যে ইংরাজরাজ মোগলরাজের মতন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন না বা সাধারণে উচ্চসঙ্গীতের মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন। তার কারণ এই যে আমাদের সঙ্গীত বর্ত্তমান সময়ে যুগধর্ম্ম মেনে চলে নি। অর্থাৎ এক কথায় উচ্চ সঙ্গীত কখনই আর সে মামুলি ধারায় বিকাশ লাভ করতে পারে না। তাকে একটা নবজন্ম দিতেই হবে।

কবিবর বল্‌লেন: "তুমি কথাটা ঠিক্ বলেছ। কেবল এখনকার যুগধর্ম্ম বল্‌তে তুমি কি বোঝ সেটা যথেষ্ট ব্যাখ্যা ক'রে দাওনি। আজকালকার যুগধর্ম্ম মানে হচ্ছে যেটা undifferentiated ছিল সেটা differentiated কর্‌া ব্যক্তিত্বের দানের সাহায্যে। ধর বিদ্যাসাগরী আমলে রামের রাজ্যাভিষেক ও সীতার বনবাসে মূলতঃ একই ঠাট বজায় ছিল। অর্থাৎ রামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন কর্‌তে হয়েছিল এই ধরণের একটা ভাষা। কিন্তু বঙ্কিমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এ মামুলি শব্দের গর্জ্জনের ধারা লোপ পেল ও সে স্থলে এল কি না, প্রতি ব্যক্তির মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের ফলে একটা সাহিত্য গড়ে ওঠা। সে ধারা আজ আরও বিকাশ পেয়েছে। তাই শরৎবাবু বঙ্কিমেরই এই ধারা নিয়েছেন কিন্তু তিনি বঙ্কিমী ঠাট বজায় রাখেন নি; নিজের মতন লিখে গেছেন। এইরকম ক'রেই প্রতি মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের এক একটা দিকের উপলব্ধি ফুটে ওঠে এবং যুগে যুগে এই সব নানাব্যক্তির আত্মপ্রকাশের সমষ্টির ধারার নামই যুগধর্ম্ম।" †

* বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ দ্রষ্টব্য।

† হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের "Progress" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এই কথাটিই বিশদ করে বলেছেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে বহুল দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে মানুষ সভ্যতার প্রতি বিকাশই সাক্ষ্য দেয় যে progressএর অর্থ differentiation বা change from the homogeneous to the heterogeneous. তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে একথা শুধু যে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে খাটে তাই নয় শিল্প, সাহিত্য, ভাষা, সঙ্গীত প্রভৃতি সমস্ত মানসিক সৃষ্টি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

আমি বল্‌লাম: "তাহ'লে tradition জিনিষটির মধ্যে কি কোনও সত্য নেই?"

কবিবর বল্‌লেন: "আছে বই কি? ব্যক্তিত্বের বিকাশকে সত্য ব'লে স্বীকার করার মানে কি tradition-এর ভিতরকার সত্যটিকে অস্বীকার করা? Tradition হচ্ছে আসলে মাটি। কিন্তু সে মাটি যখন জীবকে আবদ্ধ না ক'রে আশ্রয় স্বরূপ হ'য়ে ওঠে, তখনই তা বন্ধন না হয়ে সত্য হ'য়ে ওঠে।"

আমি বল্‌লাম: "তার মানে?"

কবিবর বল্‌লেন: "কেমন জান? যেমন নদী ও তার দুই তীর। তীরের কাজ কি? না, নদীর শক্তিকে সংহত ক'রে তাকে গতিশক্তি দেওয়া। এখানে তুমি বল্‌তে পার না যে নদীর দুই তীর তার অবাধ স্বাধীনতাকে ব্যাহত ক'রে একটা অসত্যতারই পরিপোষণ করছে। কারণ এই দুই তীরের জন্যই নদী—নদী। নইলে তা বদ্ধ জলাশয় হ'য়ে পড়্‌ত। সেই রকম, Tradition হচ্ছে প্রতি জাতির মধ্য দিয়ে গুটিকতক সত্যের প্রকাশের আশ্রয়। মানুষ তার সৃষ্টিলীলায় দেখেছে যে তার স্ফূরণের আনন্দ পাবার উপায়ের গুটিকতক বিধি ব্যবস্থা আছে। তার মনের প্রকৃতিই এ সব বিধি ব্যবস্থার সৃষ্টি ক'রেছে। তাই এ সব নিয়ম বা ধর্ম্মকে নৈমিত্তিক (accidental) বা সাময়িক বলা চলে না। বলা চলে না যে যেহেতু গৃহ আমাদের প্রকৃতি হ'তে বিচ্ছিন্ন করে সেহেতু গৃহ অসত্য, বন জঙ্গলই সত্য।"

আমি বল্‌লাম: "কিন্তু traditionএর অত্যাচার সম্পর্কে—"

কবিবর: "প্রতি জীবন্ত traditionএর মধ্যে যথেষ্ট elasticity থাকেই থাকে। তা যদি না থাক্‌ত তাহ'লে tradition নদীতীরের মতন নদীর গতিকে সহজ না ক'রে নদীর মোহানায় 'ব'দ্বীপের মতনই স্রোতরুদ্ধকর হ'য়ে দাঁড়াত। মানুষ এ সত্যটি অনেক সময়ে ভুলে গিয়ে traditionএর কঙ্কালকেই বড় ক'রে দেখে থাকে। অর্থাৎ traditionএর মধ্যে সত্য যেটুকু সেটুকুর সুবিধে না নিয়ে তার বন্ধনকেই একান্তভাবে স্বীকার ক'রে বসে। সেই সব সময়ে প্রতিভার অভ্যুদয় দরকার হ'য়ে পড়ে ও তিনি এসে traditionএর মধ্যে যা জড়তারই পরিপোষক তাকে ভেঙেচুরে দিয়ে জীবনীশক্তির স্রোত বহান—তাঁর সৃষ্টির গঙ্গোত্রী দিয়ে। কিন্তু অনেক traditionএর প্রাণশক্তিহীন জাড্যকে তিনি দূর ক'রে থাকেন ব'লেই বলা চলে না যে তিনি তাঁর নিত্য-নূতন সৃষ্টির দ্বারা মানুষের যুগসঞ্চারী traditionএর ভিতরকার গভীর সত্যটাও অস্বীকার ক'রে বসেন। কারণ tradition হচ্ছে বস্তুত মানুষের আনন্দ প্রেরণা পাবার ও নিজেকে প্রকাশ ক'রে তুলে ধরবার উপযোগী পরীক্ষিত নিয়মকানুন বা ধর্ম্মের সমষ্টি। তাই তাকে একদম অস্বীকার করলে যা সৃষ্টি হয় সেটা খাপ-ছাড়াই হ'য়ে ওঠে, সত্য হয় না। বস্তুতঃ যিনি প্রকৃত কলাবিৎ তিনি বিধাতার কাছ থেকে সেই সহজ অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ অনুভূতির (intuition) আলোর বর নিয়েই আসেন যার আলোয় তিনি এক মুহূর্ত্তে দেখ্‌তে পান প্রতি traditionএর কতটুকু সত্য ও চিরন্তন ও কতটুকু নির্জ্জীব ও সাময়িক।"

ব'লে একটু থেমে বল্‌তে লাগলেন: "এখন গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। আমি গানের মধ্যে অনেক সময়ে কি চাই জান? আমি বলি বেশ, খাম্বাজের সমগ্র রূপটি আমার জানা আছে—সেটা ত তুমি আমাকে অনেক-বার শুনিয়েছ—এখন এসো আমাকে খাম্বাজের একটা বিশেষ রূপ দাও। অর্থাৎ খাম্বাজের traditionকে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু তবু খাম্বাজের মধ্যেই তার একটা নতুন বিকাশ কামনা করি। যদি একটি ছোট্ট গানেও আমি খাম্বাজের এ বিশেষ রসটি পূর্ণভাবে পাই তাহ'লে আমার মন একটা পরম খুসিতে ভ'রে উঠ্‌বে ও সে গানটি অনেকবার শুন্‌তেও ক্লান্তি বোধ করব না। কারণ সেটা একটা সত্য প্রকাশ হ'ল। আমি বলি হে গুণী তুমি তোমার মধ্য দিয়ে গানকে প্রকাশ কোরো না গানের মধ্য দিয়ে তোমাকেই প্রকাশ কর। তাহ'লেই তোমার গান সত্য হবে। কারণ এক প্রত্যেকে যদি নিজের নিজের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের নানান্ দিক ও মুখ প্রকাশ ক'রে তুলে ধর্‌তে পারে তাহলেই

অনেক ধ্রুব scientific axiom ও Euclidian postulatesও আজ ধ'সে পড়ছে। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশী আক্ষেপজনক সেটা হচ্ছে এই যে তাঁরা ভুল উপমা প্রয়োগ দ্বারা এ রকম একটা অপরীক্ষিত axiomকে চিরন্তন সত্য ব'লে প্রমাণ করবার প্রাণপণ প্রয়াস পেয়ে থাকেন। সাধারণ লোক এ রকম পন্থা অবলম্বন করলে অবশ্য তাতে ক্ষুব্ধ হবার বিশেষ কারণ থাকৃত না। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'তে হয় যখন অবনীন্দ্রনাথের মতন লোকও এ রকম স্বচ্ছ ভুল উপমা দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রমাণ করতে যান। তিনি একদিন অম্লানবদনে আমাকে এমন কথাও বলেছিলেন যে আপনার গান যদি কোনও গায়ক ইচ্ছামতন বদ্‌লে সদ্‌লে গাইবার অধিকার দাবী ক'রে বসেন তাহ'লে ত যে-কোনও অসন্তুষ্ট লোক তাঁর ছবির আঙুল ছোট ক'রে নেবারও অধিকার দাবী ক'রে বস্‌তে পারে? আমি উত্তরে বল্‌তে চাই যে এরূপ উপমা দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করতে যাওয়ার মতন বিড়ম্বনা জগতে কমই আছে। যেখানে মূল বক্তব্যটি স্বীকৃত কেবল সেখানেই উপমার সার্থকতা, কেননা সেখানে উপমা বক্তব্যটিকে স্ফুটতর ক'রে তোল্‌বার সহায়তা ক'রে থাকে। কিন্তু যেখানে গোড়ায়ই মতান্তর সেখানে উপমা কোনোমতেই যুক্তির স্থান অধিকার ক'রে বস্‌তে পারে না। সুতরাং আমি বল্‌তে চাই যে সাহিত্য বা চিত্রকলার উপমা এখানে অবান্তর। আসল কথা স্রষ্টার সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন interpretationএর স্বাধীনতা থাকা সমর্থনীয় ও বাঞ্ছনীয় কি না।"

কবিবর বল্‌লেন: "এ স্বাধীনতা আমি কখনও অস্বীকার করি না। হ্যামলেটের আজ একশ' এক রকমের interpretationএর চল্‌তি হ'য়েছে। কিন্তু কে বল্‌তে পারে এটা সুষ্ঠু নয়? আর সুষ্ঠু নয় বল্‌লেই বা কোন্ interpretationটি যে সত্য তা কে নির্দ্দেশ ক'রে দেবে? আমি কেবল বল্‌তে চাই—যে প্রতি গানের বিশেষ রূপটি সম্বন্ধে একটু আন্তরিকভাবে ভাবো, ও এক শ্রেণীর সঙ্গীতের আদর্শ অন্য শ্রেণীর সঙ্গীতের স্কন্ধে চাপিয়ো না। অবশ্য ভাব্‌লেই যে প্রতি গায়ক এটা ধরতে পারবেন তা বলা যায় না। তবে এ সমস্যার অন্য কোনও সমাধানও যখন দেখা যাচ্ছে না তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ত গুণীকে কমবেশি স্বাধীনতা দিতেই হবে—বিশেষতঃ যখন ললিতকলার মধ্যে সঙ্গীত এ বিষয়ে একটু বেশি রকম অসহায়। কেমন জান? ধর কাব্য বা চিত্র বা ভাস্কর্য্য। এদের স্থিরতাকে স্থায়ী করা যায়। কিন্তু সঙ্গীত ত তা নয়। তাকে যে প্রতি মুহূর্ত্তে নির্ভর করতে হয়, গুণীর গুণপনার উপর। তাই সঙ্গীতকারের স্বরচিত গানকে গায়কের হাতে সঁপে দেওয়া যেন মেয়েকে জামাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে বলার মতন যে 'বাপু হে আমার এ আদরের ধনটিকে আমিই জন্ম দিয়েছি বটে কিন্তু এখন থেকে এর ভার একেবারে তোমার—একে সুখে রাখ সুখে থাকবে, দুঃখ দাও দুঃখ পাবে'।"

কবিতা ও কুসুম

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

কুসুমে যেমন তুমি পরিপূর্ণ, রস ঢল-ঢল
প্রস্ফুট লাবণ্যভার অর্পিয়াছ একটি নিমেষে;
পল্লবে যেমন তুমি চিরদিন পেলব, বিমল
শ্যামল সস্নেহ বাণী দিয়ে গেছ সুমধুর হেসে;
তেমনি কোমলস্পর্শে সঞ্জীবনী সুধা দাও ঢালি'
মধুর কবিতা প্রাণে; ভরি' দাও নব অর্ঘ্য ডালি।
অশোক-অমৃত-মন্ত্রে পরিশুষ্কে প্রাণদান দিয়া
সযত্নে ফুটায়ে তোলো ভাবময়ী কবিতার হিয়া।

হে চিরসুন্দর, কবি, ক্রান্তপ্রজ্ঞ, সৃজন-বিধাতা!
কুসুমে যেমন তুমি দিলে প্রাণ, দৃশ্যরূপরাশি
ভাষার তেমনি আজি হও তুমি নবপ্রাণদাতা;
বিচ্ছুরিত বিভাজালে বিভাসিয়া তোলো তার হাসি।
কুসুমে যেমন দিলে নব বর্ণ, নব মধুধারা;—
কবিতায় দাও প্রেম, নব রূপ, বাধা-বন্ধ-হারা।
কবিতা-কুসুমে হো'ক ধীরে ধীরে প্রাণ-বিনিময়
তুমি যে বাঁধিবে জানি, তারি মাঝে অমর আলয়।

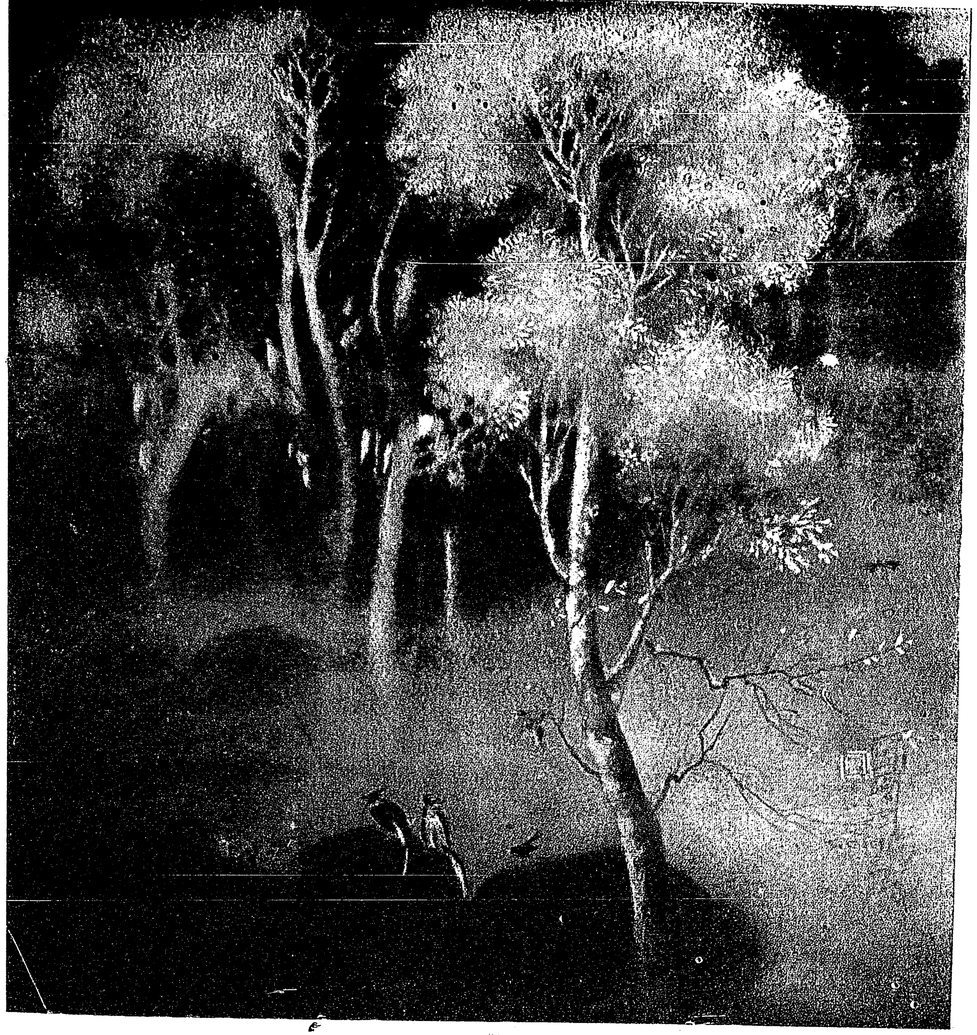

বসন্তের সজ্জা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। মালয়ী ভাষায় ইহাকে 'তিরুবিতাম্‌কুর' বলা হয়। কুমারিকা অন্তরীপকে শৃঙ্গ ধরিয়া ইহাকে একটী বিষমবাহু ত্রিভুজ বলা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে কোচিন্‌রাজ্য ও বৃটিশ কোয়াটোর জেলা; পূর্ব্বে—বৃটিশ মাদুরা ও তিন্নিবিল্লী জেলা; দক্ষিণ এবং পশ্চিমে—ভারতমহাসাগর। উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য—১৭৪ মাইল; পূর্ব্বপশ্চিমে প্রস্থ—৭৫ মাইল; ক্ষেত্রফল—৭,৬২৫ বর্গমাইল। অর্দ্ধেকেরও বেশী জায়গা পাহাড়-পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেগুন্, আবলুশ, কাঁঠাল ও অন্যান্য বিবিধ বাহাদুরী কাষ্ঠ এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসী আমার জনৈক বন্ধু এক দিন বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বাংলাদেশের অপেক্ষা তথাকার ফলগুলি আকারে অনেক বড় হয়। এক একটী কাঁঠাল দুইজন লোকের কমে তোলা যায় না। হস্তী, ব্যাঘ্র, বৃষ, চিতাবাঘ প্রভৃতি বন্য জন্তু যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত গরম খুব বেশী। ভাত, মাছ, আটা প্রভৃতি অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।

প্রাচীন ইতিহাস মাত্রই কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে। তবে, ইহা সুনিশ্চিত যে, ত্রিবাঙ্কুরের রাজ-পরিবার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চেরবংশ-সম্ভূত। মিঃ স্মীথ ত্রিবাঙ্কুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The Kerala or Chera kingdom included the Malabar District with the modern Cochin and Travancore States, and sometimes extended eastwards." P. 144

"The Chera or Kerala territory consisted in the main of the rugged region of the Western Ghats to the South of the Chandragiri river, which falls in the sea not far from Mangalore, and forms the boundary between the peoples who severally speak Tulu and Malayalam." P. 206.

Little is known about the details of the mediaeval history of the Chera kingdom, which was subject to the more powerful members of the Chola dynasty. The conquest was the first military operation on a large scale undertaken in the reign of Rajaraja Chola, about A. D. 990 The kingdom ordinarily included greater part of the modern Travancore State. Village assemblies exercise extensive powers, as in the Chola territory. The Kollam or Malabar era of A. D. 824-5, as commonly used in inscriptions seems to mark the date of the foundation of Kollam or Quilon." P. 215.

The immediate cause of the (Carnatic) war was Tippoo's attack on Travancore, a state in alliance with and under the protection of the Company. On December 29, 1789 he assailed the 'lines of Travancore,' a rampart covering thirty miles of the northern frontier of the state, and suffered a repulse owing to a sudden panic among his troops. P. 559.

The strangest event during Lord Minto's term of office was the mad rebellion in Travancore organized by the Diwan or minister, Velu Tampi. The country had

been shockingly misgoverned, and constant disputes had existed between the minister and the Resident concerning the administration and the arrears of payment for the subsidiary force. In December 1808 the minister, who felt much aggrieved at certain measures taken by the Resident, made a furious attack on the House of that officer, who barely escaped with his life. Velu Tampi then issued a violent proclamation calling on the inhabitants to defend caste and the Hindu religion, which elicited an eager response from the Nayars. 'The whole country rose like one man. Their religious susceptibilities were touched, which in a conservative country like Travancore is like smoking in a powder magazine'. An officer and about thirty European soldiers of H. M. 12th Regiment were foully murdered, an incident which induced Thornton to echo an opinion that in turpitude and moral degradation the people of the State transcend every nation upon the face of the earth. That severe judgment is not justified by the later history of the State, which is now, and has been for many years, exceptionally well administered. The rebellion, of course, never had any chance of success and was soon suppressed. The minister committed suicide and his brother who deservedly hanged for his active share in the murder of the soldiers." (History of India by Mr. Smith.) P. 615.

সারমর্ম্ম—কেরল বা চের রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার জেলা ও কোচিন রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাষা সাধারণতঃ তুলু ও মালয়ালাম ছিল। ৯৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা-রাজ চোল বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুরের অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন। গ্রাম্য পঞ্চায়তদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও কার্য্যদক্ষতা দেখা যাইত। 'কোল্লম্' বা মালাবার অব্দ হইতে 'কুইলন' নামক স্থানের উৎপত্তির তারিখ নির্ণয় করা যাইতে পারে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতানের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে যুদ্ধ হয়, তাহার অব্যবহিত কারণ টিপুর ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ। তখন হইতেই ত্রিবাঙ্কুর বৃটিশগবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজ্য। ১৮০৮-৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর সময়ে ত্রিবাঙ্কুরে ভীষণ বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ইংরাজ প্রতিনিধি এবং দেশী শাসনকর্ত্তার মধ্যে নানা কারণেই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তত্রত্য সৈন্যবাহিনীর খরচ যোগাইতে জনসাধারণ অসম্মত হইল। দেওয়ান বেলু তাম্পীর অধীনে সুসংবদ্ধ হইয়া তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। প্রথম অবস্থায় তাহারা জয়লাভই করিয়াছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। কোম্পানীর পশুশক্তির নিকট পরাজিত হইল। বেলু তাম্পী আত্মহত্যা করিল এবং তাহার ভাই ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিল।

মহারাজা মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা (১৮২৯—৫৮ খৃঃ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া সমগ্র ত্রিবাঙ্কুরে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনিই বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুরের স্থাপয়িতা। রাজধানী ত্রিবান্দ্রামের কয়েক মাইল উত্তরে আঞ্জিঙ্গো নামক স্থানে ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তথায় একটী কারখানা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর কর্ণাটক ও মহীশুর যুদ্ধে ত্রিবাঙ্কুর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সময় ত্রিবাঙ্কুরের নামও যুক্ত ছিল। টিপুসুলতানকে বাধা দিবার জন্য ১৭৮৮ খৃঃ ত্রিবাঙ্কুর ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে একটী সাধারণ চুক্তিপত্র হয়। কিন্তু পরে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে যথা-যথভাবে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সেই সন্ধির সর্ত্তমতে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ত্রিবাঙ্কুরকে রক্ষা করিতে কোম্পানী প্রতিশ্রুতি দেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা নজরানা ত্রিবাঙ্কুর সরকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিয়া থাকেন।

(Report on the Administration of Travancore, 1924—25.)

মহামান্য 'শ্রীপদ্মনাভ দাস ভাঞ্চিপাল রামবর্ম্মা কুলশেখর কীরিতপতি মান্নী সুলতান মহারাজা রাজারাম রাজা বাহাদুর সমসেরজাঙ্ ত্রিবাঙ্কুর মহারাজ ১৯১২ খৃঃ ৭ই নভেম্বরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে তারিখে তিনি 'মসনদ' প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত মহামান্যা 'শ্রীপদ্মনাভসেবিনী ভাঞ্চিধর্ম্মবর্দ্ধিনী রাজরাজেশ্বরী' মহারাণী সেথু লক্ষ্মীবাই প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন। মহারাজার অভিনন্দনের জন্য ১৯টী তোপধ্বনির ব্যবস্থা আছে। মালাবার প্রদেশের রীতি অনুসারে ত্রিবাঙ্কুর রাজ-পরিবারে মাতৃসূত্রেই জাতাধিকার জন্মিয়া থাকে। Marumakkathayam Law অনুসারে রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ণীত হয়।

রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা

মহারাণীর নামে এবং শাসনাধীনেই রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রধান মন্ত্রীকে 'দেওয়ান' বলা হয়। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য বৃটিশ ভারতের আদর্শানুযায়ী পৃথক পৃথক বিভাগ গঠিত হইয়াছে। আইনের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং নূতন আইন তৈরীর জন্য একটী আইন-পরিষৎ আছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে উহার সৃষ্টি হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পরিষদের একটু সংস্কার করা হইয়াছে। নূতন নিয়মানুসারে পরিষদের মোট সভ্যসংখ্যা—৫০ জন; তন্মধ্যে ২৮ জন জনসাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত, ও ২২জন সরকারের দ্বারা মনোনীত। শেষোক্ত ২২জনের মধ্যেও মাত্র ১৫ জন সরকারী কর্ম্মচারী থাকিতে পারেন। দেওয়ানই পরিষদের সভাপতি। দেওয়ানের অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সরকারী বা বেসরকারী যে কোন যোগ্য ব্যক্তি সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন। বাৎসরিক আয়ব্যয়ের খস্‌ড়ায় মতামত প্রকাশ করিবার এবং প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার সভ্যদের আছে। নির্ব্বাচিত ২৮ জনের মধ্যে ১ জন ত্রিবান্দ্রামের নগরপালদের সভা (Municipality) হইতে, ২২ জন—৩০টী তালুক ও বাকি ৮টী মিউনিসিপ্যালিটি হইতে, ১ জন জমিদার পক্ষ হইতে, ১ জন পেনসন প্রাপ্ত সৈন্যদের মধ্য হইতে, ১ জন—কৃষক সম্প্রদায় হইতে ও অবশিষ্ট ২জন—ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। যাঁহাদের ভূমির খাজনা বাৎসরিক ৫৲ টাকার নীচে নয়, মিউনিসিপালিটীর এলাকাধীন যাঁহাদের জমির কর ৩৲ টাকার কম নয় (ত্রিবান্দ্রামসহরে ২৲), যে সব ব্যবসায়ীর আয়ের উপরে মাশুল (Income tax) দিতে হয়, যেসব 'গ্র্যাজুয়েট' সরকারের অনুমোদিত কলেজ হইতে উপাধি লাভ করিয়াছেন, নায়ার সৈন্যবাহিনীর যে কোন অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা মহারাজার নৌবল বা স্থলবলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন ব্যক্তি ত্রিবান্দ্রামে অবস্থান কালে—সভ্যপদ প্রার্থীদের নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারেন। ২১ বৎসরের কম বয়স্ক বা বিকৃত-মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি ভোট দিতে পারিবে না। নির্ব্বাচনে এবং সভ্যপদে স্ত্রীপুরুষের সম্পূর্ণ সমান অধিকার।

ভূতপূর্ব্ব মহারাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে একটী রাষ্ট্রীয় পরিষদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভিতর দিয়া এক দিকে যেমন সাধারণ প্রজারা তাঁহাদের অভাব অভিযোগ নিজেই সরকারের নিকট নিবেদন করিতে পারে, তেমনি, অপর দিকে সরকারও জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাব জানিবার ও যুক্তি-পরামর্শ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। এই সভার নাম—'শ্রীমূলম পপুলার এ্যাসেম্বলী।' ইহার মোট সভ্য সংখ্যা ৪০০। প্রথম বৎসর সভ্যগণ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন—কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসর হইতে নিম্নলিখিতরূপে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।—

যাঁহার ভূমির খাজনা বাৎসরিক ৫৲ টাকার অন্যূন, যাঁহার বাৎসরিক আয় ২০০০৲ টাকার কম নহে, এবং যে সব 'গ্র্যাজুয়েট' অন্ততঃ ১০ বৎসর কাল নিজ তালুকে বাস করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—কেবলমাত্র তাঁহারাই উক্ত পরিষদের সভ্যপদপ্রার্থীদিগকে ভোট দিতে পারেন।

শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য রাজ্যটী ৩০টী তালুকে বিভক্ত হইয়াছে। কোন কোন বিশেষ তালুকের অধিবাসী-দিগকে একাধিক সভ্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ৩০টী তালুক হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সাধারণতঃ নভেম্বর মাসে

তহসীলদারের (তালুকের প্রধান শাসনকর্ত্তা) তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাচনকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বাকি সভ্যগণের মধ্যে ১৯টি মিউনিসিপালিটী হইতে ১৯ জন, কৃষক-সম্প্রদায় হইতে ৪ জন, ব্যবসায়ী-সমিতি হইতে ৭জন, ও জমিদার-পক্ষ হইতে ৪ জন নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। অবশিষ্ট ২৩ জন মাত্র সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। সভাতে যে-কোন দুইটী বিষয় উত্থাপনের জন্য প্রত্যেক সভ্যকেই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে, বৎসরে একবার মাত্র (সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে) উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবার পরই সভ্যগণ স্ব স্ব প্রস্তাব ও প্রশ্নাদি স্থানীয় পেশকারের মারফতে দেওয়ানের নিকট প্রেরণ করেন। যথাসময়ে দেওয়ান সভা আহ্বান করেন। দেওয়ানের অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে যথারীতি সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভ্যগণ স্ব স্ব বিজ্ঞাপিত বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও প্রশ্নাদি করিয়া থাকেন ; এবং দেওয়ানই সরকারের পক্ষ হইতে এ সবের উত্তর দিয়া থাকেন।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য রাজ্যটীকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দেবীকুলম্, বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে 'কমিশনার' বলা হয়। এ ছাড়া অন্য তিনটী বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে দেওয়ান-পেশকার বলা হয়। ইহাঁরা সকলেই নিজের নিজের এলাকায় ভূমি-রাজস্ব ও আয়-কর বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহারা প্রত্যেকেই বৃটিশ-ভারতের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সমান ক্ষমতাপন্ন। প্রত্যেক বিভাগই কতিপয় তালুকে বিভক্ত এবং প্রতি তালুকের অন্তর্ভুক্ত অনেক 'পকুথি' বা 'পঞ্চায়েত' আছে। পকুথির প্রধান 'কর্ম্মচারীকে 'প্রোবেথিকর' বলা হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩২টী পকুথি আছে।

লোকসংখ্যা ও সাধারণ লক্ষণ

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে ত্রিবাঙ্কুরের লোকসংখ্যা ৪০,০৬,০৬২ (পুঃ ২০,৩২,৫৫৩ ; স্ত্রীঃ ১৯,৭৩,৫০৯)। লোকসংখ্যা ১৯১১ সালের অপেক্ষা শতকরা ১৬·৮ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মই প্রধান।

গত বৎসর ত্রিবাঙ্কুর ভ্রমণকালে মহাত্মা গান্ধী জাতিহিসাবে লোকসংখ্যার যে তালিকা দিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

জাতি	সংখ্যা
ব্রাহ্মণ	৬০,০০০
অন্যান্য উচ্চজাতির হিন্দু	৭,৮৫,০০০
অস্পৃশ্য হিন্দু	১৭,০০,০০০
খৃষ্টিয়ান	১১,৭২,৯৩৪
মুসলমান	২,৭০,৪৭৩
এ্যানিমিস্‌ট	১২,৬৩৭
অন্যান্য ধর্ম্মের লোক	৩৪৯
মোট	৪০,০১,৩৯৩ জন

গত দশ বৎসরে শতকরা হিন্দু ১১·৩, মুসলমান ১৯·৪, এবং খৃষ্টান ২৯·৮ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে শিক্ষায় ত্রিবাঙ্কুরবাসীরা নিম্নলিখিত রূপ অগ্রসর হইয়াছে—

পাঁচ বৎসরের শিশুদিগকে বাদ দিয়া হাজার করা

	১৯১১		১৯২১	
	সাঃ শিক্ষায়	ইংরাজী শিক্ষায়	সাঃ শিক্ষায়	ইং শিক্ষায়
ব্যক্তি	১৫০	৮	২৪১	১৩
পুরুষ	২৪৮	১৩	৩৩০	২১
স্ত্রী	৫০	২	১৫০	৫

বাৎসরিক আয় ব্যয়ের সাধারণ হিসাব নিকাশ

ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত টি রাঘবিয়া ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে পর্য্যন্ত রাজকার্য্য সুপরিচালিত করিয়াছিলেন এবং ২৩শে জুন হইতে বর্ত্তমান দেওয়ান মিঃ এম্, ই, ওয়াটস্ মহারাণী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের সরকারী বিবরণ অনুসারে ত্রিবাঙ্কুরের মোট আয়—২৮৫,৪২,১২৬ টাকা ; মোট ব্যয়—২০১,২২,৫৫৩ টাকা ; ফাজিল—৮৪,১৯,৫৭৩ টাকা। আলোচ্য বর্ষের ফাজিল টাকা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ফাজিল টাকা ও এবারের অতিরিক্ত ব্যয় (কুইলন-ত্রিবান্দ্রাম রেললাইন নির্ম্মাণের জন্য ৪,৩৯০ টাকা এবং কোচিন পোতাশ্রয় নির্ম্মাণের জন্য ৭৮,০৩৪ টাকা) মোট ৭৫৫৯৭৫ টাকা বাদ দিলে দেখা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা

৮,৬২,৫৯৮ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের বাৎসরিক আয় ও ব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আয়-ব্যয় সমভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ইহা অনুমান করা যায় যে সরকারের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্যই আয় বৃদ্ধি করা হইতেছে না। অতিরিক্ত আয়টা দেশের ও দশের কাজেই ব্যয় হইতেছে। আয় বৃদ্ধির মোটামুটি কতকগুলি কারণ নিম্নে দেওয়া গেল। ব্যয়ের তালিকায়ও দেখা যায় যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মত কেবলমাত্র সৈন্য ও পুলিশ বিভাগের জন্য সমগ্র আয়ের বেশী-অর্দ্ধেক টাকা বরাদ্দ করা হয় নাই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগেও টাকার

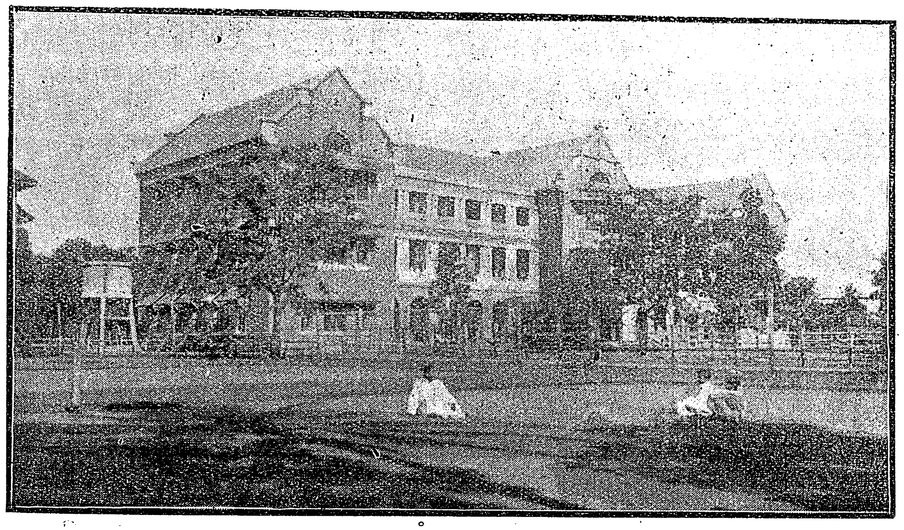

মডেল স্কুল ও ট্রেনিং কলেজ—ত্রিবাঙ্কুর

কৃপণতা করা হয় নাই এবং এ সব জনহিতকর ব্যাপারে নূতন ট্যাক্স বসাইবারও প্রস্তাব করা হয় নাই।

১। আয়কর বিভাগে মোট ২,৪৩,৯৭৯ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার মোটামুটি কারণ এই যে বন্দোবস্ত ভাল থাকায় প্রায় সমুদায় টাকাই আদায় হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরে অনেক বাকী থাকিত।

২। আবগারী দোকানের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও মোট আয় ৩,১০,৬৮৮ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত দোকানগুলি অত্যন্ত উচ্চহারে নীলাম-বিক্রী হইয়াছে।

৩। বনবিভাগে মোট ৭৩, ৯৪৩ টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ সেগুন কাষ্ঠের রপ্তানী খুব বেশী হইয়াছে।

৪। ডাক বিভাগের আয় বৃদ্ধি হইবার কারণ এই যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চিঠি পত্রের ব্যবহার অধিক হইয়াছে এবং মামলা মোকদ্দমাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৫। কলেজে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাত্র-বেতন বাবৎ শিক্ষাবিভাগের আয় সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী বিভাগে আবার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে—

১। লবণের শুল্ক কমাইয়া দেওয়াতে লবণবিভাগে মোট ৬,৫৩,০৯৭ টাকা আয় কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্যয় ৮,৩০৭ বাড়িয়াছে।

২। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও পূর্ত্তবিভাগে যথাক্রমে ৬৬,৮১১ টাকা, ১,৯৬,৫২৬ টাকা, ৩,৩৯,৩৩৯ টাকা ও ১১,৩৪০ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন যে আমরা বৃটিশ ভারতে যে সব ব্যয় কমাইতে বা বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছি, ত্রিবাঙ্কুরে কার্য্যতঃ তাহাই হইতেছে। শুধু আবগারী বিভাগটীর অসামঞ্জস্য আছে। এই ঘৃণ্য ব্যবসায়ে ত্রিবাঙ্কুরের আয়

বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছে। শিক্ষাবিভাগের অতিরিক্ত ব্যয়টী নিম্নলিখিত রূপে বিভাগ করা হইয়াছে—

	টাকা
(১) কলেজ	৬২,০৭৬
(২) ইংরাজী স্কুল	৪১,৬৩৮
(৩) দেশী ভাষার স্কুল	৩৬,২৩৫
(৪) বিবিধ	৫৫,৪৮৭

কলেজের শিক্ষায় বেশী ব্যয় হইবার প্রধান কারণ এই যে, মহারাজার কলেজকে বিজ্ঞান ও কলা দুই পৃথক শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরে যত লবণ দরকার হয়, তার অধিকাংশই দেশী কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং বাকী অংশ তিন্নিবেল্লী ও বোম্বাই হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষে ভূসম্পত্তির যথাসম্ভব পরিষ্কার আইন থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেক ধনী ব্যক্তি সুযোগ পাইলেই জমি ক্রয় করিয়া থাকেন; কারণ ভূসম্পত্তি সহজে নষ্ট হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ত্রিবাঙ্কুরে জঙ্গল পরিপূর্ণ অনেক পতিত জমি আছে। বৎসরের পর বৎসর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অনেক স্থান চাষ আবাদের উপযুক্ত করা হইতেছে। সুবিধাজনক মনে করিলে কৃষকেরা তথায় বসবাসও করিতে পারে। এইরূপ বন-জঙ্গল-পরিপূর্ণ স্থান সরকার অতি অল্পমূল্যে প্রজার নিকট বিক্রয়ও করিয়া থাকেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অধিকাংশ বেসরকারী সভ্যের মতানুসারে একটী নূতন আইন তৈরী করা হইয়াছে ইহাতে পতিত জমির কতকাংশ গরীব দুঃখীর ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; কতকাংশ, যুদ্ধে আহত হইয়া যে সব সৈন্য অকর্ম্মণ্য হয়, তাহাদের ভরণপোষণের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং অবশিষ্টাংশ সরকারের খাসে রাখা হইয়াছে।

উপনিবেশ স্থাপন বিধির ৬নং সর্ত্ত অনুসারে সমগ্র ত্রিবাঙ্কুরে মোট ১৪টী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দেওয়ান-পেশকার বা কমিশনার স্ব স্ব বিভাগের অধীন সমিতিগুলির সভাপতি এবং কৃষি ও মৎস্য-বিভাগের তত্ত্বাবধায়কগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিরা এবং বন-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ঐ সমিতি-গুলির সরকারী সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

দরিদ্র জনসাধারণের উপকারার্থ নূতন আইন দ্বারা সান্ধ্য বাজারগুলির শুল্ক রহিত করা হইয়াছে। যে সব বাজার ইতিপূর্ব্বে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিকট ইজারা ছিল, কেবলমাত্র তাহাতেই বর্ত্তমানে শুল্ক আদায় করা হয়। বৎসরকাল মধ্যে পূর্ব্ব ইজারার ম্যাদ শেষ হইলে, নূতন ইজারা আর দেওয়া হইবে না। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবনে ত্রিবাঙ্কুরের ভীষণ ক্ষতি করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কখনও এরূপ বন্যা হইয়াছে বলিয়া কেহ বলিতে পারে না। বন্যায় প্রপীড়িত প্রজাদের সাহায্যার্থ এবং রেললাইন ও রাস্তাঘাট মেরামত করিবার জন্য সরকার হইতেও প্রতি বৎসর যথেষ্ট টাকা ব্যয় করা হইতেছে।

কৃষি-বিভাগ

কৃষি-বিভাগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পরীক্ষা খুব জোরে চলিতেছে। কৃষি-উপযোগী মাটী, সার এবং খাদ্য অনেক আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে নারিকেল, তাল প্রভৃতির সারোদ্ধার করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। উদ্ভিদের বিবিধ মারাত্মক ব্যাধি ও শত্রু নিবারণের জন্য গভীর গবেষণার পর অনেকটা কৃতকার্য্যতা দেখা যাইতেছে। কোন কোন গাছে দদ্রুর মত একপ্রকার চর্ম্মরোগ দেখা যায়। চাষ করিবার সময় মাটী বেশ করিয়া পোড়াইয়া তার পর পরীক্ষিত সার প্রভৃতি দেওয়া হইলে এ রোগের ভয় থাকে না। ফুলের কুঁড়িতে অনেক রোগ জন্মিতে দেখা যায়। ফ্রান্স দেশীয় 'বোর্দ্দো' সুরা রজন বা ধুনার সহিত মিশাইয়া বৃক্ষাদির উপর ছিটাইয়া দিলে এ রোগ আর বিস্তার লাভ করিতে পারে না। কোন কোন বৃক্ষের গোড়া হইতে অনবরত রস নির্গত হয়। ঐ ব্যাধিগ্রস্ত স্থান কাটিয়া তাহাতে গরম আল্‌কাত্‌রা লাগাইয়া দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। বহুবিধ উদ্ভিদের তন্তু হইতে দড়ি, সূতা, ব্রাস্ প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইতেছে।

ধান্য, নারিকেল, লঙ্কা, এবং বিবিধ প্রকার তূলা ত্রিবাঙ্কুরের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। উৎকৃষ্ট বীজ, সার এবং যন্ত্রাদি যাহাতে কৃষকেরা সহজে পাইতে পারে, তজ্জন্য সরকার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট গরু সরবরাহ করিবার জন্য সরকারী গো-শালা খোলা হইয়াছে। মধুমক্ষিকা,

মৎস্য ও কুক্কুটাদি পালনের জন্য পৃথক পৃথক যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সরকারও প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবসায়ীদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেছেন। সরকারী পশুচিকিৎসা ও কৃষি-বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর যথোপযুক্ত ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানে যত্নবান হইয়াছেন।

শিল্প-বিভাগ

বিবিধ বৃক্ষ, ছাল ও ফল হইতে নানাপ্রকার আটা, তৈল, রং, ছাপিবার কালি, বার্ণীস্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষজ্ঞরা নিযুক্ত হইয়াছেন। রাসায়নিক উপায়ে

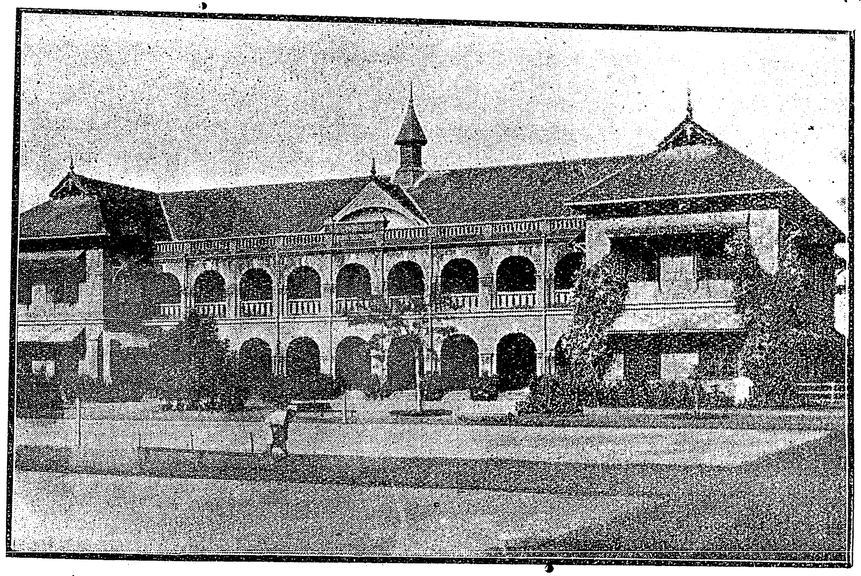

ত্রিবাঙ্কুর—মহারাজার আর্ট কলেজ

প্রস্তুত আদার নির্য্যাসের ব্যবসায় ইতিমধ্যেই খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। চামড়া পাকা করা ও রং করার কারখানা-গুলিও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাগেরকৈল ও পল্লীয়াদী নামক স্থানে বেসরকারী চামড়ার ব্যবসায় দুইটী বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সূতা-কাটা ও কাপড়-বুনা শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে বিশেষজ্ঞরা নিযুক্ত হইয়াছেন। গ্রামে গ্রামে বয়ন-বিদ্যালয়গুলি যথারীতি পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শকও নিযুক্ত আছেন। মহারাজার কলেজের রসায়ন শাস্ত্রাধ্যাপক ডাঃ মৌদগীল স্থানীয় গাছগাছড়া হইতে চারি প্রকার উৎকৃষ্ট তৈল আবিষ্কার করিয়াছেন; এবং আদা হইতে শীঘ্রই অন্য একপ্রকার তৈল আবিষ্কার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

মৃৎপাত্র প্রস্তুত, চিনি সংস্কার, দিয়াশলাই প্রস্তুত প্রভৃতির বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের বালিশের ও মশারীর ঝালর প্রভৃতির ব্যবসায় একসময়ে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বিলাতে পর্য্যন্ত এ সব মাল রপ্তানি হইত। কিন্তু বৃটিশ সরকার আমদানী মালের উপর শতকরা ৩০ টাকা শুল্ক বসানোর দরুণ মন্দা পড়িয়া গেল।

গৃহশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার একটী নূতন খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। নিকেলের বাসন তৈয়ার, সোণারূপার কারুকার্য্য, সেলাই, ছাতার লেইস্, রেশম বুনা, জরীর কাজ ও অন্যান্য চিকণ কাজ শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই নাগেরকৈলে "দি এস, এম্, আর, ভি, শিল্পাগার" নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; ত্রিবান্দ্রামে "দি শ্রী মূলম্ শিল্পবিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে রাজমিস্ত্রী ও ছুতারের কাজ

শিক্ষা দেওয়া হয়। ত্রিবান্দ্রামের শিল্প কলেজে ছবি আঁকা, হাতীর দাঁতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 'কুইলনে'র ছুতারমিস্ত্রীর কাজ শিক্ষা দিবার বিদ্যালয়টী প্রসিদ্ধ। এল্লীপের সরকারী বাণিজ্য-শিক্ষালয় হইতে প্রতি বৎসর অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাহির হইতেছেন। বর্ত্তমানে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬টী শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সরকারী ব্যয়ে সংবাদ-সংগ্রহ-সঙ্ঘ ও শিল্প-ঋণ-দান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্প-বিভাগের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য সময় সময় পুস্তিকা প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া থাকে। এই বিভাগে গত বৎসর মোট ১,৪০,৭২০ টাকা ব্যয় হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে মাত্র ২১,৩৯৬ টাকা আয় স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রজাদের মঙ্গলার্থ আয়ের প্রায় ৭গুণ বেশী টাকা সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী সদস্য আছেন। স্থানীয় লোকেরা যৌথকারবার এবং সমবায়-সমিতির উপকারিতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। অধুনা ১৯৫টী যৌথকারবার এবং ১০০২টী সমবায়-সমিতি কাজ করিতেছে। ত্রিবাঙ্কুরে চামড়া, চিনি, লবণ, প্রভৃতির মোট ১৬০টী ভাল কারখানা আছে। 'চা' ও 'রবারে'র চাষ করিবার জন্য দুইটী সুগঠিত যৌথকারবার সম্প্রতি খোলা হইয়াছে। এল্লীপী, কুইলন, ত্রিবান্দ্রাম এবং কুলাচল—এই চারিটী পোতাশ্রয় ও বন্দর অতি প্রসিদ্ধ।

পূর্ত্ত-বিভাগের কাজও প্রশংসার যোগ্য। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি নূতন রাস্তা তৈরী হইয়াছে; এবং কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য খাল, কূপ প্রভৃতি খনন করা হইয়াছে। ডাক-বিভাগের কাজও বেশ সুন্দররূপ চলিতেছে। বর্ত্তমানে ২৪১টী ডাকঘর ও ৩৬৪টী চিঠির বাক্স আছে। তন্মধ্যে ৬টি পোষ্টাফিসে সেভিংস-ব্যাঙ্কের নিয়মে জনসাধারণের টাকা গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

নগরপালগণের সভা (Municipality)

ত্রিবাঙ্কুরে মোট ১৯টী স্বয়ং-শাসিত নগর আছে। প্রত্যেক সহরেই নগরপালদের সভায় যথেষ্ট পরিমাণে বেসরকারী সদস্য আছেন। সদস্যদের মোট সংখ্যা ৩০৮ জন; ইঁহাদের মধ্যে ২৫৩ জনই বেসরকারী সদস্য। ত্রিবান্দ্রাম ব্যতীত সর্ব্বত্র বেসরকারী সদস্যই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। নাগেরকৈলের মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে চারিজন স্ত্রীলোককে মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য ত্রিবান্দ্রামের "বালকবালিকা হাসপাতালে" পাঠান হইয়াছে। প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীর অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্তও আছে। সরকার হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ২৯টী হাসপাতাল এবং ৩২টী ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পাগল বা সংক্রামক রোগীর জন্য পৃথক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৯২টী সরকারী-সাহায্য-প্রাপ্ত আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় আছে।

শিক্ষা-বিভাগ

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজার কলেজ মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখন হইতে বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়ই উক্ত কলেজে পড়ান হইবে। মুসলমান অধিবাসীদের সুবিধার জন্য স্থানীয় ভাষার ৬টী অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় বিশেষভাবে স্থাপিত হইয়াছে। দুই বেলা স্কুল বসাইবার নিয়ম অনেক স্থানেই প্রচলিত করা হইয়াছে। ইহাতে বেশ সুফল পাওয়া যাইতেছে। নিম্নে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

	সরকারী সাঃপ্রাপ্ত	বেসরকারী সাঃপ্রাপ্ত	সরকারের সম্বন্ধ রহিত	মোট
বিদ্যালয় সংখ্যা	১০৮৬	২১০৮	২৬৫	৫২৭	৩৯৮৬
ছাত্র সংখ্যা	২২৭৫৪১	২১৬৫০০	২৬৯৮২	১৮৩৪২	৪৮৯৩৬৫

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, প্রতি ১·৯ বর্গমাইলে বা প্রতি ১০০৫ জন অধিবাসীর মধ্যে একটী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, প্রতি ২·২০ বর্গমাইল বা প্রতি ১১৫৮ জন অধিবাসীর মধ্যে একটী করিয়া সরকারের অনুমোদিত স্কুল আছে, এবং মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১১·৩৫ জন অনুমোদিত স্কুলে পড়িতেছে। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৪৮·৩ জন খাস সরকারী স্কুলে আছে এবং শতকরা ৫১·৬ অন্যান্য অনুমোদিত স্কুলে স্থান পাইয়াছে। পীড়ামিড তালুকের একটী পকুথী এবং দেবী-

কুলমের ৭টী পকুথী ব্যতীত সর্ব্বত্রই অন্ততঃ একটী সরকারের অনুমোদিত স্কুল আছে। কেবলমাত্র অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্র সংখ্যা ৪,৭১,০২৩ জন। তাহাদের মধ্যে কোন্ বিদ্যালয়ে কত ছাত্র বর্ত্তমানে আছে, নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে—

কলেজ	২,৫০৩
ইংরাজী স্কুল	৪৪,৬৯০
দেশীভাষার স্কুল	৪,২১,৩০৭
বিশেষ স্কুল	২,৫২৩
মোট	৪,৭১,০২৩ ছাত্র



ত্রিবাঙ্কুরের স্বর্গীয় মহারাজ—উপাসনার পরিচ্ছদে

মোট অধিবাসীর শতকরা ১৫ জন যদি প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত ছেলে মেয়ে বলিয়া ধরা যায়, তবে দেখা যায়, মোটামুটি হিসাবে শতকরা ৬৪·৫ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

১৯২৫ সালের রিপোর্ট অনুসারে শিক্ষাবিভাগের মোট ব্যয় ৩৭,১৮,০২৩ অর্থাৎ ত্রিবাঙ্কুরের বাৎসরিক মোট ব্যয়ের শতকরা ২০·১ অংশ।

এতদ্ব্যতীত বেসরকারী অন্যান্য শিক্ষালয়ের সাহায্যার্থও সরকার হইতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে 'ল'কলেজ, আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, শিল্প ও ব্যবসায় বিদ্যালয়, ফরেষ্ট স্কুল, সার্ভে স্কুল, কৃষি বিদ্যালয়, কম্বল তৈরীর স্কুল, কার্পেট বুনা শিক্ষালয় প্রভৃতি ১৮টী সরকারী শিক্ষালয় আছে। তা'ছাড়া সাহায্য-প্রাপ্ত আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, সংস্কৃত-কলেজ, শিল্পাগার প্রভৃতিও যথেষ্ট আছে। এ সবের জন্য গত বৎসর মোট ব্যয় ১,১১,০৯৪ টাকা হইয়াছে। আবার, সাধারণ পুস্তকাগার, পাঠাগার, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, সংস্কৃত ও মালয়ী ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়, শিক্ষালয় মেরামত প্রভৃতির জন্যও বাৎসরিক অনেক টাকা ব্যয় হয়। এইরূপে সমগ্র ব্যয় একত্র হিসাব করিলে ত্রিবাঙ্কুরের মোট ব্যয়ের শতকরা ২১·৬ অংশ শুধু জন-সাধারণের শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইয়া থাকে বলা যায়। ইহাতে দেখা যায়, গড়ে প্রতি অধিবাসীর শিক্ষার জন্য মোটামুটি হিসাবে ৸৵৫ ব্যয় করা হয়। কিন্তু, বৃটিশ ভারতে প্রতি অধিবাসীর জন্য প্রতি টাকার মাত্র ০·০ ৫ অংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের সঙ্গে তুলনা করিয়া শিক্ষা বিষয়ে ত্রিবাঙ্কুরের অবস্থা দেখান হইতেছে—

প্রদেশ বা দেশীরাজ্য পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে বাদ দিয়া হাজার করা—

	ব্যক্তি	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিবাঙ্কুর	২৭৯	৩৮০	১৭১
ব্রহ্মদেশ	৩১৭	৫১০	১১২

	ব্যক্তি	পুরুষ	স্ত্রী
কোচিন	২১৪	৩১৭	১১৫
বরদা	১৪৬	২৪০	৪৪
কুর্গ	১৪৪	—	—
দিল্লী	১১২	—	—
আজমির মাড়োয়ার	১১৩	১৮৫	২৬
বাংলা	১০৪	১৮৮	২১
অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীরাজ্য	একশতেরও কম		

(আদম সুমারী ১৯২১)

পুরুষ ও নারী শিক্ষিতের সংখ্যা একত্র হিসাব করিলে সমগ্র ভারতবর্ষে ও ব্রহ্ম দেশের ভিতর ত্রিবাঙ্কুরের স্থান দ্বিতীয়; কিন্তু কেবল নারীশিক্ষার বা উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ধরিলে ত্রিবাঙ্কুরই প্রথম স্থান অধিকার করিবে।

শিক্ষা বিভাগের জন্য উন্নত দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে কে কিরূপ ব্যয় করিতেছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ—

	রাজ্য রাজস্ব	শিক্ষার জন্য মোট ব্যয়।	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়।
	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ
ত্রিবাঙ্কুর	২,৮৬	৪০	২১
কোচিন	৬২	১০	৫৩৩
মহীশূর	৩৪৪	৪৪	১৩
বরদা	২২১	৩০	১৭
যোধপুর	১২৫	২১৪	১৪

মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যত বেশী টাকা ব্যয় করা হয়, সে দেশ তত বেশী পরিমাণে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রসর হইতেছে।

প্রত্যেক বিভাগে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক-বালিকারা অনেক সময় না বুঝিয়া অপরাধ করিয়া থাকে। তাহাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য এবং লেখাপড়া শিক্ষার জন্য একটী সরকারী সংশোধক স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টীর প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া হইতেছে এবং সুফলও পাওয়া যাইতেছে। অনাথ শিশুদের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট অনুসারে সরকারের অনুমোদিত সর্ব্বশুদ্ধ ৪২৭টী বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রীসংখ্যা ১,৬৩,৫৬২। নীচে বিশেষ ভাবে দেখান হইল ঃ—

পরিচালনার ব্যবস্থা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা
সরকারী	২৩২	৭৫,৬৫০
সাহায্যপ্রাপ্ত	২০০	৮২,৬৫৩
সাহায্য অপ্রাপ্ত	৯	৫,২৫৯
মোট	৪৪১	১,৬৩,৫৬২

তন্মধ্যে কলেজে—২২৪ জন, ইংরাজী স্কুলে ৮,৪১৮ জন স্থানীয় ভাষার স্কুলে—১,৫৩, ৮১৫ জন এবং বিশেষ স্কুলে—১,১০৫ জন ছাত্রী পড়িতেছে। প্রতি ১৭ জন শিক্ষিত অধিবাসীর মধ্যে ১২ জন পুরুষ ও ৫ জন স্ত্রীলোক পাওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরে নারীর সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্র-পরিষদেও সভ্য নির্ব্বাচনে বর্ত্তমানে স্ত্রী-পুরুষের সম্পূর্ণ সমান অধিকার।

পূজা ও দান বিভাগ

বর্ত্তমান দেওয়ান মিঃ ওয়াটস্ এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান খৃষ্টান। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশেই কাটাইয়াছেন; বিদেশী আচার ব্যবহারেই অভ্যস্ত। তাহা হইলেও রাজকার্য্য পরিচালনে তিনি একজন যোগ্য ব্যক্তি, সন্দেহ নাই।

গত বৎসর বিধর্ম্মী মিঃ ওয়াটস্‌কে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য পূজা বিভাগ ও তৎসংলগ্ন দান-বিভাগটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহাও দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। এখন হইতে উক্ত বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী নিজের কার্য্যকলাপের জন্য স্বয়ং মহারাণীর নিকট দায়ী থাকিবেন। বর্ত্তমানে ২৯টী পূজাবাড়ী সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে পরিচালিত হইতেছে। পুরাতন অনেক দেবমন্দিরের সংস্কার করা হইতেছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ আরও ১৪৬০টী পূজাবাড়ী অল্পাধিক সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে। গত বৎসর এই বিভাগে মোট ১৬,১৩,৯২৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং দান বিভাগে মোট ৩৩২৭১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বিবিধ

'নায়ার' সৈন্যবাহিনীতে বর্ত্তমানে ১৪৭১ জন সৈনিক আছে। এই সৈন্যবাহিনীর পদাতিক সৈন্য দুইটী ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত। অশ্বারোহী সৈন্যের একজন ইউরোপীয়ান Commissioned officer আছেন। গোলন্দাজ সৈন্যের মধ্যে একজন এবং পদাতিক সৈন্যের মধ্যে ৬৫ জন ভারতীয় Commissioned officer আছেন। ২০০ গজ পাল্লা-বিশিষ্ট মার্টিনী-হেনরী-রাইফেল্ মাত্র সাধারণ সৈনিকেরা ব্যবহার করিতে পারে। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবসায়ের জন্য সমগ্র ত্রিবাঙ্কুরে সাধারণ প্রজারা বাৎসরিক অল্লাধিক একশত পাস্ পাইয়া থাকে মাত্র।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মুদ্রাবিভাগে গত বৎসর বৃটিশ ভারতের ২২, ৩৩৪ টাকা মূল্যের স্থানীয় বিবিধ মুদ্রা তৈরী হইয়াছে।

সমগ্র ত্রিবাঙ্কুরে সরকারী 'গেজেট' ছাড়া ৫২খানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজ এবং ৭৯খানি মাসিক পত্রিকা আছে। তন্মধ্যে ৬০খানি মালয়ী, ৩৮খানি ইংরাজী-মালয়ী ১৯খানি ইংরাজী, ৯খানি তামিল, এবং ৩খানি ইংরাজী-মালয়ী- তামিল ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। মালয়ী ও সংস্কৃত ভাষায় হস্তলিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। ত্রিবান্দ্রামে সরকারী ব্যয়ে জনসাধারণের জন্য একটী সুদৃশ্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণকে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের উপকারিতা শিক্ষা দিবার জন্য একটী আদর্শ জীবন-বীমা আফিস্ সরকার হইতে খোলা হইয়াছে। বন্য পশু ও বন্য বৃক্ষ রক্ষার জন্য একটী নূতন আইন তৈরী হইয়াছে। এখান হইতে বিশেষ অনুমতি না লইয়া কেহ কোন বন্য জন্তু শিকার করিতে পারিবে না।

মহাত্মা গান্ধী রাজপরিবারের অনাড়ম্বরতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মহারাণীকে হঠাৎ দেখিয়া আমি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম। সামান্য গৃহস্থ-বধূরাও



ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী (রাজপ্রতিনিধি)

আজকাল মূল্যবান বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন (বিশেষ ভাবে কোন লোকের সঙ্গে দেখা করিবার সময়)। আমি ভাবিয়াছিলাম মহারাণীকে কত কি হীরকজত-

শোভিত বেশভূষায় সুসজ্জিত দেখিব। বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিলাম কি না সামান্য একখানা মোটা থান কাপড় পরিয়া মহারাণী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। বিশেষ লক্ষ্য করিবার পর দেখিলাম তাঁহার গলদেশে একটী 'মঙ্গলমালা' মাত্র শোভা পাইতেছে। গৃহসজ্জাও তদনুরূপ আবিলতাশূন্য। নেহাৎ সাদাসিধা রকমের কয়েকখানা আসবাবপত্র ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ছোট মহারাণী সেথু পার্ব্বতীবাই (রাণীমা) ও নাবালক মহারাজ শ্রীমান চিত্তিরুনলকেও সর্ব্বপ্রকার



ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত টি, রাঘবিয়া, সি-এস-আই

কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত দেখিলাম। তাঁহাদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সুগঠিত দেহ আমার বেশ প্রীতিদায়ক হইয়াছিল। বলিতে কি, তাঁহাদের অনাড়ম্বরতার আতিশয্য আমার হিংসার বস্তু হইয়াছে।"

এত সব বর্ণনা দ্বারাও তাঁহার মনের আনন্দ সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে না পারিয়াই যেন অবশেষে তিনি বলিয়াছেন—"The reader must pardon this minute description of the Travancore Royalty. It has a lesson for us all. The Royal simplicity was so natural because it was in keeping with the whole of the surroundings. I must own that I have fallen in love with the women of Malabar."—'Travancore and its Ruler' by M. Gandhi.

যে স্থানের অধিবাসীদের অনাড়ম্বরতা ও সারল্য মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিতে পারে, তাহার তুলনা দ্বিতীয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। মিঃ স্মিথ লিখিয়াছেন—"The country and people of Travancore are the most interesting in all India on many accounts." এ সম্বন্ধে অন্য কিছু বলা অনাবশ্যক।

উপসংহার

ত্রিবাঙ্কুরের অভাব এখনও যথেষ্ট আছে। সমাজ-সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। গোঁড়া হিন্দুরা পরিবর্ত্তন মাত্রকেই ভয় করেন। আবার, অস্পৃশ্য জাতিসংহ সংস্কারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এ বিষয় লোকের স্বাধীন মত সংগ্রহ করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। সাম্প্রদায়িক ভাব যাহাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বেকার-সমস্যা ত্রিবাঙ্কুরে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। শিক্ষিত যুবকেরা কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবে অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। এই গুরুতর সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানের জন্য বিশেষভাবে উত্তর-ত্রিবাঙ্কুরে রেল লাইন শীঘ্রই খোলা হইতেছে। সরকার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শিক্ষা-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যার সমাধান কোন দিনই হইবে না। তাই কার্য্যকরী শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সেদিন দেওয়ান বলিয়াছেন—

"A variety of reasons has led to the unemployment problem being inextricably mixed up with the educational question. I am not surprised. As the administration of the State became more highly organised and more complex from year to year, the need for public servants in many capacities grew

rapidly. University degrees and school certificates became the only means of testing fitness for Government employment; and the whole current of our youth set towards the institutions where such qualifications could

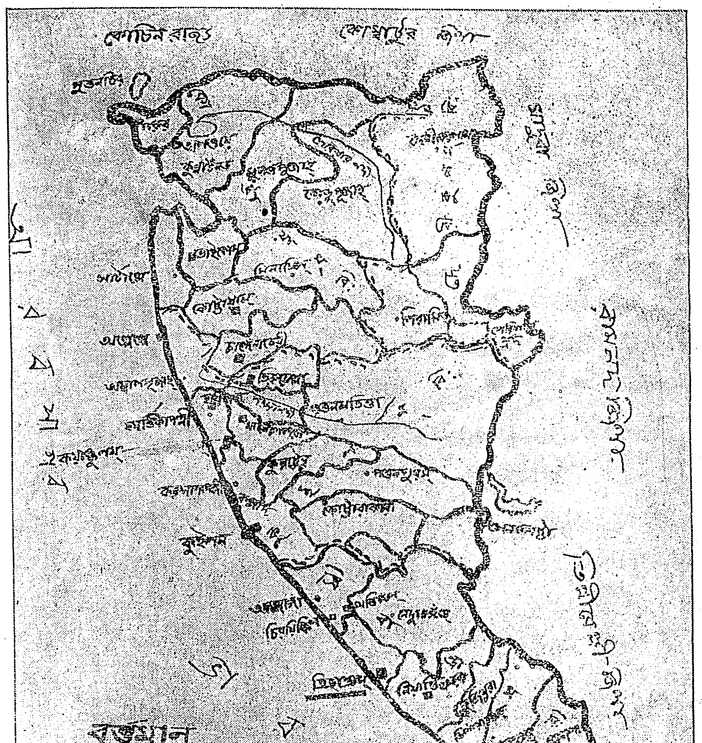

ত্রিবাঙ্কুরের মানচিত্র

be procured. Hence our swollen colleges, our multiplicity of schools. Hence this spectre of unemployment. There is no getting away from the fact that the Government are the largest employers of educated labour in Travancore. In so far as there are Government posts available the Government will continue to distribute them and will continue to afford equality of opportunity to every son of the soil. A change must and will come over the outlook of our people once they have manfully faced the cold hard fact of the struggle for existence. Meantime the Government will leave nothing undone to narrow the margin of unemployment. A progressive railway policy and electric and water supply schemes will open up fresh avenues of useful service." Address of the Dewan, Travancore, 1926 p. 1.

দেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রজাকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে সরকার যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। অল্প দিনের মধ্যেই এ বিভাগে আশানুরূপ ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে মিঃ ওয়াটস্ বলিয়াছেন—

"The growth in the value and volume of imports and exports indicates prosperity which is reflected in the increase of revenue

under 'Income Tax,' 'Stamps,' and 'Customs'. The strong revival of the rubber market and the recent high rise of pepper and lemon grass oil have benefited a large section of the population. The State-aided Bank of Travancore Ltd., with a capital of Rs. 30,00,000, was registered on the 18th December 1925." Address of the Dewan, Travancore, 1926, p. 6.

মহারাণীর আদেশ অনুসারে গত বৎসর হইতে দেব-মন্দিরে পশুবলি রহিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাণীর মাতৃ-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রাজ্যে কোথাও এখন ধর্ম্মের নামে প্রাণিহত্যা হয় না।

ত্রিবাঙ্কুরের একটী বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক বিভাগই স্বদেশী ব্যক্তি দ্বারা সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এত সব উন্নতির মূল কারণ যে ভূতপূর্ব্ব দেশী দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত টি, রাঘবিয়া, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভারতীয়দের কার্য্যদক্ষতায় যাঁহাদের সন্দেহ আছে, তাঁহা-দিগকে ত্রিবাঙ্কুরের ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আবগারি বিভাগ হইতে ত্রিবাঙ্কুরের যথেষ্ট আয় হয়। মহাত্মা ইহার খুব নিন্দা করিয়াছেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, খৃষ্টান অধিবাসীরাই বেশী মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। আশার কথা এই যে, এ কলঙ্ক দূর করিবার জন্য সরকার স্বয়ং বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন। দেওয়ানের অভিভাষণে আবগারি বিভাগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"As you (members of the Council) are aware, advantage was taken of the renewal of the biennial contracts for 1100-01 to make a substantial reduction in the number of country liquor shops. The total number of shops opened under the new contracts is 1,915 against 2,015 in the previous year. The independent shop system in the case of toddy now obtains in all the taluks of the State except Devicolam where there is no manufacture or sale of toddy. The sale of arrack or toddy to minors and of arrack to adult women has been prohibited from the 1st Chingam 1102. The department has been active in putting down llicit traffic as can be judged from the larger number of cases detected and the growth in the percentage of convictions." Address of the Dewan, Travancore, 1926, P.6

সমাধিস্থ

শ্রীনির্ম্মল দেব

অনেক দিন পরে দেশে ফিরিয়া যেখানে-সেখানে শুনিতে লাগিলাম—গৌর মল্লিকের বাগানে কে-একজন সন্ন্যাসী আসিয়া সমাধিস্থ হইয়া আছেন!

এই গৌর মল্লিক লোকটি না কি এক সময়ে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। তা'র পর উচ্ছৃঙ্খলতার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহার সে অগাধ ঐশ্বর্য্য এক দিন দুর্দ্দশার অতল তলে তলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। আজ এই বন-জঙ্গলে ভরা, পোড়ো বাগানের মালিক যে কে, গ্রামের কেহই তাহা জানে না; কিন্তু তবু এই বাগানটি নির্দ্দেশ করিতে হইলেই, সেই গৌর মল্লিকের নামটি কেহ কোনো দিন বিস্মৃত হয় না। এই চির-স্মৃত মানুষটিকে প্রত্যক্ষ দেখার সৌভাগ্য আমার কোনো দিন হয় নাই; কিন্তু তাঁহার এই অতীত প্রমোদ-কাননটি আমার বাল্যের স্মৃতির সহিত একান্ত ভাবে জড়াইয়া আছে! ছেলে বেলায় কত দিন পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া এই বাগান হইতে পাকা পেয়ারা, কাঁচা গোলাপজাম পাড়িয়া আনিয়া বিজয় গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি,

কত কন্‌কনে শীতের রাতে এই বাগানের খেজুর-গাছে উঠিয়া রসের পূর্ণ-কলস নামাইয়া আনিয়া সগৌরবে বন্ধুদের বিতরণ করিয়াছি, কত স্তব্ধ-গভীর নিশীথে এই বাগানের ফুল চুরি করিয়া আনিয়া মা-সরস্বতীর চরণে ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া একজামিনে পাশের বর প্রার্থনা করিয়াছি! আমার কৈশোরের কত অত্যাচার, কত উপদ্রব এই বিগত-শ্রী বাগানের গাছের শাখায় শাখায়, পাতায়-পাতায় আঁকা আছে! প্রথম-জীবনের সেই উন্মুক্ত-উদ্দাম দিনগুলা এই বাগানের মালিকেরই মত আজ সুদূর অতীতের কালো অন্ধকারে ঝাপ্‌সা হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে! তখন শুনিতাম, এই বাগানে তাঁহার এক পেয়ারের রক্ষিতা বাস করে। কত দিন কত চেষ্টা করিয়াও এই নারীকে একবার দেখার অকারণ কৌতূহল মিটাইতে পারি নাই। কেবলমাত্র একটি দিন—এক প্রচণ্ড ঝড়ের সন্ধ্যায়—এই বাগানের পাশের রাস্তা দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর পানে ছুটিতে-ছুটিতে উপরে দ্বিতলের জানালার গরাদেয় গাল্‌টি রাখিয়া সে হতভাগিনীকে ম্লান-মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম! সেই একটি দিন মাত্র, আর কোনো দিন তাহাকে দেখিতে পাই নাই! .....তা'র পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে,—সেই পরিত্যক্ত বাড়ীর সে জানালা আজ জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, সেই ফুলের-আল্‌পনা-আঁকা গোলাপ বেলার গাছগুলি শুকাইয়া গিয়া অতীত সম্পদের মূক সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে, কেয়ারিরু ফাঁকে-ফাঁকে সেই মর্ম্মর-নির্ম্মিত নগ্ন নারী-মূর্ত্তিগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হইয়া হেলিয়া রহিয়াছে! আমার জীবনেও তা'র পর কত আসিয়াছে, কত গিয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে, কত গড়িয়াছে! কিন্তু সেই এক দিন এক দুর্দ্দান্ত ঝড়ের সন্ধ্যায় এক কুলত্যাগিনী ঘৃণিতা নারীর সেই আচম্‌কা দেখা বেদনা-বিহ্বল মুখখানি আমার চক্ষের সম্মুখে আজও ঠিক তেম্‌নি করিয়াই জাগিয়া আছে!

আজ এত দিন পরে দেশে ফিরিয়া তাই যখন সেই গৌর মল্লিকের বাগানে এক সমাধিস্থ সন্ন্যাসীর কথা যা'র তা'র কাছে শুনিতে লাগিলাম, তখন পরম বিজ্ঞের মত মনে মনে বলিলাম—এ মজা মন্দ নয়! একে সন্ন্যাসী, তা'য় সমাধিস্থ, তা'য় আবার সেই গৌর মল্লিকের বাগানে!—এ একটা প্রকাণ্ড বুজ্‌রুকী না হইয়া যায় না! কিন্তু মানব-চরিত্রের একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে, যেখানে যত সংশয়, কৌতূহলও সেখানে তত বেশী। তাই ঠিক করিলাম—এমন মজা ছাড়িলে চলিবে না!

বিকালে সুধীর আসিতেই বলিলাম—"ওহে চলো, তোমাদের সমাধিস্থ সন্ন্যাসী জীবটিকে একবার দর্শন ক'রে আসা যাক্!"

সুধীর একেবারেই সোজাসুজি বলিয়া ফেলিল—"না, তোমার সেখানে যাওয়া হবে না!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন?"

সুধীর বলিল—"না, তুমি যে সেখানে গিয়ে তাঁ'কে বিদ্রূপ ক'রবে, তা' হবে না। তুমি যে চিরকালই নাস্তিক।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি—কিচ্ছু ব'লবো না, শুধু দূর থেকে চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো ব্যাপারখানা কি।"

সুধীর তবু সন্দিগ্ধ চিত্তে বলিল—"আচ্ছা চলো, কিন্তু যা' ব'ললে মনে থাকে যেন,—সেখানে গিয়ে যেন ভুলে যেয়ো না!"

সুধীরের সঙ্গে চলিলাম গৌর মল্লিকের পোড়ো বাগানে।

* * * * *

অনেকখানি পথ চলিয়া, চাল-কল ছাড়াইয়া, শ্মশান পার হইয়া, গ্রামের উত্তর প্রান্তে ভাঙ্গা ফটকের ভিতর দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। নিরালা-নির্জ্জন নদীতীরে অতীতের সেই ফুলে-ফলে-ভরা সুন্দর বাগানটি আজ বিগত-যৌবনা রূপজীবিনীর দেহের মত রুক্ষ, ভীষণ! সেই ভাঙ্গা বাড়ীটার পানে চাহিয়া কত কথাই না মনে পড়িতে লাগিল! এক দিন যাহার সজ্জিত বিলাস-কক্ষে উন্মত্ত ভোগের বাতি সারা-রাত নির্নিমেষে জলিয়াও নিভিতে চাহিত না, যে উৎসব-মুখর ঘরের মর্ম্মর-মেজ কত লীলাময়ী তরুণীর আবেশ-বিহ্বল চরণ-চুম্বনে এক দিন পুলকিত হইয়া উঠিত, কত চঞ্চল চোখের চাহনি, কত তরল হাসির উচ্ছ্বাস, কত গোলাপী ওড়্‌নার শিথিল অঞ্চল-প্রান্ত যাহার বাতাসকে এক দিন মাতাল করিয়া তুলিত,—আজ সেথায় শুধু মৃত্যুর মত একটা বিরাট-গম্ভীর স্তব্ধতা যেন হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

সুধীরকে বলিলাম—"কই হে, তোমার সন্ন্যাসী-ঠাকুর কোথা?"

সুধীর বলিল—"বাগানের শেষে সেই চাঁপা গাছ-তলায়।"

সুধীরের সঙ্গে চাঁপা-গাছটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন সেখানে কেহ বড় একটা ছিল না, সারা দিন ধরিয়া সন্ন্যাসী-দর্শনে পুণ্যের ঝুলি বোঝাই করিয়া সন্ধ্যা-বেলা যে-যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এক ভস্মাচ্ছন্ন, দীর্ঘ-জটাজূট-শোভিত, লোটা-চিম্‌টা-পরিবৃত, উলঙ্গ-প্রায় মানব-মূর্ত্তিকে উইয়ের ঢিপির মত খাড়া হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিব। কিন্তু দেখিলাম, এক সাধারণ মানুষেরই মত মানুষ। পরণে তাহার এক মোটা আধ-ময়লা ধুতি, গায়ে একখানা সুতি চাদর। সেই চাদরের ভিতরে হাত দুইটা জোড় করিয়া কোলের উপরে রাখিয়া মুদিত নয়নে নিশ্চল-নিস্পন্দ দেহে লোকটা বসিয়া আছে। উপরের গাছ হইতে খসিয়া পড়িয়া দু-একটা চাঁপা-ফুলের শীর্ণ পাপ্‌ড়ি তাহার গায়ে ও মাথার রুক্ষ বিপর্য্যস্ত চুলের উপরে ছড়াইয়া আছে। অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু সন্ন্যাসিত্বের একটুও বিজ্ঞাপন কোথাও ধরিতে পারিলাম না। মনে মনে হাসিয়া বলিলাম—লোকটা খুব ওস্তাদ! ও বুঝিয়াছে যে, অবিরত ঠকিয়া-ঠকিয়া লোটা-চিম্‌টা, জটাজূটে লোকের আজকাল আর তেমন শ্রদ্ধা নাই, তাই ও এক নূতন ফন্দি আঁটিয়াছে! সাধারণ বেশ-ভূষায় চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া মহা-যোগীর ন্যায় বসিয়া থাকিয়া লোকের ভক্তি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দু-পয়সা কামাইবে!

কিন্তু তাহার আনত মুখটার দিকে চাহিতেই কেমন-যেন একটু থমকিয়া গেলাম! ঝড়ের রাতের প্রভাতের মত তাহার সারা মুখখানার উপর কেবল যেন ছিঁড়ে-যাওয়া, ভেঙ্গে-পড়া, উড়ে-যাওয়ার চিহ্ন আঁকা! মনে হইতে লাগিল, যেন তাহার ওই মৃদু-স্পন্দিত বুকখানার মধ্যে একটা রুদ্র-ভীষণ আগ্নেয়-গিরি ঘুমাইয়া আছে,—কে জানে সেথায় কি দাহ, কি জ্বালা গোপনে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে!

সুধীর আমার পাশে পরম ভক্তিভরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁ হে, লোকটার ইতিহাস কিছু জানো?"

সুধীর বলিল—"না, কেউই তা জানে না, কবে-যে উনি এখানে এসেছেন, তা'ও কেউ ব'লতে পারে না। এক দিন ওই শিবমন্দিরে পূজো দিতে এসে গোপালের-মা এঁকে প্রথম দেখ্‌তে পান্।"

চলিয়া না আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম,—ঠিক করিলাম, দেখি, লোকটা কতক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকে!

দিনান্তের শেষ আভাটুকু সাঁঝের আকাশ হইতে ধীরে-ধীরে মুছিয়া গেল। বাদুড়ের ঝাঁক নদীর এপার হইতে ওপারে উড়িয়া গেল, কর্ম্ম-চঞ্চল দিনের ব্যস্ত কোলাহল ক্রমে-ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। আমি ঠিক তেমনই ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

নিকটে শিব-মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দে লোকটা চোখ খুলিয়া জোড়-করা হাত দু'টা কপালে ঠেকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাশে শ্মশানের দিকে চাহিয়া দেখিল। সেথায় একটা সদ্য-প্রজ্বালিত চিতা হইতে ধূসর ধূম-রাশি ঊর্দ্ধপানে কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিতেছিল। খানিকক্ষণ অনিমেষ নয়নে সেই দীপ্ত চিতার পানে চাহিয়া থাকিয়া একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইতেই আমার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সেই স্তব্ধ-নির্জ্জন জঙ্গলের মাঝে আসন্ন অন্ধকারে আমায় অমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সন্ন্যাসী বোধ হয় খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমার সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া ক্ষণকাল আমায় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বেশ ভদ্র, বিনীত ভাবে বলিল—"আমার কাছে কি তোমার কোনো দরকার আছে ভাই?"

আমি কিছুই চিন্তা না করিয়া মুরুব্বিয়ানা-চালে বলিলাম—"না, বিশেষ কিছুই নয়, তবে হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে দু'-চারটে কথা কইতে পার্‌লে মন্দ হয় না!"

মনে-মনে কি ভাবিয়া সন্ন্যাসী বলিল—"বেশ ত, যে-কোনো দিন একটু গভীর রাতে যদি আস্‌তে পারো, তা' হ'লে বেশ হয়। রাত্রে আমি ওই বাড়ীতে থাকি।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী সেই জীর্ণ দ্বিতল বাড়ীটা দেখাইল। মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া সন্ন্যাসী আবার বলিল—"কিন্তু ভাই, আমার একান্ত অনুরোধ—তুমি একলা এসো, রাত্রে আমি বেশী লোকের সঙ্গ সইতে পারি না।"

আমি আর অনর্থক কথা না বাড়াইয়া "আচ্ছা" বলিয়া তাহার ভদ্রতার প্রতিদানে একটা নমস্কার করিয়া সুধীরের সঙ্গে চলিয়া আসিলাম। খানিকটা আসিয়া একবার

পিছন ফিরিয়া দেখিলাম—সন্ন্যাসী মন্ত্র-চালিতের মত ধীর-পদক্ষেপে সেই পোড়ো বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

* * * * *

আড্ডা মারিয়া, গাল-গল্প শেষ করিয়া রাত্রি এগারোটার সময় শুইতে গেলাম। ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নাছোড়-বান্দা ঘুম আজ কিছুতেই কাছে ঘেঁসিতে চাহিল না! কেবলই মনে হইতে লাগিল—গভীর রাতে সেই বাড়ীতে গেলে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইবে। আমার বুকের মধ্যে যে একটা ডান্‌পিটে সৃষ্টিছাড়া মানুষ আজন্মকাল হুড়াহুড়ি করিয়া বেড়াইতেছে,—যাহাকে কোনো দিন সাম্‌লাইতে পারিলাম না,—সে আমায় কেবলই ঠেলা দিতে লাগিল। বিনিদ্র নয়নে চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম, ঠিক করিলাম—আরো খানিকটা রাত্রি হইলেই উঠিয়া পড়িব!

বারোটা বাজিয়া গেল, তখনও শুইয়া রহিলাম। ঢং করিয়া একটা বাজিতেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

নিকষ-ঘন নিশীথ রাতে চলিয়াছি নির্জ্জন গ্রাম্য-পথ বাহিয়া—জানি না কোন্ অদম্য আকর্ষণে! চতুর্দ্দিক স্তব্ধ নীরব, কোথাও একটু সাড়া নাই, কোনো শব্দ নাই! মাথার উপরে কেবল ওই নিশাচর তারাগুলা নির্নিমেষ নয়নে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া আছে!

ভাঙ্গা ফটক দিয়া গৌর মল্লিকের বাগানে ঢুকিলাম। কি একটা জানোয়ার আমার গা ঘেঁসিয়া শ্মশানের দিকে ছুটিয়া পলাইল। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া সেই বাড়ীটার দিকে চলিলাম। উপরে দ্বিতলের একটা ঘরে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখিতে পাইলাম। অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া, সেই আলো লক্ষ্য করিয়া, ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া আস্তে-আস্তে উপরে উঠিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—একটা রেড়ীর তেলের প্রদীপ মিট্‌-মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, আর তাহারই সম্মুখে ধূলি-ধূসরিত মেজেয় একটা ছেঁড়া কম্বলের উপরে গেরুয়া কাপড় পরিয়া সেই সন্ন্যাসী চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—পাশে একখানা গীতা খোলা রহিয়াছে। ঘরের দেওয়ালের চূণ-সুরকী সব খসিয়া গিয়া জীর্ণ ইঁটগুলা মড়ার মাথার মত ওষ্ঠহীন দাঁত মেলিয়া রহিয়াছে! দরজা-জানালা-গুলি ভাঙ্গিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ছাতের কড়ি-বরগাগুলাও যেন এই ধর্ম্মঘটে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া হেলিয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইবার সুযোগ খুঁজিতেছে! এম্‌নি একটা ভয়ঙ্কর ঘরে এই নিবিড়-নির্জ্জন রাতে ওই রহস্য-ময় মানুষটাকে এমন করিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মনটা কেমন-যেন একরকম বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল।

আমার পায়ের শব্দে মুখ ফিরাইয়া আমায় দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিল—"এস ভাই! এত রাত্তিরে তুমি এসেছো! আমি ভাবিনি তুমি আজ আস্‌বে।" এই বলিয়া একটু সরিয়া কম্বলের উপরে আমার বসিবার স্থান করিয়া দিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া বলিলাম—"আমি আজ না এসে থাক্‌তে পার্‌লুম না। আমার বড্ড জান্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে!"

সন্ন্যাসী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—"কি জান্‌তে চাও ভাই?"

আমি অসঙ্কোচে বলিলাম—"এই জন-মানবহীন জঙ্গলের মধ্যে এই ভুতুড়ে বাড়ীতে কী আকর্ষণ আপনাকে টেনে এনেছে? এ বাড়ীর ইতিহাস বোধ হয় আপনি জানেন না!"

আমার কথায় সন্ন্যাসী যেন একটু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"জানি।"

আমি বলিলাম—"সব জেনে-শুনে আপনি এসেছেন!"

সন্ন্যাসী একটুখানি হাসিল,—সে-হাসি যেন অনেক-দিনের-অনেক-অশ্রুর-বাষ্প-জমা মেঘের সজল বর্ষণ! সন্ন্যাসী বলিল—"এই ঘরখানি যে আমার জীবনের মহাতীর্থ! এর চেয়ে বড় তীর্থ তো আমার কোথাও নেই,—স্বর্গেও নয়,—ঈশ্বরের চরণেও নয়!"

আমি তাহার কথার কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাইলাম না। সে-ঘর একদিন ঐশ্বর্য্য-দৃপ্ত ধনীর স্থূল ভোগের লীলাক্ষেত্র ছিল, যেখানে একমাত্র দুর্দ্দান্ত লালসা ছাড়া আর কোনো জিনিসের সাধনা কোনো দিন হয় নাই,—সে-ঘর কি করিয়া যে এক স্থবির ভোগ-বিরাগী সন্ন্যাসীর মহাতীর্থ হইতে পারে, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। তাই কিছু না বলিয়া আমি জিজ্ঞাসু চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সন্ন্যাসী বলিল—"তুমি বিয়ে ক'রেছ?"

আমি বলিলাম—"না।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল—"জীবনে কোনো দিন কোনো

নারীকে যথার্থই ভালোবেসেছ—হাসি. যেমন ক'রে কান্নাকে ভালোবাসে ?"

এ কথার উত্তরে সহজে স্পষ্ট ভাবে "হ্যাঁ" বলিতে পারিলাম না; "না" শব্দটাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—"ঠিক—বোধ হয়—নয়।"

মুহূর্ত্ত কাল চুপ করিয়া সন্ন্যাসী চোখ-দু'টা বুজিয়া বুকের মধ্যে কি যেন অনুভব করিয়া লইল। তা'র পর হঠাৎ আমার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিল—"কিন্তু আমি বেসেছিলুম! শুধু, ভালোবেসেছিলুম নয়—দু'-পায়ে থেঁত্‌লে সে ভালোবাসার লক্ষ অপমান ক'রেছিলুম! তাই সে আজ আমার সারা জগৎ ঘিরে অক্ষয়-অমর হ'য়ে আছে! অপমানের পূর্ণ অর্ঘ্য দিয়ে পূজা ক'রেছিলুম, তাই আমার সে পূজা আমার ভালোবাসার দেবতার চরণে গিয়ে পৌঁচেছে!"—অবরুদ্ধ অশ্রুর ভারে সন্ন্যাসীর গলাটা ভারী হইয়া আসিল।

খানিক থামিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে আবার বলিতে লাগিল:—"যখন আমার বিয়ে হ'য়েছিল, তখন আমার বয়স তেইশ্ বছর। তা'র আগে কোনো দিন আমার প্রাণের চোখ দিয়ে কোনো নারীর পানে চাইনি! সেই এক দিন দীপালোকিত উৎসব-রাতে সপ্ত-আয়তির-কলহাস্য-কুহরিত ছান্‌লা-তলায় লাল চেলীর নীচে দু'খানি লজ্জা-কম্পিত কালো চোখের কুণ্ঠিত-আনত দৃষ্টির সঙ্গে যখন আমার শুভ-দৃষ্টি হ'লো, তখন কী নিবিড়-মৌন মহিমা যে সেই স্নিগ্ধ-করুণ দৃষ্টি হ'তে ঝ'রে প'ড়ছিলো, ভাষায় তা'র কণামাত্রও কোনো দিন প্রকাশ ক'রতে পার্‌বো না! এই নিঃসঙ্গ জীবনের কত নিদ্রাহারা রাতে শয্যা ছেড়ে উঠে ওপরে অন্ধকার আকাশের পানে চেয়ে মনে মনে বিধাতার উদ্দেশে ব'লেছি—ভগবান, এই জীবনই যদি মানুষের শেষ না হয়, যদি পর-জন্ম ব'লে কোনো জিনিস তোমার সৃষ্টিতে থাকে, তা'-হ'লে আর কিছু চাই না দয়াময়,—একটিবার—শুধু আর একটিবার—তুলসীর মূলে সন্ধ্যা-প্রদীপের মৃদু-কম্পিত শিখাটির মত, লাল চেলীর নীচে সেই দু'খানি কালো চোখের সেই সলজ্জ-চকিত চাহনি তেম্‌নি ক'রে আমায় দেখ্‌তে দাও!—সাধ যে আমার মেটেনি!

"বাসর-রাতের ভোরের বেলা যখন নির্জ্জন ঘরে শুধু আমরা দু'জনে,—পাশে চেয়ে দেখ্‌লুম তা'র আনন্দ-বিহ্বল মূর্ত্তিখানি! কণ্ঠের মধ্যে যেন নিখিল-জগতের সমস্ত ছন্দ, সমস্ত সুর এক ক'রে আমি ডাক্‌লুম—'লীনা!' সে আমার কাছে স'রে এসে আমার বুকের ওপরে তা'র উচ্ছ্বসিত বুকখানি এলিয়ে দিয়ে, আমার গালের ওপরে তা'র লজ্জারক্ত গালটি রেখে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ব'ললে—'আমি ম'রে গেলে তুমি আবার বিয়ে ক'রবে?'—দু'টো তপ্ত অশ্রুর বড়-বড় ফোঁটা তা'র বিহ্বল চোখ থেকে আমার গালের ওপর গড়িয়ে প'ড়লো! আমি শিউরে উঠ্‌লুম! এই বাসর-ঘরে হাসির দেওয়ালীর মাঝে কেন যে সে তা'র মরণের কথা ভাব্‌ছে, জীবনের প্রভাতেই কেন যে সন্ধ্যার কথা তা'র মনে প'ড়ছে,—'তা' কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না! আজ পর্য্যন্ত কত ভেবেও সে দিন তা'র অন্তরের এই অকারণ আশঙ্কার কোনো কারণই আমি খুঁজে পাইনি!

"তা'র পর পাঁচ-পাঁচটি বছর ধ'রে আমার এই আল্‌গা জীবনটাকে কী প্রেম, কী সেবা, কী যত্ন দিয়ে যে সে ছেয়ে রেখেছিল—একটু কণামাত্রও ফাঁক কোথাও রাখেনি! আজ যখন পেছন্ ফিরে জীবনের সেই-সব হারানো দিন-গুলোর কথা ভাবি, তখন মনে হয় যেন সে-সব সত্য নয়, বাস্তব নয়!—আমার জীবনে যেন সে-দিন কখনও আসেনি, সে-সব যেন একটা স্বপ্ন—সুখস্বপ্ন,—একটা নিদ্রা-বিরল রাত্রির ক'টি অলস মুহূর্ত্তের জন্য তা'রা এসেছিলো এক দিন আমার ঘুমন্ত জীবনে—যৌবনের কল্প-লোক থেকে! কত জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধে অমন পরিপূর্ণ সুখ আমার জীবনে এসেছিল—জানি না! আজ কেবলই ভগবানকে বলি—ভগবান, মানুষকে যত দুঃখ দিতে পারো দিও, কিন্তু পরিপূর্ণ সুখ—অতো বড় অভিশাপ—তা'কে কখনও দিও না! অপূর্ণ রেখে তা'র সুখকে বেঁচে থাক্‌তে দিও, পূর্ণ ক'রে তা'কে অমন নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ফেলো না!

"সুদুর্লভকে পেয়েছিলুম! যা' জগতে কেউ পায় না—তা'ই আমি পেয়েছিলুম! তাই সে আমার আকাঙ্ক্ষার ধন না হ'য়ে, অবসাদের বোঝা হয়ে উঠ্‌লো! তা'র পর কি ক'রে যে প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্ত্তে অসময়ে, অকারণে, অযথা ভাবে তা'র কচি প্রাণটির মাঝখানটিতে ঘা দিতে লাগলুম, সে-সব কথা আর তোমায় ব'লবো না ভাই! এক দিন বাগান থেকে নিজের হাতে একটি করবী ফুল তুলে

এনে সে হাসি-মুখে আমার জামার বোতামে আটকে দিতে এলো, আমি তা'কে রূঢ় ভাবে ঠেলে দিয়ে ব'ললুম—'যাও, আমার এখন কাজ আছে, অতো ন্যাকামী কর্‌বার সময় আমার নেই!' লোহার সিন্দুকে হীরে জহরৎ ভরা র'য়েছে, কোনো দিন তা'কে প'রতে দেখিনি! এক দিন তা'কে ব'ললুম—'গয়নাগুলো কি তোমার শ'য়ে চাপাবার জন্যে হ'য়েছে?' সে আমার রূঢ় কথা কাণে না তুলে ছেলে-মানুষের মতন হেসে ব'ললে—"হ্যাঁগা, ভগবানের-দেওয়া রূপের চেয়ে কি মেয়েমানুষের আর-কিছু বড় রূপ আছে? গয়না রূপকে বাড়ায় না, ঢেকেই রাখে!' আমি তা'র এ নিরীহ-সরল কথার উত্তরে বিষ ছড়িয়ে ব'ললুম—'ভদ্র-সংসারে অতো রূপের দেমাক ভালো নয়, রূপ খুব দামে বিকোয় তা'দেরই যা'রা—!'এমন-একটা জঘন্য-কদর্য্য কথা আমার মুখে শুন্‌বে—সে কোনো দিন ভাব্‌তে পারে নি। তাই কেমন-যেন থম্‌কে গিয়ে আহতা হরিণীর মতন একটা মুহূর্ত্ত আমার হিংস্র মুখের দিকে কাতর চোখে চেয়ে সে ক্লান্ত চরণে আস্তে-আস্তে আমার কাছ থেকে চ'লে গেল। সেই দিনের পর আর কোনো দিন তা'কে হাস্‌তে দেখিনি!

"তা'র পর হঠাৎ এক দিন কাউকে কিছু না ব'লে, তা'র কোনো বন্দোবস্ত না ক'রে, তা'কে একলা ফেলে, ভারতবর্ষ ছেড়ে সোজা চ'লে গেলুম বিলেতে—ব্যারিষ্টারী প'ড়তে! তা'র পর কোনো দিন তা'কে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখিনি! তা'র খবর জান্‌বার কোনো ব্যগ্রতাই আমার ছিল না, তবে নায়েব-গোমস্তার চিঠিতে মাঝে-মাঝে তা'র খবর আমার কাণে পৌঁছতো।

"পুরো পাঁচটি বছর ক'লকাতায় আমার সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটি কোণে সে দুঃখিনী চোখের জলে ভেসে নীরবে, নির্জ্জনে কাটিয়েছে। যে বাড়ীতে আমার ঘরের-লক্ষ্মী রূপে তা'কে বরণ ক'রে এনেছিলুম, যে-বাড়ীতে তা'কে আঘাতের পর আঘাত ক'রে জর্জ্জরিত ক'রে-ছিলুম, যে-বাড়ীতে তা'কে অসহায়া ফেলে বিলেতে পাড়ি দিয়ে-ছিলুম, সে-বাড়ী ছেড়ে সে কোথাও যায়নি, সে-বাড়ীর মাটি কাম্‌ড়েই সে প'ড়ে ছিলো!

"এক দিন নায়েবের চিঠি পেলুম—লীনা হঠাৎ এক দিন রাত্রে ঘর ছেড়ে চ'লে গেছে—কোথায় গেছে কেউ জানে না! সেদিন বিলেতে প্রচণ্ড শীতের স্তূপীকৃত তুষার গ'লে বসন্তের প্রথম রোদ্ দেখা দিয়েছে, তরুণ-তরুণীর দল দুনিবার উচ্ছ্বাসে হাইড্ পার্কে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে, পাইন্-এ কচি পাতা গজাচ্ছে, চেরীর ফল ধ'রেছে,—দিকে দিকে জাগরণের সাড়া! আমি তখন যৌবনের নেশায় মাতাল হ'য়ে ভর-আবেশে ভেসে চ'লেছি! তা'র মাঝে লীনার এ অতি-নগণ্য খবরটা আমার কাণেই পৌঁছোলো না। কোথায় কোন্ সুদূর সাগর-পারে কে-একটা অবমানিতা, নির্য্যাতিতা, স্বামী-পরিত্যক্তা নারী কেন যে সংসারের আকাশ হ'তে খ'সে গিয়ে দিশাহারা আঁধারে পাড়ি দিলে,—সে-সব তুচ্ছ কথা ভেবে মাথা ঘামাবার ফুরসৎ তখন আমার ছিল না!

"আরও কিছুদিন এম্‌নিভাবে কাট্‌লো, লীনার কথা একেবারেই ভুলে গেছি!—কিন্তু আমার মর্ম্মের মাঝখানে যা'র সোণার আসন বিধাতা পেতে রেখেছেন, আমার নিভৃত অন্তর-দেউলে যা'র পূজার পঞ্চ-প্রদীপ নিনিমেষে জ্ব'লছে, আমার পরমাত্মার নাদ-লোকে যা'র সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা অবিরত ধ্বনিত হ'চ্ছে,—আমার সাধ্য কি আমার কাছ থেকে তা'কে ঠেলে দিই! এক দিন রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌লুম—লীনাকে! সেই এক দিন বিয়ের রাতে সম্প্রদান সভায় হোমানলের দীপ্ত আলোয় আবেগ-কম্পিত হাতে তা'র গৌর সীমন্তে আয়তির গৌরব-রেখা এঁকে দিয়ে, তার সেই সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত রক্তাভ মুখখানি যে-রূপে দেখেছিলুম,—ঠিক সেই সদ্য-বধূরূপেই সুদূর প্রবাসে সে আমায় স্বপ্নে দেখা দিলে! চট্ ক'রে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, বুকের ভেতরটা তখন কি-যেন এক সব-হারানোর ব্যথায় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে! অভিভূতের মতন বিছানার ওপর উঠে ব'সলুম!—দূরে ওয়েষ্ট্‌মিন্‌ষ্টারে বিগ্ বেল্ ঘণ্টাটায় ঢং ঢং ক'রে দু'টো বাজ্‌লো। বাকি রাতটা তেম্‌নি খাড়া হ'য়েই চুপ ক'রে বসে রইলুম!.....

"পরের মেলেই দেশে ফিরলুম। ক'লকাতায় পৌঁছে বাড়ীর মুখে গেলুম। সদর-দরজার চৌকাটে পা দিয়েই একবার তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতন চ'ম্‌কে উঠে থ'ম্‌কে দাঁড়ালুম! তা'র পর—দুঃখের পরশ-মণিকে আমার বুকের মাঝখানটায় একবার ভালো ক'রে ছুঁইয়ে নিতে শুষ্ক চক্ষে আমার শোবার ঘরে ঢুক্‌লুম—সেই ঘরে, যে-ঘরে তা'কে দু'-হাতে জড়িয়ে ধ'রে জেগে-ঘুমিয়ে ফুলশয্যার রাত

কাটিয়েছি !—যে-ঘরে তা'র সেই উথ্‌লে-ওঠা রূপের সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রেছি !! তা'র বড় ছবিখানার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মনে-মনে ব'ললুম—'দেবি, ক্ষমা চাইবার কোনো পথ আমি রাখিনি, তবু জানি আমি ক্ষমা চাইবার আগেই তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবে !'

"তা'র পর বাড়ী থেকে সোজা বেরিয়ে প'ড়লুম ! আর কোনো দিন সে-বাড়ীতে ঢুকিনি,—এ-জীবনে আর কোনো দিন ঢুক্‌বো না ! তা'রপর কত—কত বছর ধ'রে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তা'কে খুঁজে খুঁজে ফিরিছি ! যৌবন প্রৌঢ়ত্বে গিয়ে প'ড়লো, প্রৌঢ়ত্ব আজ বার্দ্ধক্যের সীমান্তে এসে পৌঁছেচে !···একদিন আচম্‌কা শুন্‌লুম সে এই বাগানে স্বর্গীয় গৌর মল্লিকের—!"

খানিকটা থামিয়া ভাঙ্গা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের থম্‌থমে অন্ধকারের পানে চাহিয়া সন্ন্যাসী যেন ঘুমের ঘোরে বলিতে লাগিল—"এই ঘরে সে তার নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রেছিলো ! এর বাতাসের স্তরে স্তরে তা'র কত দিনের কত বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস জমাট্ হ'য়ে আছে ! সে যে কত বড় সতী ছিল, কেউ জানে না—ভগবানও জানেন না ! কিন্তু আমি জানি,—তা'র রক্তের প্রতি অণু-পরমাণুতে লক্ষ সীতা, কোটি সাবিত্রীর রক্তধারা মেশানো ছিল ! সেই চির-সতী স্ত্রী আমার, সেই অভিমানিনী লীনা আমার,—উঃ ! কী আগুনে পলে পলে জ্ব'লে, পুড়ে, ছাই হ'য়ে—!"

হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধে আকাশের পানে দু'টি ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করিয়া কম্পিত কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল—"না—না—এসো লীনা, ও মিথ্যা স্বর্গ ছেড়ে দিয়ে, এসো—আমার এই বুকের স্বর্গে নেমে এসো—!"

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীসুরজিৎ দাশ

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কর্ম্ম-জীবনের এমন দু' একটি কথা আমি জানি, যা' অনেকে জানেন না। আজ তাঁ'র তিরোধান দিনে সে কথা স্মরণ করছি।

কবি সেটেল্‌মেণ্ট্ অফিসার হয়ে মেদিনীপুর সুজামুঠায় আসেন। সুজামুঠা পরগণা বর্দ্ধমান মহারাজের জমিদারী। বর্দ্ধমান ষ্টেট্ তখন কোর্টস্ অব্ ওয়ার্ডসে ছিল। সাব্ ডেপুটি হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় সুজামুঠার ম্যানেজার ছিলেন। আমার বাবা ছিলেন সেখান্‌কার চেরিটেবল্ ডিস্‌পেন্সরীর ডাক্তার। আর কবির স্বগ্রামবাসী রামগোপাল মুখোপাধ্যায় সাব্‌রেজিষ্ট্রার ছিলেন। এই সব একান্ত অ-কবিদের নিয়ে সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত কবি দুধের পিপাসা ঘোলে মেটাতেন। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন বারো তেরো বছর হবে।

কবিবরের থাক্‌বার বাঙ্‌লা ছিল বড় একটা দীঘির উত্তর পাড়ে। দীঘির চা'র পাড়ে বকুল গাছের সারি; মাঝে মাঝে এক একটা বট গাছ।

কবি তখন জীবন যাপন কর্‌তেন খাঁটি সাহেবী ধরণে। তাঁ'র ভাষায় বল্‌তে গেলে তিনি তখন—ফরাসী ধরণে কাসতেন, বিলাতি ধরণে হাস্‌তেন। পা ফাঁক্ করে' সিগারেট্ খেতে বড্ড ভালোবাস্‌তেন।

কবি সেই বাঙ্‌লার পূব্‌দিকের বারাণ্ডায় দক্ষিণ-মুখো হয়ে কখন ইজিচেয়ারে শুয়ে কাগজ পড়্‌তেন, কখন হার্‌মোনিয়াম্ বাজাতেন।

কবি ছোটো ছোটো ছেলেপুলেদের বড় ভালোবাস্‌তেন। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা তাঁর সাম্‌নে এগুতে সাহস পেতো না। দূরে দাঁড়িয়ে সাহেব দেখ্‌ত। তিনি তা'দের ডেকে ছবি দিতেন। আমার একটি দেড় বছরের বোন ছিল। কবি তাঁকে কোলে কর্‌তে চাইতেন—সে সাহেব দেখে ঘাব্‌ড়ে যেত। শেষে এক দিন ধুতি পরে আস্‌তে, সে কোলে এল। তিনি হেসে বল্‌তেন—"ও আমাকে বিলেতি বাঁদর মনে করেছে।" "আম্‌রা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর; হাট্‌কোট্ পরে' সেজেছি বিলেতি বাঁদর।"

কে জানে এই কবিতাটির কল্পনা এই ঘটনায় তাঁ'র মনে উদিত হয়েছিল কি না।

এক মাসকাবারে তিনি মাইনে পাওয়ার পর ঘর থেকে দু'শ টাকার নোট্ চুরি গেল। কবি খান্‌সামা বাবুর্চি মেথর সবাইকে ধমকালেন, তবু তা'র কোনো কিনারা হ'ল না। শেষে কিছু দিন পরে এক দিন হার্‌মোনিয়াম বাজাতে গিয়ে দেখ্‌লেন, সেই দু'শ টাকার নোট হারমোনিয়ামের ভিতরে আছে। তখন তিনি অনুতপ্ত হ'য়ে সবাইকে ডেকে দেখালেন। বৈষয়িক লোক হ'লে ভুল প্রকাশ করা আহম্মকি মনে করে চেপে যেতেন। কবি এই করেই ক্ষান্ত হলেন না। তা'দের বৃথা দোষী করেছেন বলে প্রত্যেককে এক এক মাসের মাইনে দিয়ে নিজেকে দণ্ডিত করে শান্তি পেলেন। এতে তাঁর ন্যায়পরায়ণতার কত দূর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই ঘটনাটি কবির ম্যাথর্ ভাগবত ঘড়াইর মুখে শুনেছি। সে এখনও জীবিত আছে।

কবিকে কার্য্য-ব্যপদেশে প্রায়ই মফঃস্বলে যেতে হ'ত। কবি-পত্নীর সখ হ'ল—তিনি মফঃস্বল দেখ্‌বেন। রাজবাড়ীর হাতী চড়ে কবি ও কবিপত্নী চল্লেন। সেটা চৈত্র কি বৈশাখ মাস হবে। এই গরমে মাঠে মাঠে দু'মাইল রাস্তা গিয়ে বেলা বারোটায় পৌঁছলেন ক্যাম্পে। ক্যাম্পের চাপরাসী বৈদ্যনাথ মাইতি দু'টি ডাব কেটে এনে তাঁ'দের সাম্‌নে ধর্‌লে। তৃষ্ণার্ত্ত কবি-দম্পতি তা'র এই সেবাপরায়ণতায় ভারি খুসি হলেন। কবি তা'কে দু' টাকা বক্‌সিস্ দিলেন। কবিপত্নী বল্‌লেন—এমন কষ্টে যে এতখানি আরাম দিলে, তা'র বক্‌সিস্ দু'টাকা ?"

কবি তৎক্ষণাৎ তা'কে চা'র টাকা বক্‌সিস্ দিলেন।

কবি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই সাহেব সেজে থাক্‌তেন, কবিপত্নী বাসায় শাড়ী পর্‌তেন, বৈকালে বেড়াবার সময় গাউন্ পরে বেরোতেন। কবি খেতেন বাবুর্চির রান্না; কবিপত্নী খানা খেতেন না। তাঁর জন্য একজন বামুন ছিলেন। যতটা মনে হয়—তাঁ'র নাম রাম ছিল। বুড়া বাবুর্চির নাম মনে নাই। কবি-দম্পতি এইভাবে জীবন যাপন কর্‌তেন। তাঁরা এখন বেঁচে থাক্‌লে বল্‌তে পারা যেতো—"বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব বুড়া ছিল শাক্ত।"

যা কিছু বীরত্বব্যঞ্জক, যা কিছু তেজস্বিতার পরিচায়ক, তাই ছিল কবির প্রিয়। আমাদের এক ছোক্‌রা চাকর ছিল, কবি আমার বাবাকে বল্‌তেন—"ডাক্তার বাবু, কষ্টি-পাথর কোঁদা আপনার চাকর ছোক্‌রাকে দেখ্‌লে ইচ্ছা হয়, ওর সঙ্গে শরীরটা বদ্‌লাই।"

একদিন কবি ও কবিপত্নী বেড়াতে বেরিয়ে দেখ্‌লেন, পথে একটা লোক কাঠ চেলা কর্‌ছে। কবি একটু দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেন। শেষে তা'র হাত থেকে কুড়ুল নিয়ে খানিকটা কাঠ চেলা করে ফেল্‌লেন। কবিপত্নী তো হেসেই খুন।

কবি কুসুম-কোমল হলেও বজ্র কঠোর ছিলেন। একবার তাঁর এক জন চাপরাশীকে সেখানকার সব্‌ম্যানেজার অন্যায় রূপে অপমান করেন। তা'তে কবি নিজেকে অপমানিত বোধ করে, চাপরাসীর পক্ষ সমর্থন করেন। শেষে বেগতিক দেখে ম্যানেজারবাবু নিজে বাঙ্‌লায় এসে মুরুব্বিআনার ভাব দেখিয়ে মিটিয়ে ফেলেন।

তখন মাত্র কবির দু'খানা বই বেরিয়েছে—"আর্য্যগাথা" আর "একঘরে"। কবি দু'খানা বইই বাবাকে দিয়েছিলেন। 'একঘরে'র এই কবিতাটি আমি মুখস্ত করে' ফেলেছিলাম।—

"বিলাত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়,
মুড়িয়ে মাথা ঢেলে ঘোল,
ধর্‌লেন আবার মাছের ঝোল ;—ইত্যাদি।

কবির সাধারণ আলাপেও কবিত্ব প্রকাশ পেতো। কবির স্বদেশবাসী রামগোপালবাবুর ছেলে মেয়েরা ছেলেবেলা দেখ্‌তে খুব সুন্দর থাক্‌ত, বড় হলে বিশ্রী হয়ে যেতো। আর কবির শ্যালক শ্যালিকাদের ছেলেবেলা তেমন ভাল দেখাত না, বড় হ'লে চেহারা খুল্‌ত। কবি রহস্য করে বল্‌তেন—"মেয়ে মানুষ দু'রকম থাকে ; কুকুর-বিয়াণী আর ময়ূর-বিয়াণী।"

কবি হার্‌মোনিয়াম্ আর বেহালা বাজাতে পার্‌তেন। আমার যতদূর মনে হয়—তব্‌লা বাজাতেও যেন তাঁকে দেখেছি। কিছু দিন একজন ওস্তাদ রেখে সেতার শিক্ষা কর্‌ছিলেন। ওস্তাদ কোথায় যেন দূরে থাক্‌তো, প্রতি রবিবার এসে তাঁকে শেখাতো। কবি এমন সদাশয় ছিলেন—অনেক সময় সান্ধ্য বৈঠকে বেহালা বাজিয়ে নেচে গান কর্‌তেন। কবির গীতস্পৃহা এত বলবতী ছিল যে, সামান্য যাত্রা গান কীর্ত্তন মনোযোগী হয়ে শুন্‌তেন। যাত্রার কথা বল্‌তে গিয়ে একটা কথা মনে হ'ল। একবার রাজবাড়ীতে ভবতারণ পাহাড়ীর যাত্রা হচ্ছে—"শ্রীমন্তের মশান"। কার একটি

ছোট ছেলে উপরের রেলিং পার হয়ে কার্নিসের উপর এসে দাঁড়িয়োছ ; তাই দেখে নীচে থেকে একজন "পড়্ল পড়্ল" করে চেঁচিয়ে উঠেছে। ভূমিকম্পে বাড়ী পড়্ছে মনে করে সকলে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে লাগ্ল। তা'তে যাত্রা ওয়ালাদের বেহালা কার পায়ের চাপে ভেঙে গেল। কবি দুঃখিত হয়ে বল্লেন—"কার পায়ের চাপে ভেঙেছে যখন কেউ দেখেনি, তখন হয়ত আমার পায়ের চাপেও ভাঙ্তে পারে।" এই বলে দাম দেবার জন্য বিশেষ জেদ্ কর্তে লাগলেন ; তাঁ'রা তা' নিলেন না।

আগেই বলেছি যে দীঘির চার পাড়ে বকুল গাছ আছে। কবির বাঙ্লার পাশেই একটা বড় বকুল গাছ ছিল। ছিল কেন, এখনও আছে। কবিপত্নী রোজ সকালে ফুল কুড়িয়ে তা'র তলায় বসে মালা গাঁথ্তেন। এক দিন এক ছড়া মালা গেঁথে কবির গলায় পরিয়ে দিলে, কবি বলেছিলেন—

"একি আমার বিজয় মাল্য ?"

তা'র পর কবি একটা গান বেঁধে ফেল্লেন—

"আমি সারা সকালটি বসে বসে
এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।"

সেদিন সন্ধ্যায় ঘটনাটি বলে' আমার বাবাকে গানটা গেয়ে শোনালেন। এই গানটি কবি উত্তরকালে সাজাহান নাটকে দিয়েছেন। কাব্য জিনিসটা একেবারে কল্পিত নয়। কবির জীবনের এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছায়া।

এবার কবির আর একটি মহত্ত্বের কথার উল্লেখ করে আমার কথা শেষ কর্ব। কবির একবার খুব জ্বর হয়। বাবা তাঁকে আরোগ্য করেন। কবি পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করেও বাবাকে টাকা গছাতে না পেরে নিরস্ত হ'লেন। বাবা মনে কর্লেন গোল মিটে গেল। কিন্তু তা'র কিছু দিন পরে কবি কল্কাতা থেকে ফিরে এসে একখানা "প্রাক্টিস্" বাবাকে উপহার দেন। তা'তে কবির নিজ হাতের লেখা আছে—Presented to Babu Kailash Ch Das Gupta with D. L Roy's Compliment

সে বইখানা আমি খুব যত্ন করে রেখেছি—যতদিন বাঁচ্বো রাখ্বো।

যখনই আমি সুজামুঠায় যাই, কবির আবাস-স্থানটি দেখে আসি। সে বাঙ্লা আর নাই। সে বকুল গাছটি, সেই দীঘিটি, আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। আমি মনে করি, প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীরই সেটি শ্রদ্ধেয়। আমি কবি-পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারকে অনুরোধ কর্ছি, তিনি তাঁর পিতা-মাতার স্মৃতি-জড়ানো স্থানটি একবার প্রত্যক্ষ করে আসুন।

মনের মত

শ্রীরেবা দেবী

দুপুর বেলা, মুখুয্যেদের বাড়ীতে কোন সাড়া-শব্দ নেই, ঘুম-পাড়ানী বুড়ী বাড়ীর ছেলে-বুড় সকলকেই নিজের কবলে এনেছে, কেবল একজন মেয়ে বাদ পড়ে গিয়েছে। অনিতা নিজের ঘরে জোরে সেলাইয়ের কলটা চালিয়ে দিলে,—এক নিশ্বাসে হাতের কাজ সাঙ্গ করে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্ল।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি ; তবে শীতটা একেবারে যায় নি। অনিতা একবার দিদিমার মহলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। রোদে পা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি দিব্য আরামে নাসিকা গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এ পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। রান্নাঘরের দাওয়ার উপর রাধু ঝির পাঁচ বছরের ছেলেটা হাঁ করে শুয়ে আছে। মাদুর ছেড়ে সে যে মেজের উপর পড়ে আছে, এটা বোঝ্বার ক্ষমতাটা বুঝি তখন তার ছিল না। গ্রামের একটা ঘেও কুকুর কুয়োতলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মগ্ন! এদিকে সোণালী বেড়ালটা খাবার ঘরে একটা আসনের উপর নিজের বেশ সুব্যবস্থাই করে নিয়েছে।

অনিতার মনে হল, সে যেন রূপকথার কোন্ এক ঘুমন্ত পুরীতে এসে পড়েছে,—এই নিস্তব্ধ, নিঝুম বাড়ীটা যেন রাক্ষসীর মত তাকে গিল্তে আস্ছে।

আস্তে আস্তে সে তার মাসিমার সন্ধানে বেরুল। তাঁর শোবার ঘর খালি দেখে অনিতা বুঝ্লে যে, তিনি এ বাড়ীতেই নেই,—তিনি এতক্ষণে নিশ্চয় তাঁর সইএর বাড়ী তাসের আড্ডায় জমে গিয়েছেন।

বিরক্ত হয়ে অনিতা খিড়্কির দোর দিয়ে বেরিয়ে

পড়্ল। অনেকখানি জমির উপর তাদের বাড়ীটা,—চার ধারে নানা রকম ফল-ফুলের গাছ। সে একটা শিউলি গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। এখানেও মানুষের কোন চিহ্ন নেই ; তবে দু'একটা জাগ্রত প্রাণী তার নজরে পড়ল। দূরে ঐ গোয়াল-ঘরের সাম্নে কালো ভাগলপুরী গাইটা নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাট্ছে ; আর তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে তার ক'দিনের বাছুরটা। পাতার খড়্ খড়্ শব্দে বেশ বোঝা যায় যে, কাটবিড়ালীরা এবার তাদের আহারের অন্বেষণে বেরিয়েছে।

অনিতা ধীরে ধীরে তার জামার ভিতর থেকে একখানা চিঠি বের করলে। চিঠিখানার অবস্থা দেখে মনে হয়, খুব কম করে বার দশেক সেটা পড়া হয়েছে। চিঠিটা আসছে তার বন্ধু সুধার কাছ থেকে। সে লিখ্ছে :—

"ভাই অনু,

তুই যে একেবারে ডুব দিলি, তোর হ'ল কি ? পাড়াগাঁ লাগ্ছে কেমন ? আর একটা মাস থাক্তিস্ যদি, তা হলে আমরা সব একসঙ্গে কলেজ-ষ্টুডেণ্ট হয়ে যেতাম। সত্যি বল্ছি ভাই, তোকে না হলে মোটেই জমে না। আমাদের ক্লাশে অনেক নতুন মেয়ে এসেছে। তবে তারা আমাদের দলের মধ্যে কখনই ঢুক্তে পারে না। আর ছাই দলই বা কাকে বলি—আমাদের দলপতিই এখন আমাদের ছেড়ে বনবাসে গিয়েছে। দু'মাস হতে চল্ল—তুই একখানাও চিঠি দিলি না। প্রথমে রাগ করে ভেবেছিলাম, চিঠিই লিখ্ব না। তার পর ভেবে দেখ্লাম, এতে তোর কিছু হবে না, আমারই লোকসান্, তাই আবার কলম ধরেছি। যাক্, এতে কোন জোর নেই,—তুই যদি মনে করে নিজের খবরটা মাঝে মাঝে দিস তো সে আমার পরম ভাগ্যি।

এবার কলেজের ক'একটা খবর দিই। আমাদের ইতিহাসের প্রোফেসরটি একটি দেখ্বার জিনিস। ওঃ, কি তার বাহার! এই লুটিয়ে কোঁচা,—গায়ে প্রায় গরদ কি তসরের পাঞ্জাবি। আমরা তার নাম রেখেছি "জমিদারের জামাইবাবু।"

ও ভাই, এক দিন কি বিপদে পড়েছিলাম—কি আর বলি! কেন যে মর্তে হীল-তোলা জুতো পায়ে দিয়েছিলাম, তা সে আমিই জানি। সিঁড়ি দিয়ে উঠ্তে যাচ্ছি, ওমা এক পায়ের হীল গেল খুলে,—আমার চোখের সাম্নে দিয়ে সেটা গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে গিয়ে পড়ল,—আমি একে-বারে হাঁ হয়ে গেলাম। ঠিক সেই সময় জামাইবাবু বেরিয়ে এলেন। হঠাৎ খটাং করে একটা জুতোর হীল তাঁর ঘাড়ে এসে পড়াতে তিনি তো একেবারে অবাক! কি ভাগ্যি মোটা হেমাঙ্গিনীটা সিঁড়ি দিয়ে সেই মুহূর্ত্তে নাম্ছিল, তাই আমি রক্ষা পেলাম। যেই না ওকে দেখা, অম্নি আমি তার পিছনে সোরে গেলাম। জামাইবাবু উপর দিকে চেয়ে মুট্কুকেই দেখ্তে পেলেন,—ঠিক ভেবে নিলেন, এ তারই জুতোর হীল। ওঃ, কি বাঁচ্নটাই বেঁচেছি! আর কখনও হীল-দেওয়া জুতো পরব না এটা ঠিক।

আর এক দিন ভাই, এই বাঁদর স্নেহটার জ্বালায় এই রকম আর একটা বিপদে পড়্তে হয়েছিল। জানিস্ তো ভাই, একটু চাট্নী না হলে আমার ভাত মোটেই রোচে না, তাতে আবার স্কুলের ভাত। সেদিন চাট্নীটা সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই স্নেহ বাড়ী থেকে এনে দেবে বলেছিল। যেই ভাই হিষ্ট্রির ক্লাশে ঢুক্তে যাব,—ও বাঁদরটা ঠিক তখনই আমার হাতে আচারের বোতলটা তুলে দিলে। আর কি ভাই আমি লোভ সাম্লাতে পারি? বাইরে দাঁড়িয়েই একটা আমের কুচো মুখে দিলেম। স্নেহ অম্নি ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে—'ভিতরে আয়, জামাইবাবু এখনও আসেন নি।' আমার এক হাতে আচারের বোতল, আর এক হাতে আমের টুক্রো,—যেই না এ অবস্থায় ক্লাশে ঢোকা, ওমা চেয়ে দেখি —প্রোফেসর মশায় দিব্যি চেয়ারের উপর বসে আছেন। প্রথমটা আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। তার পর কোন দিকে না চেয়ে একেবারে দে ছুট্। সোজা গিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে বল্লাম যে, আমি হিষ্ট্রি ছেড়ে দেব। তা' তিনি কিছুতেই শুন্লেন না, আবার আমায় ক্লাশে গিয়ে বস্তে হ'ল। এবার একেবারে পিছনে গিয়ে বস্লাম। তাতেও কি কিছু হয়? দুষ্টু লোকটা ঘাড় উঁচু ক'রে ক'রে আমার দিকে চায় আর হাসে।

আরও অনেক খবর আছে। তোর যদি চিঠি পাই তবে আবার জানাব। তা' না হলে এ সব রইল।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি—কনকের সেই খোকা দাদাকে মনে আছে? সেই যে ব্যক্তি টেনিস্ খেলা, ঘোড়ায় চড়া, মোটর হাঁকান থেকে আরম্ভ করে পিয়ানো বাজিয়ে গানও কর্তে পারে? ইলা শুন্ছি না কি

তাকে বিয়ে করবার জন্যে একেবারে পাগল। তাঁর পিছনে সে এমন লেগেছে যে বেচারা ভদ্রলোক না কি শীঘ্র কোলকাতা ছেড়ে কোথায় পালাচ্ছেন। ছিঃ, মেয়েগুলোর কি একেবারে লজ্জা নেই? এ সব "লভে পড়া" মেয়েদের জ্বালায় আমাদেরও নাম খারাপ হয়। ছিঃ ছিঃ, এমন নির্লজ্জের মত একটা পুরুষের পিছনে ছোটাছুটি করার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল নয় কি?

আজ এখানেই শেষ করা যাক্। যে হাতের লেখা,—পড়তে পারলে হয়। লক্ষ্মীটি ভাই, যত শীঘ্র পারিস চিঠির উত্তরটা দিস্,—আমি তোর চিঠির আশায় পথ চেয়ে রইলুম ইতি—

তোর সু"

অনিতা চিঠিটা শেষ করে আবার যথা স্থানে রেখে দিলে। কত সুখ-দুঃখের কথা ঠিক আলো-ছায়ার মত তার মনের মধ্যে খেলে গেল। মাকে তার মনে নাই, তার বাপই তার সর্ব্বস্ব ছিল। ঠিক ম্যাট্রিক দেবার এক মাস আগে হার্ট ফেলিয়রে তার পিতার মৃত্যু হয়। অনিতা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। এক দিদিমা আর এক বিধবা মাসি ভিন্ন তার তিন কুলে কেউ ছিল না। এই দুটি বিধবা জন্মাবধি গ্রামেই বাস করতেন,—তাঁরা কিছুতেই নিজের ভিটা ছেড়ে অনিতাকে নিয়ে কোলকাতায় থাকতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে অনিতাকেই তাদের কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হল। কোল্‌কাতার বসবাস উঠিয়ে দিয়ে অনিতা তার অল্প-পরিচিত দিদিমা ও মাসিমার কাছে চলে গেল।

আজ প্রায় ছয় মাস হ'ল অনিতা দিদিমার কাছে আছে। এত দিনে পল্লীগ্রামের চাল-চলন তার একটু দোরস্ত হয়ে এসেছিল। সুধার চিঠি পেয়ে অবধি কিন্তু অনিতার আর একদণ্ড এখানে থাকবার ইচ্ছা করছিল না। মনে হচ্ছিল, সব ছেড়ে দিয়ে কোল্‌কাতায় পালিয়ে যায়। সেখানে সে অনায়াসে একটা বোর্ডিংএ থেকে পড়া-শুনা করতে পারে। এ কথা আজ সে দিদিমার কাছে তুলেছিল। তিনি কিন্তু সে কথায় একেবারে কাণ দেন নি। বেশী পীড়াপীড়ি করাতে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—"আমার চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ কখন ইস্কুলে থাকে নি,—সেই অনাচারীদের মধ্যে আমি তোমায় যেতে দিতে পারব না, আমি মোলে যা খুসী তাই কোর।" এর উপর আর কথা বলা চলে না,—অনিতা মুক্তির আশা ছেড়ে দিলে।

অনেকক্ষণ গাছতলায় বসে সে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করলে। সে বেশ ভাল করেই বুঝেছিল যে, এখান থেকে ছাড়া পাবার তার কোন উপায় নেই। তার বিয়ের বয়স পেরিয়ে গিয়েছে বলে তার দিদিমা আর মাসিমা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন,—তার জন্যে তাঁদের লোক-সমাজে মাথা কাটা যাচ্ছে। তাকে বিয়ে করতেই হবে এবং সেটা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। অনেক করে সে তার মনকে বোঝালে; কিন্তু তার বাঁকা মন কিছুতেই বুঝতে চাইলে না। চির জীবন কি তার এই পল্লীগ্রামেই কেটে যাবে? এ কথাটা সে কিছুতেই মান্‌তে চাচ্ছিল না।

রোদ পড়ে এসেছে দেখে অনিতা ভিতরে যাবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় দেখে যে, একজন ভদ্রলোক তাদের বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে। তাকে দেখেই বৃদ্ধ বল্লেন—"হ্যাঁ মা, এটা কি অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ী? আমি তাঁর নাত্‌নীর জন্য একটি সম্বন্ধ এনেছি।" ফস্ করে অনিতা বলে ফেল্লে—"তাঁর নাত্‌নীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে।" বৃদ্ধ একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"ও মা, কবে হল? কৈ আমরা তো কিছু শুনিনি? শশী বিশ্বেস সেদিন আমাদের গ্রামে গিয়েছিল। তা সে ত অন্নপূর্ণা দেবীর নাম করে বল্লে কি যে, তাঁর নাত্‌নীর বিয়ের বয়স হয়েছে, তার জন্যে যেন একটি পাত্তর খুঁজে দেওয়া হয়। আমি এত দিনে ভাল সম্বন্ধ পেয়েছি, তাই তাঁকে বল্‌তে এলাম। তা তাঁর নাত্‌নীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে? যাক্, ভালই হ'ল, আইবুড় মেয়ে যত শীঘ্র বাড়ী থেকে বিদেয় হয় ততই ভাল।" অনিতা আর বেশী কিছু বল্লে না, বৃদ্ধও আবার অনেক দূর যেতে হবে ব'লে একটা গরুর গাড়ীর সন্ধানে চলে গেলেন। অনিতা খানিক চুপ করে পথের দিকে চেয়ে রইল; তার পর বৃদ্ধকে যখন আর দেখা গেল না, তখন সে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

মাসিমা বাড়ী এসে খবর দিলেন, আজ তাঁর সইএর জামাই কোলকাতা থেকে আস্‌বে; তাই রাত্রে তাঁদের ওখানেই খাওয়া। মাসিমার সই বাঁড়ুয্যে-গিন্নি লোক ভাল; সকলেরই সঙ্গে তাঁর ভাব। তাঁর বড় মেয়ে সরসীর শ্বশুরবাড়ী কোল্‌কাতায়; তার স্বামী নরেন সেখানেই

কাজ করে। সরসী'র শরীর খারাপ বলে' সে কিছু দিন হল বাপের বাড়ী এসেছে। সরির বরের বিষয়ে অনিতা অনেক কথা শুনেছিল বটে, তবে তাকে এক দিনও দেখে নি।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই,—মাসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন, তখনও অনিতা রোয়াকে বসে সোণালীর সঙ্গে খেলা করছে। তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"ও কি হচ্ছে অনু? বেলা গেল যে, কাপড়চোপড় ছাড়বে না? মানুষ খেতে বলেছে বলে কি একেবারে খাবার মুখেই যেতে হয়? যাও—কাপড় ছেড়ে ফেল গে। আর দেখ, একটু ভাল করে সেজো। অনেক তো কাপড় আছে,—বেছে বেছে কি যে সব বুড়র মত সাদা কাপড় বার কর, তার ঠিক নেই"

তার পর একটু সুর নরম করে বল্লেন—"ওঠ্ মা, অমন করে বেড়াল ঘাঁটিস নি বাবু, দেখ্‌লে গা কেমন করে। যা বাছা যা, ঝপ্ করে সেরে নে।" অনিতা সোণালীকে কোল থেকে নামিয়ে বল্লে—"মাসিমা, আমার জন্য তুমি দাঁড়িও না, তুমি বেরিয়ে পড়, আমি এখুনি সব সেরে নিচ্ছি, আজ আমার মাথাটা বড় ধরেছে, আমি একটু তাল-বনের দিকে বেড়িয়ে বড় মাসিমার ওখানে সন্ধ্যার আগেই গিয়ে পৌঁছব।"

মাসিমার তখন সইএর ওখানে যাবার জন্যে প্রাণ হাঁপাচ্চে, একবার নিজের মনেই বল্লেন—"কোল্‌কাতার মেয়েদের ঐ এক রোগ—মাথা ধরা! আমাদের ত বাপু মর্‌বার বয়স হল, মাথা ধরা কাকে বলে তা জানিই না।" কথা শেষ হবার আগেই তিনি বাড়ীর বার হয়ে গেলেন।

অনিতার আজ মাথা ধরার কারণ ছিল। সে আজ দুপুরে যে কাজটা করে ফেলেছে, তার জন্যে তার অনেক ভোগ আছে, সে বেশ স্পষ্টই বুঝতে পার্‌লে। সরসীদের ওখানে যাবার তার কোনই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না গেলেও নয়। সে চিন্তিত ভাবে কাপড় ছাড়্‌তে গেল। সাদা কাপড় দেখ্‌লে মাসিমা চোটে যাবেন, হয়ত সব লোকের সাম্‌নেই তাকে বক্‌তে সুরু করে দেবেন, তাই সে নট্‌কানে ছোপান একটা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল।

সূর্য্য তখনও একেবারে অস্ত যায় নি। পশ্চিম আকাশ-টাকে কে যেন একরাশ আবীর ঢেলে রঙ্গিয়ে দিয়েছে। সবুজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে যে বাঁকা পথটা এঁকে বেঁকে চলেছে, সেইটা ধরে অনিতা তালবনের ভিতর ঢুক্‌ল। মাথার উপর দিয়ে ধব্‌ধবে সাদা বকগুলো উড়ে যাচ্ছে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে। দূরে গ্রামের ঐ নির্জ্জন পথে কোন রাখাল ছেলের বাঁশীর করুণ স্বর এই ফাল্গুনের গন্ধ-ভরা সন্ধ্যা-বাতাসকে পাগল করে কেঁদে কেঁদে মিশিয়ে যাচ্ছে কোন্ শূন্যের মাঝে!

অনিতা ধীরে ধীরে একটা গাছের নীচে এসে বসল। কত এলোমেলো ভাব্‌না তার মনকে একেবারে গ্রেপ্তার করে ফেল্লে। এমন সময় মনে হল, কারা যেন এইদিকেই আসছে। তাদের দামী সিগারেটের গন্ধ তাদের আগমনের বার্ত্তা জানিয়ে দিচ্ছে। এদের মধ্যে একজন যে সরির বর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। অনিতা একবার ভাব্‌লে পালায়। কিন্তু পালাতে গেলে এদের সাম্‌নে দিয়ে যেতে হবে। তার চেয়ে বরং গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকা ভাল। তারা নিশ্চয় এখুনি চলে যাবে। তারা সরে গেলেই সে ঐ ঘোষেদের আমবাগানের মধ্যে দিয়ে বড় মাসিমার ওখানে চলে যাবে। তাদের যাবার কিন্তু কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং তারই অতি নিকটে আর এক সারি তালগাছের আড়ালে তারা নিজের আসন গাড়্‌লে।

অনিতা মহা বিপদে পড়ল,—পলায়নের কোন আশা নেই। তারা যতক্ষণ থাক্‌বে, তাকেও ততক্ষণ বসে থাক্‌তে হবে। ভয়ে তার নিশ্বাস ফেল্‌তেও সাহস হল না। সে একেবারে জড়সড় হয়ে এক পাশে চুপ করে বসে রইল।

দু'জন লোকের মধ্যে একজন বল্লে—"ওহে, এখানে কি নট্‌কানের গাছটাছ আছে না কি? আমি যেন নট্‌কানের গন্ধ পাচ্ছি।"

ভয়ে অনিতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হল; এইবার যদি ধরা পড়ে! এর চেয়ে এদের সাম্‌নে দিয়ে চলে যাওয়াও যে ছিল ভাল!

অপর লোকটি একটু হেসে বল্লে—"দূর পাগল, এখানে আবার নটকানের গাছ কোথায়? এখানে বেশীর ভাগই তো তাল গাছ, এর নামই যে তালবন।"

সরির বরটা কি বোকা, কলকাতার মানুষ বলে কি তাল গাছও চেনে না? অনিতার হাসি পেল। লোকটি কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে আবার বল্লে—"গাছ থাকুক বা না থাকুক, আমি কিন্তু নট্‌কানের গন্ধ পাচ্ছি।" পুরুষ মানুষের এত নাক? সরির সৌখীন বরের জ্বালায় যে অস্থির!

অপর লোকটি বল্লে—"বোধ হয় এদিক দিয়ে কে

নট্‌কান নিয়ে গিয়েছে, তারই গন্ধ বাতাসে রয়ে গিয়েছে।"

"হবে।"

তার পর সে আবার বল্লে—"আঃ, এই নট্‌কানের গন্ধটা আমার বড় ভাল লাগে,—কত কথা যে মনে পড়ে! সত্যি, এ গন্ধটা আমায় একেবারে পাগল করে তোলে।"

"কি কথা মনে পড়ে শুনি?"

"ও, সে অনেক কথা।"

"আরে বল্ না ছাই শুনি।"

খানিক বাদে সরির বর বল্লে—"জানিস্, এই নট্‌কানের গন্ধ পেলেই আমার মনের মধ্যে একটি মেয়ের ছবি জেগে ওঠে—"

অনিতা অন্যায় জেনেও সরির বরের কথাগুলো শোন্‌বার জন্যে কাণ খাড়া করে রইল।

"—তার রংটা খুব সাফ নয়, এই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হবে। কি জানি কেন নট্‌কানের সঙ্গে আমার খুব ফর্সা রং ভাল লাগে না। তার চোখ দুটো বেশ ভাসা-ভাসা; তবে সব থেকে ভাল তার মিষ্টি মুখের হাসিটি। বেশ ছিপছিপে দোহারা চেহারা—মোটা মেয়েদের আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না, তবে একেবারে খুব রোগাও ভাল না,—বেশ গোল-গাল গড়ন, আর তার মাথায় একরাশ চুল। মেয়েদের এই চুলের মধ্যে যে কতখানি সৌন্দর্য্য লুকান থাকে, তা বলা যায় না। আমার মনে হয়, আমি মানুষ বাদ দিয়ে শুধু একরাশ কালো কোঁকড়া চুলকে ভালবাস্‌তে পারি।"

বন্ধু তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লে—"আরে থাম্ থাম্, একেবারে অত কবিত্ব করিস্ নি, আমার এই মোটা বুদ্ধিতে তত ভার সইবে না। দাঁড়া কতদূর গিয়েছিস্,—মেয়েটির মাথায় গাদা গাদা চুল আছে, তার পর?"

"থাম্, তুই অমন ভাবে বলিস্‌নি,—সব মাটি হয়ে যাবে। তার মাথায় একরাশ চুল একেবারে পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা চুলের গুচ্ছগুলো তার গালে কপালে সারাক্ষণই খেলা করছে, আর তার কপালে জ্বল-জ্বল করছে একটা বড় সিঁদুরের টিপ। এই নট্‌কানের মৃদু গন্ধ নিয়ে সে যখন সরল সহজ গতিতে কাছ দিয়ে চলে যাবে, তখন মনে হবে—"

ব্যস্ত হয়ে বন্ধু বলে উঠ্‌ল—"যথেষ্ট হয়েছে, এবার ক্ষান্ত হও। এসব রাত-দিন কবিতা পড়বার ফল। আজকালকার এই কাজের দিনে নট্‌কানের শাড়ী পরে কেউ তোমার মন ভোলাতে আস্‌বে না। গৃহিণীরা কাজের ভিড়ে ওসব কবিত্ব করবার সময়ই পান না।"

"আরে বোকা, এ সব যে হবার নয় তা কি আমি জানি না? না, আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে এসব খুঁজতে যাব? স্ত্রী তো হল আটপৌরে জিনিষ,—এটা হ'ল আমার মানস প্রতিমা, এ মনেই থাকে।"

অনিতার বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিল—"মানস-প্রতিমার সঙ্গে স্ত্রীর কি কোন মিল হবার উপায় নেই? এ দুটোকে কোন রকমে জোড়া তাড়া দিয়েও কি এক করা যায় না?" তার বন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে কাপড় ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে বল্লে—"আচ্ছা, আপাততঃ তোমার মানস-প্রতিমা তোমার মনেই থাক্, এখন বাড়ী যাওয়া যাক্ চল।" দুই বন্ধুতে বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

খিড়্‌কির দোর দিয়ে অনিতা বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী ঢুক্‌ল। রান্নাঘরের দিকটা একেবারে খালি। কেবল এক কোণায় মতি ঝি উবু হয়ে বসে কলাপাতা ধুচ্ছিল। সে তাড়াতাড়ি মতিকে অন্য কাজে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজেই পাতা ধুতে আরম্ভ করে দিলে। কিছুক্ষণ পরে তার মাসিমা আর সরির মা সেদিকে এসে অনিতাকে দেখে একেবারে অবাক্। মাসিমা গালে হাত দিয়ে সুর করে বল্লেন—"ও হরি, এখানে বসে পাতা ধোয়া হচ্ছে? আমরা ভেবে মরি—মেয়ে এখনও বাড়ী এল না কেন। এই মাগুর ভজাকে লণ্ঠন নিয়ে তালবনে যেতে বল্‌ব ভাব্‌ছিলুম, তা এসে একটু খবর দিতে হয়—"

সরির মা একটু এগিয়ে এসে বল্লেন—"হ্যাঁ রে অনু, তোকে কি আমি পাতা ধুতেই ডেকেছি না কি? পাড়ার সব বৌ-ঝিতে মিলে ওপরের ঘরে কত হাসি-ঠাট্টা কর্‌ছে, আর তুই সেই অবধি একা বসে পাতা ধুচ্ছিস? যা মা, উপরে যা, সরি সেই অবধি অনু অনু করে হেদিয়ে গেল। মতিটাকে বল্লাম পাতা কটা ধুয়ে দিতে, তা সে নিশ্চয় পান-দোক্তার নাম করে পালিয়েছে—! এই মাগীগুলোকে নিয়ে আর পারি নে বাবু।"

অনিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল—"না, বড় মাসিমা, মতির দোষ নেই, আমিই ওকে ছুটি দিয়েছি। উপরে যাবার আগে ভাব্‌ছি, খাবার জায়গাগুলো করে দিয়ে যাই।"

"না, তোকে ওসব করতে হ'বে না। এমন মেয়েও তো

কোথাও দেখি নি। কোথায় একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে,—না, কেবল কাজ আর কাজ। আমরা বুড়ীরা সব রয়েছি কি করতে?"

"না বড় মাসিমা, আমাকে করতে দাও,…তোমরা গল্প করতে যাও। চিরকালই কি তোমরা খাট্‌বে না কি? আমি এক দণ্ডের মধ্যে সব সেরে নিচ্ছি। বাইরের ঐ বসবার ঘরেই তো খাওয়ান হবে? সেইখানেই পাতা সাজাইগে যাই।" অনু জায়গার বন্দোবস্ত করতে চলে গেল।

সরির মা সস্নেহে অনুর দিকে চেয়ে বল্লেন—"সই, অনুর মত মেয়ে বাপু দেখা যায় না,—ও যার হাতে পড়বে লক্ষ্মী তার ঘরে বাঁধা থাক্‌বে।"

মাসিমা ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"ও যে কার হাতে পড়বে আমার এখন তাই ভাবনা। পেটে তো কাউকে ধরিনি আমি—এক রকম ঐ সব চিন্তে থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। এখন আবার ঐ মেয়েটা এসেছে। যা হোক করে ওর একটা উপায় করে দিতে হবে তো? আপন বল্‌তে ওর আর কে আছে বল? আমাদের দুই মায়ে ঝিয়ের সময় তো হয়ে এল,—কখন আছি কখন নেই। এই বেলা যদি ওকে কারুর হাতে দিয়ে দিতে পারি, তবেই নিশ্চিন্দি। ওর কপালে কি আছে তা ভগবানই জানেন।"

যার সম্বন্ধে এই আলোচনা চল্‌ছিল, সে তখন এক-মনে খুরি গেলাস সাজাচ্ছিল। খানিক পরে সরির ছোট ভাই রমু এসে বল্লে—"এই যে অনুদি, ঘরে পাণ আছে? জামাই বাবু যে পাণ পাণ করে অস্থির হচ্ছেন।"

"ঘরে পাণ থাক্‌বে না কেন? একটু দাঁড়া আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।"

ভাঁড়ার খুলে পাণ আন্‌তে বেশ একটু সময় গেল। ফিরে এসে অনু দেখে, রমু তো নেই, উল্টে মেজেতে খানিকটা রস ছড়ান। রসগোল্লার হাঁড়ির দিকে লক্ষ্য করে দেখে, তার মধ্যে থেকে কতকগুলো রসগোল্লা বেশ বেমালুম উবে গিয়েছে। পাণের থালা নামিয়ে রেখে সে আবার কাজে মন দিলে। খানির পরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। অনু পিছনে না ফিরেই বল্লে—"এই বাঁদর ছেলে, পাণের নাম করে রসগোল্লা চুরি করে পালান হয়েছে?" তার পর ফিরে দেখে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে একজন নিতান্ত অপরিচিত ভদ্রলোক। ইনিই যে সরির বর তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। অনিতা প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে কি করবে বুঝ্‌তে পার্‌লে না। তার পর তখুনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—"জামাই বাবু বুঝি? এই দেখুন না রমুর কাণ্ড, আমাকে পাণ আন্‌তে পাঠিয়ে নিজে বেশ রসগোল্লার সদ্ব্যবহার করে রেখেছে।"

সরির বর একটু হেসে বল্লে—"রমুটা তো ভারি দুষ্টু হয়েছে।"

"আর বলেন কেন? সারাদিন যে কি দস্যিপনা করে বেড়ায়, তার ঠিক নেই।" দুজনেই হাস্‌তে লাগল। তার পর অনু বল্লে—"শেষে পাণের জন্যে নিজেকেই আসতে হ'ল? একটা চাকর পাঠিয়ে দিলেই হ'ত।"

"কাউকে ওদিকে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না।"

"সত্যি—চাকরগুলো যে সব কোথা পালিয়েছে! আপনি দুদিনের জন্যে এসেছেন, তাও তেমন যত্ন হচ্ছে না। সত্যি—এটা আমাদের বড় অন্যায়।"

"এতে অযত্নটা কোনখানে হল?"

"লজ্জার খাতিরে আপনি এখন তো ও-সব বল্‌বেনই। দেখ্‌বেন, কোল্‌কাতা গিয়ে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের নিন্দে করবেন না যেন।"

"নিন্দের তো কিছু দেখ্‌ছি না।" নরেন একবার অনিতার দিকে চকিতে চেয়ে দেখ্‌লে। সে দৃষ্টিতে প্রশংসা বেশ স্পষ্ট করেই লেখা ছিল।

"পাণ নিন।"

অনিতা পাণের থালা এগিয়ে দিয়ে যাবার মত্‌লব করছে দেখে নরেন বল্লে—"আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি?"

"সম্পর্কটা বেশ মধুর,—সরি আমার বোন হয়। আমায় আর আপনি বল্‌তে হবে না,—সরি আমার থেকে বয়সে বড়।"

"তোমাকে কি বলে ডাক্‌ব?"

অনিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লে—"সরি যা বলে ডাকে তাই বলে ডাক্‌বেন।"

"সেটা কি?" ঘরের বাইরে থেকে শুধু একটি কথা শোনা গেল—"অনু।"

রাত্রে বাড়ী এসে অনু নিজের খাটটা জান্‌লার কাছে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। চাঁদের আলো চোখের উ

পড়াতে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল, তবুও সে খাটখানা সরালে না। চোখের উপর হাত রেখে সে ঘুমবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় দূর থেকে মনে হ'ল কে যেন গান গাচ্ছে। প্রথমটা গানের কথাগুলো ভাল শোনা যাচ্ছিল না। পরে একটা পরিচিত গানের কথা ভেসে এল—"আজ মনে মোর যে সুর বাজে কেউ তা শোনে নাই কি?" একলা প্রাণের কথা নিয়ে একলা এদিন যায় যে!" আঃ! সরির বরের কি সব গুণই আছে? পৃথিবীতে এক-একজন কি স্বামীভাগ্য নিয়েই না জন্মায়!

সেদিন সকালে বারাণ্ডায় বসে অনিতা পাণ সাজছে, এমন সময় রমু এসে সংবাদ দিলে যে, আজ দুপুরে পাণ সাজতে তাদের ওখানে অনিতাকে যেতে হ'বে, তার মা বলে পাঠিয়েছে। অনিতার রমুর কাছ থেকে অনেক কথা জান্‌বার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রমু তার বক্তব্য শেষ করে তখুনি কোথায় উধাও হয়ে গেল। কুলগাছ-তলায় গেলে তাকে দেখ্‌তে পাওয়া গেলেও যেতে পারত।

দুপুর বেলা খেয়ে অনিতা সরসীদের বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। তার মাসিমা তখন বারাণ্ডায় বসে তেঁতুল কাট্‌ছিলেন। তিনি অনিতাকে যেতে দেখে বল্লেন—"অনু, ঘোষেদের আম-বাগানের মধ্যে দিয়ে যেও, রাস্তায় এ সময় ছোঁড়াগুলো বড্ড হুটোপাটি করে।" তার পর অনিতার দিকে একবার চেয়ে বল্লেন—"ও কি, ভিজে চুলগুলো অমন করে পোঁট্‌লা পাকিয়েছ কেন? চুলগুলো যে সব যাবে! একে তো মাথায় তেলের নাম নেই!" অনিতা হেসে বল্লে—"মাথায় রোজ এক পো' করে তেল দিই—তাও হয় না?" "হ্যাঁ, দাও বৈ কি? এক ফোঁটা পড়ে তো যথেষ্ট।" তার পর অনুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"একটা পাণ মুখে দে না, কি যে মেমেদের মত সাদা ধব্‌ধবে দাঁত, দেখ্‌তে ভাল লাগে না।" অনিতা হাস্‌তে হাস্‌তে একটা পাণ মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।

আমবাগানের মধ্যে দিয়ে সে বরাবরই যাওয়া-আসা করে,—এ জায়গাটা তার বড়ই প্রিয়। খানিক দূর গিয়ে সে দেখে যে, একটা ঝড়ে-ওপ্‌ড়ান গাছের গুঁড়ির উপর বসে সরির বর নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট খাচ্ছে। তাকে দেখেই সে সিগারেট ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটু হেসে সে বল্লে—"কোথা যাওয়া হচ্ছে?"

"এই আপনাদেরই ওখানে।"

"এ সময় যে? গান তো বিকেলে হবে।"

"মানুষের গান শোনা ভিন্ন আর কোন কাজ থাক্‌তে পারে না বুঝি?"

"তা থাক্‌বে না কেন? তবে তুমি কি সত্যি কাজ করতে যাচ্ছ?"

"কেন, বিশ্বাস হয় না? আপনার স্ত্রীই বুঝি এক কাজের লোক?"

"তা কি আমি বল্‌ছি? তুমি কেন এমন গায়ে প'ড়ে ঝগ্‌ড়া করছ?"

"এখন তো সব দোষ আমারই হবে। জানেন, আমি ঠিক করেছিলাম—সরিকে আপনার মনের মত সাজিয়ে দেব, কিন্তু আপনি যদি শুধু শুধু আমার সঙ্গে লাগেন তো কখনই দেব না।"

"না—না, মাপ কর, অত বড় শাস্তিটা একেবারে দিও না। আচ্ছা এখন বল তো তাঁকে কি রকম সাজাবে?"

"এখন কেন বলব? রাত্রে তো দেখ্‌তেই পাবেন।"

"তবু এখন একবার শুনে রাখা ভাল। যদি তুমি আমার পছন্দটা ঠিক না বুঝে থাক, আমি এই বেলা শুধ্‌রে দিতে পারি।"

"আমায় আর শোধ্‌রাতে হবে না, আমি ঠিক জানি। বলব? আচ্ছা বলুন তো, আপনার নট্‌কানের গন্ধটা কেমন লাগে?"

"ছিঃ অনু, তুমি লুকিয়ে আমাদের কথা শুনে নিয়েছ? এটা কিন্তু তোমার অন্যায় হয়েছে।"

অনু কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বল্লে—"আমার কি দোষ,—আমি তো আর ইচ্ছে করে শুনি নি। আমি আগে থেকে সেখানে বসে ছিলাম। আপনাদের প্রাইভেটলি যদি কিছু বল্‌বার ছিল, তো ভাল করে দেখে নিলেন না কেন? শুনুন, অত ভয় পাবেন না, আমি সরিকে একটি কথাও বলি নি,—বলবও না।"

"আচ্ছা, তুমিই সেদিন নট্‌কানের কাপড় পরে বসে ছিলে?" নরেন একবার অনিতার খোলা চুলের দিকে চাইলে। স্ত্রীলোকের চুল সম্বন্ধে নরেনের মতটা মনে পড়ে যেতে লজ্জায় অনিতার মুখখানা রাঙ্গা হয়ে গেল। সে

তাড়াতাড়ি বল্লে—"আমি এবার পালাই—অনেক দেরি হয়ে গেল।"

নরেন তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করলে না—কেবল যতদূর দেখা গেল, সে একদৃষ্টে অনিতার দিকে চেয়ে রইল।

দুপুরে অনিতা একটা বই নিয়ে শোবার চেষ্টা দেখ্‌ছে, এমন সময় বাইরে থেকে কে হাঁক্‌লে—"মা সরস্বতী বাড়ী আছ?"

অনিতার মাসিমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বল্লেন—"এই যে আসুন, ভিতরে আসুন।"

আগন্তুকের গলা পেয়েই অনিতা বুঝেছিল, এ শশি বিশ্বাস ছাড়া আর কেউ নয়। সে নিশ্চয় তারই সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে এসেছে। অনিতা যা সন্দেহ করেছিল, তাই ঠিক হ'ল। অনেকবার হেঁচে, কেসে শশি বিশ্বাস যা বল্লেন, তার মর্ম্ম এই যে, মিথ্যা কথা বলে সরস্বতী দেবীরই বাড়ীর একজন অনুর একটি ভাল পাত্র হাতছাড়া করে দিয়েছে। অনেক বিবেচনার পর দু'জনে মিলে ঠিক কর্‌লেন যে, রাধু ঝি ছাড়া এ কায আর কারুর নয়। সরস্বতী দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠ্‌লেন—"ঠিক্ ঠিক্, এ নিশ্চয় রাধুর কায, ঘুস্ টুস্ খেয়েছে বোধ হয়। আসুক না মাগী,—তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে তবে ছাড়ব। যার শীল তারই নোড়া, তারই ভাঙ্গে দাঁতের গোড়া। আমাদেরই খেয়ে-পরে মানুষ হলি, আর আমাদেরই সঙ্গে এই বাধ সাধা। কলি কাল কি না?"

এরপর মিষ্টিমুখ করে শশি বিশ্বাস বিদায় হলেন। তাকে বেরুতে দেখে অনিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এল; আস্তে আস্তে মাসিমার কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করলে। অনিতার কথায় মাসিমা একেবারে গালে হাত দিয়ে বসলেন—"ও মা, এমন করে শত্রুতা করতে হয়? আমরা তোর কি করেছি অনু? এই বুড় বয়সে কোথায় একটু হরিনাম করতে করতে চোখ বুজব, না কেবলই আমাদের সংসারের মধ্যে জড়িয়ে রাখবি? আর-জন্মে তুই আমাদের কে ছিলি যে, এ জন্মে শান্তিতে মরতেও দিবি নি? এমন স্বার্থপর কবে থেকে হলি অনু? আমাদের মান অপমানের দিকে কি একবারও চেয়ে দেখতে নেই?"

অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে অনিতা বল্লে—"মাসিমা আর বোলো না,—আমি সত্যি তোমাদের প্রতি অন্যায় করেছি। আমি এত দিন কেবল নিজেরই বিষয় ভাবছিলাম; তোমাদের দিক দিয়ে দেখি নি। আমি আজ তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি—তুমি যাকে বিয়ে করতে বল্‌বে, তাকেই করব, আর একটিও আপত্তি তুলব না।" অনিতা চোখের জল সামলাতে না পেরে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে গেল।

বিকেল বেলা, একটু খোলা হাওয়ার আশায়, আম-বাগানের পাশ দিয়ে যে ছোট মাঠটি গিয়েছে, সেইখানে একটা বকুল গাছের নীচে অনিতা এসে বস্‌ল। অনেক কথাই আজ তার মনে পড়ল। সে সব স্মৃতি যত শীঘ্র মন থেকে মুছে যায়, ততই ভাল। তা না হলে, সে মাসিমার কাছে যে কাজ করতে স্বীকার হয়েছে, সে কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব হবে। সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না—এখনকার মেয়েরা কি করে অচেনা, অজানা লোকের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে, সেই বা কেন পারছে না? হঠাৎ সরির কথা তার মনে পড়ল—সেও তো বিয়ের আগে নরেনকে দেখে নি; শুভদৃষ্টির সময় প্রথম সে যখন তাকে দেখলে, তখনই যে সে তাকে স্বামী বলে বরণ করে নিলে, এটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু সকলেরই কি সরির মত ভাগ্য? তার অন্তরের মধ্যে যে বেদনাটা চাপা ছিল, সেটা এবার রূপ ধরে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়্‌ল।

একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি যে তারই দিকে এগিয়ে আস্‌ছে, সেটা অনিতা একেবারে টের পায় নি। সে যখন অতি নিকটে এসে বল্লে—"ওঃ, তুমি? আমি ভাব্‌লাম, বনদেবী-টেবী হবে।" তখন অনিতা চোখ তুলে তার দিকে চাইলে,—তার চোখের জল তখনও শুকায় নি। বৃষ্টির পর ফুলের মধ্যে যেমন দু' এক ফোঁটা জল রয়ে যায়, অনিতারও চোখের কোণে জলের রেখা ঠিক সেইরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ল। নরেনের মুখের হাসি মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সে একটু ঝুঁকে পড়ে ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—"অনু কাঁদ্‌ছ? কি হয়েছে তোমার?"

"বিশেষ কিছু নয়।" অনু হাস্‌বার চেষ্টা করলে,—সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ।

"তোমাকে প্রশ্ন করবার অধিকার আমার নেই। তবে যদি কোন কাজে আস্‌তে পারি, তো বন্ধু মনে করে' নিঃসঙ্কোচে আজ্ঞা কর।" নরেনের কথায় অনিতার চোখ জলে ভরে এল। সে তার কাছ থেকে সেটা লুকোবার আশায় চোখ নামালে।

"অনু, আমার খুব বিশ্বাস, তুমি বিশেষ রকম একটা আঘাত পেয়েছ, তা না হলে এমন করে কাঁদ্‌তে না।"

"আমার কাঁদবার কারণ শুন্‌লে আপনি হাস্‌বেন।"

"সেটা পরীক্ষা করেই দেখ।"

"সত্যি বল্‌ছি, এমন কিছুই নয়।" তার পর একটু থেমে বল্লে—"আমি এই মাত্র মাসিমাকে বলে এলাম যে, 'তিনি যার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন আমি তাকেই বিয়ে করব,—সে কানাই হোক বা খোঁড়াই হোক। ও কি? অমন গম্ভীর হলেন কেন? হাস্‌ছেন না যে বড়?"

"এর মধ্যে হাস্‌বার তো কিছু দেখ্‌ছি না।"

"আপনি তা' হলে আমারই মত বোকা। এই সারা গ্রামে এমন একটিও লোক পাবেন না, যে এর মধ্যে কাঁদ্‌বার কারণ দেখ্‌তে পাবে।"

নরেন চুপ করে রইল,—মনে হল, কি যেন ভাব্‌ছে। অনিতা একটু হেসে বল্লে—"আচ্ছা, বলুন তো, যদি আমায় কেউ দেখ্‌তে আসে, তো আমায় কি কি পরীক্ষা দিতে হবে? ভিজে পায়ের ছাপ নেবে? হাত ধুইয়ে দেখ্‌বে রংটা আসল কি নকল?"

"থামো, আমার এ সব কথা শুন্‌তে একটুও ভাল লাগে না।"

"রাগ করছেন কেন? এ ত কিছু নতুন নয়! আপনি না হয় কোল্‌কাতার মানুষ, তাই সরিকে এসব পরীক্ষা দিতে হয় নি,—সকলের তো আর তা' হয় না।" তার পর নরেন কোন উত্তর দিল না দেখে অনিতা বল্লে—"সন্ধ্যা হয়ে এল, বাড়ী যাওয়া যাক্।" সে উঠে দাঁড়াল, হাস্‌বার বৃথা চেষ্টা করে বল্লে—"আজ আমার নিজের উপর এত ঘৃণা হচ্ছে,—আমি এত দিন জান্‌তাম না যে, কথা দিয়ে কথা রাখ্‌বার মত সাহস আমার নেই।" সে দ্রুতপদে বাগান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সারা রাত কেঁদে কাটাবার পর সকালবেলা মাথার যন্ত্রণায় সে বিছানা থেকে উঠ্‌তে পার্‌লে না। তার চোখ মুখ লাল দেখে মাসিমা, জ্বরের আশঙ্কায় তাকে দু'দিন শুইয়ে রাখ্‌লেন।

পরদিন দুপুরে অনিতা সরির সঙ্গে দেখা করতে বেরুল। বাড়ী থেকে একটু দূরে যেতেই পুঁটির সাক্ষাৎ মিল্‌ল। পুঁটি বিশেষ মুখরা মেয়ে, তার উপর সে অনিতাকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারত না। সে একটু মুখ টিপে হেসে বল্লে—"কি গো, বিরহিনীর মত কোথা যাওয়া হচ্ছে?" পুঁটির কথা বল্‌বার ধরণটা অনিতার মোটেই ভাল লাগল না,—সে কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে চল্ল। পুঁটি কিন্তু থাম্‌বার মেয়ে নয়, সেও এগিয়ে গিয়ে হেসে বল্লে—"কি ঢলানটা ঢলালি ভাই! বিজয় বাবু চলে গিয়েছে বলে একেবারে দু'দিন বিছানা থেকে উঠ্‌তেই পার্‌লি না? লোকের বর বিদেশে গেলেও তো কেউ এমন করে না।" পুঁটির কথার কোন মানে না বুঝ্‌তে পেরে অনিতা বিরক্ত হয়ে বল্লে—"সকাল থেকে কি বাজে কথা বক্‌তে আরম্ভ করেছ; সর, আমি যাই।"

"যাও না, আমি কি তোমায় ধরে রেখেছি? আমরা গরীব মানুষ, তোমাদের মত বড়লোকের সঙ্গে কথা বল্‌বার যোগ্য নই, তা কি আর আমি জানি না? বড়লোকের সবই শোভা পায়। আমরা যদি আজ এ কেলেঙ্কারীটা করতাম, তা' হলে গাঁয়ের আর পাঁচজনায় এসে এক গালে চুণ আর এক গালে কালি মাখিয়ে একেবারে দূর করে দিত।"

অনিতার এবার সত্যি রাগ হল। পুঁটির সব কথা সে বুঝ্‌তে পারলে না বটে, তবে এটা সে স্পষ্ট বুঝ্‌লে যে, তাকে কোন একটা অন্যায় কাজের জন্যে দোষী করা হচ্ছে। পথে দাঁড়িয়ে পুঁটির সঙ্গে এসব বিষয় আলোচনা করবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না; তাই সে কিছু না বলে বাড়ীর দিকে চলে গেল। যেতে যেতে সে শুন্‌লে পুঁটি বল্‌ছে—"ঈষ, চলন দেখ না, যেন মহারাণী,—সকলে যখন গুণের কথা শুন্‌বে, তখন গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে।"

সন্ধ্যা বেলা অনিতা সরসীদের বাড়ী গিয়ে দেখে, সরি ছাতে বসে আছে। তার মুখ দেখে মনে হ'ল, তার কি একটা হয়েছে। খানিক বাজে কথার পর সরসী বল্লে—"ভাই অনু, তোর নামে একটা কথা শুন্‌লাম, তুই যদি রাগ না করিস তো বলি।"

"রাগ করব কেন? বল্‌ই না কি শুনেছিস্?"

"লক্ষ্মীছাড়া পুঁটিটা ভাই তোর নামে যা' তা বলে বেড়াচ্ছে। তুই না কি ভাই রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আম-বাগানে বিজয় বাবুর সঙ্গে দেখা করতিস্? ওই পেঁচা-মুখো মেয়েটা না কি সব দেখেছে। আজ দুপুরে এই নিয়ে সে ঘোঁট করতে এসেছিল, আমি দু' ধমকে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি।"

শরীরের সব রক্ত যেন এক ঝলকে অনিতার মুখে এসে পড়্‌ল। ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞেস করলে—"বিজয় বাবু কে?"

"বিজয় বাবু এঁরই এক বন্ধু।"

"তাঁকে তো আমি দেখি নি।"

"দেখ্‌লি, আমি ঠিক জানি এর ভিতর এক কাণা কড়িও সত্যি নেই। পুঁটিটার মত মিথ্যেবাদী দুনিয়ায় দু'টো নেই, পরনিন্দা পেলে ও আর কিছু চায় না।" সরি একটি আরামের নিশ্বাস ফেল্লে।

"দাঁড়া ভাই, পুঁটির সব দোষ নয়, আম-বাগানে যেতে-আস্‌তে দু' একবার তোর বরের সঙ্গে দেখা হয়,—ও হয় ত তাকেই বিজয় বাবু বলে ভুল করেছে।"

"কি বল্লি অনু, এঁর সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে? ওমা লোকটা কি ন্যাকা! এই কাল রাত্রে সবে আমায় বলা হচ্ছে—'তুমি এত অনু অনু কর, কিন্তু কৈ আমার সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলে না।' আমার অত মনে ছিল না যে তুই ওঁকে দেখিস্ নি,—এঁর কথাতে সেটা মনে পড়ল। তাই এঁনাকে বলেছিলাম, আজ যেন সকাল সকাল বাড়ী আসেন,—তোর সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে দেব। এই এল বলে। আচ্ছা লোক যা হোক—এত রঙ্গও জানেন।"

সরির কথা শেষ হবার আগেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল—"ঐ যে আস্‌ছেন।" সরসী মাথার কাপড়টা তাড়াতাড়ি টেনে দিলে। নরেন ছাতে পৌঁছবার আগেই অনিতা একটু ব্যঙ্গ করে বল্লে—"কি নরেন বাবু, আমায় না কি আপনি চেনেন না?" মুখের কথা আর বের হল না,—অনিতা একজন নিতান্ত অপরিচিত লোকের দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল।

এর পর অনিতা বাড়ী থেকে বের হওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে। সকলেই তাকে নিয়ে আলোচনা করে। কেউ মেয়ের দোষ দেয়; কেউ বা আবার বলে, এতে অনিতার দোষ নেই। তবে বিজয় তো বরাবর জান্‌ত যে, অনিতা তাকে নরেন বলে ভুল করেছে? তবুও যখন সে তার এ ভুল ভাঙ্গায় নি, তখন ধরে নিতে হবে—তার কোন দু-অভিসন্ধি ছিল।

বাড়ীর বাগানটাই এখন অনিতার বেড়াবার এক মাত্র স্থান। বাগানের এক কোণে কতকগুলো গোলাপ ফুলের গাছ ছিল। আজকাল আর বড় তাদের যত্ন হয় না, তবুও গরীবের মেয়ের মত অনাদরে মানুষ হয়েও তারা বেশ বেড়ে উঠেছে। সইখানেই অনিতা প্রায়ই বসে থাক্‌ত। সন্ধ্যা নাম্‌তে, অনিতা ভিতরে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় বিজয় তার কাছে এসে বল্লে—"অনিতা একটু বস, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" সহসা এমন স্থানে বিজয়কে দেখে তার মুখ দিয়ে একটিও কথা বের হল না।

বিজয় বল্লে—"আমি প্রথম থেকেই জান্‌তাম, তুমি আমায় নরেন বলে ভুল করেছ। সেদিন তোমাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল, হঠাৎ ভগবান বুঝি আমার প্রতি বিশেষ দয়া করে আমার মানস-প্রতিমাকে রূপ দিয়ে আমার তৃপ্তির জন্য পাঠিয়েছেন। তার পর তুমি আমার সঙ্গে না জেনে যে সম্পর্কটা পাতালে, সেটা উপেক্ষা করবার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি বুঝেছিলাম, তোমার সঙ্গ পেতে হলে এ ছলনাটা রাখতেই হবে। আমি এখন বুঝ্‌ছি—এ কাজটা করা কতদূর অন্যায় হয়েছে। দু'দিন হল আমি কোল্‌কাতায় গিয়েছিলাম, আজ এসে আমি সব শুন্‌লাম। আমারই দোষে লোকে তোমার নামে যা' তা' বল্‌তে সাহস পেয়েছে,—" বিজয়ের গলার স্বরটা ভেঙ্গে গেল। একটু পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আবার সে বলতে সুরু করলে—"আমি যখন বুঝলাম, তোমাকে না হ'লে আমার আর এক দিনও চল্‌বে না, তখুনি আমি বাড়ী গেলাম। ছোট বেলা থেকে মার আশীর্ব্বাদ না নিয়ে আমি কোন কাজে হাত দিই নি। তাই আমার জীবনের এত বড় ব্যাপারটা তাঁকে না বলে থাক্‌তে পার্‌লাম না। তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছি। এসেই যা শুন্‌লাম, তাতে আরও স্পষ্ট করে মনে হচ্ছে, আমি কোন অংশে তোমার উপযুক্ত নই। তোমাকে আর সকলের হাত থেকে রক্ষা করা দূরে থাক্, আমিই তোমার অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি। তোমার মাসিমার সঙ্গে দেখা করলাম, তাঁকে সব কথা খুলে বল্লাম। তিনি নিজগুণে আমায় মাপ করেছেন। তোমার প্রতি যে অন্যায়টা করেছি, সেটার জন্যে ক্ষমা চাইবার সাহস হ'ত না, যদি না মাসিমার কাছে একটা কথা শুন্‌তাম—"

গম্ভীর হবার বৃথা চেষ্টা করে অনিতা বল্লে—"মাসিমা আমার নামে কি বানিয়ে বলেছেন শুনি?"

"মাসিমা বল্লেন যে, লোকে যখন আমার নিন্দে করে, তখন না কি তুমি বলেছিলে যে তুমি নিজের বদনামের জন্য দুঃখিত নও, কেবল আমার নিন্দে তোমার অসহ্য। এ কথাটা কি মাসিমা বানিয়ে বলেছেন?"

"আমি মাসিমাকে বিশেষ করে যা' বলেছি, মাসিমা

কখনও উচিত হয় নি যাকে-তাকে বলে বেড়ান।" অনিতা বিজয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। বিজয় জোর করে তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লে—"কে বলে সতী সাবিত্রীর যুগ চলে গিয়েছে?"

বাসি-বিয়ের কনের বেশে অনিতা যখন তার স্বামীর বাড়ী নাম্‌ল, তখন তার মনে হল, এত দিনের অপেক্ষা তার সার্থক হয়েছে। যে সৌম্য-মূর্ত্তি বিধবা নারী তাকে "ঘরের লক্ষ্মী" বলে নিজের কাছে টেনে নিলেন, তাঁকে দেখেই অনিতা বুঝেছিল, স্বামীর মনের মত হতে হলে এঁরই ছায়ায় জীবন গঠন করতে হবে।

ফুলশয্যার দিন অনিতার ননদেরা তাকে মনের মত সাজিয়ে ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালে। এমন সময় অনিতা শুন্‌তে পেলে পাশের ঘরে কে বল্‌ছে—"খোকাদাদা যে শেষে এমন বিয়ে করবে, আমি তা' স্বপ্নেও ভাবি নি। কত মেয়েই না তাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছিল,—তা কাউকেই আর পছন্দ হ'ল না। এর চেয়ে আমার মনে হয়, ইলার সঙ্গে হলেও ভাল হ'ত। ও একটা তবু মানুষের মত মানুষ। আমার খুব বিশ্বাস, খোকাদা কোন এক অরক্ষণীয়া মেয়েকে উদ্ধার করে এনেছে। বিয়ে-থার সম্বন্ধে এ সব "কুইকসোটিসম" আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

স্বরটা অনিতার পরিচিত। সে হাসিমুখে এই মেয়েটির আগমনের প্রতীক্ষায় রইল। যে মেয়েটি এতক্ষণ উঁচু গলায় এ সব মন্তব্য প্রচার করছিল, সে এইবার মুখ অন্ধকার করে ঘরে ঢুক্‌লো; কিন্তু কনেকে ঘরে দেখেই সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। তার পর এক লাফে মনের উল্লাসে অনুকে জড়িয়ে ধরে কনক বলে উঠ্‌লো—"ওমা তুই! আমি এতক্ষণ বৃথা কতই না বক্ বক্ করলাম। কোথা থেকে যে কি হয়, কিছুই বলা যায় না। তুই যে শেষে আমার বৌদিদি হবি, এ আমি কোন দিনই ভাবি নি।

রাত্রে অনিতা স্বামীকে বল্লে—"দেখ, আজ সকালে একটা সুখবর পেলাম। আমি একেবারে শুধু হাতে তোমার কাছে আসি নি,—বাবা আমার জন্যে কিছু টাকা রেখে গিয়েছেন।"

"তাতে তোমার এত বেশী কি লাভ হ'ল?"

"আমার আবার লাভ কিসের? তবে তোমার যদি কোন কাযে লাগে—"

বাধা দিয়ে বিজয় বল্লে—"তুমি কি মনে কর তোমার টাকা আমি নেব?"

"কেন? আমার টাকা নিলে তোমার জাত যাবে না কি?"

"জাত না হোক, মান যাবে।"

"ঈষ, মান অপমানের জ্ঞানটা যে বড্ড টন্‌টনে দেখ্‌ছি। আচ্ছা, আমার টাকা নিও না, আমি নিজেই সেটা সৎ খরচ করব।"

"তা বৈ কি? তুমি ওর থেকে এক পয়সাও নিতে পাবে না। তোমার যা দরকার—আমার টাকা থেকে কিন্‌বে।"

"অতগুলো টাকা তবে কি হবে?"

"কেন, তোমার যে-কোন চ্যারিটিতে ইচ্ছা দিয়ে দাও।"

"তবুও ব্যবহার করতে দেবে না?"

"না, তুমি যখন আমার স্ত্রী, তখন তোমার সব অভাব আমি পূর্ণ করব।"

"বাবা, ঢের ঢের অহঙ্কারী লোক দেখেছি, কিন্তু তোমার জুড়ি পাওয়া যাবে না।"

"সে তুমি যাই বল, তোমাকে আমার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হবে, এটা ভুল না যেন!" অনিতার বল্‌বার ইচ্ছা ছিল—"এর চেয়ে সুখের বিষয় আর নেই।" তবে আজকালকার এই নারী-স্বাধীনতার যুগে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়েও বেরুল না।

এক এক লাফে দু'টো করে সিঁড়ি পার হয়ে বিজয় যখন প্রায় তার মার ঘাড়ের উপর পড়ছিল, তখনই তার বড় বোন সুনন্দিনীর মোটর গাড়ী বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল। সুনন্দিনী বিজয়কে দেখে বল্লে—"খোকা, তোর হাতে ওটা কি রে?"

"ওঃ—এটা? ও একটী পার্শেল।" লজ্জিত ভাবে বিজয় মাথা চুল্‌কে এদিক ওদিক চাইলে। তার দিদি হেসে বল্লে—"আর লুকচ্ছিস্ কেন? বুঝ্‌তে পেরেছি—বৌয়ের জন্যে নিজের পছন্দমত কাপড় কিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।" মায়ে-ঝিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে উপরে চলে গেলেন।

বিজয় নিজের ঘরে ঢুক্‌তেই নট্‌কানের মৃদু-গন্ধ-মাখা একটা হাল্‌কা বাতাস তার মুখে এসে পড়ল। দূরের একটা চেয়ারে অনিতা বসে ছিল; পরনে তার একখানা নটকানের শাড়ী। বিজয়কে দেখে সে বল্লে—"কি গো? মনের মত সাজ হয়েছে?" বিজয় তার দিকে একবার চাইলে; তার পর একটু হেসে বল্লে—"শুধু সাজটা কেন? তোমার আগাগোড়াই আমার মনের মত।"

হিমালয়ের পত্র

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ-এম্-এ-ঈ, এম্-আর-এ-এস (লণ্ডন)

বদরীনাথ ধাম, ৫ই জুন, ১৯২৪ সাল।

তরশু যোশীমঠে আপনার পত্র পেয়েছিলাম। আজ আমি বদরীনাথে। এখানে তিন দিন থাকবো। সমুদ্রতীর হ'তে কেদার এবং বদরী যথাক্রমে ১১,৭৫৩ এবং ১০,২৮৪ ফিট উঁচু। আগে কেদার থেকে বদরী যাবার জন্য বরফের মধ্য দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রাস্তা ছিলো। তিন দিনে যাওয়া যেতো। পাহাড় ভেঙ্গে পড়াতে সে পথ বন্ধ হয়েছে। ফলতঃ যে রাস্তায় আমরা কেদারে গিছলাম, তাতে ১৫ ক্রোশ নেমে এসে, নালা থেকে উত্তর-পূর্ব্বগামী রাস্তায় ৫০ ক্রোশ চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে বদরীনাথে এসেছি। এই পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে প্রসিদ্ধ উখীমঠ ও যোশীমঠ আছে। উখীমঠ নালা থেকে দু' ক্রোশ। মনে করুন, পূর্ব্বে-পশ্চিমে দুটী পাহাড় আছে, সামনা-সামনি। উভয়ের গায়ের কাছে, অনেক নীচে, নদী। পূর্ব্বদিকের শৃঙ্গটার উপরে উখীমঠ এবং পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে গুপ্তকাশী আর নালা চটি। কেদারনাথ থেকে আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলাম, তাতে আমি গুপ্তকাশীর এবং অভ্রভেদী পাহাড় দুটীর বর্ণনা করেছি। শীতকালের আট মাস কেদার এবং বদরী বরফে চাপা থাকে। অধিবাসীরা গৃহপালিত পশু নিয়ে নিম্নদেশে গমন করেন।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কেদার, বদরী, উখীমঠ এবং যোশীমঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অষ্টম শতকের শেষভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্যা থেকে হিন্দু ধর্ম্মকে রক্ষা করতে শঙ্কর আবির্ভূত হ'ন। শঙ্কর-বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে তার ইতিহাস পাওয়া যায়। ভারতের "চার ধামে" তিনি চারটী মঠ স্থাপিত করেন, ধর্ম্ম-প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ। সেতুবন্ধে সিঙ্গিরী মঠ, পুরীধামে গোবর্দ্ধন, দ্বারকায় শারদা এবং হিমালয়ে যোশীমঠ। উখীমঠও তাঁরি স্থাপিত। Lhasa and its Mysteries নামক পুস্তকে লাসার ছবি দেখেছিলাম—অনন্ত হিমালয়ের চিরতুহিন গাত্রে তাসের খেলাঘরের আকৃতি বাড়ীঘরের মধ্যে প্রধান লামা মহোদয়ের সুবৃহৎ আবাস। নালা এবং গুপ্তকাশী হ'তে ওপারের উখীমঠ অনেকটা সে রকম দেখতে। মন্দিরের উঁচু প্রাকার ঘিরে ছোটো ছোটো বাড়ী। নালা থেকে আমরা উৎরাই পথে নামলাম, সেতুর সাহায্যে নদী অতিক্রম করলাম এবং খাড়া

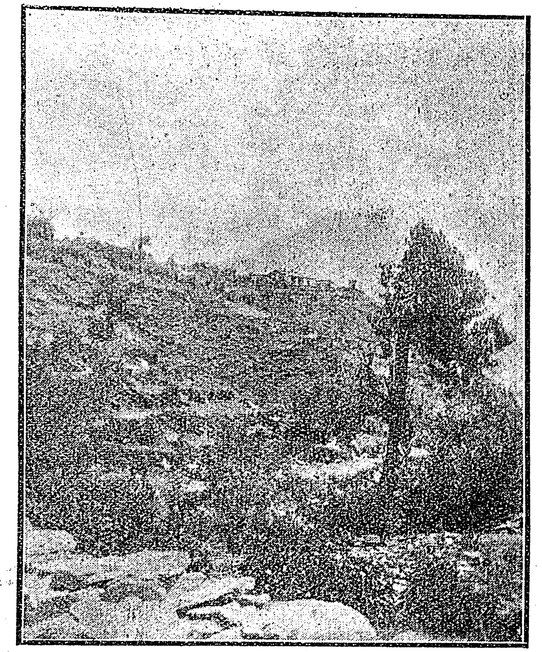

উখীমঠ পথে

চড়াই পথে উখীমঠে উঠলাম। সহরে প্রবেশ করবার মুখে প্রায় সমতল ক্ষুদ্র উপত্যকা দেখা যায়। তার মাঝে সেকালের মোহান্ত বা রাওয়ল মহারাজদের সমাধি আছে। নিকটে সেকালের জলাধার। তার তটদেশে নক্সা-খোদা পাষাণ-প্রাচীর। উখাজীর মঠ সমচতুষ্কোণ; এবং পাষাণ

প্রাকার ও সিংহদ্বারে ঘেরা। প্রাঙ্গণে দুটী মন্দির আছে। একটি মাঝারি, অপরটি ছোটো। প্রথমটী প্রাচীন কালের বলে মনে হ'ল। ছোটোটীর চারপাশে দালান এবং উঠান। দেয়ালে যক্ষ, দ্বারপাল, কৃষ্ণ, রাধা, গণপতি প্রভৃতির মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। সুন্দর মূর্ত্তি। বৈষ্ণব যুগের ছাপ। পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তিও আছে। প্রাঙ্গণের চারধারে বারাণ্ডা ও কক্ষ। তথায় রাওয়ল মহারাজের গদী, কার্য্য-গৃহ এবং যাত্রী থাকবার কুটুরী। সেগুলি প্রাঙ্গণ হ'তে হাত দুই উপরে

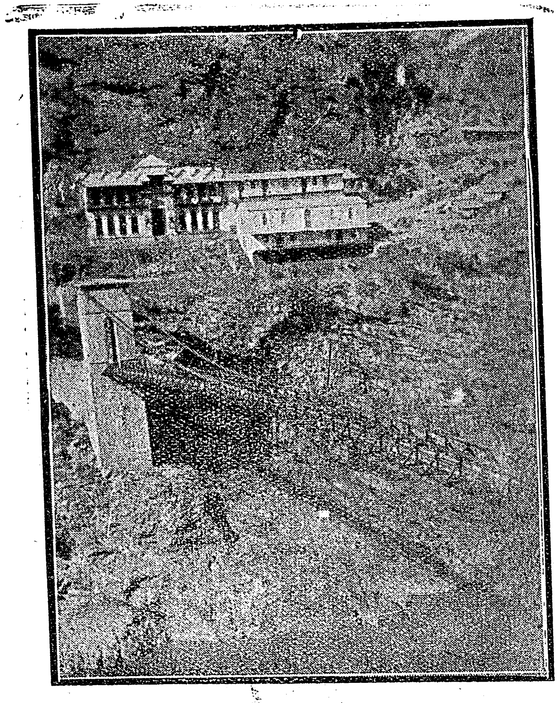

বিষ্ণু-প্রয়াগ

হ'বে ; কিন্তু পাশের রাস্তার উপরে অন্ততঃ পনের হাত। দূর থেকে কক্ষগুলোকে একটি দুর্গের প্রাকারের শিরোভাগ বলে মনে হয়। শীর্ষদেশে এরূপ কক্ষ সমেত পাষাণ প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী সিংহদ্বারটী বৃহৎ, কারুকার্য্য-খচিত ও চিত্র-বিচিত্রিত। সাঞ্চী স্তূপের উত্তর তোরণের উপরে কতকগুলো গজরাজ lintel বা তোরণ-শীর্ষ ধরে আছে দেখেছিলাম। এই দ্বারের উপরে লাল ও কালো রঙের গজরাজের bracket বা বন্ধনী আছে। তবে সে রকম উচ্চশ্রেণীর নয়।

মন্দিরে হস্তীর বন্ধনীগুলি আমার দৃষ্টি বিশেষ কোরে আকর্ষণ করেছিলো। শুধু এখানে কেন, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের নানা মন্দির ও প্রাসাদের স্থাপত্যে গজরাজের প্রতিপত্তি দেখা যায়। এতই সুন্দর সেগুলি যে রক্ষ, যক্ষ, পশুপক্ষীর ভাস্কর্য্য তাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। প্রাচীন যুগ হ'তে হস্তী আমাদের কাছে বরণীয়। সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে মিশরের প্রথম নরপতি মেনেসের (Menes) জন্মস্থানে হস্তীদন্তে-নির্ম্মিত রাজার মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। সে সময়কার রাণীদের গন্ধদ্রব্য ও গয়নার কৌটা, চিরুণী, দর্পণের হাতল, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি হাতীর দাঁতে তৈরী হ'ত। ইরাক্ দেশে নীমরূদ (Nimroud) এর ঢিবিতে খৃঃ জন্মের হাজার বছর আগেকার ফিনিসীয়ানদের কৃত হাতীর দাঁতের কাজ পাওয়া গেছে। সলোমনের সিংহাসন তদ্দ্বারা তৈরী হয়েছিলো। গ্রীকেরা হস্তীদন্তের আদর করতেন। সোণা আর হাতীর দাঁত মিলিয়ে অনেক সময়ে গ্রীকেরা তাঁদের দেবতার মূর্ত্তি গড়তেন। শরীরের যে সব অংশ অনাবৃত রাখা যায়, সে গুলি হাতীর দাঁতে, আর পরিধেয় প্রভৃতি সোণায় তৈরী হ'ত। হস্তীদন্তের পাণ্ডু রঙে দেবদেহের শ্বেতিমার চমৎকার অনুকরণ হ'ত। এ সকল মূর্ত্তিকে গ্রীকেরা "স্বর্ণেভ" মূর্ত্তি (ইংরাজীতে Chryselephantine) ব'লত। ওলিম্পিয়াতে শিল্পী ফিদিয়াস (Pheidias) কৃত জেউস (Jeus) বা দ্যৌঃ পিতা দেবতার এবং আথেন্সে আথেনী পার্থেনস্ (Athene Parthenos) বা কুমারী আথেনী দেবীর এরূপ দুটী মূর্ত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। গ্রীকেরা বাদ্যযন্ত্র, চেয়ার, টেবিল, তৈজসাদি হস্তীদন্তে নির্ম্মাণ করতেন। রোমাণ, বাঈ-জান্তাইন এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতিও তৎকরণে বিমুখ ছিলেন না।

ভারতে কিন্তু হাতীরা লাগলো প্রধানতঃ দেবতার কাজে। বিদেশী শিল্পীরা বলেন, ভারতবর্ষের মন্দির এবং প্রাসাদের স্থাপত্যের তক্ষণ-শিল্পে গজরাজের যেরূপ অদ্ভুত, প্রাণবন্ত ভাব ফুটেছে, পৃথিবীর অন্যত্র সেরূপ দেখা যায় না। কি বানরের সঙ্গে বৃক্ষশাখা নিয়ে খেলা করবার কালে, কি যুদ্ধাবস্থায়, তার সহজ সরল স্বচ্ছন্দ গতির ভাব দেখলে বিস্ময় জন্মে। পাষাণের বোধি-দ্রুম তলে বুদ্ধদেব সমাধি-মগ্ন। পর্ব্বতপ্রমাণ ক্ষ্যাপা হাতী এনে মার তাঁকে সংহার করবার জন্য লেলিয়ে দিলো। তাঁকে সংহার না করে হস্তীবর জানু

পেতে তাঁর পদতলে বসে পূজা করছে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারত-শিল্পী তাঁর ভাস্কর্য্যে হাতীর যে ভক্তি-ভাবটা ফুটিয়েছেন, তা হেলেন রাজ্যের রাজকুমারীর নগ্ন বক্ষে আর বিলোল কটাক্ষে সম্ভবপর হয়নি। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য-শিল্পে হস্তীর অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ছিলো ; মুসলমান যুগে মন্দিরাদি ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। বেহারে প্রায় আড়াই হাজার বছরের লোমশ মুনির গুহাতে চলন্ত হাতীর শ্রেণী উৎকীর্ণ আছে। গুহার গঠন দেখলে মনে হয়, কাঠের বাড়ীর অনুকরণে তৈরী। বোম্বাইএর এলিফ্যাণ্টা এবং দক্ষিণ ভারতের কতকগুলো গুহা-মন্দির দেখেও তাই মনে হয়। কাঠের বাড়ীতেও হাতী খোদা হ'ত। মথুরার অশোকস্তম্ভে, সাঞ্চির উত্তর তোরণের শীর্ষভাগে, ভরূৎ এবং অমরাবতী স্তূপের পাষাণ-বেষ্টনীতে, ভুবনেশ্বর, এলোরা এবং কার্লির গিরি গহ্বরে, মহাবল্লীপুরের রথে, মাদুরাতে, শ্যাম ও যবদ্বীপে, রাজস্থানের মন্দির-প্রাসাদে সর্ব্বত্র গজরাজ বিদ্যমান। মহীশূরের হালবেদ্ মন্দিরে উৎকীর্ণ বিরাট শোভাযাত্রায় হাতী শুঁড় দুলিয়ে যেন উল্লাসের সঙ্গে গান গেয়ে চলেছেন,—যদি হাতীর পক্ষে বৃংহিতরবে রেখাব সুরে গান গাওয়াটা সম্ভব হয়! অজন্তায় হস্তীযূথের চিত্র আছে। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে হস্তী নরনারায়ণের সহচর। কমলা কমলাসনে উপবিষ্টা—হস্তী-যুগল স্বর্ণ-কলসে গঙ্গোদক নিয়ে তাঁর শিরে ঢালছেন। গোকুলে বংশিধারী করিণীরূপিণী নবনারীর পৃষ্ঠে গমন করছেন। করী-রূপে বুদ্ধ মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করে জন্মগ্রহণ করেন। Col. Simmএর Embassy to Ava নামক দুষ্প্রাপ্য পুস্তকে পড়েছিলাম—ইংরাজদের সঙ্গে ব্রহ্মরাজের যুদ্ধ বেধেছিলো "শ্বেত হস্তী" নিয়ে। ব্রহ্মরাজ হাতী ফিরে পাবার আশায় ইংরাজকে প্রচুর অর্থ দিতে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য "শ্বেত হস্তীদের" শুভাধিষ্ঠানের জন্য নরপতি "চ্যং" বা মন্দির এবং দাসদাসী নিযুক্ত করেছিলেন। হস্তী মহাশয়দের হীরা-মুক্তার গহনা, বেনারসী চেলী এবং কাশ্মীরি শাল ছিলো। গন্ধ-বারিতে তাঁদের স্নান করানো, মাল্যচন্দন পরানো, সকাল-সন্ধ্যা ভোগ দেওয়া এবং সুন্দরীদের কণ্ঠে গান শোনানো, এবং "পোয়ে" নাচ দেখানো হ'ত। এ থেকে ইংরাজীতে white elephant পোষার খরচার প্রবাদ সৃষ্ট হয়েছে। "শ্বেত হস্তী" অবশ্য বিশেষ কোনো ভিন্ন জাতের হাতী নয়—এ কথাটা বলা দরকার। ভারতবাসীদের মধ্যে কারো কারো আর সকলের মত শ্যাম বর্ণ, কালো চুল, কালো চোখ না হয়ে ইয়োরোপীয়-সুলভ শ্বেতবর্ণ, পিঙ্গল কেশ আর কটা চোখ হয়। এরকম বৈচিত্র্যের কারণ হচ্ছে শরীরের রঙের ভিন্ন সমাবেশ। এরকম লোককে albino বা সাদাটে বলা হয়। হাতীদের

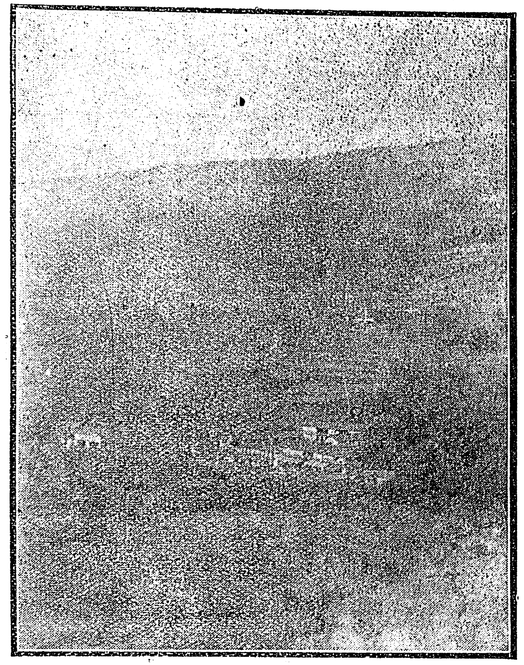

অনন্তের কোলে—যাত্রীর চটী

মধ্যে দু'একটা বিধাতার বিচিত্র বিধানের ফলে সাধারণ কালো রঙ না পেয়ে albino বা সাদাটে রঙ নিয়ে জন্মায়, তারাই হয়ে যায় বর্ম্মী আর শ্যামীদের পূজিত শ্বেত-হস্তী।

মন্দিরের কথা শেষ হ'ল। উখীমঠও গুপ্তকাশীর মত সমৃদ্ধিশালী। ডাকঘর, ডাক্তারখানা, দোকান ও বসত-বাড়ী অনেকগুলি। একটি দোকানে আমি Leader এবং Bengalee সংবাদপত্র দেখেছিলাম। সহরে কিন্তু জলের অভাব। ক্ষীণা ঝরণা হতে কুণ্ডে জল পড়ছে ; লোকের ভীড় সেখানে। গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের গোমুখী জলধারায় আধ মিনিটে একটি জালা ভরে ওঠে কিন্তু! উখীমঠে যে

প্রশস্ত ঘরখানি অর্থাৎ 'বাংলায়' আমরা ছিলাম, সেটি অন্যান্য বাড়ীঘর, দোকান হ'তে অনেক উঁচু পাহাড়ের উপরে তৈরী। আর তার চারদিকে ফাঁকা, আর তার নীচে মুদীর দোকান। একাদশীর পারণের জন্য সেখানে আমরা দুদিন থাকি। অনেক নীচে নেমে আমাদের স্নান করতে এবং জল নিয়ে উপরে যেতে হ'ত। সেই বাংলার দ্বিতলের জানালা হ'তে উত্তর-পশ্চিম কোণে অনন্ত-তুষার-কিরীটিনী কেদার-শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। বাইশ হাজার ফিট উঁচু! মেঘের কোলে তুষারমালার অনির্ব্বচনীয় শোভা,—লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি



বরফের উপরে—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র (বেচাচন্দ্র)

নীল আকাশে ভেসে ভেসে কেদারের ক্রোড়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—আমি জানালার ধারে বসে বসে দেখতাম। আর ভাবতাম, পুণ্য-নিস্যন্দিনী মন্দাকিনী সেই হিমধামে জন্মগ্রহণ করে, কেদার ও হরিদ্বার প্লাবিত ও সঞ্জীবিত করে, সাগরের উদ্দেশে ছুটেছেন—এবং কতকাল পরে ওই লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডাকারে ফিরে এসে পুনরায় হিমধামের হিরণ্য-গর্ভে বিলীন হচ্ছেন।

এই পথে অনেকবার জলের কষ্ট পেয়েছি। বিশেষতঃ চৌপাতা চটীতে। চৌপাতাতে সকল যাত্রীকে থামতে হয়—তুঙ্গনাথে যাবার জন্য। যাঁরা আগে পৌঁছাতে পারেন, তাঁরা জলের সুবিধা করে নিতে পারেন। চটী থেকে দূরে, মাঠের মাঝখানে, বুদ বুদ করে জল উঠছে—জনতা ঠেলে জল নিতে হয়। কাঠ ফাটা রোদ। ঘন ঘন তৃষ্ণা পায়। আর মাছির উৎপাত। চৌপাতা থেকে একটি সরু, দুর্গম চড়াই পথ তুঙ্গনাথে গেছে। অন্য রাস্তাটী বদরিকার দিকে। সেটাও চড়াই ; ও বনজঙ্গলের মধ্যে।

আবার গভীর অরণ্যে পড়লাম, ঘনোন্নত পাদপরাজি। ওক, আখরোট, বাদাম, শাল, মেহগিনি, আবলুস, হরিতকী, তিন্তিড়ি, পলাশ, পিয়াল, ন্যগ্রোধ, জায়ফল—ঠেলাঠেলি করে আকাশে ওঠবার চেষ্টা করছে। ঘন-সন্নিবিষ্ট বেতসীলতার মধ্যে দোদুল্যমান ভুঁই চাঁপা ফুল। আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা। রং-বেরঙের পাতাগুলি। আবার সেই পাখীর গান—বনস্পতির মর্ম্মর ও নির্ঝরের ঝঝর কাহিনী। হিমারণ্যে এ সময়ে বসন্ত কাল। বনে বনে "ফাগুন" লেগেছে। বসন্তের অনিল, বসন্তের রঙীন আলো। আবার সেই "বরাঁস" (Rhododendron) গাছের সারি *—করবীর পাতার মত সুচল পাতা গুলোর সঙ্গে পলাশের মত ঘোর লাল ফুলগুলি হুড়োমুড়ি করছে। বক্র সঙ্কীর্ণ, নির্জ্জন বীথি-পথ অবলম্বনে আমি একা 'জঙ্গল' চটীতে যাচ্ছি। আশ্চর্য্য জিনিস দেখলাম। প্রকৃতির বিরচিত পাষাণের সেতুবন্ধ। আজ পর্য্যন্ত আমি কোনো পাহাড় থেকে উৎরাই পথে নেমে এসে, আবার চড়াই পথে অন্য পাহাড়ে গেছি। পরন্তু এক স্থানে দেখলাম, হাবড়ার পুলের চেয়ে কিছু বেশী চওড়া একটি পাহাড়ের সেতুর উপর দিয়ে আমাদের পথটী অন্য শৃঙ্গে গেছে। পরীক্ষা করে দেখলাম মানুষের রচিত সেতু নয়। ভূকম্পনের ফলে সে যুগে ধরিত্রী যখন ওলট-পালট হয়েছিলো,—এবং হিমালয় সাগর-গর্ভ হ'তে সরাসরি আকাশ-মণ্ডল স্পর্শ করতে উঠেছিলেন—রোষান্ধ গিরিরাজ শীতল হ'লে, সঙ্কোচনের ফলে,—সে সময়ে ধরিত্রীর সমতল ভূভাগের অবস্থার বিপর্য্যয়,

* ইংরাজীতে একে এক বিরাশী সিক্কার ওজনের অভিধা দেওয়া হয়েছে rhododendron ; কথাটা গ্রীক, মানে হচ্ছে "গোলাপ-দ্রুম," পাহাড়ী-হিন্দী ভাষায় "বরাঁস" বলে।

এবং এবম্বিধ "সেতুর" উদ্ভব হয়েছিলো, Syncline এবং Anticlineএর মধ্যভাগে। ভূতত্ত্ববিদেরা সেই সেতুকে Fau't বলেন। উত্তর ব্রহ্মে শাণরাজ্যে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য গোটেয়িক্ সেতুর নীচে ওরূপ Fault আমি দেখেছি। শতকোটী বর্ষ পূর্ব্বেকার সেই ভূকম্পনের প্রভাবে হয় ত এই "সেতুটীর" সৃষ্টি হয়ে থাকবে। সেই সেতুর উপর দিয়ে আজ আমরা পারাপার হচ্ছি। আমাদের ডাইনে ও বামে গভীর খদ, আর সম্মুখে পশ্চাতে পর্ব্বতমালা! চারিদিকে "নানামৃগগণ্যকীর্ণা মৃক্ষশার্দ্দুল সেবিতাং নিষ্কুজমান শকুনি ঝিল্লিকাগণ নাদিতাং" নিবিড় অরণ্যানি!

তখন প্রায় সন্ধ্যা ; আমি জঙ্গল-চটীর পাহাড়-জঙ্গল থেকে মণ্ডল-চটীতে নেমে এলাম। সমতল উপত্যকা। বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের মধ্যস্থলে কয়খানি চালাঘর ও দোকান। পাশে স্বচ্ছতোয়া সুরধনী উপলখণ্ডের মধ্য দিয়ে চঞ্চল চরণে ধাবমানা। তীরে শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র, আল-দেওয়া। ক্ষেতের পশ্চাতে জঙ্গলচটীর পাহাড় ও জঙ্গল। ওকগাছ-গুলির শীর্ষ দেশে অস্তাচলগামী রবির স্বর্ণাভ কিরণ প্রতিফলিত হয়েছে। পাহাড়ের কোলে, ওকের ছায়াতলে, ছোট তাঁবু দেখলাম। বিশ্রামান্তে সেখানে গেলাম। সরকারি পূর্ত্ত-বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়র (Mr. E. M Crew) ক্রু সাহেবের তাঁবু। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সাহেব আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। বল্লাম যে আমিও তাঁর মত ইঞ্জিনীয়র। সাহেব মিষ্ট-ভাষী। নানা কথা আমাকে বল্লেন। স্থানীয় রাস্তার দুরবস্থার কথা তাদের মধ্যে একটি। "এবছরের বজেটে মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা চার-শো মাইল রাস্তার সংস্কার কার্য্যে দেওয়া হয়েছে। তা'তে কি করে রাস্তা ভালো রাখা যায়? সুতরাং, আপনি যা বলেছেন, রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। কয়টা পুল অব্যবহার্য্য হয়েছে। ফলে যাত্রীদের অসুবিধা। দুর্ঘটনাও ঘটেছে।"

হিমালয়ের খবর পেলাম। অদূরে তামার পাহাড় আছে। সীসা, শ্লেট, মার্ব্বেল এবং অভ্রের পাহাড় আমি দেখে এসেছি। জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, মহিষ প্রভৃতি আছে। সাহেব শিকার করেছেন। বাঘ ও হরিণের চামড়া দেখালেন। সম্প্রতি একটি নেকড়ে দুজন পাহাড়ীর প্রাণসংহার করেছিলো। তিনি তাহাকে বধ করেন।

আমাকে Pioneer পড়তে দিলেন। কুলীর ডাক বসিয়ে সংবাদপত্র ও রসদ আনাতে হয়। প্রাতে আমাকে মঠ চটীতে যেতে বল্লেন। এগার মাইল। সেখানে প্রচুর শাক সবজী ও ফল ফুল মেলে।

চা পান কালে বল্লাম "এই যাত্রায় আমার মানস সরোবর ও কৈলাসে যাবার ইচ্ছা আছে। আপনার সেখানকার

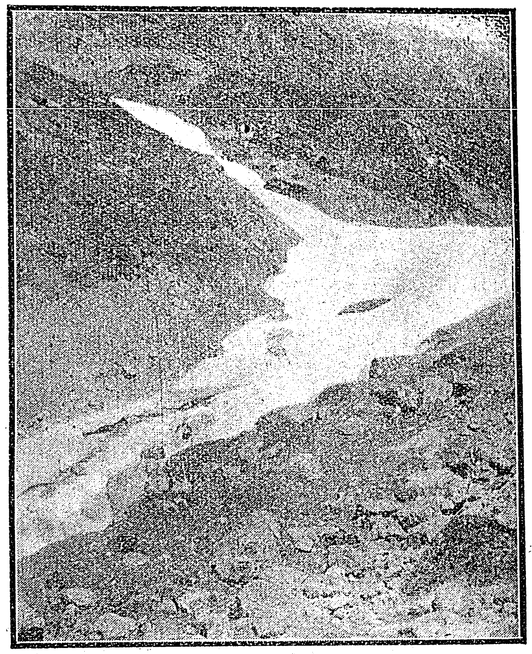

বরফের নদী

অভিজ্ঞতা আছে কি?" তিনি বল্লেন, বদ্রী অথবা যোশীমঠ থেকে 'মানা' অথবা 'নীতি' সঙ্কট দিয়ে কৈলাসে যেতে হয়। গিরি সঙ্কটের ৫০ মাইল মাত্র তাঁর অধীনে। তিনি কৈলাসে যান নি। তাকালকোট পর্য্যন্ত গেছেন। দুরন্ত শীত ওই বরফের রাজ্যে। চামড়ার পোষাক ছাড়া বুকে গরম জলের বোতল রেখে দিতে হবে। তত্রাচ শীত লাগবে। কৈলাসের পথে এক স্থানে উনিশ হাজার ফিট উঁচু গিরিসঙ্কট অতিক্রম করতে হয়। পথ দুর্গম। তবে, স্থান-বিশেষে সমতল উপত্যকা, কৃষিক্ষেত্র এবং পার্ব্বত্য সহর আছে। "গাইড" পাওয়া যাবে। তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন এবং দুখানি সুপারিশ-পত্র লিখে দিলেন। একখানি চম্পা

সহরের মোড়ল মহাশয়কে, আর একখানি যোশীমঠে তাঁর সহকারী ওভারসিয়র বাবুকে।

পরম আনন্দে সে রাত্রে গাওয়া ঘী-এ ভাজা, অত্যুৎকৃষ্ট আটার গরম গরম খাস্তা লুচি, আলুর দম, কুমড়া ও পাঁপর-ভাজা, আচার, চাটনী এবং চিনি খেলাম। আহারান্তে সেই চাঁদের আলোয়, নদীর সৈকতে, বৃহৎ পাথরের উপরে পা ছড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে গুণগুণ স্বরে অনেকগুলো গান করলাম। বিছানায় শুয়ে কিন্তু ঘুম আসে না, এতো

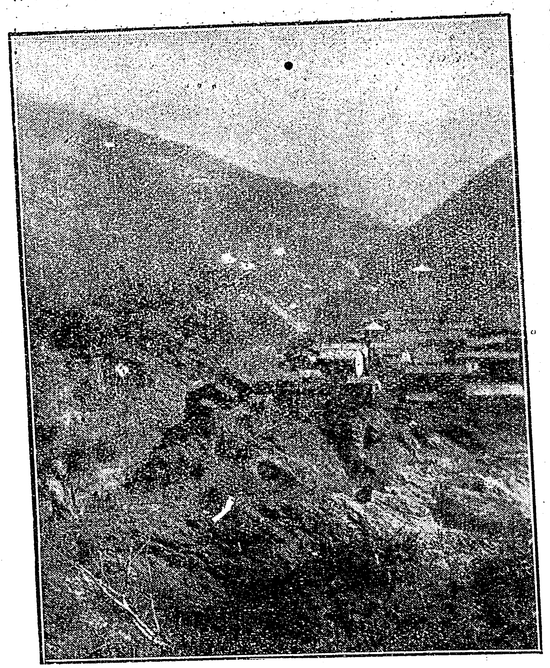

বদরী ধাম

উৎসাহ আমার! কৈলাস যাত্রা এবং চিঠির কথা কিন্তু সঙ্গীদের কাউকে বলিনি। বাধা পাবো তাহলে।

ভোরের কাক কোকিল ডাকবার আগে মঠ চটীতে যাত্রা এবং অন্যান্য যাত্রীদের পৌঁছাবার অনেক আগে সেখানে পৌঁছানো, বেলা নটায়। আমি যাই পদব্রজে, সঙ্গীরা ঝাঁপানে অথবা ডাণ্ডীতে চেপে আসেন। মধ্যে লালসাঙ্গা অতিক্রম করলাম। সেখানে অলকানন্দার উপরে বৃহৎ Suspension bridge বা লোহার ঝোলানো পুল আছে। তিনটী রাস্তা। একটিতে কেদারে যাওয়া যায় এবং আমরা তা ধরে এলাম। একটিতে আমরা বদরিকা যাচ্ছি। অপরটী পুল পেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে রামনগর রেল ষ্টেসনে গেছে। বাড়ী ফেরবার সময় আমরা সে পথে রামনগর যাই। এখানে অলকানন্দার জল কর্দ্দমাক্ত। মঠ চটীতে ঝরণা আছে; তা থেকে জলসরবরাহ হয়। কয়েকটা বাগান দেখলাম। ক্ষেতে ধান, তামাক, মূলা ও পেঁয়াজকলি জন্মেছে। বাগানে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও কলাগাছ। মোচা ও কলা ফলেছে। গোলাপ ও মতিয়া বেল ফুল দেখলাম। একটি বাগানের মধ্যে গেলাম। দোতালা একটি বাড়ী আছে। গৃহস্বামী তখন ক্ষেতে। গিন্নি এলেন। নাকে বৃহৎ নথ, ময়লা কাপড়। তিন আনায় দশটা পাকা কলা, এক আনায় দুটো মোচা, এবং পেঁয়াজকলি, কুমড়া, লাউ, মূলা, লেবু কিনলাম। মূলা ও পেঁয়াজকলি বাগান থেকে তুলে এবং মোচা গাছ থেকে পেড়ে দিলো। একটি যুবতী মেয়ে ছিলো। সুন্দরী মেয়ে। তার হাতে মুখে ঘা—উপদংশের মত।

ঝরণার জলে স্নান, পরিতোষ পূর্ব্বক আহার, দুঘণ্টাকাল বিশ্রাম ও সরবতি লেবু ও মিছরির সরবৎ পানান্তে অপরাহ্নে যাত্রা করা গেলো। নদীর ধারে রাস্তা। মাইলখানেক গিয়ে পরে পরে দুটী সেতু। ক্রু-সাহেবের কথা মত একটি সেতু সংস্কারাভাবে অব্যবহার্য্য বটে। তার পরে বিরল-বৃক্ষ লোহার পাহাড়ের উপরে মসৃণ রাস্তা। লোহার পাথরের নমুনা দিয়েছি। সেতুর অদূরে দুটি ঝরণা আছে। উভয়ের মধ্যে একটি "পাকদণ্ডী" বা ছোট পথ প্রায় খাড়া ভাবে শিখরে উঠেছে। সে পথে গেলে অন্ততঃ আধ মাইল রাস্তা কম হ'বে। সঙ্গীরা পিছনে। অগ্রগামী যাত্রীরা পাকদণ্ডীতে গেলেন না। একটি পাহাড়ী বালক সে পথে উঠছিলো, আমি তার অনুসরণ করলাম। উঠে বুঝলাম—বাঙালীর পক্ষে পথটী অতীব বিপদসঙ্কুল। পুস্তকে আছে এলিজা তার হারানো ছেলেকে আনবার জন্য গাছের শিকড় ধরে "রকী" পর্ব্বতের উপরে ঈগলের বাসায় গিছলো। নামবার সময় ছেলেকে বুকে বেঁধে গড়িয়ে পড়া। এ পাহাড়ও তাদৃশ। প্রতি পদে হড়কাবার ভয়। অতি সন্তর্পণে অর্দ্ধেক পথ উঠলাম। নীচে তাকাতে আমার মাথা ঘুরে গেলো। বুক ধড়াস ধড়াস করতে ও পা কাঁপতে লাগলো। অনেক নীচে নদী। আমি যেখানে আছি সেখানে থেকে

হড়্‌কে গেলে, গড়িয়ে বিশ হাত যেতে হবে না, পাহাড়ের কাণা থেকে, ঢিলের মত, টুপ করে তিনশ হাত নীচে নদীতে পড়ে যাবো। পাহাড়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম এবং উচ্চৈঃস্বরে ছোকরাকে ডাকলাম। নীচে নামতে বেশী ভয়। তার সাহায্যে উপরের রাস্তায় উঠি।

পিপুল চটীর পথে। নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির ভস্মাচ্ছাদিত, কূর্ম্মপৃষ্ঠ উপত্যকা। গৈরিক নিঃস্রাব জমে গিয়ে পাথর হয়েছে। নমুনা নিয়েছি; যাঁরা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করেন তাঁদের দেখাবো। বৃক্ষ নাই, লতা নাই; একপ্রকার কণ্টকাকীর্ণ লতাগুল্ম, আর শিয়াল কাঁটা। যে দিকেই তাকাই—একেবারে নেড়া, খাড়া, আকাশচুম্বী



গিরিসঙ্কটে অলকানন্দ

বিরাট পাহাড়! শৃঙ্গে-শৃঙ্গে ঢেউ-খেলিয়ে আকাশে মিশেছে। কঠিন, ধূসর-কালো পাষাণের ঢেউ। নরকঙ্কালের কোটর চোখের মত বিশাল পর্ব্বত গুহা খাঁ-খাঁ করছে। সুদীর্ঘ ফাটল। বহু নিম্নে খরস্রোতা। গিরিসঙ্কটের বায়ুপথে অবিশ্রান্ত রেলগাড়ির মত গড়্ গড়্ শব্দ আসছে। সে শব্দ নদীর গর্জ্জনের। নদীর পাষাণময়ী তলদেশ বড়ই উঁচু নীচু এবং তার বক্ষদেশে রাশিকৃত জগদ্দল পাথর। উদ্দাম প্রবাহের ও উত্তাল পাষাণের সংঘাতের ফলে এরূপ গড়্ গড়্ শব্দ। কাল এ সময়ে আমি বনস্পতির ছায়াশীতল ক্রোড়ে ছিলাম। আজ দানবের শ্মশানভূমে।

মাদ্রাজ হ'তে মহীশূর হয়ে বোম্বাই যাবার পথে বহু প্রাচীন Archœan যুগের পূর্ব্ব-ঘাট পর্ব্বত দেখেছিলাম; শাখাপ্রশাখাহীন ফণীমনসার জঙ্গলসমাকীর্ণ। তৎপরে দাক্ষিণাত্য উপত্যকার কোলার প্রদেশে উঠি। উপত্যকাটী আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাব (Basaltic lava) হ'তে উদ্ভূত। সেখানে কিন্তু কাঁটা গাছ পর্য্যন্ত নাই; কেবল কালো কালো অঙ্গারের কর্কশ, কঠিন পাহাড়। সোণার খনি দেখবার কালে সেই পাহাড়ের গর্ভে চার হাজার ফিট—এবং ভারত মহাসাগরের নীচে একহাজার ফিট—নেমেছিলাম। সেখানকার পাথরও আগ্নেয়গিরির অঙ্গার-সম্ভূত, এবং ছাইরঙা (Quartzite) এবং সোণা-মেশানো। রেঙ্গুনের ৫০০ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আলোন (alon) নামে মৃত একটি আগ্নেয়গিরির মুখবিবর আছে। তিন মাইল পরিধির হ্রদের মত দেখায়। পিপুল চটীর পথের গিরি-গহ্বরের মুখের পাঁশুটে রং সেই বিবরের রংএর মত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পিপুল উপত্যকাটী অগ্ন্যুৎপাতের পরিণাম। কিন্তু সে কথার উল্লেখ কোথাও আছে কি না জানি না। যদি বলেন, তার অত কাছের মঠ চটীতে কলাগাছ হয় কি প্রকারে? ঠিক সেই প্রকারে যে প্রকারে কোলারের কাছে বাঙ্গালোরে অত ফল-ফুলের আধিক্য। কোলারের দশক্রোশ দূরে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন ও লব কুশের জন্মস্থান দেখে এসেছিলাম। সে স্থানও উর্ব্বর। আলোনের উপকণ্ঠবর্ত্তী Shewb প্রদেশে ধান উৎপন্ন হয়। এরূপ উর্ব্বরতার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। তাহা বলতে গেলে, ভূ-তত্ত্বের আলোচনা করতে হয়। সন্ধ্যার পরে পিপুল চটীতে পৌঁছালাম। পিপুল চটীকে সহর বলা চলে এরূপ জনবহুল স্থান। সেখানে রাত্রি যাপন করে পর দিন প্রভাতে গরুড়-গঙ্গা যাত্রা করলাম। পথের দৃশ্য মনোরম। কোথাও কিংখাবের মত শ্যামল, ঈষৎ সমতল কৃষিক্ষেত্র

কোথাও নগ্নকায় দৈত্যের আকৃতি পাষাণ স্তূপ। ঊর্দ্ধে তুষারের মেখলা। নিম্নে অলকানন্দা। বীণ এবং ডমরু লয়ে একদল নর্ত্তক-নর্ত্তকী যাচ্ছিলো। আমার অনুরোধে নৃত্য-গীত করলো। আট আনা বকসিস এবং ছেলেদের মিছরি ও কিসমিস দিলাম। ছুচ, সুতো চেয়েছিলো। গরুড়-গঙ্গা একটি নির্ঝরের নামান্তর। তীরে দোকান-পাট এবং দেবালয় আছে। গরুড়-গঙ্গায় যাত্রীরা স্নান করবার কালে ডুব দিয়ে নুড়ী তুলে থাকেন। প্রবাদ, সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে সেই নুড়ী ঘষে দিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। গরুড়-গঙ্গার ছয় ক্রোশ দূরে যোশীমঠ। চড়াই পথ। যোশী-মঠের কথা অনেক শুনেছিলাম। এখন স্বচক্ষে দেখলাম। সহরে একতলা ও দ্বিতলা কোঠা অনেকগুলি। বাড়ীর নীচের তলায় দোকান। থানা, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিস, ডাক বাংলো, দাতব্য চিকিৎসাগার, হাসপাতাল এবং অশথ, বট ও অন্যান্য গাছ। হিমালয়ের এ প্রদেশের সহর বললে এই বুঝতে হবে যে, আঁকাবাঁকা, অসমতল, অপ্রশস্ত রাস্তার দুধারে তিন চারশ'খানা কাঁচা-পাকা ইমারত। একধারের বাড়ীগুলো রাস্তার পাশে নীচু জায়গায়; অন্য ধারের গুলো রাস্তার উপরে। যোশীমঠের বাড়ীগুলো মাঝারি এবং ছোটো। পাথরের দেয়াল, কাঠের বারাণ্ডা, শ্লেটের অথবা খোলার ঢালু ছাদ। আর বাড়ীগুলো ঘেঁসা-ঘেঁসি। মেঝে প্রধানতঃ গোবর-মাটীর,—দরজা, জানালা, বারাণ্ডায় রং নাই। ফলতঃ পাঁচ বছরের বাড়ীকেও পুরানো দেখায়। সহরের রাস্তা অতিক্রম ক'রে হাত দুই চওড়া একটা ঝরণা, বাঁধানো ড্রেনের মত, রাস্তার ও-পাশে গভীর খদের দিকে ছুটেছে। সহরবাসী সে জলে কাপড় কাচে এবং বাসন মাজে। রাস্তার ডান দিকে একটি দোতালা বাড়ীর উপরের ঘরে আমাদের থাকবার স্থান হয়। তার নীচে বাড়ীওলার মুদীর দোকান। দোকানে চাল, ডাল, আটা, আলু থেকে আর্শি চিরুণী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। রাস্তার বামে ঢালু পাহাড়ের নিম্ন ভূমি। সেখানে হরপার্ব্বতী, গণেশ এবং নরসিং দৈবের মন্দির। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের এখানে সমান প্রভাব। উভয় সম্প্রদায়ের লোক এখানে আছেন। তাঁদের মধ্যে সদ্ভাব আছে। দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী ধামের অবস্থা কিন্তু বিপরীত। সহরের এক অংশে শিব-কাঞ্চী, অপর অংশে বিষ্ণু-কাঞ্চী। শুনেছিলাম, এ দলের আখড়ার লোক ওদলের আখড়ায় যেতে পারেন না। যোশীমঠের প্রধান মন্দিরের চার দিকে পাথরে-বাঁধানো প্রাঙ্গণ এবং দোতালা, চকমিলানো বারাণ্ডার সঙ্গে ছোটো ছোটো কুঠুরী আছে। সিংহ-দ্বারের মাথায় গুপ্ত-যুগের চৈত্য বাতায়নের মত দেখলাম। একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের গঠনও চৈত্যের মত। মন্দিরগুলির প্রাচীনতার ইহা অকাট্য প্রমাণ। পাথরের সোপান দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে নামবার বাঁ দিকে একটি পাকা ঘর আছে। সে ঘরের মধ্যে পাথরের দেয়াল দিয়ে বাঁধানো একটি ঝরণা আছে। যাত্রীরা সেখানে স্নান দি করেন। কপালে সিঁদূরের টিপ এবং কাছা দিয়ে খোর-ছড়ী শাড়ী-পরা হৃষ্টা-পুষ্টা একটি মরাঠী তরুণী আমা তামার হাণ্ডাতে জল ভর্রাছলেন। তিনি বল্লেন যে তিনি স্বামী পুত্র লয়ে যোশীমঠে বাস করেন। স্বামীর দো আছে। যোশীমঠের মন্দির ও বাড়ীগুলিতে প্রাচীন ছাপ দেখা যায়। সহকারী রাওয়ল মহাশয়ের সঙ্গে সা করলাম। মঠে শঙ্কর-যুগের পুঁথি ও অনুশাসন আ তবে সেগুলি দেখতে অথবা তাদের সম্বন্ধে তথ্য সং করতে পারলাম না। পুঁথির অনুবাদ এবং তা প্রস্তুত হয়েছে কি না তাও জানা গেল না। জৈসলমের দুর্গের গোপাল-মন্দিরে শিকলে-ঝোলানো একটি পোটকা দেখেছিলাম। তন্মধ্যে হাজার বছরের পুরানো জৈনগ্রন্থ আছে। বৎসরান্তে তাদের বের করে পূজা করা হয়। সাধারণে তাদের দেখতে অথবা নকল নিতে পান না। যোশীমঠের গ্রন্থাগারেও সাধারণের অধিকার নাই।

আহারান্তে সাহেবের সুপারিশ-পত্র নিয়ে ওভারসিয়র বাবু আনন্দস্বরূপের বাসায় গেলাম। তিনি আমাকে সাহায্য করবেন বল্লেন, এবং ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের মঠাধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সহর-প্রান্তে তাঁর মঠে নিয়ে গেলেন। মঠটী মনোরম নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। প্রাঙ্গণে শত সহস্র গোলাপ ফুটেছে। অধ্যক্ষ মহাশয় হিন্দী এবং অল্প ইংরাজী কথা কহিতে পারেন। বল্লেন, তিনি দুবার কৈলাসে গেছেন। নীতিপাশ এখনো বরফে ঢাকা। মাসখানেক পরে খোলা হ'বে। ভুটিয়া ব্যাপারীরা লবণাদি বাণিজ্য-সম্ভার, ঘোড়া, ছাগল, চমরী, তাঁবু এবং অস্ত্র লয়ে সে সময়ে তিব্বতে যাত্রা করবেন। তাঁদের সঙ্গে গেলে আমার বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। তাঁদের সঙ্গেই

আমার যাবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। তবে, তাঁরা কৈলাসে যাবেন না। লাসা যাবার পথ থেকে ৫।৬ দিন লাগে কৈলাসে যেতে। আমার সঙ্গে যে দোভাষী কাণ্ডীওলা, আমার মাল পত্র নিয়ে যাবে, সে-ই আমাকে মানস সরোবর ও কৈলাস পরিক্রম করিয়ে আলমোড়ায় পৌছিয়ে দেবে। হিসাব করে দেখলাম, দু'মাস সময় লাগবে এবং গরীবানা চালে থাকলে তিনশ' টাকা খরচ হ'বে। ব্যাপারীদের সঙ্গ ছেড়ে যেদিন কৈলাস মুখে যাবো, পনর দিনের খোরাক—রুটী, গুড় ও মাখন—সঙ্গে নিতে হ'বে। গুহায় রাতে থাকতে হ'বে। পথে তিব্বতী পোষাক তৈরী করাতে হবে। ৫০।৬০টাকা লাগবে। আমার ইচ্ছা, লাসা হ'য়ে দার্জ্জিলিং এর পথে বাড়ী ফিরি। টাকা ফুরিয়ে গেলে ভিক্ষা করে খাবো, তথাপি যাবো। তিনি বল্লেন—সেখানে যাবার ছাড়পত্র পাওয়া একরূপ অসম্ভব। তবে তিনি ব্যাপারীদের প্রধানকে চেষ্টা করে দেখতে অনুরোধ করবেন—লামা বা সাধু সাজিয়ে যদি আমাকে পাঠানো যায়। এ রকম সাধু সেখানে গেছে। সেখানে সাধুরা পূজার্হ। লাসা থেকে দার্জ্জিলিং যাবার পথের বিষয় তিনি কিছু জানেন না। আমাকে সন্ধান নিতে এবং ব্যবস্থা করতে হ'বে। স্থির হ'ল, আমি তাঁর আশ্রমে থাকবো এবং যাত্রার আয়োজন করবো। আমি সেখানে কিছু দিন থাকলে তাঁরও উপকার হ'বে। মঠের একটি নতুন বাড়ী তৈরী হ'চ্ছে। স্থানীয় ঠিকাদার কাজ সুরু করে গোলমাল করছেন। কাজ বন্ধ আছে। আমি বাড়ীটা আরম্ভ করাবো। সন্ন্যাসী-বরের নাম ও ঠিকানা—নর্ম্মদা স্বামী হঠাত্যাগী; ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল, যোশীমঠ, গাড়োয়াল জেলা। যদি কেউ বদরীর পথে কৈলাস যাবার ইচ্ছা করেন, উক্ত ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে পত্র বিনিময় করতে পারেন, তিনি সাহায্য করতে পারেন।

যোশীমঠ হ'তে খাড়া উৎরাই পথে বিষ্ণু-প্রয়োগে নামলাম। লাঠির সাহায্যে অতি সাবধানে নামতে হ'ল, পাছে টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়ি। বিষ্ণু-প্রয়াগে অলকানন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গম হয়েছে। ঝোলানো লোহার পুল দিয়ে পেরোতে হ'ল। সঙ্গমে সাবধানে স্নান করলাম, শীতবস্ত্রে গা ঢাকলাম এবং পূজার্থে মন্দিরে গেলাম। ছোটো মন্দিরটী সঙ্গমের ঠিক উপরে এবং পাহাড়ের গায়ে। বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে দশ ক্রোশ চড়াই পথে বদরিকা যেতে

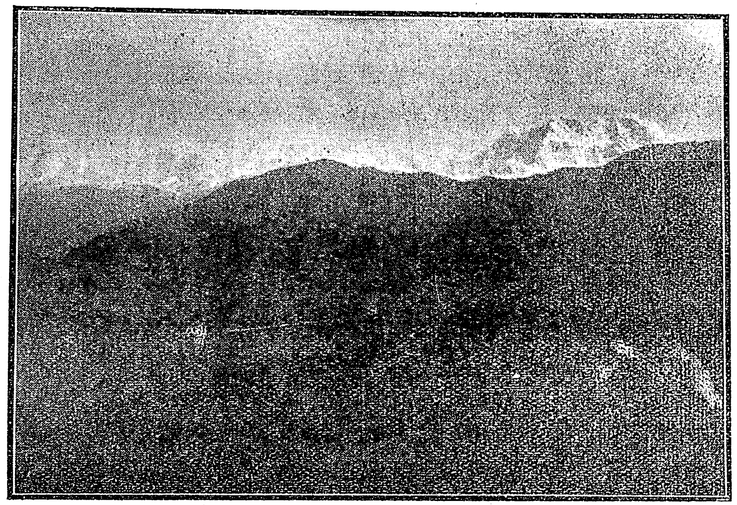

তুষারের দৃশ্য

হয়। এ পথের দৃশ্য অতি মনোরম ও বিচিত্র। অলকানন্দা তির্য্যগাকৃতি গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে আছড়ে পড়ে সফেণ তরঙ্গ ছড়িয়ে ছুটেছে—খাড়া, উঁচু, উন্নুনের ঝিকের মত শীর্ষ, শত সহস্র শৃঙ্গগুলি রেখাকারে তাকে আগলে ধরে দাঁড়িয়ে। উন্মাদিনী নির্ঝরিণী সশব্দে নদী-বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জলপ্রপাতের উপরকার সেতু দিয়ে যাত্রী চলছে। সঙ্গমের ঘূর্ণায়মান ফেণিল আবর্ত্তে সূর্য্যবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ করেছে। হনুমান-চটী বদ্রীনাথের তোরণ স্বরূপ। পবননন্দন দ্বারী হ'য়ে দণ্ডায়মান। তার পরে গন্ধমাদন-চটী। লক্ষ্মণকে

বাঁচাবার জন্য তিনি সেখান থেকে বিশল্যকরণী সহ গন্ধমাদন শৃঙ্গ তুলে নিয়ে যান। চটী জঙ্গলের মধ্যে। একজন পাহাড়ী চটীতে ভাল্লুকের পিত্ত বেচতে এনেছিলো, বলে ৪০০৲ সের। দোকানী—মধু, ভূর্জ্জপত্র, চমরীর লেজ বা চামর, হরিণ, ভাল্লুক ও বাঘের চামড়া বিক্রীর জন্য রেখেছে। পুরাকালে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিরা যে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করতেন, সেরূপ বস্ত্রের চলন হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান—পাহাড়ীদের মধ্যে। তার নাম "ভাঙ্গেলা"। ভাং অর্থ সিদ্ধি গাছের ছাল হ'তে তৈরী হয়, নাম সেজন্য ভাঙ্গেলা। ৪৷৷০ টাকায় একখানা কাপড় কিনলাম। শ্রীনগরের মুখুজ্জে মহাশয় আমাকে ভাঙ্গেলার সন্ধান দিয়েছিলেন।

গন্ধমাদনের স্মৃতি আমি ভুলতে পারবো না। নীলাভ ধূসর পর্ব্বতমালার ক্রোড়ে নীলবরণা স্রোতস্বিণী। অলকানন্দার অশ্রান্ত কলগানের সঙ্গে বনস্পতির মর্ম্মরতান। দীর্ঘজটাধারী বট। তার পাষাণময় তলদেশের শৈবালময় শিলা পৃষ্ঠে, পাকা বট ফল প'ড়ে আছে - কতো পাখী এসে বটফল ঠুকরে খেয়ে ফেলে রেখে গেছে। বনফুল, গৌরীফল, শ্বেত গোলাপ, কামিনী ও চামেলীর অফুরন্ত জঙ্গল—স্থানটি সুগন্ধে ভুর ভুর করছে। ফুলের গন্ধে আকুল নির্জ্জন সেই বন-বীথিকার মহাদ্রুম তলে যেখানে লীলাময়ী প্রকৃতি-রাণী আলো আঁধারের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন, সে স্বপ্ন-রাজ্যে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেখানকার শোভা বাড়িয়ে তুলেছিলেন একজন সন্ন্যাসিনী। অলকানন্দার বিজন পুলিনে, বিহগকূজন-মুখরিত নিবিড় কাননে, দূরাগত গিরি-নির্ঝরিণী যেখানে ফেণায়মান জলপ্রপাত রূপে অলকানন্দার কল্লোলে মিশেছে—শীকর-সম্পৃক্ত তরুতলে, পাষাণ-চত্বরের কোলে, বনফুলে আলুলায়িত কেশসম্ভার সুসজ্জিত ক'রে, চামেলীর মালা গাঁথছিলেন তিনি। পরনে লাল গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা; সহাস, সৌম্য, প্রশান্ত, পবিত্র মূরতি। কপোলে বিভূতি মাখা। স্বামীকে হারিয়ে আনন্দময়ী নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি আমাদের সহযাত্রী। সাধারণতঃ ঝাঁপানে চেপে যান। তীর্থক্ষেত্রে বহুবার তাঁকে মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করতে দেখেছি।

তুষারের রাজ্যে উঠছি। শীত করছে। খাড়া পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা বের করা যেখানে সম্ভবপর হয়নি, সেখানে সেতুর সাহায্যে নদীর ওপারে গিয়ে অন্য পাহাড়ের গা দিয়ে আবার উপরে উঠতে হয়। মনে করুন, গিরি সঙ্কটের বাঁ পাশ থেকে সেতু দিয়ে ডান পাশে গেলাম। একটুখানি গিয়েই একসঙ্গে নদী ও পাহাড়ের বাঁক, ডান দিকে। নদীর একশ হাত উপরে, পাহাড়ের গায়ে সঙ্কীর্ণ রাস্তায় আমরা চলেছি, এমন সময়ে নদী ও রাস্তা ডাইনে বেঁকে গেল। বাঁকের মুখে নদী আমাদের সামনে পড়ল; তার পরে বামে। এবং নদী যখন সামনে তার ঠিক ওপারে, অনেকটা তীর ভূমির পিছনে, অন্য একটি পাহাড়ে দেখা গেলো, নদীতীর হ'তে তিনশ' হাত উপরে পাহাড়টার গায়ে ঘুরন্ত সিঁড়ির মত পথ দেওয়া রাস্তা উঠেছে। আমাদের এই বাঁক থেকে বাঁ দিক নদী রেখে, অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে অনেকটা গিয়ে, চড়াই পথ, সেই পাকের মুখে উঠতে হ'বে। আবার সেই কোণ থেকে নদী ডাইনে বেঁকে গেলো। এরকম ভাবে ঘন ঘন এঁকে বেঁকে আমরা অনেকবার এসেছি। যখন নীচে ছিলাম পাহাড়ের মাথায় বরফ দেখেছি—কালো পাহাড়ের এখানে ওখানে যেন চুণ ছড়ানো। ওপরে ওঠার কালে তুষার ক্রমশঃ আমাদের নিকটে, পরিশেষে একেবারে পাশে এলো। নদী জমে গেছে দেখলাম; বরফের নীচে জলের স্রোত। ক্রমে আমরা তুষার মাড়িয়ে চল্লাম। এক ইঞ্চি পুরু, ভিজে দোবরা চিনির মত তুষার প'ড়ে। রং কিন্তু ধবধবে সাদা নয়—অতি অল্প লালচে ভাবের। বিষম চড়াই ভেঙ্গে ঘাম দরুণ আমার বেশী শীত করেনি। যাঁরা ঝাঁপানে অথবা দাণ্ডীতে বসে আসছিলেন, তাঁরা কম্বল গায়ে দিয়েছেন।

কেদারে হিমালয় বিরাট, বিশাল, গম্ভীর—লক্ষ কোটি বর্ষব্যাপী ধ্যান-নিমগ্ন মহাদেবের মত। শৃঙ্গগুলি বদরিকার পথের শৃঙ্গগুলির মত ঘন ঘন এবং আ-ফোটা পদ্ম-কলির মত ছুঁচালো নয়। সেখানে এক শৃঙ্গ হ'তে অন্য শৃঙ্গে যেতে সময় লাগে। নদী সহস্র ফিট নীচে, গিরিসঙ্কট বেশী চওড়া। সেখানে চিল মানুষের নীচে ওড়ে। সেখানকার তুষার এখানকার তুষারের চেয়ে পুরু; এবং অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে থাকে। ত্রিশ হাত চওড়া বরফের নদী অতিক্রম করে গেছি। বড় বড় গুহা, বড় বড় জলপ্রপাত দেখেছি। কেদারনাথ—কেদারা চৌতাল সঙ্গীতের মত উদাত্ত গম্ভীর। সুরধনী মন্দাকিনী—সঙ্গীত-ছন্দের গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে তাঁর সামগানের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। নীহার-স্ফোট মৃদঙ্গ

বাজাচ্ছে। অন্তরা, সঞ্চারী শেষ করে কেদার আভোগ ধরেছেন।.....

বদরীনাথ—খেয়ালের মত। পরের পর ছুঁচাল অফুরন্ত শৃঙ্গগুলি যেন কলকল ছলছল অলকানন্দার অবিশ্রান্ত লহরী। এখানকার দ্রুত-লয়-দৃশ্য দর্শনে মানব হৃদয়ে দ্রুতগতি স্পন্দন ও কম্পন আসে—বিশাল কেদারের গাম্ভীর্য্যের অনুভূতি-প্রসূতি আত্মহারা সমাধির ভাব আনে না।

ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে কেদারে যাচ্ছি—হঠাৎ একটা

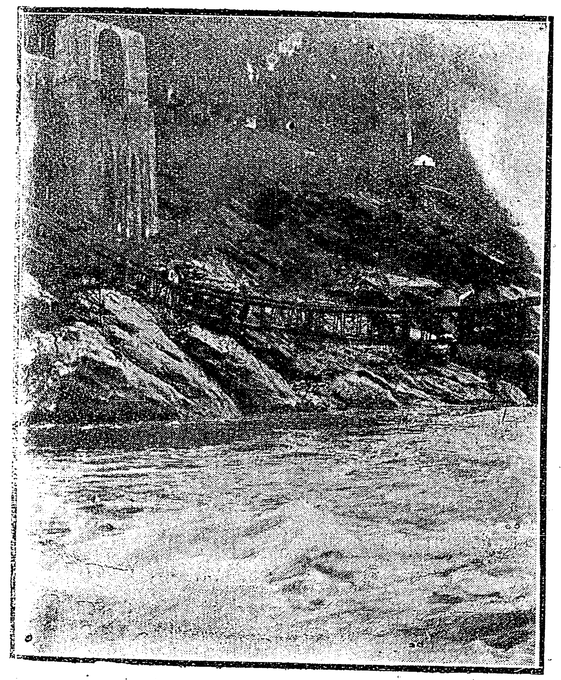

দড়ির ঝোলা

বাঁকের মুখে দেখলাম—বাইশ হাজার ফিট কেদার-শৃঙ্গের পাদপ্রান্তে নীলকণ্ঠ কেদার মন্দির! নীল মেঘের আকৃতি পাষাণের দেবালয়। একেবারে এগার হাজার ফিট খাড়া বরফের স্তূপের নীচে মন্দির দেখা গেলো—অন্য বাড়ীর চিহ্ন মাত্র দেখতে পেলাম না—যা দেখতে চোখ সরাতে হবে! এক নিমেষে চোখের এক পলকে দুটী দৃশ্য দেখলাম—শৃঙ্গ ও মন্দির। অনন্তের গানে ডুবে গেলাম। কালও আমি, ঠিক সেই রকম একটা বাঁকের মুখে গিয়ে অকস্মাৎ বদরীনাথ দেখলাম। কিন্তু বসত-বাড়ীগুলোর মাঝে মন্দিরের কলস। চোখ নামিয়ে মন্দির খুঁজে নিতে হ'ল। যেহেতু, মন্দির ও বাড়ীগুলি উপত্যকার নীচে এবং আমি যেখানে দাঁড়িয়ে তার চাইতে নীচু জায়গায়। মন্দিরের পিছনে কেদারের ন্যায় বিশাল শৃঙ্গ নাই। আগ্রা দুর্গের সমন্-বুরুজ থেকে তাজমহল দেখবার কালে আবেশে যে রকম বিভোর হয়েছিলাম, সে রকম বিভোর হয়েছিলাম অসীম কেদারের কোলে অখণ্ড অব্যয় দেবালয় দেখে। কেদার হচ্ছে ধুর্জ্জটীর ধ্রুপদ সঙ্গীত, আর তাজমহল শাহাজাদীর লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী।

এখন বদরীনাথের কথা একটু বলা যাক। এক মাইল দীর্ঘ এবং আধ মাইল প্রস্থ উপত্যকার তিন দিক জুড়ে, ঘোড়ার খুরের মত বক্রাকারে, পাঁচ ছয় হাজার ফিট উঁচু কয়টী শৃঙ্গ। শৃঙ্গগুলি বরফে ঢাকা। উপত্যকার বুকে অলকানন্দা। এবং তার দক্ষিণ তীরে ৺বদ্রীনাথ ধাম। সহরে ৩০০ খানা একতল, দ্বিতল বাড়ী। পাথরের বাড়ী। কাঠের ছাদ শ্লেটে ঢাকা। বারাণ্ডা নেই। পূর্ব্বে বর্ণিত পাহাড়ের বাঁক থেকে নীচে নেমে অলকানন্দার ছোটো সেতু পার হলাম এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে সহরে পৌঁছালাম।

ধূলা পায়ে মন্দিরে গমন এবং দেব-দর্শন। তখন মহা সমারোহে আরতি হচ্ছিলো। চতুর্ভুজ নারায়ণের সুন্দর মূর্ত্তি। কালো পাথরের। গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার। হীরক-খচিত মুকুট। কেদারে পাণ্ডার সঙ্গে দেবদর্শন করেছিলাম। এখানে কিন্তু পাণ্ডাদের যাত্রী লয়ে মন্দিরে যাবার অধিকার নেই।

আমাদের চটীটি দ্বিতল। দরজার পাশে, পাথরে লেখা আছে;—

৺ কালীচরণ দাস তস্য পত্নী নিস্তারিণী দাসী

তস্য পুত্র

শ্রীপ্যারীমোহন দাস তস্য পত্নী শ্রীমতী হরিমতি দাসী

তস্য পুত্র

শ্রীমাণিকলাল দাস তস্য পত্নী শ্রীমতী নন্দরাণী দাসী

ঠিকানা ২৩১ নং আম পোস্তা কলিকাতা!

আমাদের পাণ্ডা রামপ্রসাদ সূর্য্যপ্রসাদ লক্ষভাইএর প্রতিনিধি আমাদের প্রত্যেককে একটি করে লেপ দিলেন

ও ঘরে আগুন রাখলেন। শীতে হাত পা যেন বেঁকে যাচ্ছিলো। পাণ্ডা ঠাকুর রাত্রে দেবতার প্রসাদ পাঠালেন। ভূর্জ্জপত্রে আতপ চালের ভাত, আটার ডালপুরী, ময়দার লুচি, মালপো, পাপর ভাজা, বেসমের লাড্ডু, আলুর ঝোল, আলু চচ্চড়ী, উচ্ছে ভাজা, ঝাল-দিয়ে ঢেঁড়শ, আম তেল, আমড়ার আচার, কুমড়ার মোরব্বা, লেবুর আচার এবং আলুর পকৌড়ী। অনেক দিন সেই একঘেয়ে ভাত-ডাল-আলু-কুমড়া-রুটী লুচি খাবার পর আজ রাজভোগ খেয়ে প্রাণ জুড়ালো।

সকালে হাত মুখ ধুয়ে তপ্ত কুণ্ডে স্নান করতে গেলাম। তপ্ত কুণ্ড মানে গরম জলের ঝরণা। মন্দির এবং অলকানন্দার মধ্যে এই ঝরণা এবং একটি ছোটো এবং অগভীর কুণ্ড আছে—পাকা ছাদের নীচে। ঝরণা থেকে ফুটন্ত জল কুণ্ডে পড়ে। মন্দিরের সিংহদ্বার থেকে ত্রিশ ধাপ নেমে কুণ্ডে গেলাম। জল অত্যন্ত গরম। ঠিক তার পাশে আর একটি গরম জলের ঝরণা আছে,—পাহাড়ের গা থেকে চাতালের উপরে জল পড়ছে। সেখানে কুণ্ড নাই। আর পাঁচ ধাপ নেমে সেখানে গেলাম—এবং আরও বিশ ধাপ নেমে অলকানন্দা থেকে বালতি করে বরফ জল এনে গরম জলে মিশিয়ে স্নান করলাম। ঝরণার জল চেকে প্রথমে মিষ্ট পরে কষা লাগলো। এই গরম জল থাকার দরুণ যাত্রীদের অনেক সুবিধা হয়। হাত মুখ ধোবার জন্য সকলে এ জল বাসায় নিয়ে যায়।

বদ্রীনাথের মন্দির আধুনিক কালের। গর্ভ-মন্দিরের উপরে নেপালী ধরণের কাঠের ছাদের মত বিমানের উপরে সোণার কলস। জগমোহনের উপরে মোগল-ধরণের পাথরের গম্বুজ। সিংহদ্বারে এবং অন্যান্য অংশে মোগল এবং রাজপুত স্থাপত্যকলার প্রভাব।

নানা দেশের যাত্রী এসেছে। বুড়া বুড়ীই অধিক। তামিল, মরাঠী, পঞ্জাবী, শিখ, সিন্ধী ও গুজরাটীদের সঙ্গে আধা-বয়সী রমণী ও ছোট ছেলেমেয়ে এসেছে। কেউ কেউ কচি ছেলে এনেছেন। একটি শিখ বালিকা পদব্রজে এসেছে। সুন্দর ও প্রফুল্ল মুখখানি, টানা চোখ। আমার সঙ্গে অনেক কথা কয়। এমন মিষ্ট কথা! চসমা চোখে, "রিষ্টওয়াচ" হাতে ভাটিয়া শেঠনী এসেছেন। দাণ্ডীতে বসে যান, ভ্রমণ-কাহিনী লেখেন। সঙ্গে দুরবীণ থাকে। খুব ধনী তাঁরা। তাঁদের দলটীর জন্য চটীতে ভালো স্থান পাওয়া শক্ত। একজন উড়েনী ভিখারিণী এসেছেন। ছেঁড়া পুটলি ও বাঁশের লাঠি সম্বল। কঙ্কালসার দেহ। পায়ে গোদ। একটুখানি হাঁটেন এবং মাথা থেকে পুটলি নামিয়ে রাস্তায় রেখে জিরোন। আর ক্ষীণ কণ্ঠে প্রাণ ভরে বলেন "কেদারনাথ বদ্রীবিশাল কি জয়।" ভিক্ষা হয় ত কোনো দিন জোটে, কোনো দিন অনাহার!

ডান পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত কাটা একজন ভিক্ষুক দুহাতে লাঠি ধরে এক পায়ে আসেন। অন্ধ পদব্রজে আসছেন। কেদার থেকে রামবাড়া নামবার পথে একজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা বার বার মাথা ট'লে বসে পড়ছিলেন। তাঁর সঙ্গী বৃদ্ধ। সহধর্ম্মিণীকে সাহায্য করতে অক্ষম। আমার অনুরোধে আমার কাঁধে ভর দিয়ে বৃদ্ধা রামবাড়া চটীতে এলেন। সেদিন অপরাহ্নে যোশীমঠ থেকে বিষ্ণু-প্রয়াগে নামছি। সঙ্গীরা এগিয়ে গেছেন। আমি সেদিন সকলের পিছনে—কৈলাস যাবার ব্যবস্থা করতে দেরী হয়ে যাওয়ার দরুন। পথে প্রৌঢ়া বাঙালী রমণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন দেখলাম। পাহাড়ীর দ্বারা জল আনিয়ে তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনলাম। পকেটে কিচমিচ, বাদাম, খেজুর ও মিছরি ছিলো। খাওয়ালাম।

পূর্ব্ববঙ্গের কয়জন দরিদ্র স্ত্রী-পুরুষ এক দিন রাত্রে চটীর বাইরে কম্বল পেতে শুয়েছিলেন। তাঁরা রসদ কিনতে পারবেন না শুনে মুদী চটীর মধ্যে তাঁদের আশ্রয় দেয়নি। খুব শীত। তাঁদের জামা নাই। দোকানীকে বলে কয়ে আমাদের নীচের তলায় তাঁদের স্থান করে দিলাম এবং আহার্য্যের ব্যবস্থা করে দিলাম। যুবতী স্ত্রীটির অসুখ করেছে। নরুদা ওষুধ দিলেন। তাঁরা একবেলা খেয়ে নারায়ণ দর্শনে চলেছেন। নবদ্বীপের একজন বাবাজী আট দশজন বৈষ্ণবী নিয়ে—হরিদ্বার থেকে আমাদের সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন। বহুকাল পরে, গুপ্তকাশীতে, তাঁদের দলের দুজনকে—প্রৌঢ়া পিসি এবং যুবতী ভাইঝী "বুড়ী"কে—দেখলাম। সঙ্গীরা কেউ ঝগড়া করে আলাদা যাচ্ছেন, অর্থাভাবে এবং পথের কষ্টে কেউ কেউ ফিরে গেছেন। এঁদেরও সম্বল কম। অনেক যাত্রীদের পৌঁছাবার আগে আমি চটীতে যাই, এবং আমাদের, ও দুর্ব্বল, নিঃসহায় সঙ্গীদের জন্য জায়গা দখল করে রাখি। তাতে তাঁদের

কিছু সাহায্য করা হয় এবং তাঁদের আশীর্ব্বাদে আমার সুখ, শান্তি, আনন্দ হয়—প্রাণে নব বলের সঞ্চার হয়। বিশেষ রমণীয় স্থান না হ'লে পথিমধ্যে আমি বসি না .. একদমে পাঁচ ক্রোশ হেঁটে আসি। সেদিন প্রদোষে, প্রকৃতির নিকুঞ্জ কাননে, সুনীল অলকানন্দার তীরে উপল-খণ্ডের উপরে শুয়ে, ঊর্দ্ধে অস্তাচলগামী দিনমণির সিন্দুর-রাগে রঞ্জিত হিমাদ্রির তুষারের টোপরের দিকে চেয়ে, নদী কল্লোলের আকর্ষণে, শান্ত সমীরের সঞ্চালনে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার মা এবং অন্যান্য সঙ্গীরা ঘাট চটীতে আমি যাবার আগে গিছলেন। তাঁদের যাবার একটু

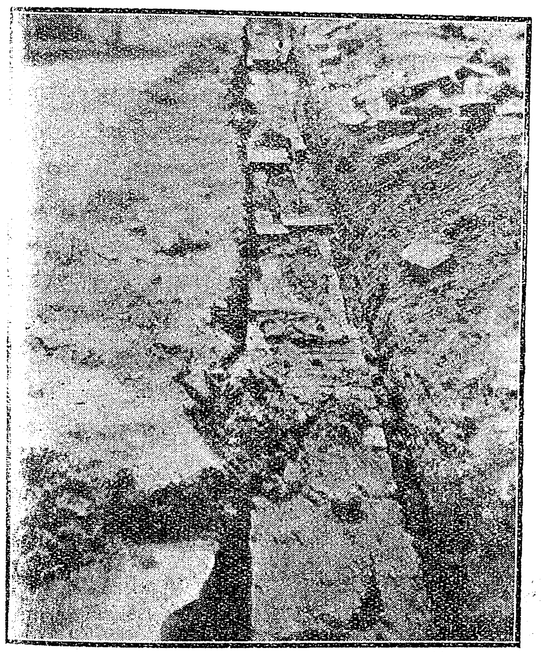

বদরী-পথে চড়াই

পরেই আমি যাই এবং দেখি, যাবার আসবার যাত্রাতে চটী পূর্ণ। আমাদের দলকে পেয়ে চটী-রক্ষক দরিদ্র হিন্দুস্থানী-দিগকে জোর করে সরিয়ে দিচ্ছে। দুজন বাঙালী বৃদ্ধা শুয়ে ছিলেন—আমাদের রাঁধবার জায়গা করবার জন্য তাদের ধাক্কা দেওয়া হ'ল। একজন কেঁদে উঠলেন। আর বাঙালীকে, স্বজাতিকে, ধিক্কার দিয়ে বল্লেন. "বাঙালীর চেয়ে খোট্টারা ভালো। তাদের দয়ামায়া আছে। আমাদের জায়গা করে দিয়েছিলো।" আমাদের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, অর্থশালী, সঙ্গী মহাশয় পরম আনন্দে বসলেন।

দরিদ্রাদের শুধু চোখ রাঙিয়েই তিনি নিরস্ত হ'লেন না, মারবার উদ্যোগ করলেন। আমি তাঁদের থামাই।

বাঙালী মেয়েদের মধ্যে অনেকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব আছে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেয়েছি বদরী যাত্রায়। এ "বেণে" (এদিকে তাঁকে "মাসি" বলে সোহাগ করা আছে), ও "জেলে", "মেড়ো মাগীগুলো মোট-মাথায় দুপুর রোদে ধিঙ্গির মত হাঁটছে দেখো, ওদের আর কি—ছাতু খেয়ে দিন কাটাবে, চান করবার বালাই নেই" "গতোর বয় না" (অথচ ঝাঁপানে যাচ্ছেন),—খালি নাকি-সুর, পর-নিন্দা, পর-চর্চ্চা, সদা আরামের চেষ্টা, আর প্রলয়ঙ্করী অল্প পয়সার অকথ্য দেমাক! গাড়োয়ালের মেয়েরা দুক্রোশ চড়াই ভেঙ্গে একজন জল তুলছে—প্রশান্ত বদন, হাসিমাখা,—বিশ্রাম করতেই সময় পায় না, পরনিন্দা করবে কখন!

যতগুলি সাধু দেখলাম, তাঁদের মধ্যে দুজনকে দেখে যথার্থ ভক্তি হয়। একজন মধ্য-ভারতের লোক। পাগলার মত। প্রতিনিয়ত ভগবানের নাম করছেন। অপরের বাড়ী গঞ্জাম জেলায়। তিনি খুব কম কথা ক'ন এবং কেউ কথা কইলে সংক্ষেপে উত্তর দেন। স্বেচ্ছায় কেউ তাঁকে খেতে দিলে একবারকার খাবার মত খাবার নেন। পয়সা নেন না।

কেদার-বদরী পরিক্রম করলাম। নিদ্রার ঘোরে স্বপ্নে আমি হিমালয়ের শোভা দেখি,—অলকানন্দার তীরে গগনস্পর্শী সহস্র হিম-শৃঙ্গের পাষাণ-প্রাকার,—অলকানন্দার অশ্রান্ত সঙ্গীত. সে সঙ্গীতের বিরাম নাই। হরিদ্বার ছেড়ে পর্য্যন্ত রাত্রি-দিন নদীর কল্লোল শুনছি। হিমালয়ে শুধু গান, আর আলো, আর হাওয়া, আর বরফ। গন্ধ-মাদনের বিজন অরণ্যে মালা হাতে সন্ন্যাসিনীর পবিত্র মূর্ত্তি আমি বিস্মৃত হবো না—অলকানন্দা-মন্দাকিনীর মিষ্টি জল আমি বিস্মৃত হ'বো না—আর আমাদের ঝাঁপান ও কাণ্ডীওলাদের সরল হাসি ও মধুর বচন আমি কখনো ভুলতে পারবো না। যাত্রী-কাঁধে পাহাড়ে ওঠে; থাম্‌লে কোনো প্রশ্ন করলে—খালি হাসে।

জয়

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

স্বদল-পরিবৃত রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় সমাসীন। দ্বিতল গৃহ বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত; মাথার উপর বিজলী-ব্যজনী অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া সকলের গ্রীষ্মতাপ দূর করিতেছে ও পুষ্পাধারে রক্ষিত সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ গৃহ মধ্যে বিকীর্ণ করিতেছে। বারান্দায় টবের উপর নানা জাতীয় গাছ শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত। সম্মুখের পরিচ্ছন্ন রক্তাভ রাজপথ তৃণ-শ্যামল প্রান্তরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া শ্যামল বসনের রক্তবর্ণ প্রান্তের মত শোভা পাইতেছে। প্রান্তরের পরবর্ত্তী শান্ত নদীর পরপারের শ্যামল তরুশ্রেণীর শিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গণেশ। বড় বাবু, এবার আর চুপ্ করে থাক্‌লে চল্‌বে না। রীতিমত তোড়যোড় চাই। এবারকার কার্য্যসাধন-মণ্ডলীতে আর ওদলের একটি লোককে ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না।

রাইচরণ। তা যদি চাও, সঞ্জীবের ঠ্যাং দুখানা খোঁড়া করে দাও—ব্যস্।

শিবনাথ। অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ঠ্যাং ভাঙ্গার চেয়ে তার জিভ্ কেটে দেওয়া হোক্।

গণেশ। তার মানে?

শিবনাথ। জিভ্ দিয়েই ও বেশী অনথ করেছে। গেল বছরই তো রাইচরণের এক বিঘে জমী সবাইকে বলে কয়ে গোচারণের জন্য দেওয়ালে তবে ছাড়্‌লে। সেই থেকেই তো রাইচরণের রাগ।

রাইচরণ। আপনি কি বল্‌তে চান, তার জন্যে রাগ না করে তাকে সন্দেশ খেতে দিতে হবে?

নরেন্দ্র। থামো দিকি—ঝগড়া থামাও। এ দল ও-দল কিছু নেই; আসল কথা সঞ্জীবকে নিয়ে। ও ভেতরে আসতে পেলে নিজের দল গড়্‌তে একটুও দেরী হবে না।

গণেশ। আপনি থাক্‌তে ও মাথা তুল্‌বে—এ কথা—

নরেন্দ্র। আঃ, থাম তো গণেশ—বাজে বোকো না। সে কি পারে আর আমি কি পারি, তা তোমার চেয়ে বোধ হয় আমি বেশী জানি। শোন—তাকে দলে পেলে সব কাজ সোজা হয়ে আসে—যদি সে আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়। যদি না হয়, যেমন করে হোক্ তাকে বাধা দিতেই হবে। সে না থাক্‌লে আর কেউ আপত্তি তুল্‌তে সাহস করবে না।

গণেশ। তবে যাতে ভাল হয় তাই করুন। আমার হাতে যত লোক আছে—সব আপনারই জানবেন্।

এক কর্ম্মচারী আসিয়া একখানি খামে-বন্ধ-করা পত্র নরেন্দ্রের হাতে দিল।

নরেন্দ্র। এখনি কর্ত্তব্যের মীমাংসা হয়ে যাবে। সকাল তাকে সব কথা জানিয়ে পত্র দিয়াছিলাম—এই তার উত্তর। (মনে মনে পত্র পাঠ)—"নরেন্দ্র, বন্ধুত্ব আমাদের আমরণ বাঁচিয়া থাকিবে; কিন্তু তাহা সুধু তোমার ও আমার;—কার্য্যসাধন-মণ্ডলীর মধ্যে তাহার স্থান নাই।

তোমার প্রস্তাব আমার কাছে সুধু অগ্রাহ্য নহে—অশ্রাব্য। সঞ্জীব।"

(প্রকাশ্যে)—সঞ্জীব রাজী নয়। লিখেছে, এ প্রস্তাব তার কাছে সুধু অগ্রাহ্য নয়—অশ্রাব্য। অশ্রাব্য! কি আস্ফালন!

শিবনাথ ব্যতীত সকলে। উঃ কি আস্পর্দ্ধা! কি অহঙ্কার!

গণেশ। ওর অহঙ্কার ভাঙ্গতেই হবে।

হীরালাল। যে মুখে ও এ কথা বলেছে, সেই মুখে যদি বড় বাবুর কাছে apology চায়, তবেই ওর রক্ষে; নইলে ওর দুর্দ্দশার একশেষ করতে হবে।

পান্নালাল। যে হাতে ও-কথা লিখেছে সেই হাত যোড় করে যদি ও বড় বাবুর কাছে ক্ষমা চায়, তবেই ওর বাঁচোয়া।

নরেন্দ্র। শিবনাথ খুড়ো, হঠাৎ উঠ্‌লেন যে?

শিবনাথ। (যাইতে যাইতে) আর সহ্য কত্তে পারলাম না বাবাজী। এদের আস্ফালন যদিও বা সহ্য কত্তে পারতাম্—তোমার মৌনভাব সইল না।

নরেন্দ্র। সঞ্জীবের অহঙ্কারে যদি কেউ স্বাধীন মত প্রকাশ করে, আমি তাতে বাধা দিতে যাই কেন?

শিবনাথ। এতই যদি তোমার স্বাধীন মতের উপর শ্রদ্ধা, তবে সঞ্জীবকে তার স্বাধীন মত নিয়ে কেন থাক্‌তে দিচ্ছ না, তা তো বুঝ্‌তে পারি নে। যাক্‌গে বাবা—ও সব কথা যেতে দাও। আমি আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে আমার দরকার! যদি বেফাঁস্ কিছু বলে থাকি, বুড়ো বলে মাপ কোরো। রোজ তোমার এখানকার চা ও বিস্কিংয়ের লোভে কর্ণেন্দ্রিয়ের যতদূর দুর্গতি করবার তা করেছি। আর নয় বাবা—আজ থেকে বিদায়।

[শিবনাথের প্রস্থান।

রাইচরণ। আসেন তো বাবুর বাড়ীতে দুবেলা চা খেতে—এদিকে বুলি খুব লম্বা। কি বল্‌ব—বড় বাবু একটু খাতির করেন ওকে—

গণেশ। বড় বাবুর এ সব দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা। শিব, চক্কত্তি নিশ্চয় সঞ্জীবের কাছে গিয়ে এসব কথা বল্‌বে।

নরেন্দ্র (বিরক্ত হইয়া)। আচ্ছা, লোকের কুৎসা ছাড়া তোমাদের কি আর কোন কাজ নেই? সকলে খারাপ আর তোমরাই খুব সাধু—এই কথাটা কি আমাকে বোঝাতে চাও?

সকলে চকিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

গণেশ (বহুক্ষণ পরে)। তাহলে বড় বাবু আমাদের কর্ত্তব্য কি বলে দিন্। আপনি যা করবেন্ আমরা তারই পেছনে আছি জানবেন্।

নরেন্দ্র। আজ বড় শ্রান্ত আছি—উঠি। কাল পরামর্শ শেষ করে ফেলা যাবে।

সকলে উঠিয়া গেল। নরেন্দ্র নিজে আলো ও পাখা বন্ধ করিয়া দিতে, শুভ্র পুষ্পরাশির মত বিমল জ্যোৎস্না বারান্দা ও গৃহতল মুহূর্ত্তে ভরিয়া দিল। বাহিরের স্নিগ্ধ উচ্ছ্বসিত পবন কক্ষ-মধ্যে হিল্লোল তুলিয়া প্রবেশ করিল।

সম্মুখের জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাজপথ, প্রান্তর, ও নদীবক্ষঃ গৃহের পানে মমতাভরা দৃষ্টিতে চাহিতেছিল।

নরেন্দ্র নির্ব্বাক্ হইয়া বহুক্ষণ বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

(২)

অপরাহ্ণ। কয়েকখানি সুদৃশ্য পরিচ্ছন্ন কুটীর। পিছনে ফল ও ফুলের বাগান। সম্মুখস্থ কুটীরখানির সম্মুখে কিঞ্চিৎ মুক্ত স্থান গৃহস্বামীর নিজ-হস্তে সুন্দর ভাবে ঘেরা। কুটীর মধ্যে জনকয়েক যুবক কথোপকথনে নিমগ্ন।

মিহির। কার্য্যসাধন-মণ্ডলীতে আপনি তাহলে থাক্‌বেন না?

সঞ্জীব। আচ্ছা মিহির, আমরা কাজ করি কেন?

মিহির। আমাদের আদর্শ বজায় থাক্‌বে, তাই।

সঞ্জীব। আমাদের আদর্শ কি?

মিহির। দেশের অভাব দূর করা।

সঞ্জীব। নরেন্দ্র এবার নিজে সে ভার নিয়েছে। সকলকে বলেছে, যদি আমাকে তারা বর্জ্জন করে, তাহলে দেশহিতকর সকল কাজ সে সানন্দে করবে।

নিখিল। আর আপনি এই ভাবে তার পথ স্বেচ্ছায় পরিষ্কার ক'রে দেবেন?

সঞ্জীব। তার পথ পরিষ্কার করে দিচ্চিনে, পরিষ্কার কচ্চি দেশের উন্নতির পথ। সে যদি এ কাজে হাত দেয়—আমার হাত দেবার কোন প্রয়োজন হবে না। আমার চেয়ে ঢের ভালরূপে সে এসব কাজ সম্পন্ন কর্ত্তে পারবে।

মিহির। তিনি যে কথা রাখ্‌বেন তার প্রমাণ কি?

সঞ্জীব। আমি তাকে খুব ভাল জানি মিহির। আমরা যে আবাল্যের বন্ধু। কথার নড়চড় করবার লোক সে নয়।

শিশির। আপনার তিনি বন্ধু, অথচ আপনাকে বাদ দিতে পারলে তিনি বাঁচেন কেন?

সঞ্জীব। এ শুধু আমার ওপর তার অভিমান। বন্ধুত্বের চেয়ে আমার মতকে আমি বড় করে দেখ্‌চি, এই তার দুঃখ।

শিশির। তিনিও কি তাই দেখ্‌চেন না?

সঞ্জীব। সে আমায় ডাকে, আমি যাই না; আমি তো তাকে ডাকি নি।

মিহির। ডাক্‌লে কি আস্‌তেন?

সঞ্জীব। নিশ্চয়।

মিহির। তবে কেন ডাকেন না?

সঞ্জীব। তার মতকেও আমি তাঁর মতন শ্রদ্ধা করি। আমার খাতিরে সে নিজের মত বদলাবে, তা আমি চাই না। আমাদের বিরোধ কোন্ খানে জান তো? সাধারণ নিরক্ষর লোকদের সে ঘৃণা করে। আমি তাদের গড়ে তুল্‌তে চাই। তাদের সে কোন সুবিধা দিতে রাজী নয়। আমি তাদের সব সুবিধা দিয়ে, তাদের চোখ মুখ ফুটিয়ে দিতে চাই।

মিহির, শিশির ইত্যাদি। আমরাও তাহলে এবার মণ্ডলীর বাধ্য থাক্‌ব না।

সঞ্জীব। তাহলে তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে—আমায় দেশসেবা থেকে বঞ্চিত করবে। আজ আমার আদর্শ নরেন্দ্র গ্রহণ করেচে। তোমরা আমার দক্ষিণ হস্ত। তার সঙ্গে তোমরা থাক্‌লে আমার পরিপূর্ণ ভাবেই থাকা হবে।

নীরদ। একটা কথা কিন্তু ভুলে যাচ্চেন—এতে যে আপনার অপমান হবে?

সঞ্জীব। আমার নিজের সম্মানের চেয়ে আমার আদর্শের সম্মানই আমি বড় বলে মনে করি। তোমরাও তাই মনে করলে আমি সুখী হব।

সকলে গাঢ়স্বরে। আপনার আদেশ মতই আমরা চল্‌ব।

সঞ্জীবকে প্রণাম করিয়া সকলে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

(৩)

সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল। উৎসব-শোভায় সজ্জিত কক্ষে বিজয়োৎফুল্ল দলবল সহ নরেন্দ্র উপবিষ্ট। দুই জন সুকণ্ঠ গায়ক আসিয়াছেন—শীঘ্রই গান আরম্ভ হইবে।

হীরালাল। আজ একটা শোভাযাত্রা বার করলে হয় না? ও-পাড়াটা একবার বেশ করে ঘুরে আসা যায়।

রাইচরণ। তা মন্দ হয় না। ব্যাপারটা কি রকম চল্‌ছে একবার দেখে আসা যায়—দেখানোও হয়।

গণেশ। বড় বাবু বলেন তো সে ব্যবস্থা এখনি করে ফেলা যায়।

নরেন্দ্র। না, তাতে আর দরকার নেই বড় বাড়াবাড়ি হয়।

হীরালাল। কিন্তু এরকম victoryআর হয় না—একেবারে, যাকে বলে, Complete—

গণেশ। তা নয় ত কি! শেষটা বাছাধনকে মাথা নীচু করে সরে দাঁড়াতে হ'ল। এর চেয়ে আর অপমান কি হতে পারে!

নরেন্দ্র। তার এ অপমানের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাকে দলে নেবার জন্য কম চেষ্টা করেছি। চিঠি লিখেছি,—তার পর নিজে তার বাড়ী গিয়ে তাকে সেধেছি। তবু সেই এক উত্তর—কোন সর্ত্তে আমি তোমার দলে যেতে রাজী নই। তাই না আমার রোক্ চাপ্‌ল—যেমন করে হোক্ ওকে সরাতেই হবে।

গণেশ। কথায় বলে—'অতি দর্পে হতা লঙ্কা'—হ'লও তাই। 'সঞ্জীব বড় কাজের লোক, সঞ্জীব বড় ভাল'—সবারই মুখে এই কথা। এখন?

নরেন্দ্র। গণেশ, নয়ানপুরে একটা পুকুর সব আগে দিতেই হবে। যখন কথা দিইছি তখন তা রাখ্‌তে হবে! কালই লোক লাগিয়ে দাও।

গণেশ। যে আজ্ঞে—তাই হবে।

হীরালাল। নয়ানপুরে এরি মধ্যে না কি দু' একটা কলেরা দেখা দিয়েছে।

রাইচরণ। বড় ২।১টা নয়—দু'দশটা এরি মধ্যে সাবাড় হয়েছে। সেদিন দেখি ২।৪ জন শিষ্য নিয়ে বাবু যাচ্ছেন নয়ানপুরে 'স্যাবা' কত্তে। এখন ঐ সব কাজই থাকুন। যত পারেন এবার স্যাবা করুন।

সন্ধ্যা নামিল। আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। বাহিরে চন্দ্রকিরণ লতায়, পাতায়, তৃণে, প্রান্তরে ও রাজপথে ঝরিতে লাগিল।

গায়ক গৃহমধ্যে উৎসব-গীতির উদ্যোগ করিতে লাগিল।

নরেন্দ্র বাহিরে আসিয়া বসিল।

গণেশ (নিকটে আসিয়া)—বড়বাবু, আপনার শরীর কি আজ ভাল নেই? কেমন যেন দেখাচ্ছে।

নরেন্দ্র। তা দেখাক্ গণেশ; আমায় একটু চুপ করে একা বসতে দাও দিকি!

সহসা দূর হইতে বহুকণ্ঠে সম্মিলিত গীতিধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

নরেন্দ্র। (চমকিয়া) এ কি গণেশ?



"লালসা"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

গণেশ। (ভাল করিয়া শুনিয়া)—সংকীর্ত্তন আস্‌ছে বলে মনে হচ্ছে।

নরেন্দ্র। এই যে মোড়ের মাথায় এসে পৌছাল্। এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

কীর্ত্তনের ভাষা শুনা যাইতে লাগিল ঃ—

হরিনাম বিনা ভবে গতি আর নাই রে।
সংসারে সব অসার হরিনাম সার রে॥

গণেশ। কেউ মারা-টারা গেল না কি ?—কি জানি।

নরেন্দ্র। ওই যে মোড়ের মাথায় ভিড় জমে গেল। গণেশ, গানটা একটু থামাতে বল ত ; আর দৌড়ে একবার জেনে এস ত—ব্যাপার কি।

গান থামিল। গণেশ খোঁজ লইতে ছুটিয়া গেল। নরেন্দ্র উৎকণ্ঠিত ভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

গণেশ। (ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া আসিয়া)—বড়বাবু!—

নরেন্দ্র (সোদ্বেগে —কি, ব্যাপার কি ?

গণেশ। সঞ্জীব মারা গেছে। নয়ানপুরে গিয়ে কলেরা হয়েছিল। চারিদিক থেকে দলে দলে লোক আস্‌ছে তাকে দেখ্‌তে ঐ দেখুন—এসে পড়্‌ল।

নরেন্দ্র (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে)। এ্যাঁ, সঞ্জীব মারা গেছে!

নরেন্দ্র খালি পায়ে, খালি গায়ে ব্যস্তভাবে নীচে নামিয়া আসিয়া দেউড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল।

দিবস ফুরায়ে গেছে, ডুবে গেছে রবি রে।
চারিদিক ঘিরে সুধু গভীর আঁধার রে॥

গাহিতে গাহিতে কীর্ত্তনীয়ারা অগ্রসর হইয়া আসিল। পশ্চাতে শিশির, মিহির, নিখিল ও শিবনাথ সঞ্জীবের পুষ্পমালা-সজ্জিত শবদেহ বহিয়া চলিল।

নরেন্দ্র অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—কাহার বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, আর কেনই বা করিয়াছিল ?

জ্যোৎস্না যেন ম্লান হইয়া আকাশে ফিরিয়া গেল। রাজপথ, প্রান্তর, নদী, আপনার অট্টালিকা—সব যেন মুহূর্ত্তে মিলাইল। মনে হইল—এসব কোথাও ছিল না, কোন দিন ছিল না ;—সব মিথ্যা, সব মায়া!—

গানের সুরে চমক ভাঙ্গিল। শববাহীরা একটু দূরে চলিয়া গিয়াছে ; সেখান হইতে শুনা যাইতেছে ঃ—

সম্মুখেতে মহাসিন্ধু গরজে ভীষণ রে।
হরিনাম ভেলা তাহে কেবলি সম্বল রে॥

নিশ্বাস ফেলিয়া নরেন্দ্র সেই অবস্থায় একাকী—দূর হইতে শবদেহের অনুসরণ করিল।

হিমালয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

২

বারেক আমারে তুমি দেখা দিয়ে আজ
ভাঙিলে সকল গর্ব্ব হে রাজাধিরাজ,
সৃষ্টি-পিতামহ-ভীষ্ম ওগো হিমাচল!
দিনে দিনে তিলে তিলে আপনা বিহ্বল।
রচেছিনু মনে মনে যে দম্ভ-নিলয়,
কঠিন কটাক্ষে তব লভি' তা বিলয়
মুহূর্ত্তে মিশেছে ওই চরণের তলে,
চরণ-ধূলার মত, আজি পুণ্যফলে!
কি আনন্দ! ক্ষুদ্র আমি, লঘু আমি আজ,
মুক্ত আমি তব স্পর্শে হে নগাধিরাজ!
এ কি হর্ষ! আজি মোর ভারমুক্ত প্রাণ
সুদূরের যাত্রাপথে বিহঙ্গ সমান
লভিল অপূর্ব্ব গতি! তুচ্ছতা তাহার
সত্যরূপে আজি তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

আমারে করিয়া ক্ষুদ্র, ওগো হিমরাজ!
সত্যকার বড় তুমি করিয়াছ আজ,
হে দেব, হে হিমালয়! অহঙ্কারে গড়া
অসত্যের আবরণ, কলঙ্ক-পসরা
নিজ হাতে কাড়ি' লয়ে করিয়াছ দান
সুযোগ্য শিষ্যের মূর্ত্তি মঙ্গল মহান্ ;
প্রেম দিয়া অগৌরবে করিয়াছ জয়,
মাভৈঃ-অভয়-মন্ত্রে হরিয়াছ ভয়
দুর্ব্বলের চিত্ত হ'তে, লভি সঙ্গ তব
সকল রিক্ততা মোর স্বর্ণ অভিনব
স্পর্শমণি স্পর্শে যথা ; লঘু বাষ্পরাশি
তোমার শীতল স্পর্শে দ্রবি হয়ে আসি'
দুই বিন্দু আঁখিজলে পরিণত আজ,
হে মোর কঠিন-কান্ত, হে অচলরাজ!

ভারতের স্থাপত্য-শিল্প

(প্রতিবাদ)

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের পুনঃ প্রচলন মানসে বদ্ধপরিকর হইয়া তৎসম্বন্ধে আবেদন আন্দোলন করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও বাঙালী এ বিষয়ে তাঁহার মত উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন কি না আমি জানি না। বিদেশী শিল্পের কবল হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের চেতনা এবং আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান আনয়ন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তজ্জন্য নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া বিবিধ উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। শ্রীশ বাবুর ইচ্ছা—আমরা সকলে সমবেত হইয়া সেইরূপ একটি অনুষ্ঠান করি। শ্রীশবাবু তাঁহার মহতী আকাঙ্ক্ষাকে কি প্রকারে কার্য্যে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার কৌশল ও প্রণালী আমি বিশদ ভাবে অবগত আছি।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতবর্ষে' বিবিধ-প্রসঙ্গে জনৈক ইঞ্জিনীয়র শ্রীশচন্দ্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

শ্রীশচন্দ্রের কার্য্যকলাপে অথবা বাংলা ও ইংরাজীতে লিখিত প্রবন্ধে "হুজুগের" বিন্দুমাত্র আভাস পাই নাই। তিনি প্রকৃতই একজন কর্ম্মী। তবে তাঁহার কর্ম্ম একাকী তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। সে কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা সর্ব্বতোভাবে অপরিহার্য্য। সেজন্য বক্তৃতা দান ও প্রবন্ধ প্রকাশের প্রয়োজন আছে। আমিও ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের অনুরাগী। সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছি। কিন্তু শ্রীশবাবুর একাগ্রতা, আন্তরিকতা, দেশহিতৈষিতা, স্বীয় স্বার্থ-বিসর্জ্জন করিয়া অর্থে-সামর্থ্যে অপরের উপকার করিবার আকুলতা এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা এবং সংগঠনী-শক্তির উচ্চ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। অশেষবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সংখ্যাতীত আপদ-অসুবিধা ভোগ করিয়া এবং বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করিয়া—জৈসলমেরের মরুভূমে ৯৮ মাইল পদব্রজে গমন করিয়া—সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ তিনি পঞ্চদশ বর্ষ ধরিয়া পর্য্যটন করিয়াছেন; এবং তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। শুধু পুস্তক পাঠে তাঁহার পিপাসা মিটে নাই। মাত্র অধ্যয়নে এবং দেশ ভ্রমণে তিনি তৃপ্ত হয়েন নাই। রাজপুতানায় বাস করিয়া ভারতীয় শিল্পের নির্দ্দেশ অনুসারে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার কৌশল তিনি শিখিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীশচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার এই তথাকথিত "হুজুগে" যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দুকুমার এবং পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়র, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং গভর্ণমেণ্টের কনসল্টিং আর্কিটেক্ট এবং দেশের অন্যতম নেতা স্যর হরি সিং গৌর এবং বোম্বাইএর যমুনাদাস দ্বারকাদাস মহোদয়ের মত কর্ম্মী। লর্ড লিটন এবং স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শ্রীশচন্দ্রকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহার প্রাণে নব বলের সঞ্চার করিয়াছেন। লেখক মহাশয় হয় ত ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, শুধু "চিত্র শিল্পী, বিজ্ঞানবিদ এবং সাধারণে এই বৈঠকে" যোগদান করে নাই। প্রথমতঃ এই পুনরুদ্ধার ব্যাপারটীতে ইনষ্টিটিউটের হাত ছিল [ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষেরা শ্রীশবাবুকে স্বতন্ত্রভাবে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।]; ইঞ্জিনীয়র এসোসিয়েশন - তদীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যমণ্ডলীর অবিসংবাদী সমর্থনে—এই বৈঠকের অনুষ্ঠান করেন। দলে দলে ইঞ্জিনীয়র আসিয়াছিলেন—শিবপুর কলেজের ছাত্রদিগে সুপণ্ডিত অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে কলেজের ছাত্রেরা আসিয়াছিলেন, পবলিক ওয়ার্কসের, কর্পোরেশনের এবং অন্যান্য সরকারী এবং বেসরকারী নিম্ন এবং উচ্চ পদস্থ পূর্ত্তবিদ এবং শ্রীযুক্ত সি, কে, সরকারের মত স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদ সেই সভায় সমাসীন ছিলেন। মিষ্টার পার্সি ব্রাউন এবং কনসল্টিং আর্কিটেক্ট কেয়ার সাহেব কার্য্যবশতঃ আসিতে পারেন নাই। তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন; এবং মিউনিসিপ্যাল গেজেটে সেই মুগ্ধকরী বক্তৃতা পাঠান্তে তাঁহাদের আন্তরিক প্রীতি, সহানুভূতি এবং সমর্থনের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পত্রগুলি আমি দেখিয়াছি। ব্রাউন সাহেব লিখিয়াছেন তিনি শ্রীশবাবুকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। লাটসাহেবের সেক্রেটারী লিখিয়াছেন, লর্ড লিটন তাঁহার ইনষ্টিটিউটের বক্তৃতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে পড়িয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জে, সি, ব্যানার্জ্জী সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি বহুদর্শী, বিচক্ষণ এবং সুদক্ষ ব্যবসায়ী। শ্রীশবাবুর ব্যবস্থাটী "উদ্দাম কল্পনা" কি না, তাহার বিচার করিবার তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র।

"চিত্র শিল্পী এবং বিজ্ঞানবিদের কথা"। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় কি বলিতে চাহেন যে, কলেজে-পাশ-করা ইঞ্জিনীয়র ব্যতীত এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকার অপরের নাই? ভারত-গৌরব অবনীন্দ্রের বিশ্বপ্রসারিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অথবা জগদীশের তপস্যালব্ধ বিজ্ঞানবাদ, লেখকের মতে স্থাপত্য-বিদ্যা-মন্দিরের রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে

অথবা প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী হইবে কি না বিবেচনা করিয়া মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ? স্থাপত্য-কলার সঙ্গে যে চিত্র ও সঙ্গীত-বিদ্যার অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে! তিনি কি তাহা কাটাইতে চান? তিনি একবার অবনীন্দ্রের চিত্রশালার স্থাপত্যকলা দেখিয়া আসুন। তিনি বহু-বিজ্ঞান-মন্দির এবং আচার্য্যের আবাস-ভবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসুন। আচার্য্যের সৌধের পরিকল্পনা করিবার এবং হিন্দু রীতিতে রমণীয়—বিচিত্র উদ্যান রচনা করিবার এবং দেশীয় ধরণে কক্ষ সুসজ্জিত করিবার অদ্ভুত শক্তি প্রণিধান করিতে পারিবেন। আচার্য্য বসু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীশবাবুকে দুইটি বাটীর "ডিজাইন" করিতে দিবেন বলিয়াছেন। তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আবাস-ভবন নির্ম্মিত হইতেছে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বিরচিত আট লক্ষ টাকা মূল্যের প্রাসাদতুল্য বিশাল ভবনের আলোকচিত্র প্রকাশিত করিয়া "ভারতবর্ষ" দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট সোসাইটীর সহকারী সভাপতি এবং "রূপম্" পত্রিকার বিশ্ববিশ্রুত সম্পাদক, শিল্পী অর্দ্ধেন্দুকুমার একজন জাতনামা এটর্ণী। শ্রীশবাবুর প্রবন্ধ পাঠান্তে তিনি লিখিয়াছেন—"প্রত্যেক ভারতবাসী যিনি civic architectureএর উৎকর্ষের প্রয়াস করেন, লেখকের সুচিন্তিত ও প্রশংসনীয় প্রস্তাবগুলির মতে কার্য্য করাইবেন।" City Architect Hathaneay সাহেব শ্রীশচন্দ্রকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

বহুকাল হইতে আমরা দেশের শিল্প পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী স্থাপত্য-কলার আরাধনা করিতেছি। বিদেশী ধরণ-ধারণ এবং Slave mentality আমাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া আছে। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আমাদের ধ্যান ধারণা সকলই বিদেশী প্রণালীতে ওতঃপ্রোত। আমরা নূতন কিছু ভাবিতে পারি না—বৃহৎ কিছু কল্পনা করিতে পারি না। মিউনিসিপ্যালিটির পূর্ত্ত-বিভাগও সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহরে দেশীয় স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠান করিতে হইলে, মিউনিসিপ্যাল আইনের "আমূল পরিবর্ত্তন" করা না হৌক, কিছু অদল-বদল করা আবশ্যক। শ্রীশবাবু তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক প্রস্তাব যুক্তিপূর্ণ অথচ বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। অত্যধিক ব্যয়-সাধ্যও নহে। তিনি বলিয়াছেন—জল, ড্রেণ বিভাগের মত ভারত-স্থাপত্যের একটি নূতন বিভাগ স্থাপন করিতে হইবে। প্রথমতঃ অনাড়ম্বর ভাবে; এবং ব্যবসার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়ে লাভ হইলে, এবং প্রণালীটা হৃদয়ঙ্গম ও কার্য্যকরী হইলে, সেই আপাততঃ ক্ষুদ্রাকৃতি ভারতীয় স্থাপত্য বিভাগটী বিশাল মহীরুহে পরিবর্দ্ধিত হইবে। সমালোচকের উল্লিখিত "মাল মশলা বিক্রয়ের জন্য দোকান খোলা," "বিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহের মারফত সাধারণকে ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যায় শিক্ষা" প্রদান, "পুস্তকালয়" "কারখানা" প্রভৃতি শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হইবে—তখন। ইহার মধ্যে আরব্য উপন্যাসের কথা কি আছে? স্থপতি যখন নগরের পরিকল্পনা করেন, তখন দুই শত বৎসর পরে নগরের কিরূপ পরিণতি হইবে, তাহার হিসাব করিয়া কার্য্য করেন। মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব চীফ ইঞ্জিনীয়র এবং দেওয়ান স্যর বিশ্বেশ্বরের অদ্ভুত কার্য্যকারিতার প্রসঙ্গে শ্রীশবাবু যখন বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তখন তিনি বাল্মীকির তপোবন—অবনী গ্রামের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন, সুদূর অরণ্যের মধ্যে দীনতম পল্লীগ্রামের কিরূপ উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছেন ওই ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনীয়র। ভারতের এক আদর্শ পল্লীগ্রাম শ্রীশবাবু দেখিয়া আসিয়াছেন—মহীশূরের গণ্ডগ্রামে। আমরা Geddesএর বক্তৃতা শুনিয়াছি এবং তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। কী বিরাট "উদ্দাম কল্পনার" ব্যাপার! ইয়োরোপ আমেরিকার অনেক মিউনিসিপ্যালিটিতে শ্রীশবাবুর কল্পিত ভারতের ভাবী মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অপেক্ষা বহু গুণে বৃহত্তর অনুষ্ঠান আছে। মিউনিসিপ্যালিটি নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই উৎপাদন এবং সরবরাহ এবং তজ্জন্য শত বিভাগ সৃষ্টি করিতে পারেন। হোটেল, থিয়েটার হইতে রেলওয়ে পর্য্যন্ত। স্বায়ত্তশাসন তাহার মূলমন্ত্র। সম্প্রতি ত্রিচিনাপল্লীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষেরা মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে জাতীয় সঙ্গীত শিখাইবার নিয়ম জারি করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্রের ইচ্ছা—ভারতবর্ষের বৃহত্তর সহরগুলিতে Municipal School of Arts and Crafts খোলা হৌক। জয়পুরে কতকটা সেরূপ ভাবে কার্য্য করা হয়। তার ফলে জয়পুরে শিল্পের এত উন্নতি। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আয় অল্প নহে। ইহার চতুর্থাংশ আয় হইলে আমেরিকার পল্লীগ্রামে এবম্বিধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইত। সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও চিত্রকলাতে জগতের মাঝে বাঙালীর উচ্চ আসন আছে। কিন্তু Molesworthএ বাঙ্গালী ইঞ্জিনীয়ারের উদ্ভাবিত একটি formula পর্য্যন্ত নাই, আবিষ্কারের কথা দূরে থাকুক। নিতান্ত গতানুগতিক ভাবেই আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাই; এতটুকু পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারি না। শ্রীশবাবু আমাদের জাতিকে, আমাদের অত্যাচার-প্রপীড়িত দেশকে জাগরিত, উত্তোলিত এবং "হুজুগ" ছাড়িয়া কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে চাহেন।

মহামতি হ্যাভেল প্রমুখ সুধিমণ্ডলী ভারতের স্থাপত্যের উদ্ধার-কল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কৃতকার্য্য হয়েন নাই। "রাতারাতি" ফললাভ না হইলেও, হ্যাভেল যে ঢেউ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, মৃতপ্রায় ভারতবর্ষকে তাহা কালক্রমে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। এরূপ কার্য্যের ফল এক দিনে পাওয়া যায় না। বৃহৎ কার্য্য করিতে হইলে বৃহৎ অনুষ্ঠান করিতে হয়—এবং তাহা সিদ্ধ হইতে সময় লাগে। সমালোচকের বিদ্রূপ মত "কল্পতরু"ই হইতে হইবে। তবে কর্পোরেশন তাঁহার ব্যবস্থামত কার্য্য করিতে সাহসী অথবা সমর্থ হইবেন কি না, সে কথা স্বতন্ত্র।

এ বিষয়ে প্রথমেই একটি কমিটি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব শ্রীশচন্দ্র করিয়াছেন। কমিটি শ্রীশবাবুর প্রস্তাবগুলির মধ্যে যে কয়টী যুক্তিযুক্ত বোধ করিবেন গ্রহণ করিবেন, নতুবা অন্য উপায় উদ্ভাবন করিবেন। মোটের উপর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা চলে না। আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা করিবেন তাঁহারা। একখানি ঘর এবং জন কয়েক কর্ম্মচারী লইয়াই

কার্য্য আরম্ভ করা যায়। ঐ নূতন স্থপতি বিভাগকে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য নূতন আইন প্রবর্ত্তন করা হৌক। আইন নাই ; আইন হইতে কতক্ষণ। বিভাগটী বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টের অধীনে তাহার শাখা বলিয়া পরিগণিত হৌক। তাহার ব্যয়ভার সাধারণ বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টকে বহন করিতে হইবে। তজ্জন্য সহরবাসীদের উপরে স্বতন্ত্র কর স্থাপন করিবার হয় ত প্রয়োজন হইবে না। আবশ্যক হইলে বিধিমত উপায়েও কর সংগ্রহ করা যায়। সে সম্বন্ধে শ্রীশ বাবু উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন। সহরবাসীর গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যের "ঠিকা" লইলে মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ লাভ হইবে। তাহা হইতে, ক্রমশঃ অন্য প্রস্তাবগুলির মত কার্য্য করা সাধ্যায়ত্ত হইবে। কেবলমাত্র হিন্দুর স্থাপত্যের পরিপুষ্টির জন্য এই স্থাপত্য বিভাগ সৃষ্ট হইবে না। মুসলমান স্থাপত্যেরও ইহাতে সমান অধিকার থাকিবে।

করদাতৃগণ "মিউনিসিপ্যালিটিকে ব্যবসায়ের আড্ডা করিতে দিলে" তাঁহারা নিজেরাই লাভবান হইবেন। তাঁহাদের অর্থ ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিবে। জেমসেদপুরে টাটা মদের দোকান খুলিয়া কুলি মজুরদের বিক্রয় করিতেছেন। জেমসেদপুরের টাকা টাটারই থাকিবে ; বিদেশী তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। মিউনিসিপ্যালিটি "ঠিকা" লইলে বিদেশী ঠিকাদারেরা প্রতিযোগিতায় এরূপ সর্ব্বগ্রাসী ভাবে দাঁড়াইতে পারিবেন না। হিন্দু মুসলমানের অর্থ হিন্দু মুসলমানেরই থাকিবে। ইহাকেই বলে স্বরাজ্য। সাধারণ বাঙ্গালী "বিল্ডিং ব্যবসায়ীদের তাহাতে গলা টিপিয়া মারা" হইবে না। পৃথিবীর কুত্রাপি কোনও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সেই ব্যবসায়ে আজ পর্য্যন্ত একাধিপত্য লাভ করেন নাই ; এক্ষেত্রেও তাহা হইবে না। Ford carএর দিনে অন্য গাড়ীও বিক্রীত হইতেছে। কয়েকখানা বাড়ী ঠিকা লইতে আপত্তি কি? Sanctionএর এবং বাটী নির্ম্মাণ করিবার সময় অহরহ গাঁথুনি ভাঙ্গিবার হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে না ভাবিয়া অনেকেই মিউনিসিপ্যালিটিকে বাটী প্রস্তুত করিবার "ঠিকা" দিবেন।

ভারত স্থাপত্যের হিতৈষী বন্ধু City Architect মহাশয় উপযুক্ত সহকারীর এবং সহানুভূতির অভাবে সহরে দেশী ধরণের ইমারত প্রস্তুত করাইতে পারিতেছেন না, শ্রীশবাবুকে এ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগের কথা তিনি পত্রস্থ করিয়াছেন। তাঁহার অধীনে উক্ত রূপে নূতন বিভাগ অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহার অভিলাষ মত কার্য্য করিবার সুবিধা হইবে। শ্রীশ বাবু কুত্রাপি এ কথা বলেন নাই যে, মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান ইঞ্জিনীয়রদের পদচ্যুত করিয়া বড়োদা জয়পুর হইতে লোক আনয়ন করিতে হইবে। তিনি বলেন—উক্ত ইঞ্জিনীয়র মহাশয়েরা মিউনিসিপ্যালিটির স্থাপত্য বিদ্যালয় হইতে ভারত-স্থাপত্য শিক্ষা লাভ করুন—সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বৃদ্ধ ইংরাজ সেনাপতি ভারতবর্ষে আসিয়া যেমন হিন্দুস্থানী পরীক্ষা পাশ করেন। এরূপ উদ্যম আছে বলিয়াই ইংরাজ আজ ভুবনবিজয়ী। আমরা শুধু পরচর্চ্চা করিতেই জানি। আর সৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য দল পাকাইতে পারি। শ্রীশ বাবু বলেন, বর্ত্তমান ইঞ্জিনীয়র মহাশয়েরা মনোমোহন বাবুর মত, কলিকাতায় থাকিয়াই দেশী ভাবের বাটী নির্ম্মাণ করিতে শিখুন—অক্লেশে তাহা পারিবেন—এবং, তাঁহাদের সম্মুখে আদর্শ গঠন করিবার জন্য জয়পুর বড়োদা হইতে প্রয়োজন মত ইঞ্জিনীয়র এবং আর্কিটেক্ট আনাইয়া Chief Architectএর অধীনে, প্রস্তাবিত বিভাগে কার্য্য করানো হৌক। একই ইঞ্জিনীয়র হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য অনুযায়ী বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। কয়েক বৎসর পরে, স্থানীয় লোকেরা যখন পাকা হইবেন, তখন বড়োদা রাজপুতানা হইতে ইঞ্জিনীয়র আনাইতে হইবে না। তিনি যখন বড়োদায় গিয়াছিলেন, তখন কলাভবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন বাঙ্গালী যুবক তাঁহার কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার ছেলে হইয়া কলিকাতায় তিনি চাকরী পাইলেন না। শ্রীশবাবু বলিয়াছেন যে জয়পুর বড়োদা বোম্বাইএর শিল্প-বিদ্যালয়ের পাশ-করা বাঙ্গালী ছাত্রদের কলিকাতায় পবলিক ওয়ার্কস বিভাগে এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরী দেওয়া হৌক।

বাংলার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া দেশীয় স্থাপত্য বিধান করিবার সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বলি সেরূপ বাটী করা সম্ভব। যেমন রবীন্দ্রনাথের নূতন আবাস-ভবন "উত্তরায়ণ।" বাংলাদেশের অনুকূল বাটীর পরিকল্পনাও শ্রীশবাবু করিয়াছেন। এই স্থলে বলা আবশ্যক, চসমাধারী বাঙ্গালী মসীজীবী এবং উদয়পুরের উগ্রক্ষত্রিয়ের আকারে-প্রকারে যেরূপ পার্থক্য আছে, উভয় দেশের স্থাপত্য-শিল্পে সেরূপ অধিক প্রভেদ থাকিবে না বাংলার প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পের প্রভাব উত্তর-ভারত এবং রাজপুতানায় বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে পরে আলোচ্য। ঘোড়া হইলে চাবুকের জন্য আটকাইবে না। সারা ভারতের সঙ্গে স্থাপত্যের আদান প্রদান বাংলায় থাকিবে—কিন্তু গথিক স্থাপত্যের সঙ্গে নহে অগ্রে আমরা নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করি—বিদেশের সঙ্গে আদান প্রদান পরে হইবে।

দেশী ভাবের গৃহ নির্ম্মাণের খরচ সম্বন্ধে করপোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়র এবং পবলিক ওয়ার্কসের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র মহাশয়েরা অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমারও বিশ্বাস, অতিরিক্ত ব্যয় হইবে না। বৌবাজার ষ্ট্রীটের "গিনি হাউস" এবং মাড়বারী মহাশয়দের বাটী নির্ম্মাণ করিতে যে পরিমাণে খরচ হইয়াছে, তদপেক্ষা কম খরচে দেশী ভাবের অতি প্রিয়দর্শন অট্টালিকা হইতে পারিত। দশ হাজার টাকাতেও দেশী এবং সুদৃশ্য বাটী করানো যায়। শ্রীশ বাবু এ কার্য্যে অভিজ্ঞ। এবং তিনি এরূপ ভাবের বাটী কলিকাতায় ও মফস্বলে নির্ম্মাণ করাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার মতের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন "ভারতীয় স্থপতির কতকগুলি অঙ্গ বিশেষের আয়তন এরূপ যে তাহা বসাইতে গেলে হয় রাজপথ হইতে অনেকখানি জমি ছাড়িতে হইবে, নতুবা মিউনিসিপ্যালিটিকে জমি দখলের বাবদে অনেক 'ফি' দিতে হইবে।" কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। রাজপথ হইতে অনেকখানি জমি ছাড়িতে হইবে কেন? সমালোচক মহাশয় গত ভাদ্রের "ভারতবর্ষে" স্থাপত্য-শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধে শ্রীশ বাবুর

রচিত আট লক্ষ টাকার ইমারত দেখুন- রাস্তা হইতে এক ইঞ্চি জমী ছাড়িতে হয় নাই। যদিই বা ছাড়িতে হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? ইংরাজী ধরণের বাটীতে কি জমী ছাড়া হয় নাই? Writers' Building এবং Govt. Science Collegeএ কি প্রচুর জমী রাজপথ হইতে ছাড়া হয় নাই? আর দেশী বাড়ীর ঝরোকা ও কার্নিস করপোরেশনের জমীর উপর ঝুলিয়া থাকিবে বলিয়া সমালোচক মহাশয় "ফির" ভয়ে ভীত হইয়াছেন। কিন্তু সেণ্ট্রাল য়্যাভিনিউএর শত সহস্র বারাণ্ডাগুলি কি করপোরেশনের জমী দখল করে নাই? করপোরেশন দেশী ধরণের বাটীর পক্ষে উক্ত "ফি" ছাড়িয়া দিতে পারেন। তদ্দ্বারা বাটীওয়ালা দেশী ধরণের বাটী নির্ম্মাণ করাইতে প্রলুব্ধ হইবেন।

Bombay Architectural Associationএর রিপোর্টে আছে, বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্ট এবং পোর্ট ট্রষ্ট দেশী ধরণের বাটী নির্ম্মাণে উৎসাহিত করিবার জন্য "ছাড়-ছোড়" মঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ভারতের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিরাও তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র যে নক্সাগুলি ছাপাইয়াছেন, তাহাদের বাতায়ন ও দ্বারগুলি বিচিত্র আকারের। বাটীর মধ্যে প্রচুর আলোক, বাতাস এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা আছে। গবাক্ষও দিতে হইবে—দেশী ছাপ আনয়নের জন্য। তাহার আলোচনা করিবার স্থানের অভাব। তিনি বলেন নাই যে কলিকাতার সমস্ত রাস্তাগুলিই উজ্জয়িনীর গলির মত অল্প-পরিসর হৌক। কৌটিল্যের কাল হইতে সহরে গঙ্গাপথ, রাজপথ, গজপথের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত। সহরে রাজপথ এবং গলিপথ উভয়ই থাকিবে। আর সকল গলিতে মোটর চলিতে পারে না। জয়পুরের রাজপথ সেণ্ট্রাল য়্যাভিনিউ অপেক্ষা বিস্তৃত ; তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বাটীগুলি জয়পুর সহরকে ভুবন-প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বড়বাজারের গলির মধ্যে যাইলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, কিন্তু উজ্জয়িনীর বক্র সঙ্কীর্ণ পাষাণ পথে দাঁড়াইলে আত্মহারা হইতে হয়।

শ্রীশচন্দ্র হিন্দু স্থাপত্যের উপরে অযথা পক্ষপাতী নহেন। হিন্দু মুসলমানের মিলন তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন। হিন্দু মুসলমানের মিলনে ভারত স্থাপত্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। হিন্দুর গৃহে তিনি মুসলমানী গম্বুজ দিয়াছেন। খাঁটি হিন্দু ভাবের "ডিজাইন"ও করিয়াছেন। সমালোচক মহাশয় কটাক্ষপাত করিয়াছেন যে শ্রীশবাবু Saracenic আদর্শে বাটীর ডিজাইন করেন নাই। গত ২৪শে এপ্রিলের মিউনিসিপ্যাল গেজেটে তিনি শ্রীশ বাবুর পরিকল্পিত Indo-Saracenic Styleএ বৃহৎ অট্টালিকার চিত্র দেখিবেন।

নান্নুর-পথে

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কতদূর কতদূর মধুগীতি ভরপুর
পীরিতি-সায়র-তীরে মধুর নান্নুর!
প্রখর ভানুর করে রবি-তপ্ত এ প্রান্তরে
ঝঙ্কৃত কতদূরে ব্রজবেণু সুর!
ওগো, আর কতদূর!

আবরিয়া দিক-রেখা বনরাজি লীলা-লেখা
ওই কি যেতেছে দেখা প্রেম-পূত পুর!
কিশলয়ে শোভাময় দোলে তরুশিরচয়
সঙ্কেতে বুঝি বা কয়—হেথায় নান্নুর।
ওগো, আর কতদূর!

"রাখাল, জান কি তুমি চণ্ডীদাসের ভূমি
মধুপুর নান্নুর আর কতদূর?"
রাখাল কহিল হেসে "এসেছ পথের শেষে,
চণ্ডীদাসের দেশে—এই ত নান্নুর।
ওগো, আর নহে দূর॥"
'শোন ভাই, শোন ভাই— এখানে কি শোনা যায়
প্রাণগলা মনভোলা মধুঢালা সুর!'
কহিল সে 'শুনি নাই' প্রাণ করে হায় হায়
দেবীহারা বেদীকার পারা এ নান্নুর।
ওগো, এসে এতদূর!
রাখাল চলিয়া যায় এ কি সুর! ও কি গায়
'সেই কেবা শুনাইল শ্যামনাম সুর!'
কাণের ভিতর দিয়া পশিয়া ভরিছে হিয়া
গীতিহারা নয় এ যে গীতিভরা পুর॥
ওগো এসেছি নান্নুর—
ওই—ওই সেই সুর॥

ভূমিকম্প

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

১

[যুবক জমিদার শেখরের নববিবাহিতা স্ত্রী বিমলা। প্রকাণ্ড বাড়ী,—দাস-দাসী, আসবাব-সরঞ্জামের অভাব নাই। কিন্তু অভাব হৃদয়ের দান-প্রতিদানের। এত বড় বাড়ী, এই বিলাস-আয়োজন, বিমলার কাছে যেন মস্ত উপহাস বলিয়া মনে হয়। শেখর তাহার অসীম প্রেমের প্রতিদান না পাইয়া ক্ষুণ্ণ, কিন্তু ধীর, সহিষ্ণু চিত্তে সে অপেক্ষা করিয়া আছে।

দ্বিতলের বারান্দার রেলিংএর ওপর হেলান দিয়া বিমলা দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে আকাশে নবীন মেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার আর্দ্র শীতল বায়ু আসিয়া বিমলার দেহে লাগিতেছিল, কিন্তু মনকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না। পাশে দাঁড়ের উপর ময়না শেখরের স্নেহের ডাক 'বিমলা' নাম বারম্বার আওড়াইয়া বিমলার বিরক্তির উদ্রেক করিতেছিল।]

বিমলা। (সক্রোধে পাখার ডাকের পুনরাবৃত্তি করিয়া) বিমলা— বিমলা—বিমলা! পোড়া পাখীর আর অন্য ডাক নেই! একটা ঠাকুর-দেবতার নামও যদি বলতে পারত! ও-ডাক আমার কাণে কঠিন বিদ্রূপের মত লাগে! (উচ্চৈঃস্বরে) ঝি—ও ঝি!

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। কি মা?

বিমলা। শুনতে পাচ্ছিস না—পাখীটা চীৎকার ক'রে মরছে? ও আমার নাম ডাকে কেন? কে আমি

ঝি। তুমি যে বাড়ীর কর্ত্রী মা, তাই ও তোমার নাম ডাকতে শিখেছে।

বিমলা। কর্ত্রী না ছাই! ও-যেন আমার নাম এমন করে একশ' বার ডাকে না।

ঝি। ও কি আমার মানা শুনবে মা? ও ত মানুষ নয়, ও যে পাখী। ও যে নিজের মনেই গাবে,—মানুষ ওকে শাসন করবে কি করে?

বি। শাসন করতে না পারিস ওকে বিদেয় করে দে! চাইনে আমার এমন পাখী!

ঝি। বিদেয় কেমন ক'রে করব মা! ওর ওই ডাকের জন্যেই ত ও বাবুর সবচেয়ে আদরের পাখী; ওকে বিদেয় করতে তিনি দেবেন কেন?

বি। দেখ্ ঝি, তুই আমার মুখের ওপর অমন ক'রে জবাব করিস নে বলছি। বিদেয় ওকে কর্‌তেই হবে। ও যদি বিদেয় না হয়, ত' আমি এই বাড়ী থেকে বিদেয় হব। দেখি কার কদর বেশী—আমার, না ওই লক্ষ্মীছাড়া পাখীটার?

(বাহির হইতে শেখরের প্রবেশ। ঝির প্রস্থান)

শেখর। (জোর করিয়া হাসিয়া) বিমলা, রাগ করবার দরকার নেই। তুমি কি সত্যিই চাও যে ও-পাখীটা না থাকে?

বি। হাঁ আমি তাই চাই। কাণের কাছে, আমার নাম দিবারাত্র এমন করে ভেঙচান আমি শুনতে চাই নে। ওকে যদি রাখতে চাও ত' আমাকে বিদেয় কর।

শেখর। ওকে আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু তোমার চেয়ে নয়—ওর ওই স্নেহের ডাকের জন্যেই বিমলা। আসল যেখানে পাওয়া গেল না, সেখানে তার নামই যে মস্ত বড়। কিন্তু তোমার আর ওই পাখীটার যদি একসঙ্গে থাকা না সম্ভব হয়, ত' ওকেই যেতে হবে। আমিই ওকে বিদেয় করছি।

(শেখর পাখীর দাঁড় নামাইয়া পাখীকে খুলিয়া উড়াইয়া দিল। পাখী খানিকটা ঝটপট করিয়া আসিয়া শেখরের হাতের উপর বসিল।)

শেখর। (দুই চোখ আর্দ্র) তবু যেতে চায় না,—ও ত' মানুষ নয়। ওরে আমার স্নেহের পাখী, আজ আর তোর

কিছুতেই থাকা চল্‌বে না; আজ ওই মুক্ত অবাধ আকাশের মাঝখানে তোকে বিদেয় দিলাম। যদি কোন স্নেহ কোনও দিন পেয়ে থাকিস, তাকে তোর দুই পায়ে দ'লে দিয়ে উড়ে যা অবাধ নীলিমায়।

(বলিয়া দুই হাতে জোর করিয়া পাখীকে উড়াইয়া দিল। পাখী উড়িয়া গেল)

বি। ওকে তুমি উড়িয়ে দিতে পারলে ত!

শে। হাঁ পারলাম বৈ কি!

বি। তুমি ওকে ভালবাসতে

শে। বাসতাম।

বি। তবু উড়িয়ে দিলে?

শে। তবুও উড়িয়ে দিলাম বিমলা। বড় লাভের ব্যবসায় এমনি কত ছোট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। রাস্তা তৈরী করা দেখেছ বিমলা? কত ইট ভেঙ্গে, কত পাথর চুরমার করে, তাকে কত নির্ম্মম ভাবে পিটিয়ে রাস্তা তৈরী হোল, কবে কোন্ প্রার্থিত জনের আসার অপেক্ষায়—

বি। তোমার চোখে ও কিসের তীব্র আলো?

শে। দেখতে পেয়েছ? বোধ হয় মনের আগুনের একটা রেখা-মাত্র।

বি। ওকে দেখে আমার ভয় কচ্ছে যে!

শে। (হাসিয়া) ভয় নেই বিমলা, চোখের জলে অমন আলো কতবার নিভে গিয়েছে!

বি। তুমি কি সব কথা বলছ, আমার বড় ভয় হচ্ছে। তুমি আমাকেও ঐ পাখীর মত মুক্তি দাও—দিন-কতকের মতও। তোমার পায়ে পড়ি।

শে। দোবো।

বি। কবে?

শে। কালই; তোমার দাদাকে তার করে দিই গে—তিনি কালই এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন।

বি। তাই ভাল, তাই ভাল।

(শেখরের প্রস্থান)

২

(বাহিরের ঘর। শেখর তাহার শ্যালক অমূল্যকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় বন্ধু অমর আসিল।)

শেখর। বোস ভাই।

অমর। (বসিয়া) তোমার মুখটা বড় গম্ভীর!

শেখর। গম্ভীর না কি? তাই যদি হ'য়ে থাকে ত ওর অপরাধ বড় নেই। জীবনে হাসবার সুযোগ পাওয়া যায় কমই।

অ। নতুন কোনও গৃহ-বিবাদ না কি?

শে নতুন নয়। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। ভাবছি, একবার পশ্চিম ঘুরে আসি। কালই বোধ হয় বেরোবো।

অ। পশ্চিম? কতদূর?

(এমন সময় চঞ্চল-চিত্তে বিমলা পর্দ্দার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।)

শেখর। ঠিক নেই। কাশী, এলাহাবাদ, দিল্লী, আগ্রা,—ইচ্ছা হয় ত' আরও। এমন কি উত্তর দক্ষিণও হয়ত' বাদ না যেতে পারে।

অ। ফিরবে কবে?

শে। ঠিক নেই।

অ। তোমার স্ত্রী?

শে। তিনি কাল বাপের বাড়ী যাচ্ছেন।

অ। (সহসা গম্ভীর হইয়া) শেখর, এ সব তুমি কচ্ছ কি?

শে। (হাসিয়া) তুমিও যে ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে উঠলে, অমর! দেশ-ভ্রমণে যাওয়াও কি একটা বড় বিচিত্র জিনিষ হোল? হাতে কাজ নেই, ঘুরেই আসি না!

অ। কিন্তু, এ ত' সখ করে যাবার মত বোধ হ'চ্ছে না।

শে। সখ ক'রেই হোক, আর প্রয়োজনেই হোক, দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য থেকে যায় একই,—সেটা হ'চ্ছে মনকে ভুলোনো। আমার এই ঘরের চেয়ে মন যদি বিদেশে ভাল থাকে, ত' বিদেশই যে তার কাছে ঘরের চেয়ে বড় হোল।

অ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমি সবই জানি শেখর, তবুও আমার মন যে দুঃখ পাচ্ছে!

শে। দেখ অমর, মানুষের প্রতি ভগবানের যত বিচিত্র দান আছে, সব চেয়ে বড় তার মন। পৃথিবীর ধূলো-মাটি—ময়লার ছাপ যদি তাতে পড়ল, তাদের মলিনতা যদি মনে সংক্রামিত হোল, তা হ'লেই যে মানুষের সব-চেয়ে বড় ক্ষতি! সে ক্ষতির পূরণ ত' আর কোন লাভের দ্বারাই হবে না। আমি সেই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চাই, তার জন্যে যা

কিছুর দরকার তা' আমাকে করতেই হবে। পরীক্ষা ভাল, কিন্তু ক্রমাগতই যদি পরীক্ষা চলতে থাকে, ত পরীক্ষার্থীর পক্ষে সে যে বিষম হ'য়ে ওঠে! মাঝে মাঝে তাকে দম না নিতে দিলে, শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দেবার লোকেরই যে অভাব হয়ে উঠবে।

অ। এ অতি করুণ।

শে। দোহাই তোমার—এর সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে, একে আরও করুণ করে তুলো না। কঠোরের চেয়ে করুণ অসহ।

অ। তা হ'লে যাওয়াই ঠিক?

শে। হাঁ ভাই, কালই।

অ। আমি আজ আসি ভাই। বাইরের ওই মেঘের মত আমারও মনটা থম্‌থমে হ'য়ে আসছে। ভাল লাগছে না কিছু।

শে। (হাসিয়া) এসো।

৩

(সেইদিন সন্ধ্যা। অমরের স্ত্রী অরুণা—বিমলার বন্ধু, অমরের নিকট সংবাদ পাইয়া বিমলার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।)

অরুণা। তুমি না কি কাল কলকাতায় যাবে বোন?

বিমলা। হাঁ।

অ। হঠাৎ?

বি। ইচ্ছে হ'ল একবার বাপ মা ভাইদের দেখে আসি।

অ। এই ত সে-দিন মোটে এসেছ বোন! এত ঘন-ঘন গেলে যে নিজের ঘরে গোলযোগ হবে!

বি। নিজের ঘর? সে কি? বাপ-মা ভাই-বোনের চেয়ে নিজের আর কে আছে?

অ। কি যে বল তার ঠিক নেই। বাপ-মা, তাঁরা দেবতা (বলিয়া অরুণা দুই হাত মাথায় ঠেকাইল), কিন্তু যে লোকটির হাতে ঈশ্বর সাক্ষী করে তাঁরা তোমাকে তুলে দিলেন, মেয়ে-মানুষের সেই যে হোল একমাত্র। সে কথা ভুলে গেলে মেয়ে-মানুষের যে বড় অনর্থ বোন।

বি। (অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া) তোমার দুই চোখ লাল কেন দিদি, মুখ শুক্‌নো।

অ। (সলজ্জে) কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি বোন, কলকাতা থেকে উনি আমার জন্যে একটা নতুন হার তৈরী ক'রে এনেছেন, সেই উপহারের আনন্দে কাল অনেক রাত কাটলো দুজনে জেগে।

বি। আশ্চর্য্য কথা। হারের উপহারের আমোদে রাত কাটলো জেগে? কই আমার ত' কত হার আছে, তার জন্যে ত' এক দিনও জাগতে হয় নি। হারের মধ্যে কি এত আমোদ পাওয়া যায়, যে আবার রাত জাগতে যাবো?

অ। সে ত' হারের আমোদ নয় বোন,—সে আনন্দ যে হারকে উপলক্ষ্য করে জেগে উঠল।

বি। সে আবার কি কথা?

অ। সে কথা যে নারী না জানে, তার লাঞ্ছনার অবধি নেই বোন। সেই আনন্দ যে নর-নারীকে আশ্রয় ক'রে রক্ত-কমলের মত ফুটে না উঠল, তাদের জীবনই যে নীরস হ'য়ে গেল। তখন তাদের আর স্থিতি রৈল না, প্রতিষ্ঠা রৈল না,—তখন তারা এই পৃথিবীতে উদ্দেশ্য-হীন গোলক ধাঁধার মত ঘুরেই মরল। সেই সোণার কমল যে মানুষের অফুরন্ত আনন্দের খনি, সেই ত' রোজকার ছোট-খাট তুচ্ছ ঘটনাকে উজ্জ্বল করে। সেই ত' রাতের পর রাত চোখ থেকে ঘুমকে তাড়ায় বোন।

বি। কি যে হেঁয়ালির ছন্দে কথা কও দিদি! এ না কি আবার সত্যি?

অ। সত্যি,—সত্যি বোন্। তোমার চেয়ে সত্যি, আমার চেয়ে সত্যি। তোমার-আমার মত কত কোটি লোক, কত লক্ষ বৎসর এলো গেল, কিন্তু এ সত্যি হ'য়ে রৈল অক্ষয়!

বি। আমি ত' কিছুই বুঝতে পারি নে!

অ। নারী-জন্ম যখন নিয়েছ, তখন এক দিন বুঝতেই হবে। আমি শুদ্ধ এই আশীর্ব্বাদটুকু করি, যেন সেই দিনটি অচিরে আসে।

বি। কেমন করে আসবে দিদি?

অ। কারুর বা আসে সহজে, আর কারুর আসে হঠাৎ এক দিনে, এক মুহূর্ত্তে, মস্ত বড় দুঃখে, মস্ত বড় পরীক্ষায় পড়ে। ভূমিকম্প দেখেছ বোন,—কেমন করে, এক মুহূর্ত্তে সে মাটির জায়গায় জল এনে দেয়, জলের জায়গায় মাটি? ঠিক তেমনি। তখন দেখবে যে পাহাড় ফেটে জল বেরিয়ে একেবারে চারি দিক ভাসিয়ে দিয়ে গেল—আর থৈ পাওয়া

যায় না। তখন দেখবে যে আনন্দে সমস্ত মনটা নিমেষে ভরে গেল, এবং আর একটি লোক দিবারাত্র তোমার মনের সঙ্গী হ'য়ে রৈল—আর (হাসিয়া) তখন এমন করে রোজ রোজ বাপের বাড়ী যেতে ইচ্ছে হবে না—বরং কেউ নিতে এলে তাকে ফিরিয়ে দেবার অছিলে খুঁজবে। আর তখন মনে পড়বে এই দিদিটিকে। (সহসা ঘড়ির দিকে চাহিয়া) যাই বোন, রাত হোল, ওঁর খাবার সময় হয়েছে।

বি। দিদি, তোমার কথাগুলো বেশ লাগছে। আর একটু বসতে পারবে না? আজকে না হয় বামুন ঠাকুরই ওঁকে খাওয়াবে!

অ। (জিভ কাটিয়া) ছি বোন, তা কি হয়। খাবার সময়টিতে আমি না থাকলে কি চলে? ভাল-মন্দ কি খাওয়াবে বামুন-ঠাকুর তার কি ঠিক আছে? আমারই বা মন মানবে কেন? আজ আসি বোন।

(প্রস্থান)

৪

(রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। শেখর বাহিরের ঘর হইতে তখনও আসে নাই। প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা সুরু হইয়াছে,—যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি, তেমনি বিদ্যুৎ। ইহারই মধ্যে বিমলা নিজের ঘরে একাকী—আজ যেন বড় অসহায় বোধ হইতেছে।)

বি। অরুণাদিদির কথা শুনে আজ মনটা কেমন করে উঠল। মিথ্যে কথা, বানানো কথা।—তাই কি? কি নিয়ে সে এমনি করে রাতের পর রাত জাগে—কেমন করে ভাল লাগে? ভালই যদি না লাগে ত' জেগে থাকে কেমন করে? একটুও বসতে পারলে না—পাছে তাঁর ভাল খাওয়া না হয়। আমার অনুরোধ পর্য্যন্ত রাখলে না। রোজ ত' খাওয়া আছেই—এক দিন একটু ভাল-মন্দয় কি এসে যেতো?

(খানিকটা চুপ্ করিয়া রহিল)

এসে-যেতো নিশ্চয়ই, তা নইলে সে কিছুতেই রইল না। এত টান? অথচ আমি কাল ওঁকে ছেড়ে স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছি—উনিও শুনলাম আগ্রা দিল্লী চলে যাবেন! আচ্ছা, আগ্রা দিল্লী—এত দূর কেন—আমার ওপর রাগ করে?

না—রাগ তিনি আমার ওপর কোনও দিন করেন না। আমি কত রাগ করি, কিন্তু তিনি কখনও একটা উঁচু কথা পর্য্যন্ত বলেন নি। এ আমাকে বলতেই হবে। অত সাধের পাখী তাঁর, তাকে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিলেন আমার জন্যে। তার পর থেকে তাঁর মনটা ভার হ'য়ে রয়েছে—এ আমিও বুঝতে পারছি। তার পর থেকে এ-দিকে আর আসেন নি। আমি যাব বলাতে তিনি একটুও বাধা দিলেন না।

(চোখের জল মুছিয়া) আচ্ছা, দিলেন না কেন? এত ভাল? তিনি যদি 'না' বলতেন, তা হ'লে কি আমি যেতে পারতাম?

না—আমি যাব না। দেশ-বিদেশ ঘুরতে গিয়ে যদি শরীর খারাপ হয়ে পড়ে? এ কথাটা আমার এতক্ষণ মনে হয়নি! তাই ত', একে দুর্ব্বল শরীর!

(আবার চোখের জল মুছিল) অরুণাদিদি, একটিবার পর্য্যন্ত খাওয়ার কাছে থাকা বাদ দিতে পারে না,—আর আমি কোনও দিনই ত' থাকি নে! চোখে এত জল আসচে কেন? এ-সব কথা আগে কোনও দিন মনে হয়নি ত'!

আজ কি আর আসবেন না? এই একলা দুয্যুগের রাত্রি—ভয় করছে যে। তিনি যদি এসে জোর করে বলেন যে, বিমলা তোমার যাওয়া হবে না—তা হ'লে? উঃ, তা হ'লে বেঁচে যাই, বেঁচে যাই।

(এমন সময় দিগন্ত আলোকিত করিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল।)

উঃ—কি আলো! ভয় করছে যে—কোনও দিন ত' এমন ভয় করে নি। পোড়া চোখে ঘুমও নেই।

পাখীটা যদি না উড়িয়ে দিতে বলতাম ত' তাঁর এত দুঃখ হোত না! আমার দোষ হ'য়েছে, অপরাধ হ'য়েছে। তুমি এসো—আমাকে বকো, বলো আমার দোষ! তবু তুমি এসো—এসো!

(এমন সময় বাহিরের ঘরে বন্দুকের শব্দ হইল।)

বিমলা। বন্দুকের আওয়াজ—বাইরের ঘরে? কি কাণ্ড হোল, কি কাণ্ড হোল! ওঃ, আমি কি করি? ওরে অভাগিনী—

(বিমলা ছুটিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিল জানালার কাছে শেখর বন্দুক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশে পাশে বন্দুকের ধোঁয়া। শেখরের মুখে কঠিন দৃঢ় সঙ্কল্প। বিমলা ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে শেখরকে জড়াইয়া ধরিল।)

শেখর (ত্রস্তে)। ছাড় ছাড়—বন্দুক গাদা আছে—নাড়িও না বিমলা—গুলি ছুটে যাবে।

বিমলা। যাক্! লাগুক আমার বুকে। বন্দুক তুমি কাকে মারলে? তোমার কিছু হয়নি?

শেখর। না বিমলা। ছাড়, এ ভয়ানক অস্ত্র।

(বিমলা আঃ বলিয়া মেজেতে গিয়া বসিল। তার চোখে ভয়-চকিত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। শেখর আকাশের দিকে বন্দুক ছুড়িয়া দিয়া, বন্দুক রাখিয়া দিল। বিমলা তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরিল)

বিমলা। এবার আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

(শেখর বিমলাকে আপনার বাহু-বন্ধনের মধ্যে লইয়া, একটা কৌচে গিয়া বসিল।)

শেখর। ভয় পেয়েছ বিমলা, কাঁপছ যে?

বিমলা। তুমি কাকে গুলি করছিলে?

শেখর। সেই পাখীটাকে।

বি। কোন্ পাখী?

শে। সেই যাকে সকালে উড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমার কথায়। সে তার স্নেহের বন্ধন ত' কাটাতে পারে নি; আশে পাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সেই তাকে, বিমলা। যে অবোধ পাখী মনে করে স্নেহই সব চেয়ে বড়, তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছিলাম—আর যেন সে স্নেহের টানে এমন করে ঘুরে না মরে।

বি। (শেখরের চোখের দিকে চাহিয়া) তোমার চোখে আবার সেই আলো, যা বিদ্যুতের চেয়ে কড়া! ওতে আমার বড় ভয় করে। ওগো—তুমি এত নিষ্ঠুর হ'লে কেন? তুমি কি জান না যে সেই পাখীর জন্যে আমারও মন সমস্ত দিন কেঁদেছে? (শেখরের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।)

(দুইজনে খানিকক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিল।)

শে। যাও—শোও গে।

বি। (শেখরকে আরও জড়াইয়া ধরিয়া) না—আমি আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

শে। কাল, বাপের বাড়ীতে?

(বিমলা কোনও উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিল।)

(শেখর বিমলার মুখ আলোতে ধরিয়া অনেকক্ষণ দেখিল। তার পর কহিল।

শে। বিমলা তোমার চোখ আজ আশ্চর্য্য শান্ত, সুন্দর; তোমার মুখ আজ অপরূপ! বিমলা!

বি। কি?

শে। এমনি তোমাকেই আমি এত দিন ধরে চেয়ে এসেছিলাম!

বি। (বুকে মুখ লুকাইয়া) আমার পাপকে ক্ষমা করে' আজকের আমাকে গ্রহণ করো, দেবতা আমার!

(এমন সময় জানালার ভিতর দিয়া ময়না উড়িয়া আসিয়া তাহাদের সংবদ্ধ হাতের উপর বসিল।)

শে। (উচ্চৈঃস্বরে) এসেছে—এসেছে বিমলা! আজ আমাদের স্নেহের পাখী, আমাদের অপরূপ আনন্দের ক্ষণে আনন্দেরই দূত হ'য়ে ফিরে এলো। আজ আমাদের মিলনকে সার্থক করলে পাখী! ওরে আমার পাখী! ভাল লাগলো না তোর নীলাকাশ, অবাধ অসীম মুক্তি! তাই আবার ফিরে এলি এই প্রেমের অগ্রদূত হ'য়ে! (বিমলার কপোলে চুম্বন করিয়া) বিমলা, আজ এই দূত যে প্রেমের অপার বারতা নিয়ে এলো, তাকে, এসো, আমরা আনন্দের সঙ্গে, সম্ভ্রমের সঙ্গে গ্রহণ করি।

(বিমলা শেখরের পায়ে গড় হইয়া প্রণাম করিল। শেখর তাহাকে আপনার আলিঙ্গন-বদ্ধ করিল।)

বিমলা। (চোখ মুছিয়া) আজই অরুণাদিদি বলছিল ভূমিকম্পর কথা—যা পাহাড় ফাটিয়ে জল বার করে! আজ হ'ল সেই ভূমিকম্প আমার জীবনে—উঃ বড় দুঃখের, কিন্তু অপরূপ—অপরূপ!

৫

(তাহার পর দিন সকালে বিমলার বড় ভাই অমূল্য আসিল। শেখরের সহিত অমূল্য বাহির বাড়ী হইতে আসিয়া ডাকিল—বিমলা, বিমলা! বিমলা হাস্যমুখে আসিয়া দাদাকে প্রণাম করিল।)

অমূল্য। হঠাৎ তোদের টেলিগ্রাম পেয়ে আমরা ত' ভেবেই অস্থির। ভাবলাম, এ আবার কি ব্যাপার। কি ভাবনাই যে হ'য়েছিল আমাদের। ভাল আছিস্ ত?

(শেখর চলিয়া গেল)

বিমলা। (সলজ্জে) আছি।

অমূল্য। তবে হঠাৎ টেলিগ্রাম করলি যে!

বিমলা। (হাসিয়া) তোমাদের সকলকে দেখবার ইচ্ছে হ'লো, তাই।

অমূল্য। বুঝেছি, ঝগড়া টগড়া হ'য়েছিল বুঝি। তুই

যেন কি! যাক্ এ-বারটা ঘুরে এসে আর এত ঘন ঘন যাবার ইচ্ছে করো না বোন। শেখরের যে অসুবিধা হয়। কোন ট্রেনে যাবি—বিকেলের ট্রেনেই যাওয়া যাক্—কি বল?

বিমলা মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অমূল্য। কি বলিস্?

বিমলা। (ধীরে ধীরে সলজ্জ ভাবে) এবার আর যাওয়ার সুবিধে হবে না দাদা।

(নেপথ্যে অরুণা শাঁক বাজাইয়া উঠিল)

অমূল্য। ও কি?

বিমলা। না, ও কিচ্ছু নয়। এবারটা থাক দাদা। শরীর টরীর সব তেমন ভাল নেই।

অমূল্য। (স্মিতমুখে) তা বেশ। এই ত' ভাল কথা। শুনে সুখী হোলাম। তুই এক কাজ কর দিকিনি; খুব ভাল করে পোলাও-টোলাও খাবার যোগাড় করগে যা,' আর আমি একটা তার করে দিই গে যে তোরা সব ভাল আছিস। কেমন?

বিমলা। (হাসিয়া) আমি চল্লুম—নিজের হাতে তোমার খাবার তৈরী করবো।

(প্রস্থান)

(শাঁক বাজাইতে বাজাইতে অরুণার প্রবেশ।)

বিমলা। তুমি যেন কি অরুণাদিদি! লজ্জা করে না?

অরুণা। লজ্জা কার কাছে করবি বোন, ও কি লুকোনো যায়? ওর আলো যে মুখে-চোখে খেলে! কি হক কথাই না বলেছিলাম! চব্বিশ-ঘণ্টা যেতে না যেতে সেই দাদাকে অছিলা ক'রে ফেরাতে হ'লো। শাঁক এখন বাজাব না ত' আর কবে বাজাবো বোন্?

কে মোরে চিনিতে পারে?

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কে মোরে চিনিতে পারে?
আজি আমি স্নিগ্ধস্রোতা
তটিনীর ক্ষীণ প্রাণধারা,
বাজাইয়া চলি একতারা
শ্যামলী পল্লীর মেয়ে
মেদুর, মৃদুল
নাচন দোদুল;
চলি গান গেয়ে;
কাল আমি প্রলয়-দুলালী
দিয়ে করতালি
মরণের প্রেমে অনুরাগী
ভৈরবী বৈরাগী
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মাতি
মরণের গান গাঁথি' গাঁথি'
সারাবেলা।
এ কী খেলা
দুর্নিবার
দুরন্ত আমার!

কে মোরে চিনিবে,
কে আমার পরিচয় দিবে
শেষ করি?
রহস্য-শর্ব্বরী
রাত্রিদিন
আদিহীন অন্তহীন
অন্ধকারে
ঢেকেছে আমারে।
কে সেথায় বাতি জ্বালাইয়া
আলোকের মূর্চ্ছনা রচিয়া
দেখাবে আপনি
চিহ্নহীন দুর্গম সরণি!
কে বোঝাবে কোথা যেতে চাই,
কোথা আছে এ পথের শেষ,
কোথা ঠাঁই
কত দূরে আছে মোর দেশ!
কাহারে শুধাই?
কারে চাই? তারে কোথা পাই?

দারুণ বিস্ময়ে
ভয়ে ভয়ে
দেখি চেয়ে,
চলিয়াছি ধেয়ে
কোটি সূর্য্য-অগ্নি-নৃত্য বেগে,
দুর্দ্ধর্ষ আবেগে
ছন্দে ছন্দে বন্ধহীন আনন্দ-পসরা
বিচ্ছুরিয়া, সঞ্জীবিয়া জরা;
ব্যঞ্জনার পিপাসায়
আমার প্রাণের দীপ কাঁপে,
নিভে যায়
ক্ষণে ক্ষণে,
সৃষ্টির দুর্ম্মদ প্রভঞ্জনে
উড়ে উড়ে চলিয়াছি আমি
দিনযামী;
এর মাঝে দুটি দণ্ড কোথা পাব
নিরালা নির্জ্জনে
নিজেরে দেখিব একমনে।

আমি শিখা উদ্দীপ্ত অগ্নির,
ঊর্দ্ধগ, অস্থির !
আমি জানি, এ রহস্য-তিমিরের মাঝে
গোপনে বিরাজে
মৌনম্লান একটি প্রদীপশিখা,
অন্ধকারে আবরিত একখানি
গোপন লিপিকা ;
কিন্তু হায়, কোথা তার লেখা
কোন্ খানে কতদূরে ?
তাই যে সুদূরে
দলে দলে নীহারিকা
আদিহীন সৃষ্টির পশ্চাতে
কাঁদে একসাথে
প্রসব-ব্যথায়,
কেহ হতে চায়
দীপ্ত সূর্য্য, কেহ চন্দ্র, কেহ তারা গ্রহ,
অহরহ
তাহাদের প্রকাশ-ক্রন্দন
অনুক্ষণ
হানে মোর মন,
ঘুচাইতে ক্রন্দসীর
রহস্য-রাত্রির
অসহ্য-বন্ধন !
আমি ভ্রূণ,
জ্বলিতেছে সৃষ্টির আগুন
প্রাণ-অন্তরালে ;
কে মোর আড়ালে
হাহাকারে
বারে বারে
রক্ত-অস্থি-শিরায়-শিরায়
তীব্র প্রত্যাশায়
ডাকিতেছে, খোল দ্বার,
খোল ওগো দ্বার,
আমারে ফুটিতে দাও,
প্রদীপ জ্বালাও !
...অন্ধকার, হায় অন্ধকার,...
কোথা দ্বার, খুঁজে নাহি পাই,
কোথা দীপ, কাহারে জ্বালাই !

কে আমার ভগবান
এমন করিয়া কাঁদে
নিষ্ঠুর আহ্লাদে
কোথা তার মিলিবে সন্ধান,
কেমনে ফুটাব তারে ?
তাই হাহাকারে
ঘুরে মরি আমি
প্রস্ফুটন-কামী
চিনিতে ও চিনাতে আমারে
দেবতারে।
তাই সারা নিশি যাপি
হই পাপী,
বুভুক্ষায় পঙ্ক করে পান
মোর ভগবান।
যারা করে অপমান
দেয় শিরে কলঙ্ককল্যাণ,
তারা ভুল করে,—
সেথায় নহে ত মোর পরিচয় ;
যে ঈশ্বরে
হানে তারা অবজ্ঞায়
আনন্দ-প্রভায়
সে ঈশ্বর রমণীয় করিয়াছে
গগন-আলয়।

তাই এই আকাশের তলে
দুই চক্ষু ভরি তুলি অশ্রুজলে,—
আমার বাহিরে যাহা আছে
তার পাছে
কত দূরে
গোপন অঙ্কুরে
আমার সত্য সে আমি
অন্তর্যামী
কোথায় করিছে ধ্যান একমনে
সঙ্গোপনে।

আমি নর
জঘন্য বর্ব্বর
হিংসায় প্রখর
লালসা-জর্জ্জর
ভয়ঙ্কর
ক্রূর বিষধর ;
এত দৃপ্ত, তবুও নশ্বর,
তাই ত' সুন্দর।
তাই,
যাহা পাই, সকলি হারাই,
ছড়াইয়া যাই
দুরন্ত সদাই ;
যাহা কিছু করেছি সঞ্চয়
তার মাঝে পাই না যে পরিচয়,
তাই করি ক্ষয়
নির্লজ্জ নিষ্ফল যাহা কিছু রয়
ভার হয়ে ;
সৃষ্টি-স্রোতস্বতী চলে বয়ে,
তাই রিক্ত সেজে
তরঙ্গে তরঙ্গে তার চলি বেজে বেজে।
মোর মাঝে কি বারতা
বহিয়া এনেছি আমি
মৃত্যু-অনুগামী—
জানি না সে কথা,
জানিতে চাহি না।
শুধু যাই বাজাইয়া জীবনের বীণা
বর্ত্তমান হতে ভবিষ্যতে,
নব পথে পথে
লক্ষ্যহারা ;
ভাঙি সব বন্ধনের কারা
তবু বন্দী অপরূপ কারাগারে
রহস্য-পাথারে।
অহরহ সুরে সুরে মত্ত হয়ে রই
নব নব কবিতায়,
আজ মোর বীণাখানি ধূলাতে লুটায়,
কাল তারে বুকে তুলে লই!

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম *

(সমালোচনা)

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

চিরদিন স্মরণের যোগ্য কোরে, সুন্দর ধরণে, সুন্দর বরণে, সুন্দর আবরণে, বন্ধুবর নরেন্দ্র দেবের এই বই বের কোরেছেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। এমন বই এর চেয়ে মনোহর কোরে আর কোনো দিন বাঙ্‌লা দেশে প্রকাশিত হোয়েছিল বোলে আমার জানা নেই।

বইটির অন্তরের সৌন্দর্য্যেও রসপিপাসু বিশেষজ্ঞরা মুগ্ধ হবেন। তার প্রধানতঃ ওমর খইয়ামের, বিদেশী ভাষায় হোয়েছিল তার প্রচার, তার থেকে বাঙ্‌লায় হোলো তার রূপান্তর ও প্রকাশ। এর আগেও রোবাইয়াতের বহু অনুবাদ হোয়েছে ; কিন্তু এক সুহৃদ্বর কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ ছাড়া আর কোনোটিই উল্লেখযোগ্য নয়।

গঠন-প্রণালীর ও ভাবের বাহনের নিরবচ্ছিন্ন সমতা শ্রবণ মনের পীড়াদায়ক হোতে পারে ; এই কারণে শ্রীনরেন্দ্র দেব বিবিধ ছন্দে তাঁর ভাষাকে গতি দিয়েছেন—এতে যে কাব্যের লীলা বিচিত্র ও বিমোহিনী হোয়েছে, তা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। এই বৈচিত্র্য অক্ষম হাতের অপটুতায় বার বার বাধা পেতো ; কিন্তু শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁর যাদু লেখনীর স্পর্শে, তাঁর ভাষার মহিমময় ঐশ্বর্য্যে, তাঁর কবিত্বের নৈপুণ্যে ওমরের রোবাইয়াৎকে একেবারে বুকের পরতে পরতেই রেখে দিয়েছেন—সাকীকে আমাদের আলিঙ্গনের মধ্যে ধ'রে দিয়েছেন।

আগেও প'ড়েছি এবং শুনেছি—এই বইয়ের ভূমিকা থেকেও জান্‌লুম—রোবাইয়াৎ না কি দর্শন-শাস্ত্রে ভরা—বেদ-উপনিষদের সঙ্গে তার অনেক মন্তব্য না কি মিলে যায়। আমি অজ্ঞতাবশতঃ দর্শন-শাস্ত্রের ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি কোর্‌তে পারি নি। তবে প্রেমের এই অমর কাব্যকে আমি ললাটে স্পর্শ কোরেছি, হৃদয়ে ধারণ কোরেছি, ওষ্ঠে চুম্বন কোরেছি।

ওমর বোল্‌ছেন, জীবন সার্থক হয় কেবল দুটিমাত্র ব্যাপারে—আনন্দ ও রস। সেই আনন্দের শ্রেষ্ঠ হোলো প্রেম—সেই রসের সার হোলো দ্রাক্ষারস। ওমর বোল্‌ছেন, বাধা মেনো না, নিষেধ মেনো না,—ভবিষ্যতের ভ্রূকুটির বিভীষিকা যারা দেখায়, তাদের কথা গ্রাহ্য কোরো না ; ভালোবাসো, সুধু ভালোবাসো। অতীতের ভাব্‌না ভেবো না, এই প্রকৃতির মাঝে থেকে তার প্রীতির ধারা থেকে বঞ্চিত হোয়ো না। কা'ল যদি চিরনিদ্রাই আসে, তখন যে সব ফুরিয়ে যাবে। তুমি রস পরিবেষণ করো, আর আমি তা উপভোগ করি—আর সব চুলোয় যাক্।

দাও পিয়ালা, প্রিয়া আমার,
পূর্ণ ক'রে এই অধরে,
যাক্ অতীতের অনুতাপ আর
ভবিষ্যতের ভাব্‌না ম'রে !
কাল কি হবে—ভাব্‌বো কেন
আজ ব'সে লো তাই,
তার আগে সই এখান থেকে
চ'লেই যদি যাই—
—বিচিত্র নয় তত !
ফুরিয়ে যাওয়া অসংখ্য দিন নিরুদ্দিষ্ট যত—
তা'র ভিতরেই কোন্ অতীতের প্রায়
মিশিয়ে যাবো হায় !
(রোবাইয়াৎ—শ্রীনরেন্দ্রদেব—২২)

কিম্বা—

দেবতা মানব নিয়ে মিছে আর হোয়োনা বিহ্বল,
তর্ক তুলে প্রতিদিন স্বর্গ মর্ত্ত্য বিচারে কি ফল ?
কালের সমস্যা যত কালে হোক্ লয়,
জীবনে যেটুক্ আজো র'য়েছে সময়,
সুরা-সংবাহিনী সখী—উচ্ছ্বসিত বক্ষতলে যা'র
যৌবনের যুগল আধার,
বেড়ি তার ক্ষীণ কটি চপল ভঙ্গীতে
ডুবে যাও মিলন-সঙ্গীতে। (রোবাইয়াৎ—ঐ-৯৪)

রোবাইয়াতের আগাগোড়া বল্‌বার কথাই এই :—যে প্রেমিক সে দুনিয়াকে অগ্রাহ্য ক'রে, দেশকাল তুচ্ছ ক'রে, কালের লিখন অবজ্ঞা ক'রে কেবলই ভালোবাস্‌বে, কেবলই রসধারায় তৃষ্ণা দূর কোর্‌বে, অরসিকের অবহেলাকে অবজ্ঞা ক'রে নিভৃতে কাল যাপন কোর্‌বে শুধু প্রাণধারণের সামান্য উপকরণ সঞ্চয় কোরে, কাব্যের আমোদে, তার রস-সংবাহিনী সখীকে সাম্‌নে নিয়ে, তার পরিবেষণ করা সুধায় ওষ্ঠ আর্দ্র কোরে—প্রেমিকের পরম তৃপ্তির এই চরম আকাঙ্ক্ষা ; সে আর কিছু চায় না, আর কাউকে চায় না।

* শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; মূল্য চার টাকা।

এইখানে এই তরুতলে,
তোমায় আমায় কুতুহলে
এ জীবনের যে-কটা দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে,
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র,
অল্প কিছু আহার মাত্র,
আর একখানি ছন্দ-মধুর কাব্য হাতে নিয়ে ;
থাক্‌বে তুমি আমার পাশে,
গাইবে সখী প্রেমোচ্ছ্বাসে,
মরুর মাঝে স্বপ্ন-স্বরগ ক'র্‌বে বিরচন,
গহন কানন হবে লো সই নন্দনেরই বন !

(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্রদেব—১০)

Fitzgeraldএর ছিল শুধু "a Book of Verse" (একখানি কাব্য)। যথার্থ রস-নিপুণ কবি, 'ছন্দ-মধুর' বিশেষণটি সংযুক্ত কোরে ওস্তাদ ভাবুকের বাহাদুরী দেখিয়েছেন। যেখানে দ্রাক্ষাসব, সাকীর স্তব, প্রেমের বৈভব, সেখানে এমন কবিতা, যার শ্রবণে বা পাঠে অমৃত বর্ষণ না হয়, যার ছন্দোভঙ্গ হোয়েছে, চোল্‌বে না—একেবারেই চোল্‌বে না—তাতে সমস্ত ললিত আবহাওয়ার যাদুটুকু নষ্ট হোয়ে যাবে - সেখানে শুধু একখানি কাব্য, তা সে যেমনই হোক্ কোনোমতেই প্রবেশ কোর্‌তে পাবে না, সেখানে যে কাব্যের ধ্বনিতে অন্তর সাড়া দেবে তা হওয়া চাই 'ছন্দ মধুর' ; সুন্দর সংযোগ !

বহু স্থানেই এই রকম মনোজ্ঞ সমাবেশ আছে। অনুবাদ যে কত চমৎকার হোয়েছে তা Fitzgerald এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লেই বোঝা যাবে। কিন্তু অনুবাদ ইংরাজীর অনুরূপ হোয়েছে বোলে এ জিনিষকে আমি খাটো কোর্‌তে চাই না। বাংলার নমনীয় ম-লীল ভাষার গুণে, শ্রীনরেন্দ্র দেবের সেই ভাষার নিপুণ বিন্যাস ও প্রশংসনীয় অধিকারের ফলে, এই বাঙ্‌লায় রূপান্তরিত রোবাইয়াৎ প্রভান্বিত হোয়েছে। ইংরাজী ও বাঙ্‌লা পদগুলি তুলনা কোরে যিনি দেখ্‌বেন, তিনিই এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন :—

'Tis all a Chequer-board of Nights and Days
Where Destiny with Men for Pieces plays ;
Hither and thither moves, and mates, and slays,
And one by one back in the Closet lays.

(Fitzgerald Quartrain 24—XLIX)
(First Edition)

রাত্রি আর দিনে আঁকা দু'রঙের সাদা-কালো ছকে
সৃষ্টির আনন্দ-ভরা অফুরান প্রাণের পুলকে
নিয়তির চলে পাশা খেলা—
ঘুঁটির বদলে নিয়ে অগণিত মানুষের মেলা !
এ-ঘরে ও-ঘরে ক'রে ঘোরে ঘুঁটি ছকে আঁকা ফাঁদে ;
কখনও বা চিকে এসে হেসে জোড় বাঁধে,
কেউ মরে, মারে কেউ দানে-দানে আড়ি,
খেলা-শেষে একে-একে ফিরে আসে বাড়ী !

(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্র দেব-৫১)

কিম্বা—

And that inverted Bowl we call the Sky,
Whereunder crawling Coop't we live and die,
Lift not thy hands to It for help—for It
Rolls impotently on as Thou or I.

(Ibid—LII)

উপুড়-করা পাত্রটা ওই,
আকাশ মোরা ব'ল্‌ছি যা'কে,
যার নীচেতেই কুঁক্‌ড়ে বেঁচে
আঁক্‌ড়ে ধরি মরণটাকে,
হাত পেতে কেউ ওর কাছেতে
হোয়ো না আর মিথ্যে হীন,
তোমার আমার মতই ওটা
অক্ষমতায় পঙ্গু দীন !

(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্র দেব-৫৫)

সমস্ত বইখানিতেই এই রকম—যে গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের সমবেত চেষ্টায় ওমরের এই অপূর্ব্ব সুন্দর সংস্করণ বাঙ্‌লায় বেরুলো, তারা বাণী-অনুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র।

এই চিরন্তন প্রেমের কাব্যখানিকে প্রেমিক কবির মোহিনী লেখনী সত্যই প্রাণারাম কোরেছে। তত্ত্ব বা দর্শন বোঝ্‌বার মত মস্তিষ্ক আমার নেই। আমি জানি—প্রেমিকার প্রেমাধারের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষাই হোলো দ্রাক্ষা, অধর হোলো তার পান-পাত্র, চুম্বন হোলো দ্রাক্ষারস। যুগে যুগে সৃজনের আরম্ভ থেকে প্রেমিক তার প্রিয়তমার কাছ থেকে এই রসই যাচ্‌ঞা কোরে এসেছে। সে সর্ব্বত্যাগী—কেবল ওই তার সাধনা। ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য তার কাছে ছার, রাজা বাদ্‌শা তার গণনার মধ্যেই নয়। সে তাই বোল্‌ছে—

হ'তেম যদি বাদ্‌শা আমি,
এর চেয়ে কি সুখের হ'তো !
তোমার রূপের এই যে আলো
চাঁদের চেয়ে উজল কতো !
এই যে আদর, এই যে সোহাগ,
অযাচিত পাচ্ছি তোমার,
অমর করা এই যে চুমা
তুলনা এর কোথায় আর ?

(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্র দেব—২৩৪)

এর ভিতর দর্শনশাস্ত্র থাকে তো থাক্—কিন্তু প্রেমের বন্যায় সে ভেসেই যাবে।

ওমর পরকাল মান্‌তেন না ; কিন্তু তাঁর মনে নিশ্চয়ই সাকীকে মৃত্যুহীন কর্‌বার দুর্ব্বার আগ্রহ ছিল। একজন ইংরাজ কবি বোলেছেন যে, তিনি তাঁর প্রণয়িনীর নাম সাগর-পুলিনে লিখেছিলেন ; কিন্তু তরঙ্গস্পর্শে তা তখনি মুছে যায় ; দ্বিতীয় বারের লিখনেরও ঐ দশা হয়। কবি বোলেছেন—তাঁকে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ স্পর্দ্ধা কোরে বোল্‌লে 'মত্ত মানব ! নশ্বরকে অমর করার চেষ্টা বৃথা'। কবি তখন তাঁর প্রণয়িনীকে উদ্দেশ কোরে বোল্‌লেন "যা কিছু নগণ্য তুচ্ছ, তা ধূলিলীন হোক্, কিন্তু তোমার যশোভাতি তোমায় চিরন্তন কোর্‌বে, আমি তোমার নামে এমন কাব্য লিখ্‌বো যা তোমার গুণকে অমরত্ব দেবে, আর দ্যুলোকে তোমার মহিমময় নাম চিরাঙ্কিত রাখ্‌বে—যেখানে, মৃত্যু সমস্ত জগৎকে জয় কোর্‌লেও আমাদের প্রেম থাক্‌বে, আবার সঞ্জীবিত হবে :—

* * "Let baser things devise
To die in dust, but you shall live by fame :
My verse your virtues rare shall eternize,
And in the heavens write your glorious name,
Where, when as Death shall all the world subdue
Our love shall live, and later life renew."

পরকাল না মান্‌লেও, কে বোল্‌তে পারে ওমরের মনে এমন কোনো কল্পনা জাগে নি যে, আর সব ধ্বংস হোলেও, তাঁর সাকীর যেন ক্ষয় না হয় ! তাঁর যে এই অরসিক অপ্রেমিক, বিধি-নিষেধ-পীড়িত এই জগতের পরিবর্ত্তে নূতন জগৎ গড়বার ইচ্ছা প্রাণে ছিল :—

তুমি আমি প্রিয়তমে,
নিয়তির সাথে
ষড় করি' যদি আজ
মিলি হাতে-হাতে,
পারিতাম ধরিবারে
সৃজনের ভুল,
উৎপাটন করি' এই
বিশ্বেরে সমূল,
চূর্ণ করি ফেলি' তা'রে
ধূলি-কণাবৎ
গড়িতাম মনোমত
নূতন জগৎ !

(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্র দেব—৭৫)

এই সাকীর গান শ্রীনরেন্দ্র দেব যে বাঙলায় গেয়েছেন, এ যোগ্যই হোয়েছে। কেন না যে কবি, সেই কেবল নারীর হৃদয়-ব্যাপারের প্রকাশ-কুশলী। আমিও ইংরাজ কবির সঙ্গে বলি—যে এত দিন ধ'রে কবি-প্রাণ আন্দোলিত কোরেছে, তার উদ্দেশে মরমের পানপাত্র পূর্ণ কর !—

Drink to her who long
Hath waked the poet's sigh,
The girl who gave to song
What gold could never buy.
Oh ! woman's heart was made
For minstrel hands alone ;
By other fingers played
It yields not half the tone.
Then here's to her who long
Hath waked the poet's sigh,
The girl who gave to song
What gold could never buy.

শ্রীনরেন্দ্র দেবের লেখনী জয়যুক্ত হোক, জগতের শ্রেষ্ঠ কবির নাম বুকে ধ'রে তাঁর যে কাব্য আমাদের হৃদয় হরণ কোরেছে, তা বাঙলা ভাষাও ও বাঙালীর সম্পদ বোলে যেন আমরা স্বীকার কোর্‌তে না ভুলি।

কবির সুরে সুর মিলিয়ে যাকে ভালোবাসি, তাকে বোল্‌তে ইচ্ছে কোর্‌ছে —

মত্ত পরাণ মিলন যাচে,
স্বর্গ নরক পায়ের কাছে
তুচ্ছ হয়ে লুটায় যে তার রাণী !

(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্র দেব—২৮২)

জার্ম্মাণী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জাতিগত সমাজগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বিবিধ বৈচিত্র্য যেমন জার্ম্মাণীতে দেখতে পাওয়া যায়, এমনটি আর কোথাও নেই। জার্ম্মাণীর অধিবাসীদের সম্বন্ধে জানতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ জাতটা নানা জাতের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে ; এবং যে সকল জাতি আজ একত্র মিলিত হ'য়ে জার্ম্মাণ জাতি বলে জগতে পরিচিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ইতিহাস, কুলকাহিনী, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ভাষা ও শিক্ষা বিদ্যমান ছিল এবং

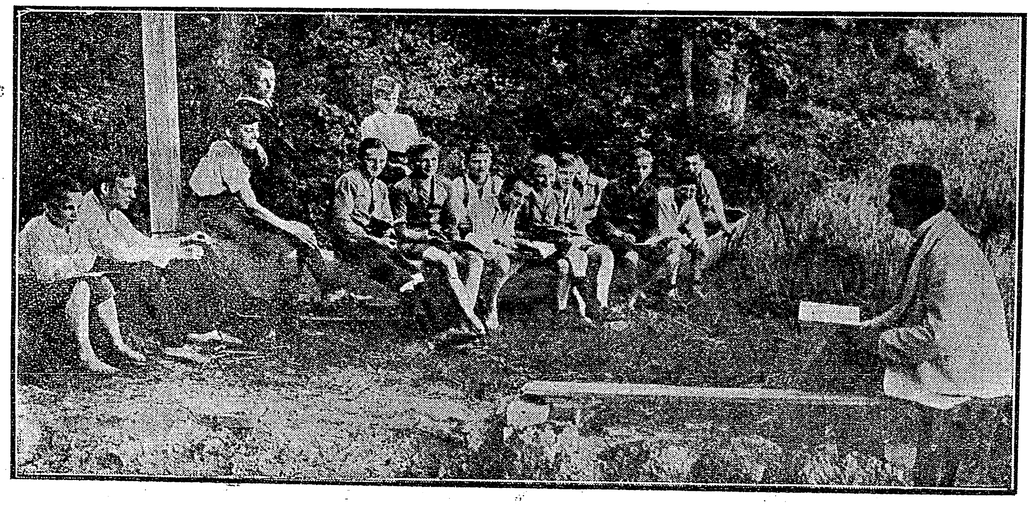

প্রকৃত শিক্ষা। (প্রকৃতির সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষালাভ হবে বলে জার্ম্মাণরা নদীতীরে অরণ্যের মধ্যে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।)

এখনও আছে। সুতরাং সংক্ষেপে জার্ম্মাণীর বর্ণনা ক'রতে হলে তাদের সম্বন্ধে কেবল সেই কথাটুকুই বলা চলতে পারে যেটা তাদের এই সম্মিলিত মহাজাতির জীবন ও চরিত্রের এবং বিশেষ ক'রে কেবল রাষ্ট্র সম্পর্কীয় ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। জার্ম্মাণ মহাজাতির স্তম্ভ-স্বরূপ যে-কটি খণ্ড জাতি তাদেরই বিভাগ বিষয়ে একটু বিশদ ভাবে বলা বিধেয়।

ভৌগোলিক সংগঠনের দিক দিয়ে জার্ম্মাণীকে প্রথমতঃ দুইটি বৃহৎ বিভাগের মধ্যে ফেলতে পারা যায়। উত্তর জার্ম্মাণী ও দক্ষিণ জার্ম্মাণী। উত্তর জার্ম্মাণী সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সমতল ভূমি ; কিন্তু দক্ষিণ জার্ম্মাণী ঠিক পার্ব্বত্য প্রদেশ না হ'লেও অসমতল উচ্চ ভূমি, পশ্চিমে আর্ডেনেস্ ও ভোস্‌জেস্ পর্ব্বত শ্রেণী থেকে সুরু করে সমস্ত জার্ম্মাণ ভূখণ্ড অতিক্রম করে একেবারে পূর্ব্বে বহিমীয়া ও আষ্ট্রিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। জার্ম্মাণীর উচ্চভূমি আরম্ভ হ'য়েছে রাইন্‌ল্যাণ্ডের শ্লেট পর্ব্বত-মালা থেকে ওয়েষ্টারওয়াল্ড্, হেনস্‌রূক্, তাওনুস্, থুরিঙ্গীবন, হার্‌জ্ পর্ব্বত, আর্‌জ্‌গেবার্‌জ্ বা স্যাক্সনী ও বহিমীয়ার মধ্যবর্ত্তী ওরপাহাড়, রীশেনগেবার্‌জ্ বা জায়েণ্ট পাহাড় যেটি প্রাশীয়ান সাইলেশীয়ার মধ্যে অবস্থিত এবং তৎসংলগ্ন উচ্চ উপত্যকা ভূমি যার দু'দিকে ওডেন্‌ওয়াল্ড্ ব্ল্যাক্ ফরেষ্ট্ বা কৃষ্ণবন এবং বাভেরীয় ও আষ্ট্রীয় আল্পস পর্ব্বতের অপরাংশ। কিন্তু জার্ম্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত-চূড়া 'স্নীকোপে' যেটি জায়েণ্ট্ পর্ব্বতমালার একটি অংশ তার

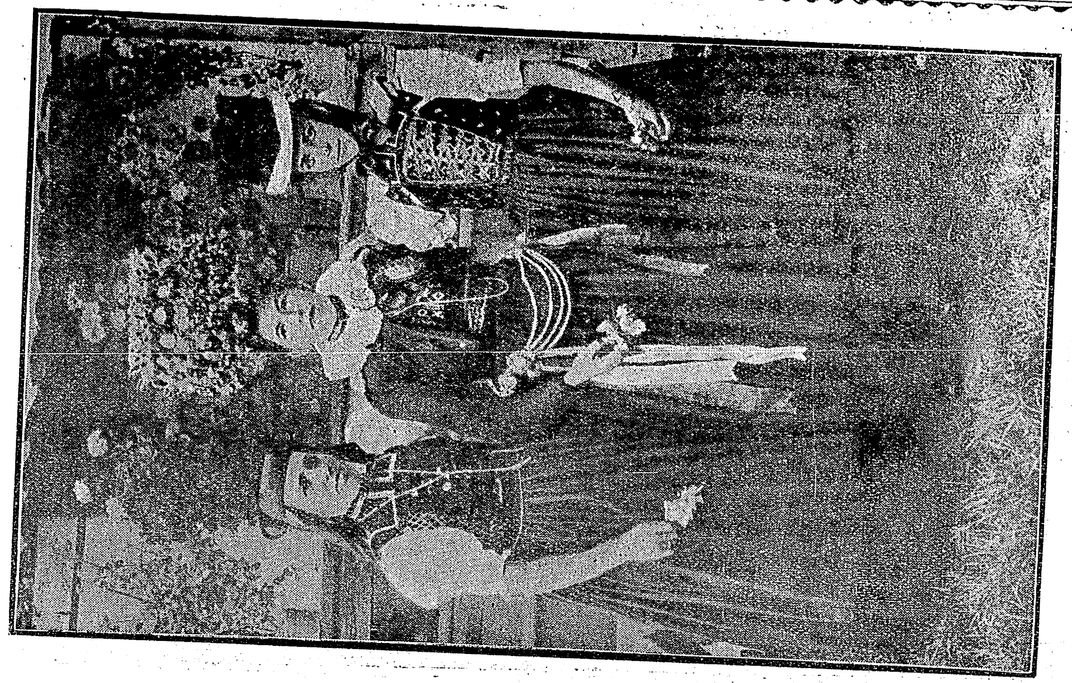

জর্জ্জিয়ান ক'নে।

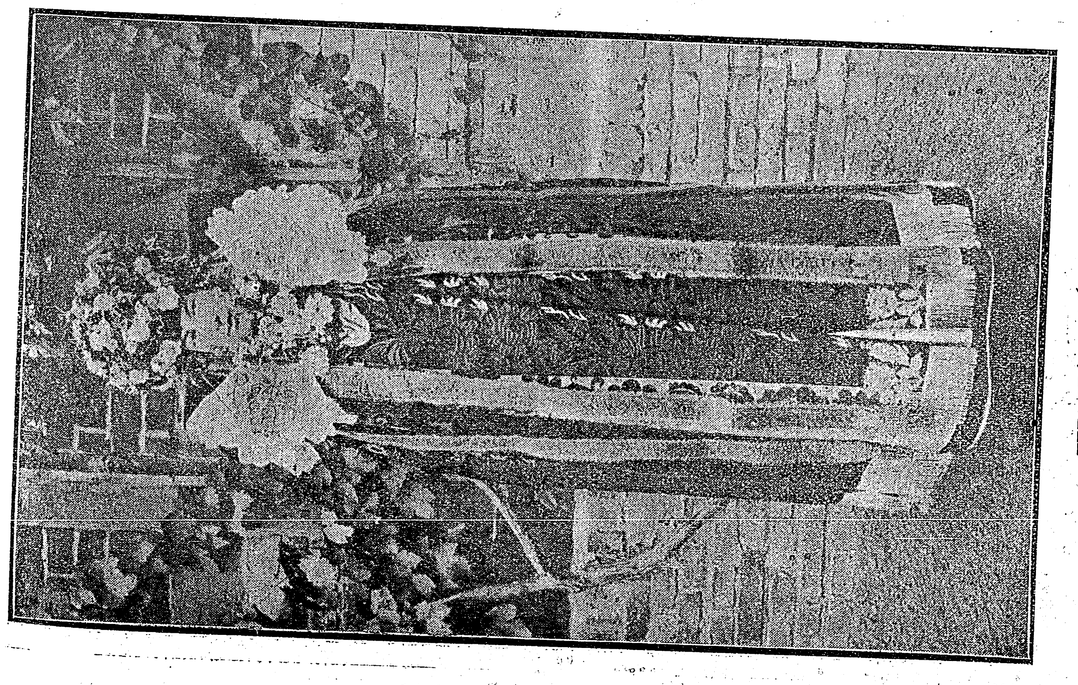

কুসুম সাজে 'বরকেবার্গের' বধূ

ওয়ার্মসের শিল্পীরা দলবদ্ধ বাজার। (ওয়ার্ম জার্মাণীর একটি প্রাচীন নগর। এই ওয়ার্মসের
[illegible])

ওয়াট্‌গার্টের গ্রাম্য জার্মাণ পরিবার। (রবিবার ছুটির দিনে শিল্পীর
পোষাকে সকলে সুসজ্জিত হয়েছে।)

বিবাহের প্রীতি উপহার (কন্যার পিতা মেয়েকে একটি ভাল গরু দিয়েছেন।)

ব্লাইনের নগর। (ধূমপান করতে বিজ্ঞাপন পড়ছে)

উচ্চতা মাত্র ৫২৬০ ফিট্! এই পার্ব্বত্য ভূভাগের প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে একাধিক বিস্তৃত অরণ্যানী।

জার্ম্মাণীর উত্তর বিভাগের সমতল প্রদেশের বিশেষত্ব হচ্ছে, অসংখ্য হ্রদ-তড়াগ-বিশিষ্ট ভূখণ্ড। এই অংশেই হলষ্টাইন, মেক্‌লেন্‌বার্গ, পমীরেণীয়া ও পূর্ব্ব প্রাশীয়া। এ অঞ্চলের অধিকাংশ প্রদেশ যেমন কৃষিপ্রধান, তেমনি অকর্ষিত ভূমিও পড়ে রয়েছে অনেক। এই অঞ্চলেই মূরেদের বাসভূমি; বালুকাময় সমতল-ক্ষেত্র এবং অফুরন্ত অরণ্য-সম্পদ—ঠিক যেমন দক্ষিণেও আছে!

বহন করবার মত অবস্থায় আপনাকে প্রসারিত করে দিয়েছে আষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও রুমেনীয়ায়! উত্তর প্রদেশের হ্রদগুলির পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়েছি। দক্ষিণে কন্সটান্স্ হ্রদ। এই বৃহৎ হ্রদটিতে জার্ম্মাণীর আংশিক অধিকার আছে,—সম্পূর্ণ মালিকান স্বত্ব আর নেই। বাভেরীয়ার একাধিক রমণীয় হ্রদ—আশী বর্গ মাইল পর্য্যন্ত আকার থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষুদ্র ডোবার মতো হ্রদও আছে। ছোট ছোট হ্রদের সংখ্যাও খুব বেশী ব্ল্যাক্ ফরেষ্টের পার্ব্বত্য ভূখণ্ডে। এই হ্রদগুলির আশের পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য একেবারে চিত্র-



বাভেরীয়ার বিচিত্র পোষাক পরা মেয়েদের দল।

জার্ম্মাণীকে নদীবহুল দেশও বলা যেতে পারে। বড় বড় নদ ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এর চারিদিকে বেষ্টন ক'রে আছে বলে জলপথে জার্ম্মাণীর প্রায় সর্ব্বত্রই যাওয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে জার্ম্মাণীর উন্নতির একটা প্রধান কারণ এই নদীপথের সুবিধা। সমস্ত বড় বড় নদ নদীগুলিই উত্তরাভিমুখী—রাইন্, বেশাদ্, এল্‌ব্ এ তিনটিই উত্তর সমুদ্রে গিয়ে পড়'ছে; এবং ওদার ও ভিষ্টুলা বল্‌টিক্ সমুদ্রকে আশ্রয় করেছে! দানীয়ুব নদের উৎপত্তি জার্ম্মাণীর 'কৃষ্ণারণ্য'-গর্ভে হলেও এবং কেবলমাত্র জার্ম্মাণ রাজ্যেরই বহু শাখা-নদীর দ্বারা পরিপুষ্ট হলেও দানীয়ুব বাণিজ্যতরী

করের তুলিকায় আঁকা রঙীণ ছবির মতো! অসংখ্য ঝরণা ও পার্ব্বত্য উৎসও জার্ম্মাণীর একটা সম্পদের মধ্যে গণ্য!

উত্তর সমুদ্র-তীরের সন্নিকটে ও বল্‌টিক্ সাগরে কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি এত ক্ষুদ্র যে সে সকল দ্বীপে মানুষের বসবাস নেই। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দ্বীপটির নাম 'রূগেন্'। এটি হেলিগোল্যাণ্ড, নর্ডার্ণী, জ্যুয়িষ্ট্ বোর্কুম প্রভৃতি অন্যান্য দ্বীপের ন্যায় ছুটী কাটিয়ে আসবার পক্ষে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ জার্ম্মাণীর উভয় বিভাগের মধ্যে লেখ্য ও কথ্য ভাষায় যতখানি প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের

আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি, আদব কায়দা এমন কি অনেকে হয় ত জানেন না যে ইংলণ্ডেও স্কচ ও ইংরেজদের চিন্তাধারার মধ্যেও ততখানি পার্থক্যই লক্ষ্য হয়। মধ্যেরএমনি বিপুল পার্থক্য আছে; এমন কি খাস ইংলণ্ডে



কৃষ্ণারণ্যের (Black Forest) উৎসববেশে সুসজ্জিতা কৃষক রমণীর দল।



খৃষ্ট-ধর্ম্মের দীক্ষা। (Baptisement)
(পিতামাতা আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণ মিলিত হ'য়ে মিছিল ক'রে শিশুকে গির্জ্জায় নিয়ে যায়।)

উত্তর অধিবাসী ও দক্ষিণ অধিবাসী ইংরেজদের মধ্যেও এতখানি পার্থক্যই দেখতে পাওয়া যায়। ভাষার পার্থক্য হিসাবে নীচের জার্ম্মাণীর উচ্চারণ-ভঙ্গী যেমন একটু কোমল মিষ্ট ও শান্ত, উপরের জার্ম্মাণীর তেমনিই তীক্ষ্ণ তীব্র ও সতেজ! অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতর জার্ম্মাণ সাধু-ভাষার জন্ম যে উত্তর-খণ্ডে, সেইখানেই আবার নিকৃষ্টতর জার্ম্মাণ চল্‌তি ভাষারও



বৃক্ষারণ্যবাসী গৃহিণীদের নিত্যকর্ম্ম! (এরা প্রতি দিন অধিকাংশ সময় কৃষিক্ষেত্রে চাষবাসের কাজে সাহায্য করে।)



রীচেনহলের রাস্তার অধিবাসীদের নাচ। (বাভেরীয়ার মধ্যে রীচেন্‌হল স্বাস্থ্যকর স্থান বলে বিখ্যাত। এখানে অনেকেই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসেন।)

জন্মস্থান! এই ভাষার নাম প্লাট্‌ডয়েশ্‌ (Plattdeutsch) এবং এই ভাষায় ফ্রীট্‌জ রয়টার (Fritz Reuter) মেক্‌লেন্‌বোর্গ্যের্‌ (Meck'enburger) প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের রচনাবলী জার্ম্মাণ সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

উত্তর জার্ম্মাণীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্বের দাবী করে, কারণ দক্ষিণ জার্ম্মাণীতে উত্তরের অধিবাসীরাই গিয়ে প্রথম বসবাস সুরু ক'রেছিল। ইতিহাস-বর্ণিত নানা বিভিন্ন জার্ম্মাণ উপজাতির মধ্যে কেবলমাত্র স্বাধীনতাপ্রিয় স্যাক্সনরাই সমতল প্রদেশ অধিকার ক'রে আছে। এদের এই প্রদেশটি একটু উত্তর



বাভেরীয়ার পার্ব্বত্য কৃষক পরিবার।



কৃষকরমণীদের খড়ের দড়ী বোনা।

পশ্চিম কোণে রাইন্ নদী ও হারজ্ পর্ব্বতের মাঝখানে। কঠোর পরিশ্রমী দৃঢ়কায় ফ্রিশীয়ানরা ওল্ডেন্‌বার্গের তটভূমি ও শ্লেস্ উইগের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এবং উত্তর সাগরের একাধিক দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করে।



দু'টি ইস্কুলের মেয়ে (জার্ম্মাণীতে মেয়েরা গাড়ীর চেয়ে হেঁটে ইস্কুল যাওয়াই পছন্দ করে।)

এরা কখনও এদের এই বাসস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি। পুরাতন বাস্তুভূমি আঁকড়ে যুগযুগান্তকাল যদি কেউ প'ড়ে থাকে ত' সে এরা। তার পর 'ফ্রাঙ্ক'দের উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা রাইনের নীচের দিক থেকে মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে। জার্ম্মাণীর যে পূর্ব্বাংশকে শ্লাভ'দের দেশ বলে, সেখানে নানা বিভিন্ন জার্ম্মাণ উপজাতির সমাবেশ হয়েছে। তাদের মধ্যেও প্রধান হচ্ছে আবার সেই সাক্সন্ ও ফ্রাঙ্করা। 'থুরিঙ্গীয়ান' ব'লে আর একটা শাখাকেও এই প্রধানদের দলে ফেলা যায়।

সেই আদিম যুগের প্রাচীন জার্ম্মাণ জাতির বৈশিষ্ট্য যদি কিছু আজও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় তো সে ওই নিম্নশ্রেণীর স্যাক্সন্‌দের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সেই রেশমী চুল, সেই ফর্সা চেহারা, সেই নীল আঁখি তারা, এ সব যত দক্ষিণে এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ক্রমশঃ যেন মিলিয়ে গিয়ে চখের সামনে ভেসে আসে স্বোয়াবীয়া ও বাভেরীয়ার সেই বাদামী চেহারা, দীর্ঘকায়, লম্বা সঙ্কীর্ণ মুখ ; কিন্তু জার্ম্মাণ গঠনের বিশেষত্ব বর্জ্জিত নয়! উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চলে এই ধরণের চেহারাই খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। আবার দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের 'শ্লাভ' প্রদেশে বেঁটে চেহারা ও চওড়া মুখ লোকই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

এদের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এখানে একটু বলা যেতে পারে। নিম্নশ্রেণীর স্যাক্সন্‌রা বেশ দৃঢ় ও স্বাধীন চরিত্রের লোক। একটু ভারিক্কে গোছের চেহারা। বেশ



কৃষ্ণারণ্যের তরুণী

গম্ভীর প্রকৃতি। চট্ ক'রে কাছে ঘেঁসতে পারা যায় না। কখনই তারা কারুর সঙ্গে যেচে আলাপ করে না। অপরিচিতকে তারা যেন একটু সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে! তাদের চরিত্রে সেই পুরাকালের ক্ষাত্র প্রবৃত্তি

এখনও বেশ প্রবল আছে। নিজের অধিকার সম্বন্ধে তারা সর্ব্বদাই বেশ প্রবল ভাবে সজাগ। ন্যায়সঙ্গত দাবী তারা কিছুতেই ছাড়তে চায় না ; কাজে কাজেই তাদের স্বভাব



শিরভূষা। (কৃষ্ণারণ্যের কুমারীদের টুপীর মাথায় লাল ঝুঁটি আঁটা থাকে এবং বিবাহিতাদের কালো)

একটু মাম্‌লাবাজ হ'য়ে প'ড়েছে। তাদের প্রকৃতি বেশ প্রফুল্ল উজ্জ্বল লঘুহাস্যময় নয়, কারণ তাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা তার বিরোধী। সেই মেঘাবৃত আকাশ ও ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন বাতাস তাদের স্বভাবতই ম্রিয়মাণ ও অপ্রসন্ন করে তুলেছে। জীবন তাদের একেবারেই গদ্যময়, কোথাও এতটুকু কাব্যের ছায়ামাত্র নেই। তবে একটা দুর্লভ জিনিস তাদের মধ্যে আছে ; সেটা হচ্ছে তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও পরিহাসের রহস্যালাপ! তারা ভাবের দুলাল নয় বটে, কিন্তু জনে জনে প্রকৃত কর্ম্মবীর। এদের মধ্যে কত পরিব্রাজক ও কত বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছে! কিন্তু কাব্য ও কলা-বিদ্যার কাছে এরা কেউ ঘেঁসতেই চায় না।

পূর্ব্বেই বলেছি ফ্রিশীয়ানরা একটু কষ্টসহিষ্ণু। তারা দেহে ও মনে খুব দৃঢ় হয়ে উঠতে পেরেছে। তাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তারা একটু বেশী রকম গোঁড়া। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে তারা বড় একটা মেশে না। আন্তর্জাতিক বিবাহের তারা খুবই পক্ষপাতী। এক একটা গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় যে তারা সকলেই প্রায়ই পরস্পরের আত্মীয়! এরাও কাব্য ও শিল্পের কোনও ধার ধারে না, এমন কি গানবাজনার সুর পর্য্যন্ত তারা পছন্দ করে না!

আরও উত্তরে এল্‌ব নদী যেখানে পশ্চিমের প্রাচীন স্যাক্সন্ ভূমিকে 'শ্লাভ' প্রদেশ থেকে পৃথক্ করে রেখেছে, এই 'শ্লাভ' অংশ যে স্যাক্সন্ ও অন্যান্য জার্ম্মাণ উপজাতির দ্বারাই পরিপূর্ণ ও তাদেরই সভ্যতার প্রভাবে সুসভ্য হ'য়ে উঠেছে, এ কথাটা ভুলে গেলে চ'ল্‌বে না! এই পূর্ব্বাংশেই

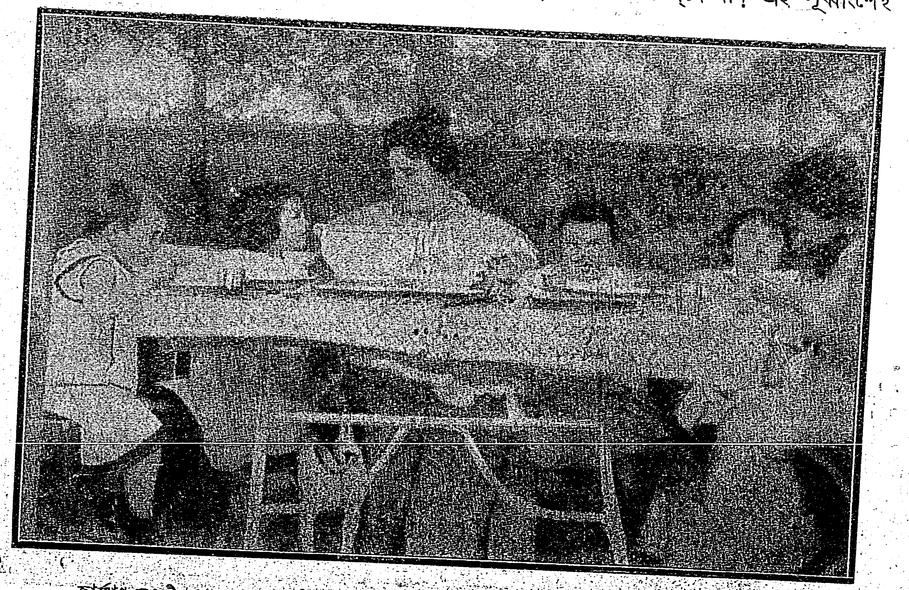

জার্ম্মাণ জননী। (সন্তান-সম্ভতিদের খাবার খাওয়াচ্ছেন ও সেই সঙ্গে উপদেশ ও শিক্ষা দিচ্ছেন)



কৃষ্ণারণ্যের কৃষ্ণক হরিণ

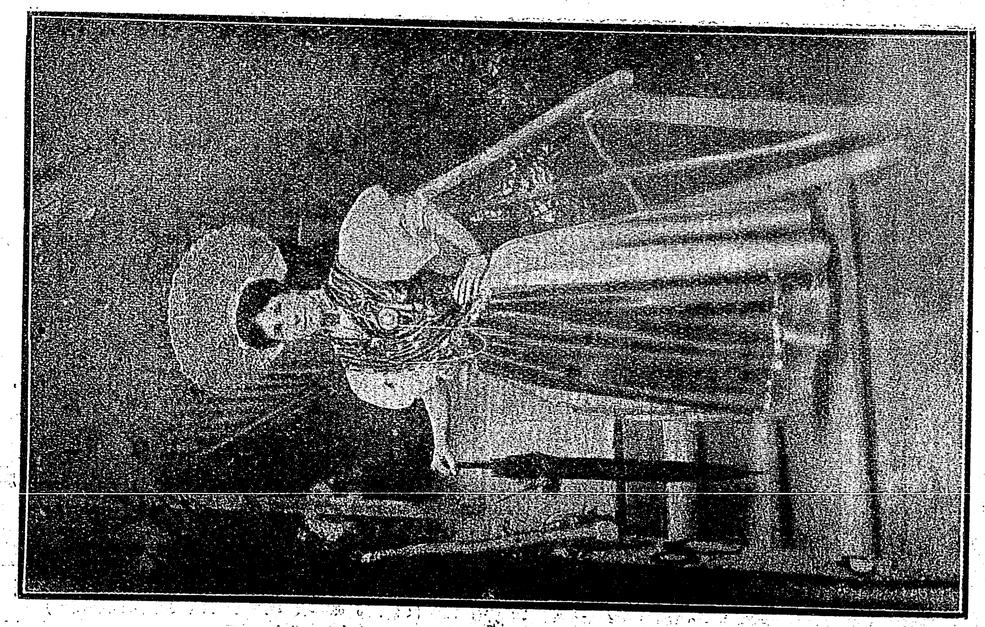

কৃষ্ণারণ্যবাসিনী (বিভিন্ন নাচে)



শার্লটেন্‌বার্গের অরণ্য-বিদ্যালয়। (অনেক অসুস্থ বালিকা এই অরণ্য আশ্রমে শিক্ষার্থিনী হ'য়ে হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে।)



ধর্ম্মোৎসবের মিছিল



পূর্ব্ব প্রাশিয়ায় মজুরণীর দল।

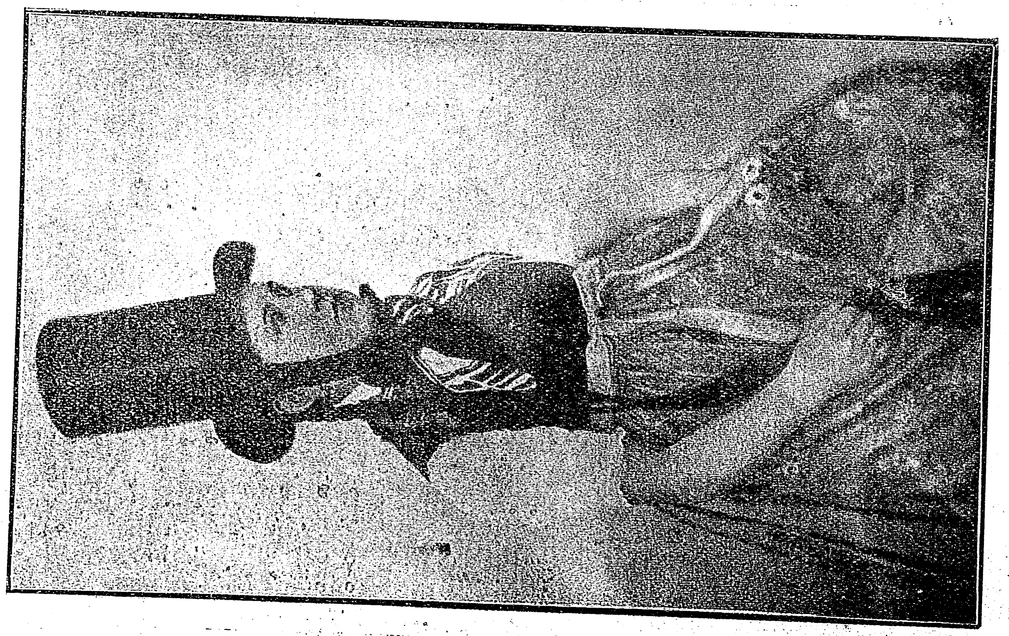

রবিবারের পোষাক। (এই লম্বা লাল টুপী পরা তাদের ফ্যাশান)

প্রূশীয় বীরগণের জন্মভূমি। বর্ত্তমান জার্ম্মাণ জাতির সকল শাখার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সজীব ও তেজস্বী জাত এই অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায়। 'শ্লাভ' উৎস থেকে এদের উৎপত্তি হলেও বল্টিক্ লিথুয়ানীয়ান জাতির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা দেখতে পাওয়া যায়।

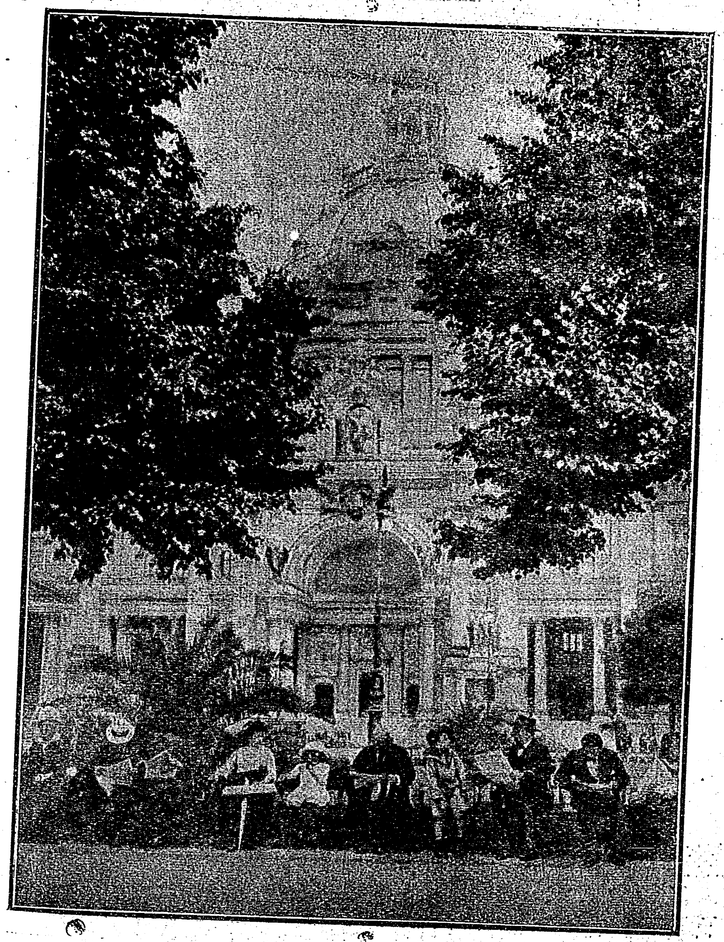

প্রমোদোদ্যান।

(বার্লিনের নূতন ক্যাথিড্রাল গির্জ্জা সংলগ্ন এই মনোহর উদ্যানে অসংখ্য জার্ম্মাণ নরনারী তাদের অবসর যাপন করে।)

মোটের উপর প্রূশীয়ানরা শক্তিমান গুণশালী এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অধিকারী। তবে 'গলেদের' মতো তাদের সে কল্পনাশক্তি নেই; সে জীবনের প্রতিপলে আনন্দের সঞ্জীবনী লীলা-চাপল্য নেই, যেমন রাইনল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়! খোয়াবীয়ানদের উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানের উৎকর্ষের সে সূক্ষ্ম অনুপ্রেরণাও তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না! জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান সভ্যতা-বিস্তার ও জাগতিক উন্নতি-পথের পথপ্রদর্শক মন্ত্রদাতা গুরুই হ'চ্ছে এরা। বিধিনিয়মের অনুকূল যে যে বিষয় এবং যা এই বিধি-নিয়মের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত হ'লেই উন্নত ও সুসম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, সে বিষয়ের পরিচালনায় প্রূশীয়ানদের মতো উপযুক্ত জাত আর জগতে নেই ব'ল্‌লেও চলে! প্রকৃতপক্ষে তাদের শক্তি সামর্থ্য যা কিছু তা হাতে-কলমের কাজের মধ্যেই প্রকাশ পায়, স্ফূর্ত্তি পায়! তারা কাজের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে কল্পনার তাজমহল গড়তে পারে না।

রাজনৈতিক ব্যাপারে এরা তেমন মাথা ঘামায় না বটে, কিন্তু নিজেদের মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা এমন সুচারুরূপে সংগঠিত করেছে যে, জগতের কোনও দেশে এমন সুনিয়ন্ত্রিত মিউনিসিপ্যাল গভর্ণমেণ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণীর ব্যবসায় সংক্রান্ত কৃতকার্য্যতা ও শিল্প সিদ্ধির মূলে এই প্রূশিয়ানদের মাথা ও অদম্য উৎসাহ বিদ্যমান। বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর জীবনের গতি-নিয়ামক প্রকৃত পক্ষে ধরতে গেলে এই প্রূশিয়ানরাই! এদের অস্তিত্ব জার্ম্মাণীতে না থাকলে জার্ম্মাণীর অবস্থা যে আজ অন্য রূপ হ'তো, এ কথা বেশ জোর করেই বলা চলে। আধুনিক গণতন্ত্রের নেতাও এই প্রূশিয়ান জাতি। এদের বিপুল শক্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে জার্ম্মাণীর বেঁচে থাকা অসম্ভব। কাজে কাজেই এদের নেতৃত্বের অনুসরণ করা ছাড়া জার্ম্মাণীর গত্যন্তর নেই।

মধ্য-জার্ম্মাণীর প্রধান জাত হ'চ্ছে ফ্র্যাঙ্ক ও থুরী-ঙ্গিয়ানরা। সমস্ত জার্ম্মাণ জাতির মধ্যে সব চেয়ে স্ফূর্ত্তিবাজ



গ্রামের ঝরণা-তলায়।

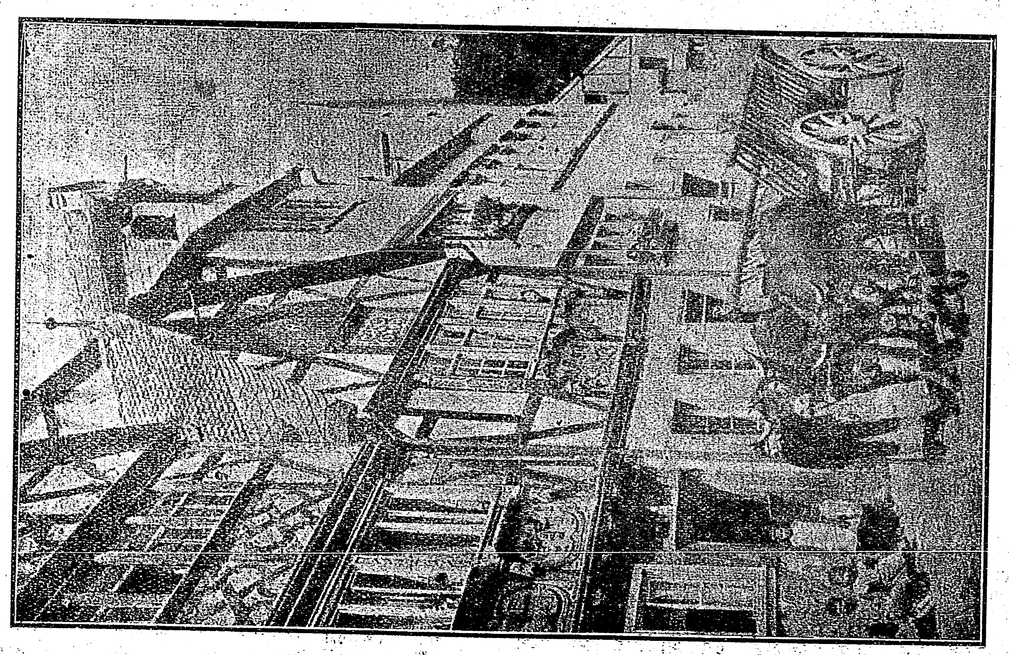

রাইন্ গ্রামের দৃশ্য

কার্য্যতৎপর সর্ব্বগুণশালী সজীব জাত হচ্ছে এই ফ্র্যাঙ্ক্‌রা! এরা কাব্যামোদী ও কল্পনা-কুশল। শিল্পকলা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের বিশেষ অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায়। এরা ভারি মিশুক ও মজ্‌লিসী—সহজেই এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রতে পারা যায়। থুরীঙ্গিয়ানরাও খুব আমুদে লোক। এদের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য ও কাজকর্ম্মে সবিশেষ উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। এরা একটু ভাবপ্রবণ জাত। গীতবাদ্যের একান্ত অনুরক্ত! অপরিচিতদের সঙ্গে এরা অতি ভদ্র ব্যবহার করে। এদের মতো এমন সহজে সন্তুষ্ট হবার সদ্‌গুণ অন্য কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় না। দোষের মধ্যে এদের আত্ম-নির্ভরতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার প্রয়াস বড় কম। বাইরের যে কোনও প্রবল প্রভাবে এরা সহজেই অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু আবার এদের মত অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমীও খুব কম দেখতে পাওয়া যায়!

দক্ষিণে আলেমান্নী বা শোয়াবীয়ানরা ও বাভেরীয়ানরা প্রধান। বেনেড ও উর্টেম্‌বার্গ প্রদেশে শোয়াবীয়ানরা বাস করে। পূর্ব্বাঞ্চলের শ্লাভ্‌দের মতো এই শ্যামবর্ণ শোয়াবীয়ানদের মধ্যে বেশ একটু কেলটিক্ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এদের স্বভাব বেশ মধুর। এরা খুব ধীর প্রকৃতির এবং জ্ঞান বুদ্ধি ও শিক্ষার ঔৎকর্ষের দিক দিয়ে এরা জার্ম্মাণীরা অপর সব জাতকে ছাপিয়ে গেছে।

বাভেরীয়ানরা খুব চতুর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষ সাবধানী জাত। জার্ম্মাণীর অপর সকল জাতের চেয়ে এদের একটা একটা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব খুব বেশী আছে। দুঃসাহসের কাজ করতে এরা মোটেই পশ্চাৎপদ হয় না। চট্ করে এরা কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রতে চায় না বটে; কিন্তু এদের ঠিক অমিশুকও বলা চলে না। একটু আত্মসর্ব্বস্ব ভাব এদের মধ্যে আছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মভাব ও স্বজাতি-প্রেম এদের মতো আর কারুরই তেমন প্রবল নয়।

বিগত মহাযুদ্ধের আগে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল প্রায় দু'লক্ষ আট হাজার সাতশ' আশী বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ছয় কোটী আশী লক্ষ। কিন্তু যুদ্ধের পর ভার্সেল্ সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মাণ্ সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ায় এদের আয়তন উপস্থিত প্রায় সাতাশ হাজার বর্গ মাইল কমে গেছে, এবং লোকসংখ্যাও সেই অনুপাতে কমে গিয়েছে প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ! সুতরাং বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের আয়তন দাঁড়িয়েছে এক কোটী একাশী লক্ষ সাতশ' আশী বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ছ'কোটীর কিছু বেশী।



বাভেরীয়ান বরবধূ। (প্রাচীন বিবাহ পরিচ্ছদে)

১৯১৮ সালের আগে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য ছিল পঁচিশটি সম্মিলিত প্রদেশের সমষ্টি। তার মধ্যে চারটি পৃথক্ রাজ্যও সংযুক্ত ছিল—প্রুশীয়া, স্যাক্সনী, বাভেরীয়া ও উর্টেম্‌বার্গ! আলসেস্ লোরেন্ প্রদেশটিও তখন জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণীতে যে প্রজাবিদ্রোহ প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল, তার ফলে জার্ম্মাণীর সমস্ত রাজন্যবর্গ সিংহাসনচ্যুত হ'তে বাধ্য হ'য়েছেন এবং রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সেখানে সর্ব্বত্রই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ তারা পূর্ব্বের সেই একাধিক

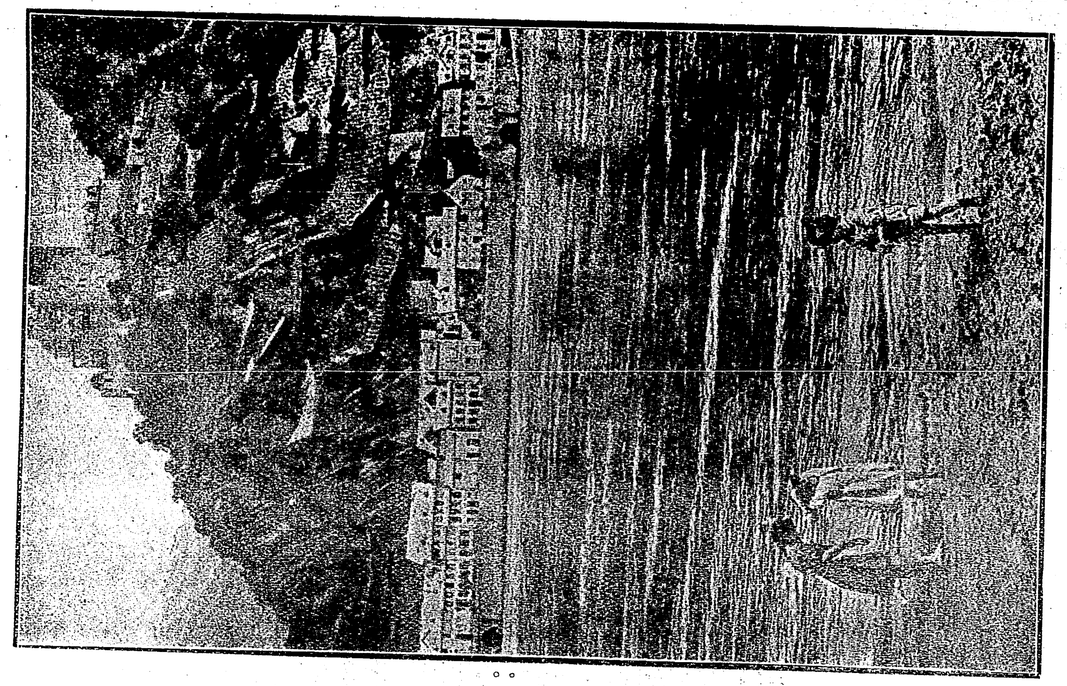

রাইন্ নদী-তীর।

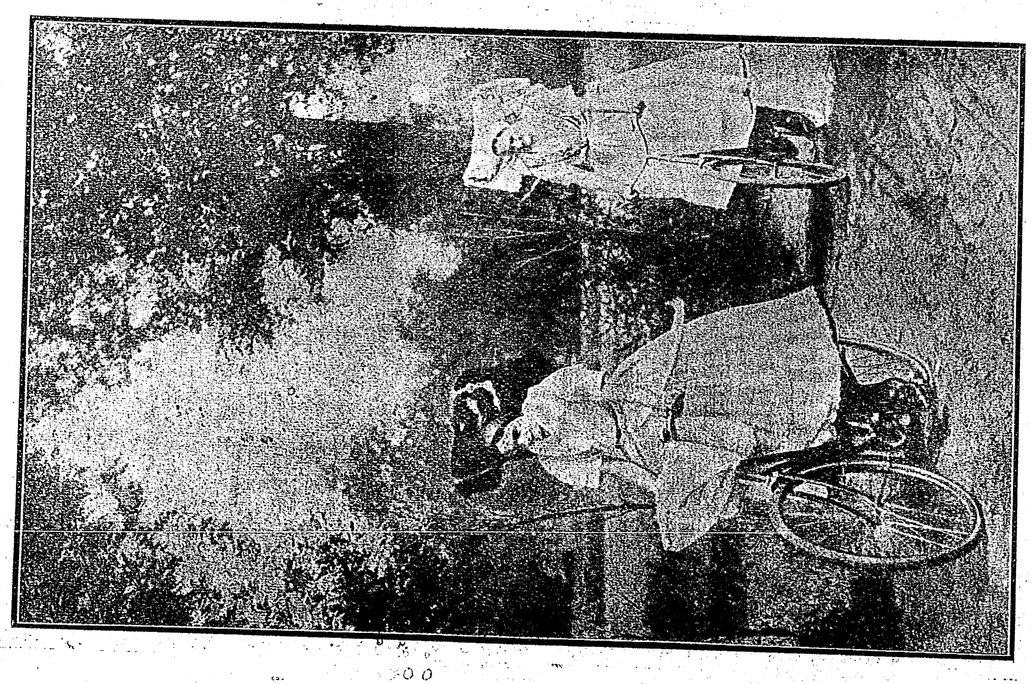

সাইকেলে বিহারিণী। (ওয়েণ্ডিশ্ মেয়েরা ঝল্‌মলে পোষাক পরেও অনায়াসে বাইকে চড়ে যায়।)

সম্মিলিত প্রদেশের সমষ্টিগত ব্যবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন করেনি, কেবল গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে সেগুলির শাসন-ব্যাপারের ঈষৎ সংস্কার ক'রে নিয়েছে মাত্র। উপস্থিত যে বিধি ব্যবস্থার প্রচলন তারা সেখানে করেছে সেইটেই হচ্ছে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা! তবে কার্য্যতঃ এ ব্যবস্থায় কী রকম সুফল পাওয়া যায় সেটা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ।

পূর্ব্বের পঁচিশটি প্রদেশ উপস্থিত অদল বদল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র আঠারোটিতে—আনহাণ্ট্, বাডেন্, বাভেরীয়া, ব্রাসুইক্, ব্রেমেন্, হামবার্গ, হেস্, লীপ, লুবেক্, মেকলেন্‌বার্গ শোয়েরীণ, মেক্‌লেন্‌বার্গ ষ্ট্রেলিট্‌জ্, ওল্ডেন্‌বার্গ, প্রুশীয়া; স্যাক্সনী, স্বাউম্‌বার্গ-লিপ্, থুরীঙ্গিয়া, ওয়ালডেফ, ও উর্টেম্‌বার্গ!

আগে জার্ম্মাণীর অধিবাসীদের মধ্যে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ ছিল প্রায় শতকরা ৬২ জন, রোমান ক্যাথলিক ছিল শতকরা ৩৭ জন, আর য়ুহুদী ছিল শতকরা ১ জন। কিন্তু আলশেস্ লোরেন্ আর পোলিশ অংশ বেরিয়ে যাবার পর এখন প্রেটেষ্ট্যাণ্ট্ সংখ্যাই বেশী হয়ে পড়েছে। তারা এখন শতকরা প্রায় ৬৫ জন!

একটা অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হবার আগে জার্ম্মাণী খণ্ড খণ্ড দেশে বিভক্ত ছিল। এবং সেই সময়েই তাদের মধ্যে নিজেদের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার যে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল, সে ভাবটা উপস্থিত এদের মধ্য থেকে অনেক কমে গেলেও এখনও একেবারে বিদূরিত হয় নি। এখনও এরা সাম্রাজ্যের কল্যাণের চেয়ে স্ব স্ব জন্মভূমির কল্যাণের দিকে অধিক সজাগ! নিজেদের ছোট ছোট দেশগুলিকে তারা যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, সমগ্র জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যকে তারা ঠিক সে চক্ষে দেখে না! জার্ম্মাণ কবিরা অধিকাংশই তাদের স্বদেশ-প্রেমমূলক কবিতায় কেবল নিজেদের ছোট ছোট জন্মভূমির প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠেছে! সমস্ত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যকে নিজের স্বদেশ বলে দেখবার মতো প্রসারিত উদার দৃষ্টি তাদের অন্তরে এখনও উন্মীলিত হয়নি। পিতৃভূমি (Fatherland) ব'লে তারা সমগ্র জার্ম্মাণীকে অভিহিত না করে নিজেদের ছোট ছোট জন্মপ্রদেশগুলিকেই বলে।

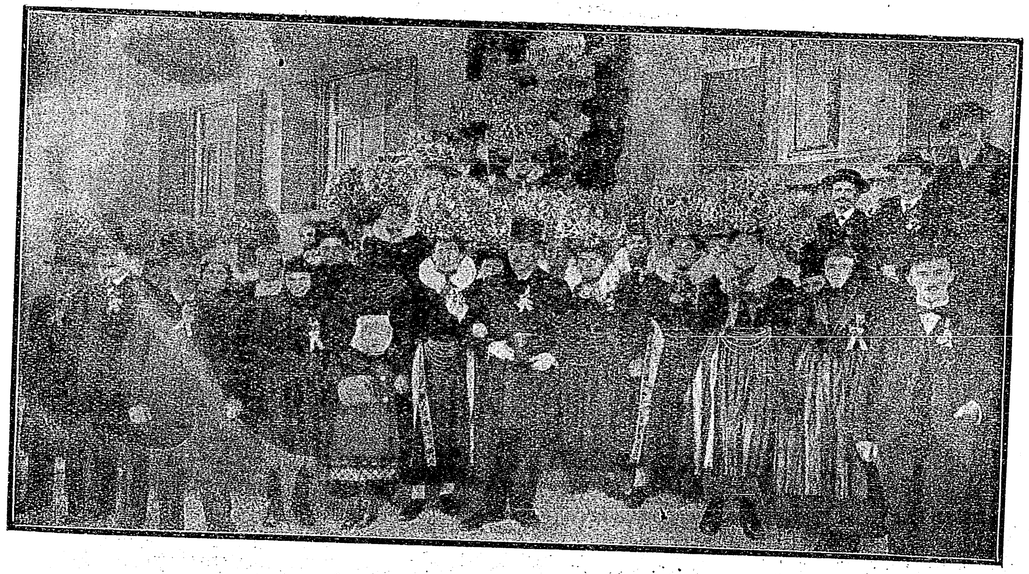

কৃষ্ণারণ্যে বিবাহ-উৎসব। (মেয়েদের মাথার মুকুটগুলি দ্রষ্টব্য)

বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর পত্তন হ'য়েছিল ধরতে গেলে সেই ১৮৭০ সালের ফরাসী যুদ্ধের পর। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জার্ম্মাণীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি আরম্ভ হ'য়েছিল। গত বিশ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণ রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই একটা সংস্কারের বন্যা বহে গেছে। সমস্ত

ওলোট পালোট হ'য়ে প্রাচীন সহর ও পুরাকালের নগর সব ভেঙে পুনর্গঠন সুরু হয়েছিল। তিনশত কোটী টাকা তারা এই দেশের উন্নতির জন্য ব্যয় ক'রতে নামায় তাদের চাষবাস ও কলকারখানার কাজ এমন একটা সুযোগ পেয়ে গেল যে দেখতে দেখতে স্বপ্নের মতো জার্ম্মাণী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী বলে পরিচিত হ'য়ে গেল!

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী-কাল ধরে দেশের শিক্ষা-বিস্তারের দিকে, অর্থকরী বিদ্যালাভের দিকে এবং বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে জার্ম্মাণীতে গত বিশ বৎসরের মধ্যে যে অসংখ্য কারু-কর্ম্মী রাসায়নিক শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের উদ্ভব হয়েছে—তারাই আজ জার্ম্মাণীর অসংখ্য কলকারখানার সুযোগ্য পরিচালক!

(ক্রমশঃ)

কান্নাহাসি

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমি ব'সে আছি, আকাশের পানে চাহি—
দূর দিগন্তে কোথাও সীমানা নাহি,
ঘন কুয়াসার অবগুণ্ঠনে ঢাকা;
সন্ধ্যারৌদ্র মেঘের অন্তঃপুরে
বাহিরে আসিতে মরিতেছে মাথা খুঁড়ে,
ক্ষীণ আলো দীন-ব্যথার ম্লানিমা মাখা।

অন্ধ আকাশ নিঃসীম ভাষাহীন,
দিবসের আলো ধীরে হয়ে আসে ক্ষীণ,
ধরণী লুকাল অন্ধকারের মাঝে;

আমি একা বসে তমিস্রা উপকূলে
নিখিলের ব্যথা মোর বুকে ওঠে দুলে
চিত্তে এক ব্যথিত রাগিণী বাজে।

ধরা যেন চায় ফেলিতে এ আবরণ
ঘন হয় পাশ, দৃঢ় হয় বন্ধন,
ক্ষীণ দীপালোকে মরে গৃহকোণে ঘুরে!

মানবের ব্যথা মৃদু এ আলোর মতো
শুধু হয় গৃহ-বাতায়নে প্রতিহত,
নিবিড় হতেছে বন্ধ অন্তঃপুরে।

বেদনা-আঘাত আমার চিত্তে লাগে,
অসীম শূন্যে মুক্তির দিশা মাগে,
অন্ধকারেতে হয় শুধু দিশাহারা।

ক্রন্দন বুকে উছলি ভাঙ্গিয়া পড়ে
আঁধার বিশ্বে তট খুঁজে খুঁজে মরে,
এ মূক শূন্যে কে দিবে কাহারে সাড়া।

মানব যেন রে নীড়হারা ভীরু পাখী
নিজেরে ভুলায় মুদিয়া আপন আঁখি,
আশ্রয়হীন ভাবে আছে আশ্রয়!

হায় অসহায় কে খুলিবে তোর দ্বার—
যে দিকে তাকাস বন্ধ এ কারাগার
বন্দী, কে দিবে মুক্তির পরিচয়?
নিশার আঁধার নিবিড় হইয়া আসে
মানব চিত্ত শিহরি কাঁপিছে ত্রাসে
জানে না যাহারে তারে আশ্রয় মানে,
অকূল, আঁধার, ছিঁড়েছে তরীর পাল,
ভাবিছে অজানা নাবিক ধরেছে হাল
সভয় স্তব্ধ, তারি বন্দনা গানে।

* * * *

কাটিল কুয়াশা তারকা আলোক জ্বালে,
দশমীর চাঁদ হাসে গগনের ভালে,
অসীম আকাশে মেঘের চিহ্ন নাহি;
হাসিয়া উঠিল ভীরু মানবের মন
কোথা বন্ধন, কোথায় বা গৃহ-কোণ,
কোথা ভাঙ্গা তরী, কে আনিল তরী বাহি?
অসীম শূন্য বিস্তার সীমাহীন—
দ্বিধা-হীন মনে ব্যথা কোথা হ'ল লীন
কারা-শৃঙ্খল কোথায় পড়িল টুটে!
মুক্তপক্ষ পাখীরা অবাধে উড়ে
প্লাবিয়া গগন ভরা হৃদয়ের সুরে
কত না শক্তি ক্ষীণ সে পক্ষপুটে।
হৃদয়ের সাথে হৃদয় আসিয়া মেলে
শূন্য আকাশে সঙ্গীত-সুধা ঢেলে;
কোথা গ্লানি, কোথা কুয়াশার মলিনতা—
আনন্দ শুধু অক্ষয় হয়ে রয়
বাধা নাই, নাই ব্যথা বন্ধন ভয়
অসীম আকাশ, উড়িবার অধীরতা!

মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

৭

রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছে আমাদের প্রধান কাজ হলো, গাড়ী দুখানি এন্, ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির ওয়ার্কশপে দেওয়া। কোথাও কোনো স্ক্রু আল্গা, বা, কল্কব্জা কোথাও ঢিলা হলো কি না, তা ঠিকঠাক করা আর ব্রেকে কোনো খুঁৎ না থাকে—এই সব পরখ করানো। কারণ, এবার সুদীর্ঘ পাহাড়-পথে পাড়ি! পাহাড়ের বাঁক, গোড়েন পথ,—ব্রেক যদি একটু বিগড়োয়, তাহলে গাড়ীশুদ্ধ সকলের প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘট্‌তে পারে। কাজেই এখান থেকে শ্রীনগর-যাত্রী মাত্রেরই গাড়ীর অঙ্গরাগ-পর্য্যবেক্ষণ একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সস্তা কাচিয়ে নেবার জন্য রজক ডাকিয়ে তার কাছে সব কাপড়-চোপড় পাঠানো হলো। এখান থেকে ছেলেরা আমাদের সহযাত্রী হবে—তাদের সঙ্গেও মোট-ঘাট আছে বিস্তর। বড় ট্রাঙ্ক প্রভৃতি অনেক হলো। অথচ গাড়ী যথাসম্ভব হাল্কা করাই সঙ্গত আর নিরাপদ! কাজেই একখানি পৃথক্ গাড়ী ভাড়া করা হলো এন্, ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির কাছে। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর অবধি সে গাড়ীর ভাড়া পড়লো ৯০৲ নব্বই টাকা। স্থির হলো, নেহাৎ প্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়া, বিছানা-পত্র বাসন-কোসন প্রভৃতির মোট সেই ভাড়া-গাড়ীতে যাবে। ছেলেদের সঙ্গে একটি পাচক ব্রাহ্মণও

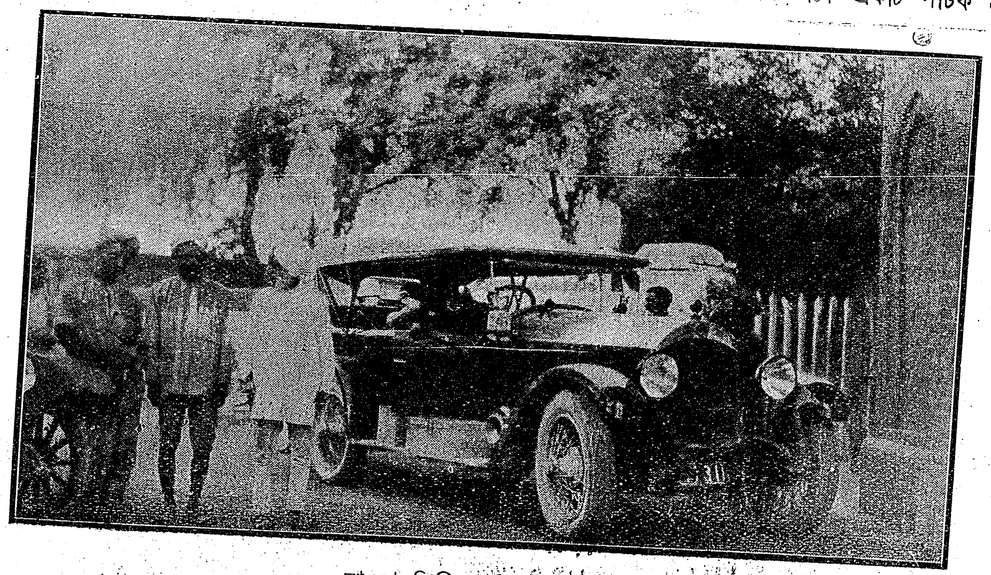

রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়িবার উদ্যোগ

ট্রেনে এসেছিল—সে আর আমাদের সাথী নেপালী বয়,—এরাও দুজনে এই মোটঘাটের সঙ্গে সেই গাড়ীতে যাবে। গোটা-চারেক ভারী ট্রাঙ্ক নিয়ে শেষে সমস্যা বাধ্‌লো! রাধাকিষণ কোম্পানির ভারবাহী প্রকাণ্ড লরি ভোরেই শ্রীনগর যাত্রা করছিল—ভারী ট্রাঙ্ক ক'টা সেই লরিতে চাপানো হবে, স্থির হলো। এ-সবের মীমাংসা সেরে

সারাদিনটা গোছগাছ কর্‌তেই কেটে গেল। রাধাকিষণ কোম্পানির অংশীদার এম্, কে, শেঠী মহাশয় আমাদের তিনি নাছোড়বন্দা···আমাদের কোনো প্রতিবাদে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। শেঠী-সাহেব পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ;

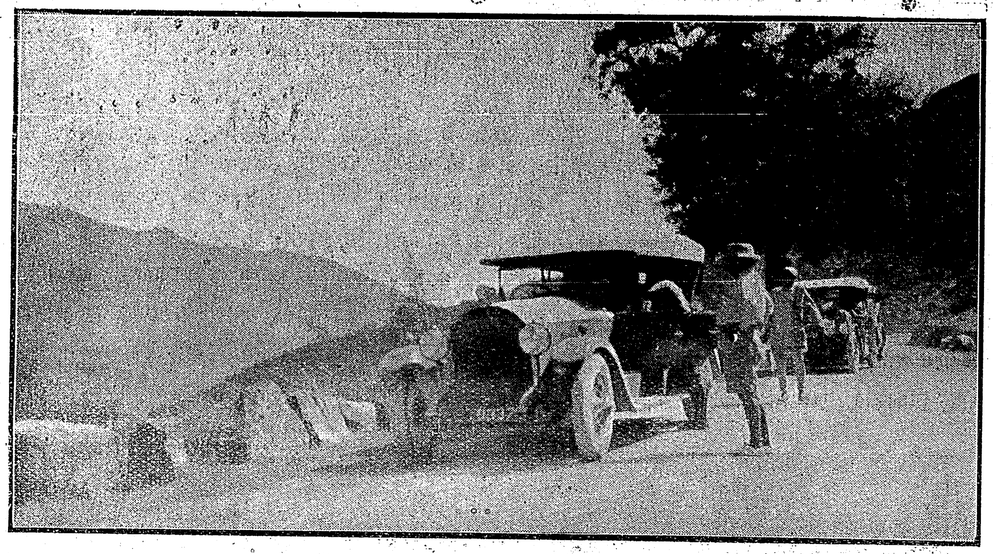

ম্যরী ও কোহালার পথে

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এমন মনোযোগী হলেন যে তাঁর তাঁর ভদ্রতা, তাঁর আতিথেয়তা অপূর্ব্ব!
খাতিরের ঘটায় আমরা অপ্রতিভ হয়ে পড়ছিলুম! কিন্তু বৈকালে তিনি বললেন,—চলুন রাত্রে কিং-কার্নিভালে।

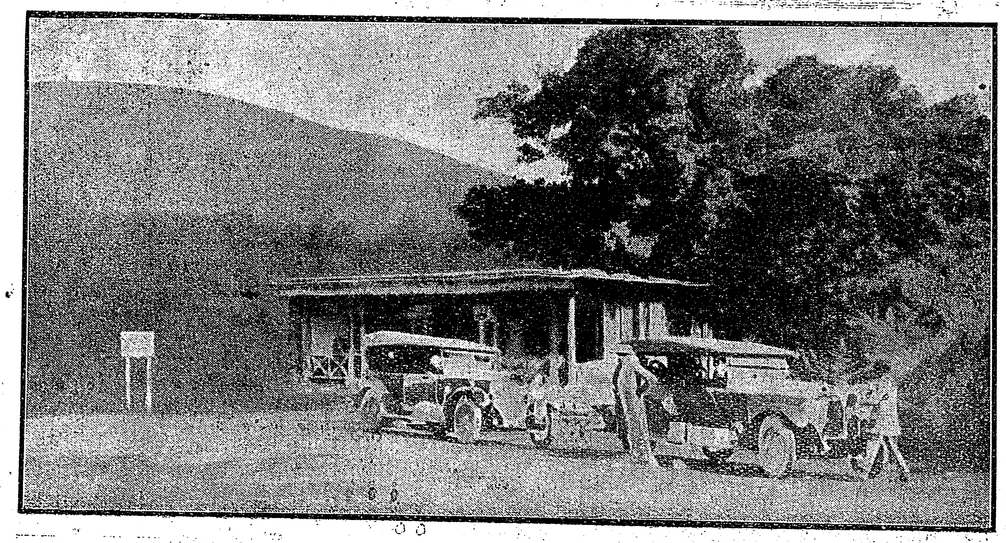

ট্রেট

আমরা বললুম, এই দীর্ঘ পাড়ির পর রাত্রি জাগা ঠিক হবে' না। আবার সামনে এই দীর্ঘ পাড়ি পড়ে আছে! তখন তিনি ছাড়ান্ দেন!

তাঁর কাছে শুনলুম, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ১৫ মাইল উত্তরে অর্থাৎ মোটরে তিন-চার ঘণ্টার পথে তক্ষশিলা..... দেখবো না? এই তক্ষশিলা ছিল সূর্য্যবংশীয় ভরতের পুত্র তক্ষের রাজধানী। জন্মেজয় রাজার সর্পযজ্ঞও এইখানে

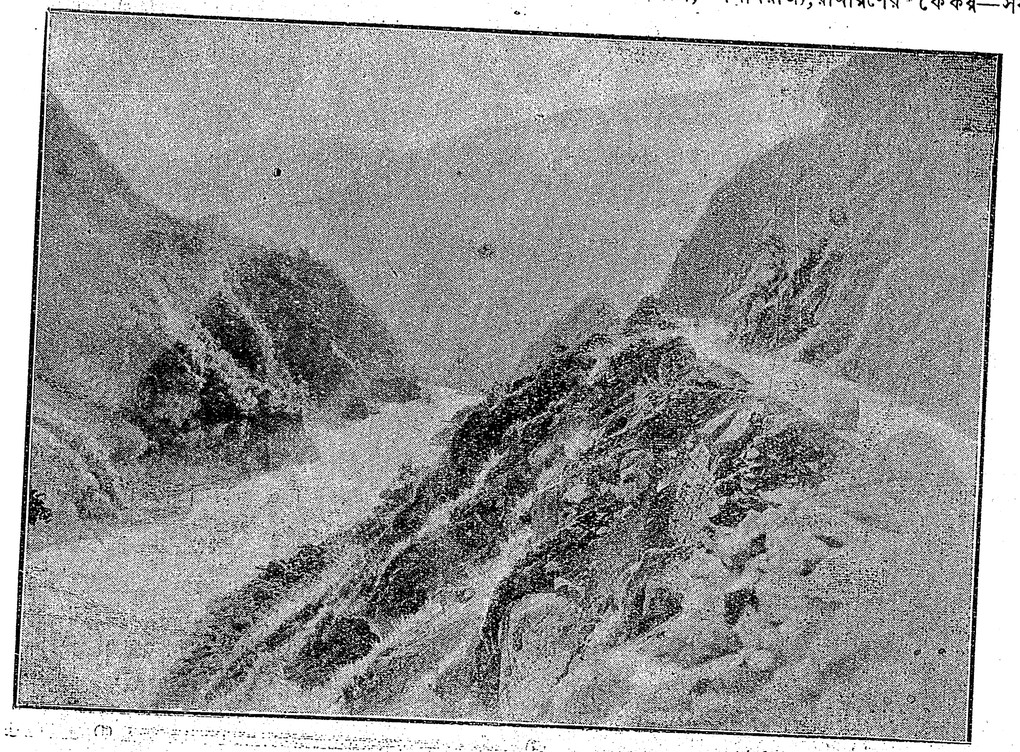

ঝিলামভ্যালি রোড

হয়েছিল। তাছাড়া ঐতিহাসিক যুগের বহু প্রাচীন শিলালিপি, ইমারতের ধ্বংস-স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে! দেখার লোভ প্রবল হলেও আমরা বললুম, আমাদের লক্ষ্য এখন শ্রীনগর, সেখানে যেতে পথের উপর যা-কিছু দেখবার থাকবে, দেখে যাবো—আপাততঃ অচল পথে কোনো কিছু দেখবার থাকলেও দায়ে পড়েই সে লোভ সম্বরণ করতে হবে। ফেরবার মুখে তক্ষশিলা, পেশোয়ার প্রভৃতি দেখে যাবার বাসনা আছে।

পেশোয়ার হিন্দু আমলের পুরুষপুর। সবক্তাগিন এইখানে রাজা জয়পালকে পরাস্ত করেন। তার কিছু দূরে সিন্ধুনদের ওপারে শুনলুম, প্রাচীন গান্ধার রাজ্য। মনটা চন্‌মন্ করে উঠলো। ভারতের একেবারে সীমান্তে এসে পড়েছি! প্রাচীন গৌরবের লীলাভূমিগুলি এত কাছে, হাতের নাগালে বললেই চলে! এই পঞ্জাব হলো মহাভারতের লীলাক্ষেত্র! মহাভারতের মদ্র, শিবিরাজ্য, রামায়ণের কেকয়—সব এই পঞ্জাবেই। শতদ্রু আর বিপাশা (বিয়াস্) নদীর উত্তরে অবস্থিত ভূখণ্ড ছিল কেকয় রাজ্য। রাজগির কেকয় রাজ্যের রাজধানী। রাজগির এখনো বর্ত্তমান আছে; প্রাচীন সমৃদ্ধির কঙ্কালের মত। চন্দ্রভাগা (চেনাব) আর ইরাবতীর (রাভী) মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ছিল সেকালের মদ্র দেশ; আর বিতস্তার (ঝিলাম্) তীরবর্ত্তী প্রদেশ ছিল শিবিরাজ্য।

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে মোটরে চড়ে রাওয়ালপিণ্ডি দর্শনে বেরিয়ে পড়া গেল। শেঠী মহাশয় সখের সাথী হলেন;

ওখানকার নানা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। রঘুনাথজীর মন্দির; বিখ্যাত টোপি পার্ক...মানুষের হাতে গড়া নয়—প্রকৃতির বুকে আপনি জেগে উঠেছে তার অপূর্ব্ব শোভা আর

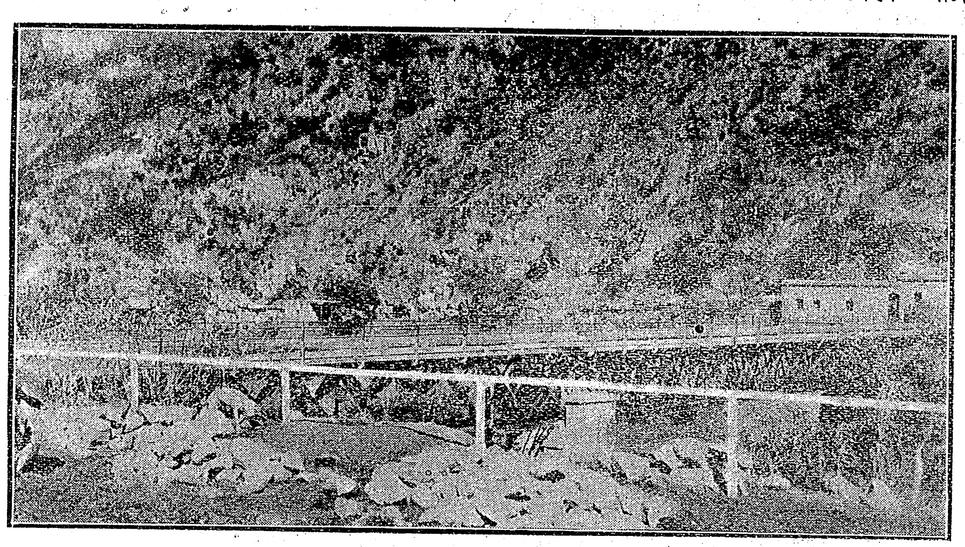

কোহালা—ঝিলামের উপর পুল।—এপারে ব্রিটিশরাজ্য, ওপারে কাশ্মীর-ষ্টেট্

ঐশ্বর্য্য নিয়ে! 'টোপি' কথাটি কোথা থেকে এলো? কেউ কেউ বলেন, টোপি স্তূপের অপভ্রংশ। হতে পারে, কারণ পার্কটি বেশ উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত।

রাওয়ালপিণ্ডি খুব প্রাচীন সহর নয়; তবে মস্ত ক্যাণ্টনমেণ্ট। সিটি আর ক্যাণ্টনমেণ্টের মাঝে ছোট একটি নদীর ব্যবধান—নদীটির নাম লেহ। প্রাচীন হিন্দু নগর গজীপুর বা গজনীপুরের উপর এই ক্যাণ্টনমেণ্টের সৃষ্টি। গজীপুর ছিল ভট্টি-রাজাদের রাজধানী। মোগল-আমলে রাওয়ালপিণ্ডির নাম ছিল ফতেপুর বাওরী। পরে

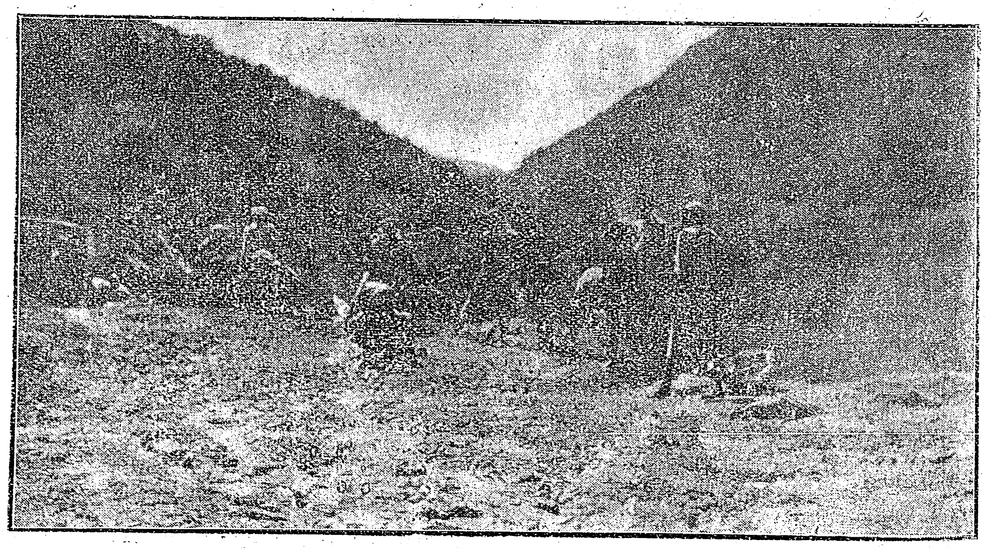

উরির পর—পাহাড় ধ্বসা। কুলিরা পথ সাফ করছে

ঘক্কর-সর্দ্দার ঝাণ্ডা খাঁ রাওয়ালপিণ্ডির পত্তন করেন। এই রাওয়ালপিণ্ডিতে কাবুলের নির্ব্বাসিত আমীর শাহ সুজা তাঁর ভাই শাহ জামানের সঙ্গে এসে আশ্রয় নেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখ-সর্দ্দার ছত্তর সিং ও শের সিং গুজরাট-যুদ্ধের পর ব্রিটিশের হাতে আত্ম-সমর্পণ করেন। সীমান্ত-রক্ষা-কল্পে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রাওয়ালপিণ্ডিকে প্রকাণ্ড মিলিটারী ক্যাণ্টনমেণ্টে পরিণত করেছেন।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ন' মাইল দূরে মঙ্গল পাশ্। এইখানে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল জন্-নিকলসনের স্মৃতি-রক্ষার্থে একটি স্তম্ভ ও জলের ঝর্ণা তৈরী করা হয়েছে। জন নিকল্সন্ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-অবরোধের সময় নিহত হন্!

রাওয়ালপিণ্ডির পার্কগুলি, ম্যাশি গেট, রঘুনাথজীর মন্দির, ইস্লামিয়া কলেজ ও হোষ্টেল, জমা মসজিদ প্রভৃতি দেখবার জিনিষ। তাছাড়া এখানে পথ ঘাট চমৎকার—সে কথা আগেই বলেছি।

১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা আটটায় স্নানাহার সেরে আমরা রাওয়ালপিণ্ডি ত্যাগ করলুম। প্রশস্ত পথ। রেলোয়ে ব্রিজের

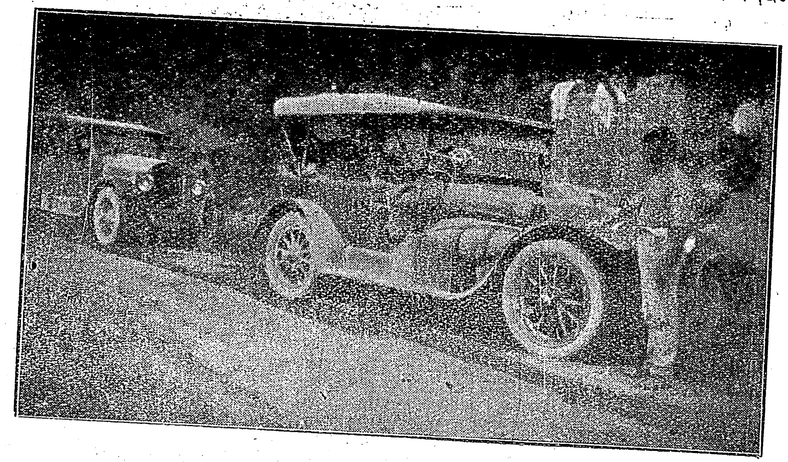

পাহাড় পথে জল লওয়া

তলা দিয়ে সোজা উত্তর-মুখে চললুম। দুধারে প্রশস্ত ক্ষেত, সামনে বহুদূরে পাহাড়ের প্রাচীর। পাঁচ-সাত মাইল আসার পর দেখি, পাহাড় আপনার শরীর এমনি বিসর্পিত করে



রাওয়ালপিণ্ডি সহরের দৃশ্য

পড়ে আছে যে দেখলে মনে হয়, ঐখানেই বুঝি পথের শেষ! ভারতবর্ষের সীমারেখা চেপে দাঁড়িয়ে আছে ঐ দীঘল

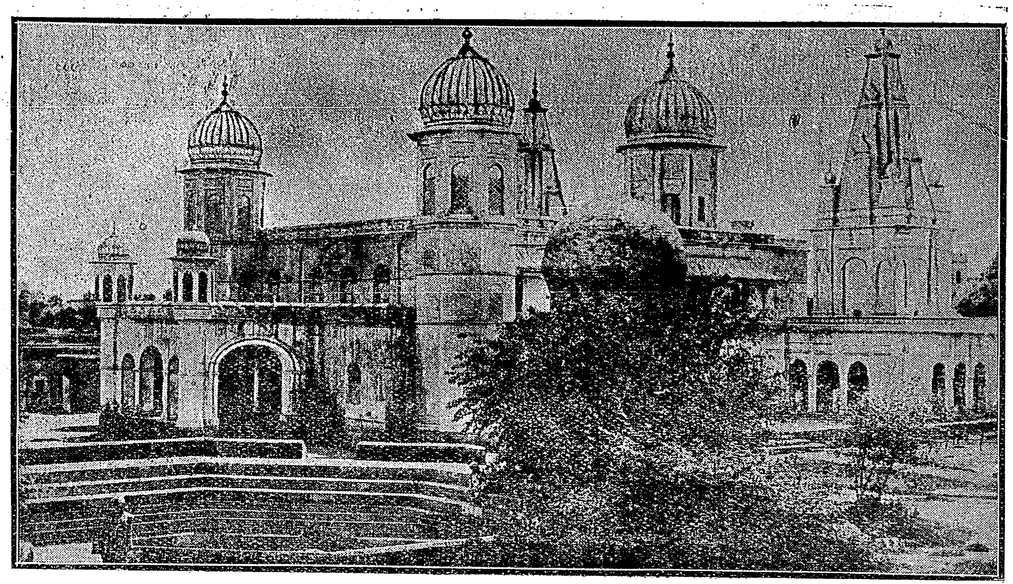

রঘুনাথজীর মন্দির—রাওয়ালপিণ্ডি

পাহাড়ের শ্রেণী। এত উঁচু, মনে হয়, ওধার থেকে এধারে অন্তরীক্ষ-পথ দিয়ে কোনো খেচরেরও বুঝি কোন কালে আসার সম্ভাবনা হবে না! গাড়ী যত এগোয়, পাহাড়ও তত সরে-সরে যায়—যেন লোভ দেখিয়ে আমাদের নিজের কবলে পুরোপুরি আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে! পাহাড়ের গায়ে পথের চিহ্নমাত্র অনুভব করা যাচ্ছিল না। আর তা যাচ্ছিল না বলে মনটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করছিল,—না জানি, কি দুর্গম পথ পাবো পাহাড় উত্তীর্ণ হতে! রাওয়ালপিণ্ডি থেকে

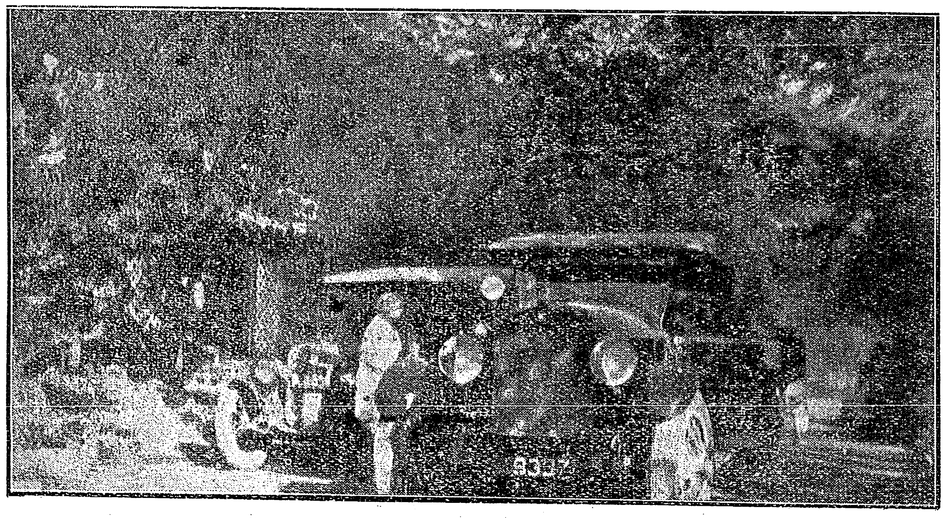

গড়হি ডাকবাংলা

১৩ মাইল দূরে পথ একটু চড়াই—একটু উঁচুতে যে উঠছি, তা বোঝা গেল। ১৭ মাইলে বরাকো—এখানে পথটা হুশ্‌ করে বাঁয়ে বেঁকে পড়েছে। শেষের চার মাইল গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ শ্যামল। বরাকোতে তিনখানি গাড়ীর জন্য টোল দিতে হলো ৬৷৵০, অর্থাৎ গাড়ী-পিছু ২৷৵০ করে। টোল্‌ যাত্রীদেরই দিতে হয়। টোল-ষ্টেশনের ধারে চায়ের দোকান—গরীব সরাই-খানার মত। তার সামনে ধূলিধূসর কাষ্ঠ-ফলকে লেখা আছে—"Welcome. Tea-Shop Very clean".

বরাকোয় বাঁয়ে বেঁকে একেবারে পাহাড়ের গায়ের উপর উঠলুম। ডাইনে উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর, তার পায়ের তলায় পথ, আর বাঁদিকে ২০০।৩০০ ফীট গভীর গহ্বর;

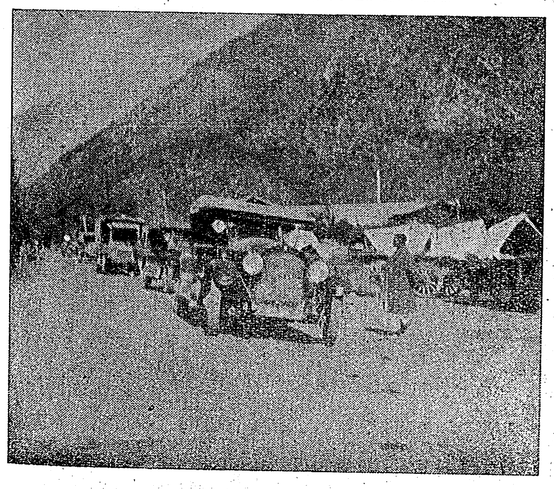

উরির বাজার

গহ্বরের ওপারে পাহাড় আর পাহাড়···ছোট বড় মাঝারি পাহাড়—যেন নগাধিরাজের ধনী-গৃহস্থ আর গরিব প্রজার দল সপরিবারে বাস করছে! দৃশ্যে বৈচিত্র্য খুব। বরাকোর টোল-ষ্টেশন একেবারে পাহাড়ের বুকে। বরাকো থেকে পথ উঁচু হয়ে চলেছে,—খুবই গোড়েন—উপরে মার্ব্বেল রাখলে গড়িয়ে পড়ে। বরাকোর ছ'

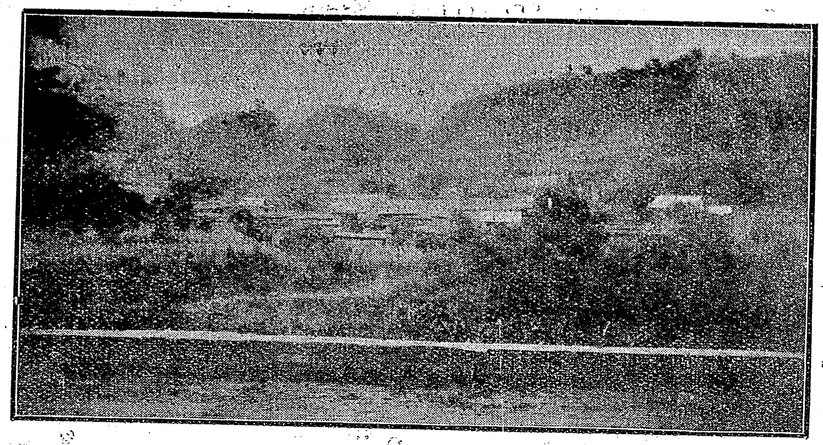

গড়হি ওপারে হাতিয়ান গ্রাম

মাইল পরে পাহাড়ের উপর ছত্তর গ্রাম। ছত্তরে নানা ফল-ফুলের মনোহর বাগান আছে। ছত্তরে বিশ্রাম-বাসের ব্যবস্থাও খাসা। এখান থেকে আবার চড়াই—ঠিক কোমর-বন্দের মত পথ ঘুরে ঘুরে উঠেছে। আরো চার মাইল পরে অর্থাৎ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে তেইশ মাইল দূরে একটী নদী পেলুম, নদীর নাম শৈলগা। নদীর উপর পুল আছে—নিরাপ্রদে সে পুল পার হয়ে আবার চড়াই। দস্তরমত উঁচু পথে উঠতে লাগলুম; ইংরাজী S হরফের মত বাঁকা পথ। গোটাচারেক বাঁক পার হয়ে চেয়ে দেখি, প্রায় চার-পাঁচ তলা উঁচু পথে উঠে পড়েছি!

এইখান থেকে পথের ধারে পাইন গাছের শ্রেণী নজরে পড়তে লাগলো। গাড়ী থামিয়ে এঞ্জিনে জল নেওয়া হলো। পাহাড়ের গা ফেটে মাঝে মাঝে ঝরণা ঝরেছে—কোথাও বা পাইপ দিয়ে ঐ ঝর্ণার জলকে সরু ধারে বহাবার চেষ্টা করা হয়েছে—লোকে যাতে এই জল সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারে! পাইপের মুখে বালতি পেতে যত-খুশী জল নাও। জল নেওয়া হলে গাড়ী চললো। পথ ক্রমে যত উঁচুতে উঠছে, বিভীষিকার মধ্যে তার গোপন সৌন্দর্য্য-মাধুরীও ততই ফুটে

বেরুচ্ছে! পথের একধার উঁচু পাহাড়ে ঘেরা—অপর দিকে চীর গাছের ঘন জঙ্গল। এই চীর গাছের নির্য্যাস থেকেই টারপিণ তেল তৈরী হয়। আমাদের এখানে যেমন তাল বা খেজুর গাছের গলার কাছটায় খানিক ছাল কেটে ভাঁড় বেঁধে তাল-খেজুরের রস সংগ্রহ করে, চীর গাছের গায়ে মাঝে মাঝে কেটে তেমনি সরু তার দিয়ে ছোট ছোট মাটীর গ্লাস বেঁধে দেছে—সেই সব গ্লাসে নির্য্যাস সংগৃহীত হয়। চীরের কি ঘন জঙ্গল, অথচ থাকে-থাকে কে যেন গাছগুলিকে সাজিয়ে পুঁতেছে! বিলাতী-ঝাউয়ের মত গাছগুলি দেখতে—পাতার গাঢ় সবুজ রঙে বাহার যা খুলেছে, চমৎকার!

অবশেষে ট্রেট্ বলে এক জায়গায় এসে পৌঁছুলুম। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ট্রেট সাতাশ মাইল। ট্রেটে ডাক বাংলা আছে; তার উপর বরাকোর মত চায়ের দোকান তিন-চার-খানি। সামনে লেখা আছে,—Your Refreshment Room —to the left. ডাহিনেও তাই। দোকানগুলির দেওয়াল মাটীর—মানুষ-ভোর উঁচু। পাহাড়ের গায়ে লাল-নীল-হলদে হরেক রঙের ফুলের গাছ—তাছাড়া ডালিম গাছের ঝাড়। কোনো ঝাড় ডালিমের লাল ফুলে আলো হয়ে রয়েছে, আবার কোনো ঝাড়ে থোলো-থোলো ডালিম ফলেছে। বাংলার সেই মিঠে ছড়াটা মনে পড়ছিল, "ডালিম-গাছে তোতা পাখী"···কিন্তু তোতা পাখীর দর্শন মিললো না! একটু পরেই দেখি, একটা পাহাড়ের মাথা এমন উঁচু—যে সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে মাথা ঘুরে যায়! তিন-তলা, চারতলা পাহাড়ের বুকে বিস্তর আবাদ-ক্ষেত, লোকের বসতি! পাহাড়ের গায়ে ছাগল চরছে। প্রকাণ্ড ছাগল ··· গায়ের রঙ পাঁশুটে আর কপালের উপর মস্ত বাঁকা শিং। আকারে রামছাগলের মত আর বেশ হৃষ্টপুষ্ট! এ জায়গার নাম শুনিব্যাঙ্ক। শুনিব্যাঙ্ক হলো ৬০৫০ ফুট উঁচু—এখানে একটা মদের ভাঁটী আছে (Brewery)। শুনিব্যাঙ্কে টোল দিতে হলো ৪৲ চার টাকা। যারা ম্যরিতে যাবে, এ টোল তাদের দিতেই হবে। যারা ম্যরিতে থাকবে না; ম্যরি পেরিয়ে আরো এগিয়ে যাবে, তারা রসিদ দেখিয়ে ম্যরিতে এ টাকা ফেরত পায়। বরাকো থেকে এই যে পাহাড়ের বুকের উপরকার পথ দিয়ে চলেছি, এ পথের নাম হলো ঝিলাম-ভ্যালি রোড। এই পথ রক্ষা করার জন্যই যাত্রীদের কাছ থেকে টোল সংগ্রহ করা হয়। যেখানে টোল দিলুম, সেখানে এক কাশ্মীরী মুসলমান বসে সারেঙ্গী বাজাচ্ছিল। পাহাড়ের উপর এমন গায়গা, আর তার সেই মিঠে সুর···আমাদের একেবারে বিমুগ্ধ করে তুললে! খানিক অপেক্ষা করে তার সুর উপভোগ করে বেলা এগারোটায় শুনিব্যাঙ্ক পার হলুম। শুনিব্যাঙ্কের দেড় মাইল পরে ম্যরি। ম্যরি সব-চেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর; ৭০০০

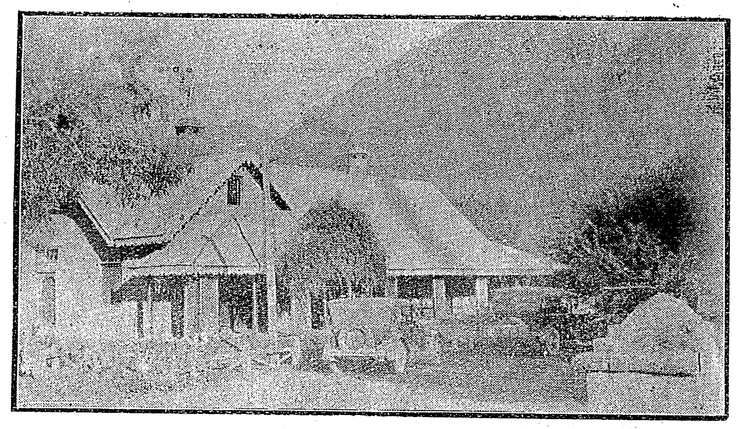

উরি—ডাকবাংলা

ফিট উঁচু। ম্যরি ক্যাণ্টনমেণ্ট মস্ত সহর—হাট, বাজার, বিলাতী দোকান, ফৌজের ছাউনি, চার্চ্চ, হোটেল, সিনেমা-হাউস, অভাব কিছু নেই! ম্যরিতে পৌঁছুলুম, ঠিক বেলা দুপুরে। ম্যরি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস; তাছাড়া ফৌজের মস্ত ছাউনি। এখানে রৌদ্রের তাপ প্রচণ্ড হলেও কষ্ট হচ্ছিল না। ম্যরীতে এসে দেখি, যে-সব পাহাড় বনজঙ্গল আমাদের মাথার বহু উপরে প্রায় আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকছিল, সেগুলো আমাদের কত নীচে যে নেমে পড়েছে! চীর গাছের জঙ্গল, পাইনের শ্রেণী—আর ঘোরা-বাঁকা পথ; নীচে খাদ এত গভীর—সে যেন পৃথিবীর বুকখানা ফেটে পাতালের কোন্ বিরাট গহ্বর প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে

হাঁ করে পড়ে আছে! দেখলে শুধু চক্ষু স্থির নয়, মাথা অবধি ঘুরে যায়! যদি গাড়ী একটু বেসামাল হয়, ড্রাইভার যদি একটু অন্যমনস্ক হয়, তা হলে গাড়ীশুদ্ধ কোথায় কত নীচে যে গিয়ে পড়বো,—কারো হাড়-পাঁজরার চিহ্ন থাকবে না, গাড়ীসমেত গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবো! তার পর পাহাড়ও কি অমন একটা! পাহাড়ের পর পাহাড়, তার পর পাহাড়! সংখ্যা নেই! আতঙ্ক হলো এই ভেবে যে, এত পাহাড় পার হয়ে কোথায় সেই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর—সেখানে পৌঁছুনো কি আর সম্ভব হবে! অথচ পেছুবার কথা মনে হলেও গা শিউরে ওঠে! এই সাত

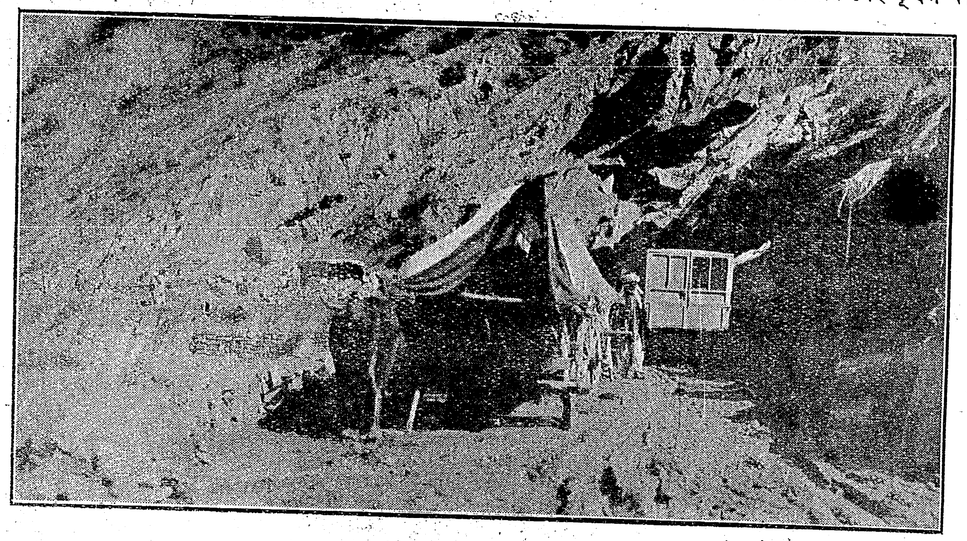

উরি—ধ্বসা পথ

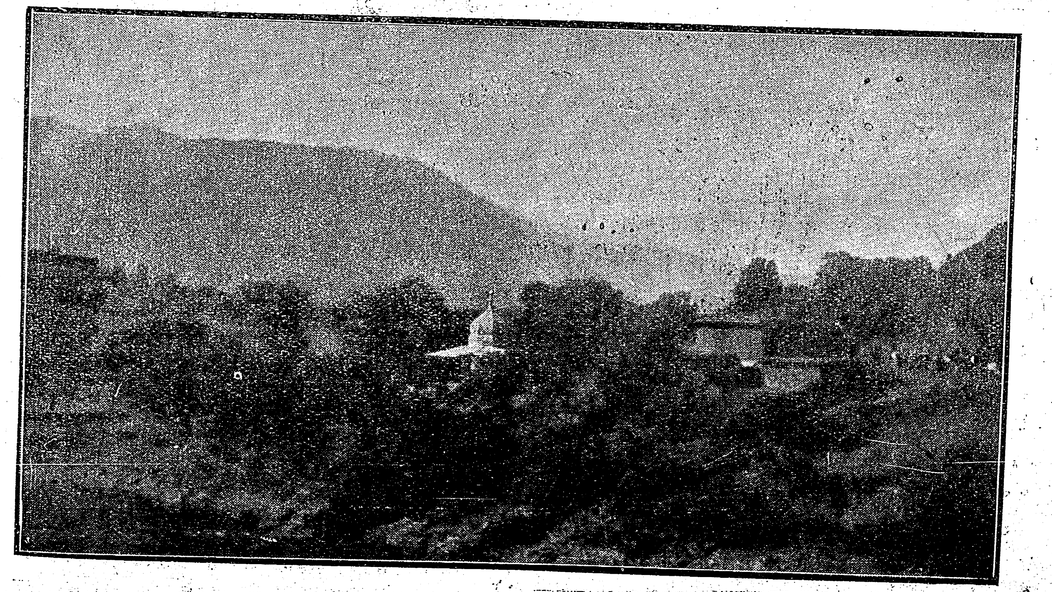

ডোমেল—অদূরে কিষণগঙ্গা নদীর তীরে বিষ্ণুমন্দির

হাজার ফিট উঁচু পাহাড় থেকে গড়ানে বাঁকা পথে নামতে হবে! গা শিউরাবার কথাই! এ পথে দুর্ঘটনাও খুবই হয়! এলাহাবাদে ললিত বাবুর কাছে এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে শেঠী সাহেবের কাছে শুনেছিলুম, ড্রাইভারের গোঁয়ার্ত্তুমি বা বেহুঁসিয়ারিতে কিম্বা গাড়ীর কলকব্জা ঢিলে হয়ে কত গাড়ী কত লরি অমন কত লোকজন-মালপত্রসমেত যে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার আর সংখ্যা নেই! তাছাড়া উল্টো-মুখ থেকে হু-হু হাওয়ার গতিতে মোটর আসছে! কোথায় কোন্ বাঁকের মুখে হর্ণ না দিয়েই একদম্ সাম্নে পড়লো—এমনও হয়। এ-পথে একটা জিনিষের দিকে হুঁশিয়ার হয়ে চল্‌লে কতক

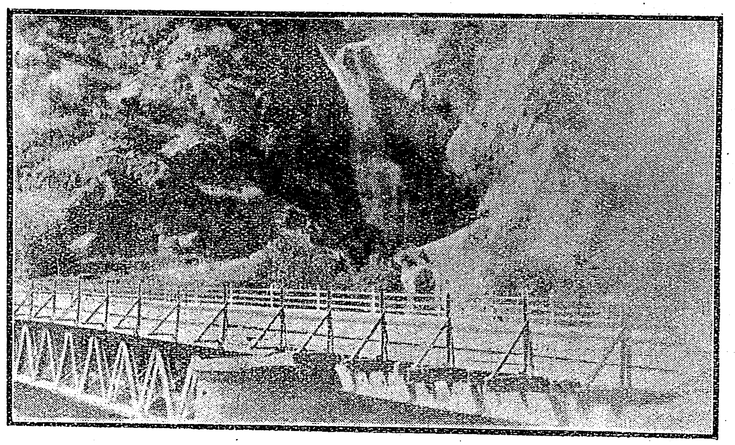

ওপিনালার উপর পুল

নিরাপদ—সামনের পথে ধূলোর ঘূর্ণীচক্র দেখলে বুঝতে হবে, আগে গাড়ী আছে। সেই বুঝে হর্ণ দিয়ে সতর্কভাবে গাড়ী চালানো চাই, না হলে বিপদের আশঙ্কা। কাজেই আতঙ্ক হওয়ায় ত্রুটি ছিল না।

ম্যরি থেকে পথ আবার নামতে সুরু হলো। সে কি নামা—বাঁকের পর বাঁক পার হয়ে নেমে চলেছি তো নেমেই চলেছি! ভাগ্যে গাড়ীর নামা, তাই রক্ষা! মানুষকে এমন ছুটে নামতে হলে কখন্ হয়তো বেদম্ হয়ে উল্টে ঠিকরে পড়তো! সে পথ-নামার ভঙ্গী খুবই রোমাঞ্চকর ব্যাপার! নেমে নেমে একটা পাহাড়ের ঝর্ণার ধারে বেলা সাড়ে বারোটায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে লুচি-তরকারী ফল-মূলে টিফিন সারা হলো। তারপর ঝর্ণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে ১২-৫৫ মিনিটে আবার গাড়ী ছাড়লুম। ম্যরী থেকে দশ মাইল পরে দেওয়ালী—দেওয়ালী ২৫০০ ফিট উঁচু। ৭০০০ ফিট থেকে একেবারে ২৫০০ ফিটে নামা—যে নেমেছে, সেই জানে, আতঙ্কের সঙ্গে আমোদ এতে কতখানি! সামনে-পিছনে আশেপাশে সবুজ জঙ্গল আর পাহাড়ের দৃশ্য আগাগোড়া রমণীয়। এইখান থেকে আবার উঁচুতে ওঠা। যাকে বলে Zigzagging, এ পথে তাই। গাছের ছায়া নেই—পাহাড়ের পথ এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছে। দেওয়ালী থেকে প্রায় আট মাইল পরে ঝিলামের সঙ্গে দেখা হলো। দুধারে উঁচু পাহাড়—মাঝখানে বড় বড় শিলা-পাথরে গতি প্রতিহত হয়ে নাতিপ্রশস্ত স্রোতস্বিনী বিপুল স্রোতে নেমে নেমে চলেছে। সে-স্রোতে কাঠ ভেসে আসছে—পঞ্জাবে ঝিলাম ষ্টেশনের কাছে যেমন দেখে ছিলুম। বেলা দুটোয় কোহালায় এসে পৌঁছুলুম। কোহালার বাঁ দিকে পাহাড়ের কাঁধে ডাকবাংলা, পোষ্ট অফিস—ডাহিনে ঝিলাম নদী সগর্জ্জনে শিলাস্তূপে তরঙ্গের আঘাত দিতে দিতে বয়ে চলেছে। কোহালা হলো ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানা। কোহালায় মস্ত পুল ঝিলামের ওপারের পাহাড়কে আঁকড়ে ধরেছে—কোহালার ওপার থেকেই কাশ্মীর-রাজ্য। এখানেও টোল্ দিতে হলো। এখানে পেট্রোল পাওয়া যায়। আমরা পেট্রোল নিলুম—তার পর বেলা ২-৫৪ মিনিটে পুলের উপর উঠলুম। পুল পার হয়ে বেলা ২।৫৬ মিনিটে কাশ্মীরের হিন্দুরাজ্যে পদার্পণ করলুম। হিন্দুরাজ্য! নিমেষে প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো যেন চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠলো।

ঝিলাম এতক্ষণ ছিল আমাদের ডাইনে—এবার আমরা এলুম ডাইনে, ঝিলাম বাঁদিকে পড়লো। কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করবা মাত্র গাড়ীর ড্রাইভারদের নাম আর

গাড়ীর নম্বর একজন কর্ম্মচারী note করে নিলেন। এঁর আফিস-ঘরটী ঠিক পুলের প্রান্তে; পাকা ঘর। পথের ধারে লেখা আছে, Beware of Boulders. লেখা দেখেই গা ছমছমিয়ে উঠলো। এতক্ষণ যে পথ দিয়ে এলুম, সেখানে উঁচুতে ঝুলন্ত পাথর পাহাড়ের গায়ে দেখেছি বটে—কিন্তু সে পথে পথিককে সতর্ক করার জন্য কোনো লেখা ফলক দেখিনি। এখন অকস্মাৎ লেখা দেখে মনে হলো, এ পথের ঝুলন্ত পাথর তাহলে একদম্ অচঞ্চল নন্—তাঁর গড়িয়ে পড়ার অভ্যাস তাহলে রীতিমত আছে! নাহলে হুঁশিয়ার করার দরুণ এ ফলক থাকবে কেন? এ পথে

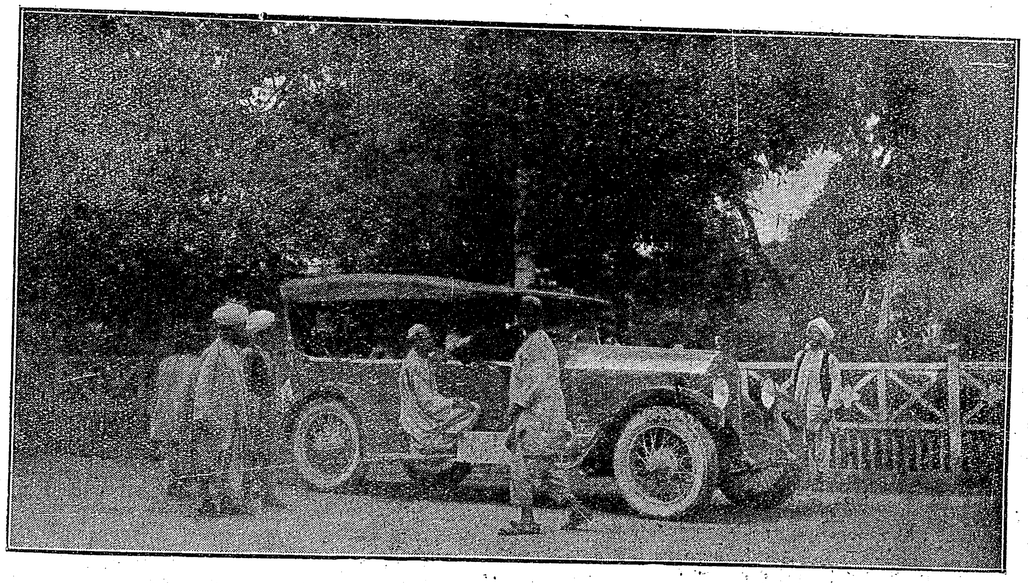

শ্রীনগরে পৌঁছানো

প্রায় পাঁচ মাইল আসার পর এক টানেল পার হলুম—তাছাড়া ছোটখাট কয়েকটি পুলও পার হতে হলো। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়, মাঝখানে গভীর খাদ—এই পুল ছাড়া পার হবার উপায়ও নেই। মাঝে মাঝে দেখলুম, পুরানো পুল ভেঙ্গে পড়ে গেছে, তার কাছে নূতন পুল তৈরী হয়েছে অর্থাৎ পাহাড়ের উন্নত অবয়ব আর ঐ খাদ, গহ্বর, নদী—এ যেন প্রকৃতির খেয়ালের মতই দাঁড়িয়ে আছে। দরদ জানে না, মমতার ধার ধারে না—যখন খুশী খেলার ছলে ভেঙ্গে ধ্বসে পড়লেই হলো—তাতে মানুষ বা গাড়ী চাপা পড়ুক বা তাদের অদৃষ্টে যাই ঘটুক!

কোহালার বারো মাইল পরে দুলাই। দুলাইয়ে ঝিলামের দিকে পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত ডাকবাংলাখানি দেখতে যেন ছবির মত! লেডি রিপন এই বাংলায় কিছুদিন বাস করেছিলেন; তিনি এর নাম দেন Honeymoon Cottage. Honeymoon-যাপনের পক্ষে এ কটেজ—এ যেন কোন্ কল্পনায় গড়া মায়াপুরী! এখানকার পথ পাহাড়ের গা কেটে তৈরী। অল্প বৃষ্টি হলে প্রায়ই পাহাড় ধ্বসে পড়ে! দুলাই থেকে পথ ঘুরে ঘুরে গেছে—কখনো নেমে ঝিলামের জলের কাছে গিয়েছে, আবার হঠাৎ বনজঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে বহু ঊর্দ্ধে অমন আট-দশ তলার সমান উঁচুতে উঠে গেছে! দুলাই থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে ডোমেল। ডোমেল ২১৭১ ফিট উঁচু। এখানেও ডাকবাংলা এবং পোষ্ট অফিস আছে। বেলা ৪।১৫ মিনিটে আমরা ডোমেলে পৌঁছুলুম। ডোমেলে ঝিলামের সঙ্গে কিষণগঙ্গা ও কোন্‌হার নদী মিশেছে; বাঁয়ে চমৎকার পুল। সেই পুল পার হয়ে বাঁদিকে যে পথ, সে পথ গেছে এ্যাবটাবাদ—সিধে পথ শ্রীনগরে গেছে। পুলের অদূরে কিষণগঙ্গা নদীর তীরে বিষ্ণু-মন্দির; তার পিছনে এক প্রাচীন শিখ-কেল্লা আছে। ডোমেলে কাষ্টম অফিস। এখানে টোল দিতে হলো—তার পরে সরকারী খাতায় আমাদের

নাম-ধাম, কোথায় যাচ্ছি, কতদিন থাকবো, সঙ্গে বন্দুক আছে কি না, কার্টরিজ আছে কত, এই সব পরিচয় লিখিয়ে, বন্দুকের লাইসেন্স দেখিয়ে পাঁচটায় আবার গাড়ী ছাড়া হলো। আঁকা-বাঁকা পথে কখনো উপরে উঠি, কখনো নীচে নামি—এইভাবে খানিক এসে এক সুন্দর ঝর্ণা দেখলুম। ঝর্ণার নাম যশকুল। বেলা পড়ে আসছিল—বেলা ৫।২০ মিনিটে পৌঁছুলুম গড়হি। গড়হির ডাকবাংলাখানি একেবারে পাহাড়ের গায়ে। পথের বাঁ দিকে ঝিলাম। ঝিলাম এখানে বেশ প্রশস্ত হয়েছে। গড়হির ওপারে পাহাড়ের ধারে হাতিয়ান্ গ্রাম; হাতিয়ান কাশ্মীর ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত। ওপারে নদীর ধারে কাশ্মীরী রমণীরা এই সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্নান করছিলেন,—অস্তগামী সূর্য্যের কিরণচ্ছটা, আর তাঁদের অঙ্গে ঐ দুধে-আলতার রং, বাহার যা খুলেছিল···নদীর জলে যেন কমলের মালা ভাসছে! যেমন রূপশ্রী, তেমনি দেহের গড়ন—সুডৌল, সুঠাম, নাক-মুখ-চোখ একেবারে নিখুঁত! নদীর তীরে ঘাগরা খুলে রেখে 'সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণে তাঁরা জলে নামছিলেন এমন অসঙ্কোচে যে, দেখ্‌লে অবাক্ হতে হয়! তীর পথে লোক চলেছে—সেদিকে লক্ষ্যমাত্র নেই!

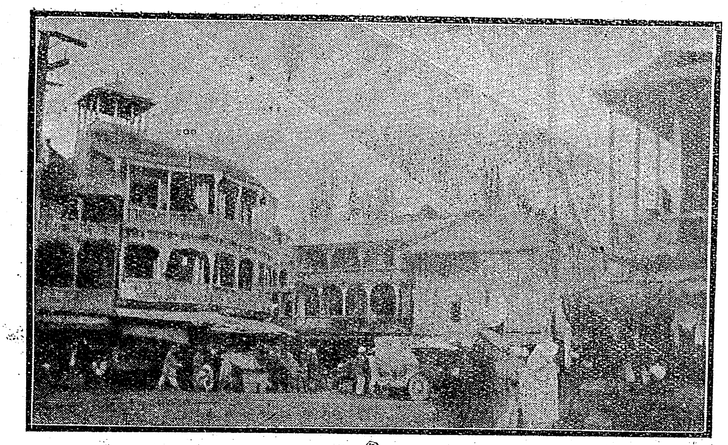

শ্রীনগর—বাজার

গড়হির ডাকবাংলাটি খুব প্রশস্ত—বারো-চৌদ্দটী কামরা, বহু বাথরুম—তাছাড়া য়ুরোপীয় ও কাশ্মীরী খানার বন্দোবস্ত আছে। রাত্রির মত এইখানেই আস্তানা পাতবো স্থির করে গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করলুম। হিন্দু কিচেনে কাশ্মীরী খানার ফরমাশ দেওয়া গেল। তারপর গরম জলে স্নান সেরে আহারাদি করে শয়ন করা গেল।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই কাশ্মীরী খানা ও টিফিনের ফরমাশ করলুম। আগের রাত্রে খুব বৃষ্টি বজ্রাঘাত হয়ে গেছলো। ভোর থেকেই এমন শীত পড়লো যে গরম গেঞ্জি, ভায়েলা সার্ট, গরম কোট, ওভার কোট, এমন কি মাফলার পর্য্যন্ত বার করতে হলো। তারপর তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারবার পালা! হিন্দু-কিচেনে খাওয়ার বন্দোবস্ত খুব ভালো। লোকজন সাম্‌নে বসে যত্ন করে খাওয়ায়। কি চাই? যত খুশী খাও! কেল্‌নার বা য়ুরোপীয় আদর্শের বাঁধা-ধরা গোণা রকম খাওয়ানো নয়। ডাল, রুটী আর মাংস—এ তিনটি রান্নাও ভারী পরিপাটি।

আহারাদি সেরে বেলা ঠিক আটটায় গড়হি ছাড়লুম। গড়হিতে একটি ঠাকুর-বাড়ী আছে; সেখানেও যাত্রীদের বাসের ও আহারের ব্যবস্থা আছে।

গড়হির একটু আগে ঝিলামের উপর ঝোলা পুল। নদীর অপর পারে একটা পুরানো দুর্গের ধ্বংস-স্তূপ পড়ে আছে। শিখদের সঙ্গে এখানে পাহাড়ীদের এক যুদ্ধ হয়েছিল সেকালে। পাথর ছুড়ে পাহাড়ীরা বহু শিখকে জখম করে।

গড়হি থেকে ষোল মাইল পরে চেনারি। চেনারিতে একটি বড় ঝরণা আছে। এখানে পথ বহুবার ধ্বসে ভেঙ্গে গেছে, এবং বারবার সরকারকে সে পথ সাফ করিয়ে নতুন পথ তৈরী করতে হয়েছে। পথ সর্ব্বক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য বহু কর্ম্মচারী মজুৎ আছে। যেখানে ভাঙ্গছে বা ধ্বসে পড়ছে, সেখানে অমনি লোক লাগছে পথ মেরামত করতে।

চেনারির আঠারো মাইল দূরে উরি। উরির দৃশ্য-সৌন্দর্য্যের আর তুলনা নেই! চারিদিকে উঁচু-উঁচু পাহাড়···এর পাশ দিয়ে

ওর গা ঘেঁষে সে-সব পাহাড় ঘুরে এসে নদীর তীরে বাজারের সামনে দাঁড়ালুম। বেলা তখন দশটা। ডানদিকে বাজার; বাজারের অপরদিকে সুদৃশ্য ডাকবাংলা। এখানে সাদা কাক দেখলুম। তাছাড়া দেখি, উরিতে বহু মোটর আর লরি ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মেল-ভ্যানের একজন কর্ম্মচারী আমাদের জানালেন, আগের রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড় ধ্বসে সামনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে—প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে—তবে পথ সাফ হবে। তখন গাড়ী থেকে নেমে চারধারে বেড়ানো গেল। বাজারে ঢুকে আপেল, নাশপাতি, আখরোট, বাদাম প্রচুর কিনলুম। আখরোট দু' আনা চার আনা করে শ'।

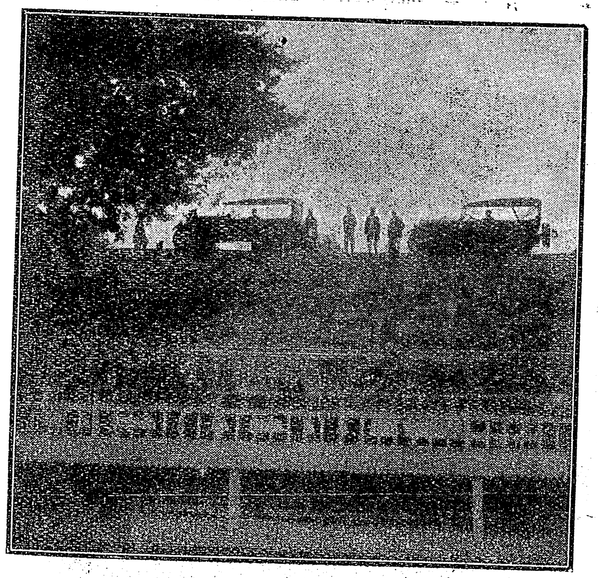

চেনার বাগ হাউস বোটে পৌঁছানো

খোলা এমন নরম—দু আঙুলে টিপে ধরলেই ভেঙ্গে যায়! এগুলোকে বলে কাগ্‌জী আখরোট, কি তার স্বাদ—তেলা গন্ধ মোটে নেই!

দেড় ঘণ্টা পরে পথ সাফ হয়েছে শুনে আবার অগ্রসর হলুম। পথ তখনো সাফ হচ্ছে। সন্তর্পণে সে জায়গা পার হয়ে আবার গাড়ীর গতির বেগ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। পথ একই রকম···সেই ওঠা আর নামা, নামা আর ওঠা! উরির পর ঝিলামের শরীর আবার শীর্ণ হয়েছে। দূরে পীর-পাঞ্জাল পাহাড়ের দীর্ঘ শ্রেণী। উরি থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে পথের ধারে এক ভাঙ্গা মন্দির—মন্দিরটার নাম ব্রাঙ্কুটীর। ব্রহ্মা-কুটীর নয় তো? মন্দিরের পর থেকে পথ একটু সমতল হয়েছে। এর একটু আগেই রামপুরের ইলেকট্রিক পাওয়ার-হাউস। এখান থেকে শ্রীনগর অবধি ইলেকট্রিকের তার গেছে কাঠের ঢাকার মধ্য দিয়ে। এখানে একটি চমৎকার পুল পার হলুম। পুলের নীচে মস্ত ঝর্ণা বয়ে চলেছে; নাম ওপিনালা। একটি জীর্ণ মন্দির দেখলুম, ভনিয়ার মন্দির। মন্দিরের দু' মাইল আগে নৌশেরা গ্রাম। নৌশেরার তিন মাইল আগে থেকে ঝিলামের অঙ্গ আবার প্রশস্ত হয়েছে। সামনের পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমে লুপ্ত হয়ে এলো। শুধু কাশ্মীরের উত্তরে হিমালয়ের একটা অংশ নাঙ্গা পর্ব্বত (২৬৯০০ ফিট উঁচু) আর হরমুখ শৃঙ্গ (১৬৯০০ ফিট উঁচু) মাথায় তুষার কিরীট পরে' দাঁড়িয়ে আছে! সূর্য্যের কিরণ শুভ্র তুষারের উপর পড়ে' তার রংটাকে কতক ঘোলাটে মেটে গোছ করে তুলেছে! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন পাহাড়ের মাথায় কে অজস্র নুন ছড়িয়ে রেখেছে! মাঝে মাঝে কাশ্মীরী বস্তী। বস্তী পার হবার পর দুধারের পাহাড়ের কপাট যেন কে খুলে দিলে! সামনে সমতল প্রান্তর—সবুজ তৃণলতায় সমাচ্ছন্ন! শস্যের প্রাচুর্য্যের আর সীমা নেই! ক্রমে বারামুলায় পৌঁছুলুম। বারামুলায় বহু লোকের বাস। ঝিলামের বুকে ক'খানা হাউস-বোট দেখা গেল; তার পর ফলের বাগান। পথের দুধারে অসংখ্য বাগান···আপেল-নাশপাতির ভারে গাছের ডাল একেবারে নুয়ে পড়েছে! এমন লোভ হচ্ছিল···বাগানে ঢুকে পড়ে সেই তাজা পাকা ফল পেড়ে খাবার জন্য! ডাইনে পথের ধারে কাষ্ঠফলক, তাতে লেখা Way to Gulmarg. ডানদিকে তুষার-মণ্ডিত গুলমার্গ পর্ব্বতও দেখা গেল।

বারামুলা থেকে পথের দুধারে পপলার গাছের শ্রেণী। গাছগুলি সোজা সুপুরি গাছের মত উঠে গেছে—মাথার কাছে ঝাঁকড়া পাতার গোছা·····ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি পথের দু'ধারে এই গাছ যেন সুদীর্ঘ পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পথে চেনার গাছের দেখা মিললো। গাছগুলি আমাদের বট-অশথের

মত। পাতাগুলি বড় বড়, আঙুরের পাতার মত দেখতে।

এই চেনার গাছ পারস্য থেকে আমদানি। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই গাছ কাশ্মীরে আমদানি করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লাহোরে এই গাছ পুঁতিয়েছিলেন, কিন্তু লাহোরের মাটীতে এ গাছ গজালো না! কাশ্মীরেই এই গাছের প্রাচুর্য্য, তা'ও বারামুলা থেকে! বারামুলা থেকে বাঁয়ে পথ গেছে সোপুর। সোপুর থেকে উলার হ্রদে যেতে হয়। বারামুলা থেকে প্রায় ১৭ মাইল পরে পাটন গ্রাম। পাটনে বড় বড় মাঠ চেনার গাছে ঘেরা। মাঠে তরুণী কাশ্মীরী রমণীরা ঝুড়ি হাতে কেউ কাঠি-কুটো গাছের ভাঙ্গা ডালপালা কুড়োচ্ছে, কেউ বা রৌদ্রে-দেওয়া ঘুঁটের তদ্বির করছে! পরণে রঙীন ঘাগরা আর রূপের প্রভায় দেহের গড়নে ঐ মুক্ত প্রান্তরে যেন কোন্ পরী-রাজ্যের বিচিত্র স্বপ্নকাহিনীর আভাস জাগিয়ে তুলেছে! কাশ্মীরী নারীর রূপের খ্যাতি ভুবন-জোড়া···সে খ্যাতির মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি নেই! এই সব গরিব কাঠ-কুড়ুনির মেয়েরা কোনো রাজার সিংহাসনে বস্‌লে সিংহাসন তাদের রূপের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! তারা ডাগর চোখ তুলে ব্রীড়াহীন অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে আমাদের গাড়ীর পানে মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তাদের দেখে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দে মন থেকে প্রশ্ন জাগছিল,···

কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!

প্রান্তর-বুকে এই রূপ সুষমা কবির চিত্রকরের কল্পনার ঋণী বইয়ে দেয়!

পাটন থেকে ১৮ মাইল পরে শ্রীনগর। শ্রীনগরের সীমায় এসে দেখি,সামনে ঝিলাম, দু'ধারে পথ দুখানি হাতের মত ডাহিনে আর বাঁয়ে বিস্তারিত রয়েছে। কোন্ দিকে যাবো, প্রশ্ন করবো বলে গাড়ী থামানো হলো। অমনি দলে দলে লোক এসে ছেঁকে ধরলে। রবিবাবুর সেই কবিতা মনে পড়ছিল—লাগিল পাণ্ডা নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত! লোকগুলো কত আশাই যে দিতে লাগলো—হাউসবোট দেবে, হোটেল দেবে ইত্যাদি। আমরা জানালুম, রাওয়ালপিণ্ডির এন্, ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির অফিসে আমরা যেতে চাই। একটী ছোকরা গাড়ীর ফুটবোর্ডে চট্ করে বসে পড়লো, বললে, —আমি পৌঁছে দেবো, জী হুজুর।

তাকেই গাইড করে গাড়ী ছাড়লুম।

ডান দিকে বেঁকেই শ্রীনগরের বাজার। বাজার পার হয়ে বাঁয়ে আমীরা কাদাল বা ফাষ্ট ব্রিজ। এই পুল পার হয়ে শ্রীনগরে প্রবেশ করলুম। পুল থেকে বাঁ দিকে নদীর গায়ে মহারাজার প্রাসাদ দেখা গেল। কাদাল অর্থে পুল। ঝিলামের উপর এই শ্রীনগরে সাতটি পুল আছে।

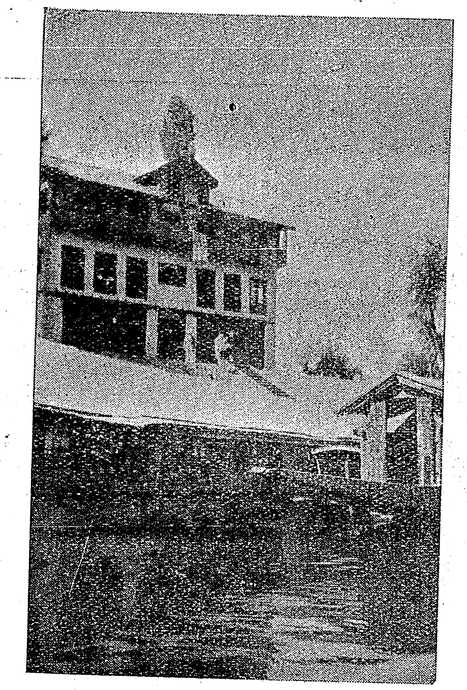

চেনার নালা

অচিরে এন্, ডি, রাধাকিষণের অফিসে এসে পৌঁছুলুম। পরিচয় পাবা মাত্র তাঁদের এক কর্ম্মচারী গাড়ীর সঙ্গে এসে আমাদের চেনার-বাগে নিয়ে গেলেন। চেনার বাগের মধ্যে চেনার নালা। এই চেনার নালায় আমাদের জন্য দুখানি হাউসবোট তাঁরা ঠিক করে রেখে ছিলেন। একটির নাম Cutty Shark, অপরটির নাম Vishnu Vavan. দু'খানি হাউস-বোটের সঙ্গে দুখানি কিচেন-বোট এবং

দুখানি শিকারাও আছে। শিকারা ছোট পান্সীর মত; তবে পান্সীর চেয়ে ছোট এবং ঢের হাল্কা। এই শিকারার অর্থ Pleasure-boat, এতে চড়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও।

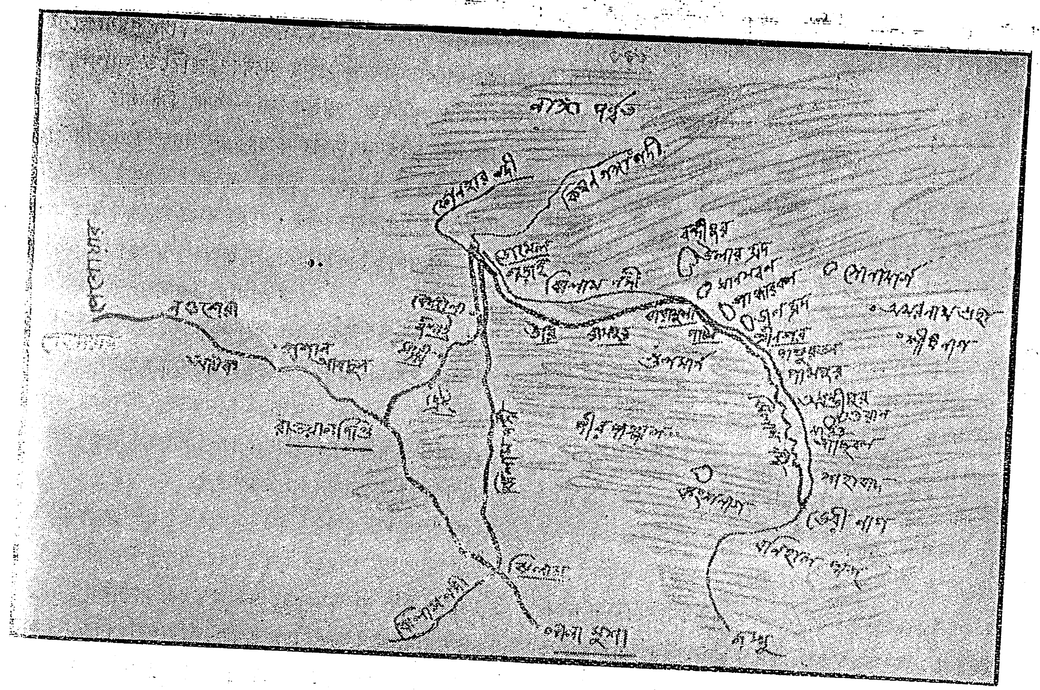

ম্যাপ

বেলা তিনটার সময় হাউস-বোট অধিকার করলুম। ২রা সেপ্টেম্বর কলকাতা ছেড়েছিলুম—১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীনগর। পথে বিশ্রামের জন্য বহু সময় ব্যয় করেছি; তার দরুণ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য এতটুকু ভোগ করতে হয়নি—কারো একদিনের জন্যও মাথা ধরা বা কোন অস্বস্তি বোধ হয় নি। এই দীর্ঘ পনেরো দিনে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত··· সুদীর্ঘ পাড়ি—নব নব দৃশ্যে প্রাণ যে কি আনন্দ পেয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

তারপর শ্রীনগর·····তার শোভা-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। কাশ্মীরকে কেন যে ভূস্বর্গ বলা হয়, আর তা বলায় যে কেন অত্যুক্তি দোষ হয় না, সে পরিচয় আগামী সংখ্যার জন্য মুলতুবি রইলো।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১১]

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সমস্ত দিন নিরবসর পরিশ্রমের পর সরমা গাত্রধৌত করিয়া তাড়াতাড়ি কলঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দ্বারে দ্বারে জল-সিঞ্চন করিল। একটি মৃণ্ময় দীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে আলো দেখাইয়া গৃহাঙ্গনের তুলসীমঞ্চে তাহা স্থাপন করিল; তাহার পর তিনবার শাঁখ বাজাইয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া প্রণাম করিতে বসিল।

অন্য দিন অপেক্ষা দীর্ঘ সময় প্রণামে অতিবাহিত করিয়া যুক্ত-করে উঠিয়া বসিতেই সহসা অতর্কিতে তাহার দুই

চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এই নিত্য-সেবিত গৃহ-দেবতাকে সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়ার আজ শেষ দিন! কাল প্রাতে এই কল্যাণ-পূত আশ্রয়, বহু সাধের শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সরমা মনে মনে বলিল, "হে মা তুলসী, শীঘ্র যেন তোমার কৃপায় স্বামী নিয়ে আবার এ বাড়ীতে ফিরে আসতে পারি।"

অর্থার্জ্জনের অন্য কোনো উপায় করিতে না পারিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে রমাপদ তাহাদের বাস গৃহটি মাসিক কুড়ি টাকায় ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের বাসের জন্য একটি ক্ষুদ্র গৃহ আট টাকায় ভাড়া লইয়াছিল। এইরূপে অর্জ্জিত মাসিক বার টাকার দ্বারা আর কিছু না হউক একান্ত অনাহার হইতে ত' পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে! রসনার পরিতৃপ্তি না হউক, জঠরের ক্ষুধা নিবৃত্তি ত' কোনো প্রকারে হইবে!

সমস্ত দিন রমাপদ, সরমা এবং বিশুয়া, তিনজনে মিলিয়া, দ্রব্যাদি গুছাইতে ব্যস্ত ছিল; অপরাহ্নে রমাপদ বিশুয়াকে লইয়া নূতন গৃহ ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কৃত করিতে গিয়াছে। পরদিন বৈকালে ভাড়াটিয়াকে এ গৃহ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

স্তব্ধালস ভাবে সরমা তুলসীতলায় বসিয়া রহিল। সমস্ত দিন পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়া, এখন যেন সহসা তাহার দেহ হইতে শক্তি, এবং মন হইতে উৎসাহ, নিঃশেষে বাহির হইয়া গিয়াছিল। সে বসিয়া বসিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল; শুধু সামর্থ্য নহে—উঠিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত যেন তাহার ছিল না।

দেহ-মনে সরমা দুর্ব্বল নহে। শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু, স্বামীর দারিদ্র্য, সংসারের দুঃখ-দৈন্য সে যেমন করিয়া বহন করিতেছিল, সতের বৎসর বয়সের অতি অল্প মেয়েই তেমন করিয়া পারে। কিন্তু চিরদিনের কার্য্যক্ষম শক্তিশালী স্নায়ু পক্ষাঘাত রোগে যেমন কোনো এক মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ নির্জ্জীব হইয়া যায়, তাহার চিরাভ্যস্ত সাহস এবং ধৈর্য্য সহসা আজ তাহাকে ঠিক সেইরূপে পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল। যে সংসারের সুখ দুঃখের সহিত সে এত দিন হাসিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছে, যাহার বক্ষঃমাঝে আশ্রয় নীড় বাঁধিয়া সে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিয়াছে, সহসা আজ ম্লানায়মান সন্ধ্যার কুহকজালের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার একান্ত নিরাশ্রয়নীয়তা উপলব্ধি করিয়া সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইল স্তব্ধ উদাস গৃহের এই পরিপূর্ণ সঙ্গিহীনতা যেন আসন্ন ভবিষ্যতের অশুভ ছায়াপাত, তাহার নির্ভরহীন নিরবলম্ব জীবনের অভিসূচনা। অন্ধকারে মানুষে যেমন দুই হাতে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ায় সরমা সেইরূপ ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিকে সহায় অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না—এমন কি তাহার স্বামীকে পর্য্যন্ত নহে! তখন অধীর ভাবে সে নিজের এই বিপর্য্যস্ত অবস্থা সম্বরণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন ভাসিবার জন্য যতই ব্যগ্র হইয়া উঠে ততই ডুবিতে থাকে, বিলীয়মান শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে গিয়া সে তেমনি ততই শক্তি হারাইতে লাগিল।

সদর দ্বারে কড়া নাড়ার শব্দ পাইয়া সরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। অবচ্ছিন্ন বহির্জগতের এইটুকু মাত্র সাড়া পাইয়া সে তাহার অপহৃত শক্তি অনেকটা ফিরিয়া পাইল। তাড়াতাড়ি একটা হাত-লণ্ঠন জ্বালিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও, সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

চাপা গলায় বাহিরে উত্তর হইল, "সে।"

সরমা দ্বার খুলিয়া দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

রমাপদ প্রবেশ করিয়া অর্গল লাগাইয়া দিল; তাহার পর বারাণ্ডায় উপস্থিত হইয়া স্ত্রীর বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি? ভয় করছিল না কি সরমা?"

"করছিল।"

"ভূতের?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "না; ভবিষ্যতের।" তাহার পর স্বামীর বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হস্তের মধ্যে তাহার দুই হস্ত গ্রহণ করিয়া উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ভবিষ্যতে আমাদের সংসার ঠিক চলবে বলে তোমার মনে হয়?"

এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া রমাপদ বলিল, "হঠাৎ, এ কথা তোমার কেন মনে হল বল ত?"

রমাপদর হস্তদ্বয়ে মৃদু চাপ দিয়া সরমা বলিল, "তাই জিজ্ঞাসা করছি! বল না, চলবে?"

এ বিষয়ে রমাপদই এ পর্য্যন্ত সরমার নিকট হইতে যাহা

কিছু আশা এবং আশ্বাস পাইয়া আসিয়াছে—আজ সহসা সরমাকে এরূপ দুর্ব্বল দেখিয়া সে তাহার শীর্ণ সাহসকে তাড়না দিয়া বলিল, "চল্‌বে না ত' কি হবে? নিশ্চয়ই চল্‌বে।" তাহার পর সরমার স্কন্ধে বাম হস্ত স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "তাছাড়া চালাবার তোমার যা অদ্ভুত শক্তি আছে, না চলে ত' উপায় নেই!"

ঈষৎ আবেগের সহিত মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "না, না, আমার একটুও শক্তি নেই! তা' যদি থাকৃত তা হ'লে আমি কখনই তোমাকে এ বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ী যেতে দিতাম না!"

"তা দিচ্ছই বা কেন? এ বাড়ী ছেড়ে যেতে তোমার এতই যদি কষ্ট হয়, তা হলে না হয়——"

রমাপদর অসমাপ্ত বাক্য অনুসরণ করিয়া সরমা বলিল, "তা হলে না হয়,—কি?"

"তা হলে না হয় যাওয়া বন্ধ করে দিই।"

একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সরমা বলিল, "না, তা' হয় না। তা'হলে খাওয়াও বন্ধ করে দিতে হয়!"

কথাটা শ্রুতিকটু হইলেও এত বেশী সত্য যে রমাপদর মুখ দিয়া কোনও উত্তর বাহির হইল না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সরমাই মৌন-ভঙ্গ করিল; বলিল, "আচ্ছা, আবার কত দিনে এ বাড়ীতে ফিরে আসা যাবে বলে মনে হয়?"

এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর রমাপদ অতি সহজে দিল; বলিল, "বছরখানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই। কিন্তু এ বাড়ীতেই যে ফিরে আসতে হবে তার কি মানে আছে সরো? এ বাড়ী ভাড়ায় রেখে আমার এর চেয়ে ভাল বাড়ীতেও ত যেতে পারি।"

সরমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, তা হবে না। এই বাড়ীতেই ফিরে আসতে হবে; প্রথম যে দিন আসবার মত অবস্থা হবে সেই দিনই!"

সরমার এই অত্যধিক আগ্রহে ও পক্ষপাতিতায় বিস্মিত হইয়া রমাপদ বলিল, "আচ্ছা, তা না হয় এসো। কিন্তু এ বাড়ীতে ফিরে আসবার জন্যে তুমি এতটা ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

রমাপদর প্রশ্নে সরমার মুখ পাংশু হইয়া গেল। একবার মনে করিল কিছু বলিবে না; কিন্তু যে কথা তাহার কণ্ঠদেশে আটকাইয়া শ্বাসরোধ করিতেছিল, তাহা না বলিয়াও থাকিতে পারিল না; চকিত নেত্রে রমাপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিল, "তুমি এরি মধ্যে ভুলে গিয়েছ? এ বাড়ী ছেড়ে যেতে মা যে আমাকে মানা করে গিয়েছেন!"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "এ বাড়ী ছেড়ে যেতে ত' মানা করেন নি;—আমাকে ছেড়ে যেতে মানা করেছেন।"

রমাপদর ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলী দিয়া দুইবার ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া সরমা বলিল, "ও-সব যা' তা' কথা মুখে আনতে নেই! বাড়ী ছেড়ে যেতেও মানা করেছিলেন।" তাহার পর সহসা তাহার দুই চক্ষু কৌতুক-হাস্যের মৃদু-প্রভায় চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল; বলিল, "এক দিন অবশ্য তোমাকে ছেড়ে যাব। কিন্তু সে কবে জান?"

পরিহাস-ছলে সরমা যে-কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া রমাপদ কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "খবরদার! ও-সব যা' তা' কথা মুখে আনবে ত—"

রমাপদ একটা কঠিন দিব্য দিল।

বিমূঢ় ভাবে এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অপ্রসন্ন মুখে সরমা বলিল, "দেখ দেখি কি অন্যায়! কথাটা বলতে পর্য্যন্ত দিলে না, ফট্ করে একটা দিব্যি দিয়ে দিলে!" তাহার পর ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল, "আমি ত' আর সত্যি-সত্যিই সে কথা বলতে যাচ্ছিলাম না—আমি বলতে যাচ্ছিলাম অন্য কথা। আমি বরং বলতে যাচ্ছিলাম যে প্রাণ থাকৃতে তোমাকে ছেড়ে যাব না!"

সরমার নিরুপায় বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া রমাপদ মনে-মনে অতিশয় পুলকিত হইয়া প্রকাশ্যে গম্ভীরমুখে বলিল, "এখন আর ও-সব কৈফিয়ৎ দিলে কি হবে? এক দিন ছেড়ে যাবে সে কথা স্পষ্ট করে বলেছ ত!"

"কখ্খনো আমি সে কথা বলিনি!" বলিয়া সরমা কপট ক্রোধের সহিত প্রস্থান করিল।

রাত্রে গৃহকর্ম্মান্তে সরমা তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—রমাপদ শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। নিকটে আসিয়া তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমিয়েছ না কি?"

রমাপদ পাশ ফিরিয়া বলিল, "না, কেন?"

"একটু ছাদে যাবে? ভারী চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে!"

"চল যাই। আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম।"

রমাপদ সত্যই সে কথা ভাবিতেছিল; কিন্তু ছাদে যাওয়ার কথা সে যত না ভাবিতেছিল, ছাদে না যাওয়ার কথা বোধ হয় ততোধিক ভাবিতেছিল। জ্যোৎস্না রাতে অবকাশকালে স্বামীর সহিত ছাদে বসিয়া জ্যোৎস্না উপভোগ করিয়া সরমা অপরিমিত আনন্দ এবং তৃপ্তি পাইত। পশ্চিম দিকের আলিসার নিকট হইতে অদূর-প্রবাহিত জাহ্নবীর কিয়দংশ দেখা যায়,—সরমা যখনই ছাদে যাইত সেই স্থানটি অধিকার করিয়া বসিত। আজ তাহার সেই অতিপ্রিয় স্থানটিতে উপস্থিত হইয়া আনন্দের পরিবর্ত্তে সে যাহা পাইবে তাহার কথা মনে করিয়া রমাপদ নিজের আগ্রহ সত্ত্বেও, ছাদে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছিল। কিন্তু সরমা নিজে যখন সে বিষয়ে অনুরোধ করিল তখন অগত্যা বলিতেই হইল, 'চল যাই।'

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া প্রকৃতি শুভ্র জ্যোৎস্নার তরল ধারায় স্নান করিতেছিল। রমাপদ এবং সরমা ছাদে আসিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাশাপাশি উপবেশন করিল। অদূরে নববর্ষার অর্দ্ধস্ফীত নদী স্বপ্নরাজ্যে অপরিস্ফুট দৃশ্যের মত বহিয়া চলিয়াছিল; সরমা গ্রীবা বাঁকাইয়া একবার মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। বহুক্ষণ উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া রহিল, কিন্তু কেহও কোনো কথা কহিল না। উভয়েই মনে করিতেছিল একটা কিছু কথা আরম্ভ করিলে ভাল হয়, কিন্তু সাহস হইতেছিল না; পাছে বাক্য-সংযোগে পরস্পরের অন্তরের নিগূঢ় বেদনা পরস্পরের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়ে! উভয়েই নিজ নিজ মানসিক অবস্থা উভয়ের নিকট হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। দুঃখ স্বীকারের মধ্যেও বোধ হয় একটা স্বতন্ত্র দুঃখ এবং গ্লানি আছে।

পাশের বাড়ীর বাগানে একঝাড় হেনা ফুটিয়াছিল। তাহার গুরু গন্ধ অলস-মন্থর বায়ুতে ঘনীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ক্রমশঃ মধ্য-গগন হইতে চন্দ্র পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িল। রজনীর গভীরতায় চতুর্দ্দিক থম্ থম্ করিতে লাগিল।

সরমার দিকে চাহিয়া রমাপদ মৃদুস্বরে বলিল, "এবার যাবে?"

শিথিল নিস্তেজ মনকে কতকটা সম্বৃত করিয়া লইয়া কম্পিতকণ্ঠে সরমা বলিল, "চল।"

নীচে নামিয়া আসিয়াও উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো কথাবার্ত্তা হইল না। শয্যা গ্রহণ করিয়া উভয়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে জাগিয়া রহিল। প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিতেছিল যে অপরে জাগিয়া আছে, কিন্তু তথাপি কেহও কাহারো সহিত কথা বলিতে পারিল না। মিশন স্কুলের ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ঘন ঘন ঘণ্টা এবং অর্দ্ধঘণ্টা বাজিতে লাগিল। অবশেষে উভয়ে যখন ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল তখন প্রভাত হইতে মাত্র ঘণ্টা দু-এক বিলম্ব ছিল।

[১২]

ঘুম ভাঙ্গিয়া রমাপদ চাহিয়া দেখিল দীপ্ত সূর্য্যকরে সমস্ত ঘর ভরিয়া গিয়াছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বিমূঢ়ভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; তাহার পর পর-মুহূর্ত্তে যখন মনে পড়িল যে বেলা নয়টার মধ্যে নূতন গৃহে যাত্রা করিতে হইবে, তখন সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সরমা তখন কোমরে আঁচল জড়াইয়া সবেগে বাকি কার্য্য সমাধা করিতেছিল। তাহার শান্ত-অচপল মুখমণ্ডলে পূর্ব্বরাত্রের বিহ্বলতার আর কোনো চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না। রমাপদকে দেখিয়া সরমার মুখে-চক্ষে স্বাভাবিক মিষ্ট-হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

"ঘুম ভাঙ্গ্‌ল?"

"তা' ত ভাঙ্গল। কিন্তু তুমি ত' দেখছি সমস্ত রাতই জেগে ছিলে!"

মৃদুহাস্যের সহিত সরমা বলিল, "আর তুমি?"

"আমি ত, দেখতেই পাচ্ছ, এত বেলা পর্য্যন্ত দিব্যি ঘুমিয়ে উঠলাম!"

সরমার শান্তমুখে সুমিষ্ট হাল্কা হাস্য ফুটিয়া উঠিল। "তবে কি করে দেখ্‌লে যে আমি সমস্ত রাত জেগেছিলাম?"

পত্নীর বাক্‌চাতুর্য্যে পরাজিত হইয়া রমাপদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা বটে!" তাহার পর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সবই ত' দেখছি গুছিয়ে ফেলেছ। বাকি আর কিছু আছে না কি?"

সরমা সহাস্যমুখে বলিল, "বাকি শুধু তুমি আছ।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রমাপদ বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, আমাকেও একটা বাক্স পেঁটরার মধ্যে ভরে নিতে চাও না কি?"

স্বামীর আশঙ্কার অভিনবত্বে পুলকিত হইয়া সরমা খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "সে ভয় যদি থাকে তা হলে শীঘ্র নিজে তয়ের হয়ে নাও।"

"তুমি যে রকম বাঁধাবাঁধি আরম্ভ করেছ, সে ভয় যথেষ্ট আছে।" বলিয়া রমাপদ হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

স্কুলের ঘড়ীতে আটটা বাজিয়া গেল।

সরমা ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, "বিশ্বনাথ! অ, বিশ্বনাথ!"

বিশুয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "কি মায়জী?"

"এই কলসীটা ভাল করে ধুয়ে গঙ্গা থেকে এক কলসী জল এনে মাঝের ঘরে মধ্যি-খানে রাখ; আর একটা ভাল দেখে আমের ডাল তাতে দিয়ে দাও। বুঝলে?"

"হাঁ মায়জী, বুঝলে।" বলিয়া সরমা-প্রদত্ত মৃন্ময় ঘট লইয়া বিশুয়া প্রস্থান করিল।

যথা সময়ে স্বামীর সহিত ঘট প্রণাম করিয়া সরমা গাড়ীতে গিয়া উঠিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা রুদ্ধশ্বাস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল—বহু যত্নেও সে তাহা রোধ করিতে পারিল না।

নূতন গৃহে আসিয়া সরমা চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভিতরে দুইটি ছোট পাকা ঘর এবং বাহিরে একটি খাপরার বৈঠকখানা; তাহা ছাড়া রান্না ভাঁড়ার স্বতন্ত্র। ইহাই বাড়ী।

রমাপদ বলিল, "কেমন? পছন্দ হল?"

সরমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, হয়েছে। তুমি বলেছিলে কষ্ট হবে; কিছু কষ্ট হবে না!"

রমাপদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "কষ্টর মানে যদি সুখ হয় তা হলে অবশ্য কষ্ট হবে না।"

সরমা রমাপদর প্রতি সহাস্য দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "না, সত্যিই কোনো কষ্ট হবে না। এর চেয়ে বেশী আমাদের দরকার কি?"

সরমার কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "কিন্তু এর চেয়ে আর কমও যেন আমাদের দরকার না হয়!"

সরমা বলিল, "ভগবান করুন তা যেন না হয়। কিন্তু আমার মনে হয় ইচ্ছা করলে আমরা আরো-কিছু কমাতে পারি!"

"কি করে? তোমার খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে?"

সরমা হাসিয়া বলিল, "না, না, তা' কেন? চাকর ছাড়িয়ে দিয়ে। ললিতবাবুরা ত' একজন চাকর খুঁজছেন—আসছে মাস থেকে বিশুয়াকে ললিতবাবুদের বাড়ীতে রাখিয়ে দাও না।"

রমাপদ এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, "তা' মন্দ নয়। একেবারে বেকার বসে দুবেলা অন্ন ধ্বংস করছি—তবু একটু খেটে খাওয়া যাবে!"

বিস্মিত স্বরে সরমা বলিল, "তুমি খাট্‌বে? কেন, কোন্ দুঃখে?"

"তবে কে খাট্‌বে? তুমি?"

"নিশ্চয়ই!"

"বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা,—এ সব করবে তুমি?"

"হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ, সব করব। এ সব কাজ যত কঠিন মনে কর তত কঠিন নয়!"

রমাপদ বলিল, "আচ্ছা, কঠিন না হয় না-ই হ'ল; কিন্তু তিন চার মাস পরে যখন বাধ্য হয়ে তোমার কাজ করা বন্ধ করতে হবে, তখন কি হবে?"

সরমার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; সে নতনেত্রে মৃদু-স্বরে বলিল, "তখন ত' বিশুয়ার বউ আসবে ঠিক হয়ে আছে।"

"কিন্তু বিশুয়ার বউ ত' তোমাকে দেখবে,—আর—আর—" রমাপদর মুখ কৌতুক-হাস্যে ভাস্বর হইয়া উঠিল। সরমার কাণের অত্যন্ত কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপা গলায় বলিল, "—আর তোমার খোকাকে নেবে!"

নিমেষের জন্য স্বামীর প্রতি আরক্ত মুখ তুলিয়া সরমা মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি ভারী দুষ্টু!"

রমাপদ সরমার প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "তোমার খোকা বললে যদি তোমার এতই আপত্তি হয় তা হলে না হয় এবার থেকে আমার খোকা বলব! তা হলে ত' আর আমাকে দুষ্টু বলবে না?"

এবার সরমা কোনো কথা বলিল না, একবার মাত্র রমাপদর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া নতনেত্রে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। সন্তান-সম্ভবের এই অনাবৃত আলোচনায় সলজ্জ-হর্ষের সুমিষ্ট ধারায় তাহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া গেল! স্বামী-কণ্ঠনিঃসৃত খোকা শব্দের অননুভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সহিত ভ্রূণ স্পন্দন মিলিত হইয়া আসন্ন মাতৃত্বের কল্পনা-প্রভায় তাহার আরক্ত-নত মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

অভিনব দৃশ্য ঃ—

রাত্রিকালে ঘাসের এবং অন্যান্য নানা লতাপাতা ইত্যাদির উপর শিশির পড়ে—এ কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই সকল শিশির-বিন্দু লতাপাতা ইত্যাদির উপর পড়িয়া কি মনোহর দৃশ্যের সৃষ্টি করে, বেন্‌ট্‌লি নামক এক ভদ্রলোক ক্যামেরার সাহায্যে বিবিধ দ্রব্যাদির এবং লতাপাতার উপর শিশির-বিন্দুর সৃষ্ট কতকগুলি চমৎকার দ্রব্যের ছবি তুলিয়াছেন। ছবিগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন দৃশ্যগুলি কি চমৎকার!

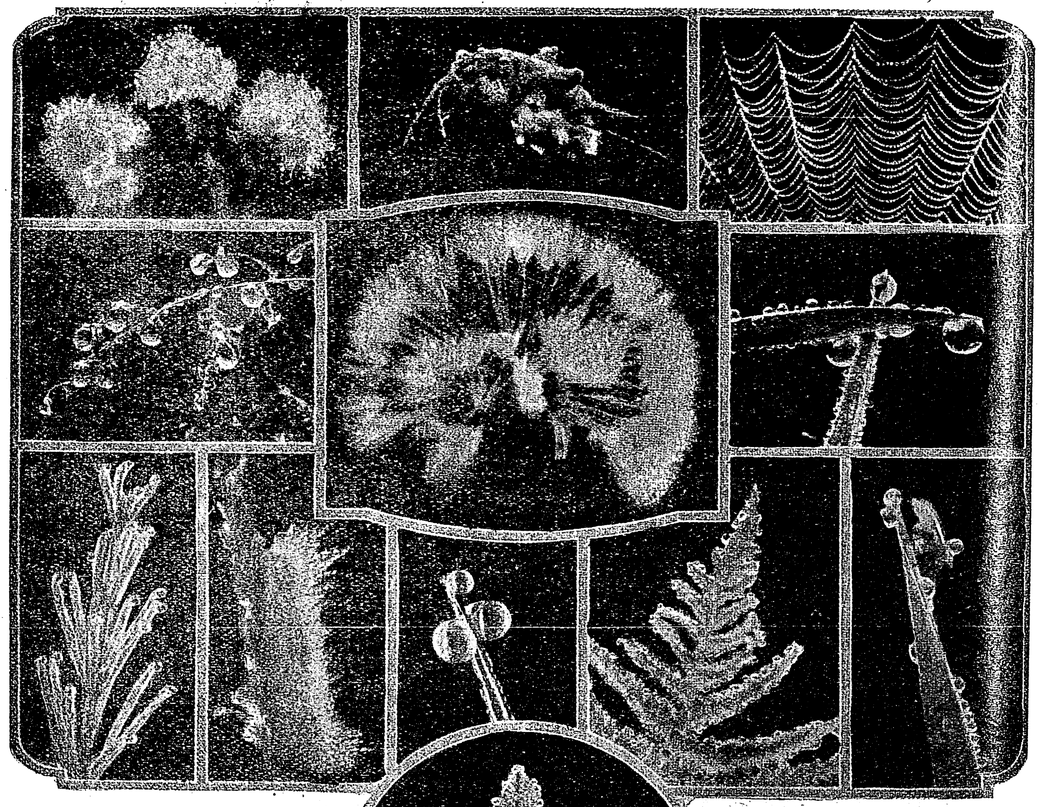

তাহা আমরা অনেকেই জানি না। ঘাসের উপর শিশির-বিন্দু ঝলমল করে—দেখিতে ঠিক যেন মুক্তা! কিন্তু অনুবীক্ষণের ভিতর দিয়া এই সকল শিশির-বিন্দু যে কি চমৎকার দেখিতে হয়, তাহা যে না দেখিয়াছে, সে কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

বিজ্ঞান বলে যে লতাপাতার শীতল ডগার স্পর্শে বায়ুস্থ বাষ্প জল-বিন্দু হইয়া যায়—অনেক ক্ষেত্রে গাছ পাতার ভিতরের জলই পাতার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পাতার ডগায় বিন্দু-আকারে অবস্থান করে। দারুণ গ্রীষ্মে এই প্রকারে ঘর্ম্ম বাহির হইয়া

অভিনব দৃশ্য

আসিয়া গাছপালাকে বাঁচায়। রাত্রিকালে যখন আর বেশী জলের দরকার হয় না, তখন গাছপালার ভিতরের জল বাহির হইয়া আসে এবং রোদ উঠিলে বাষ্পাকারে আকাশে মিশিয়া যায়।

অনেক দেশের লোকের বিশ্বাস যে শিশির-বিন্দুর দ্বারা সকাল বেলায় মুখ ধৌত করিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। অনেক দেশে শিশির প্রচুর পরিমাণে পড়ে এবং কেবল মুখ ধোওয়া কেন—তাহা দিয়া ইচ্ছা করিলে স্নানও করা যায়।

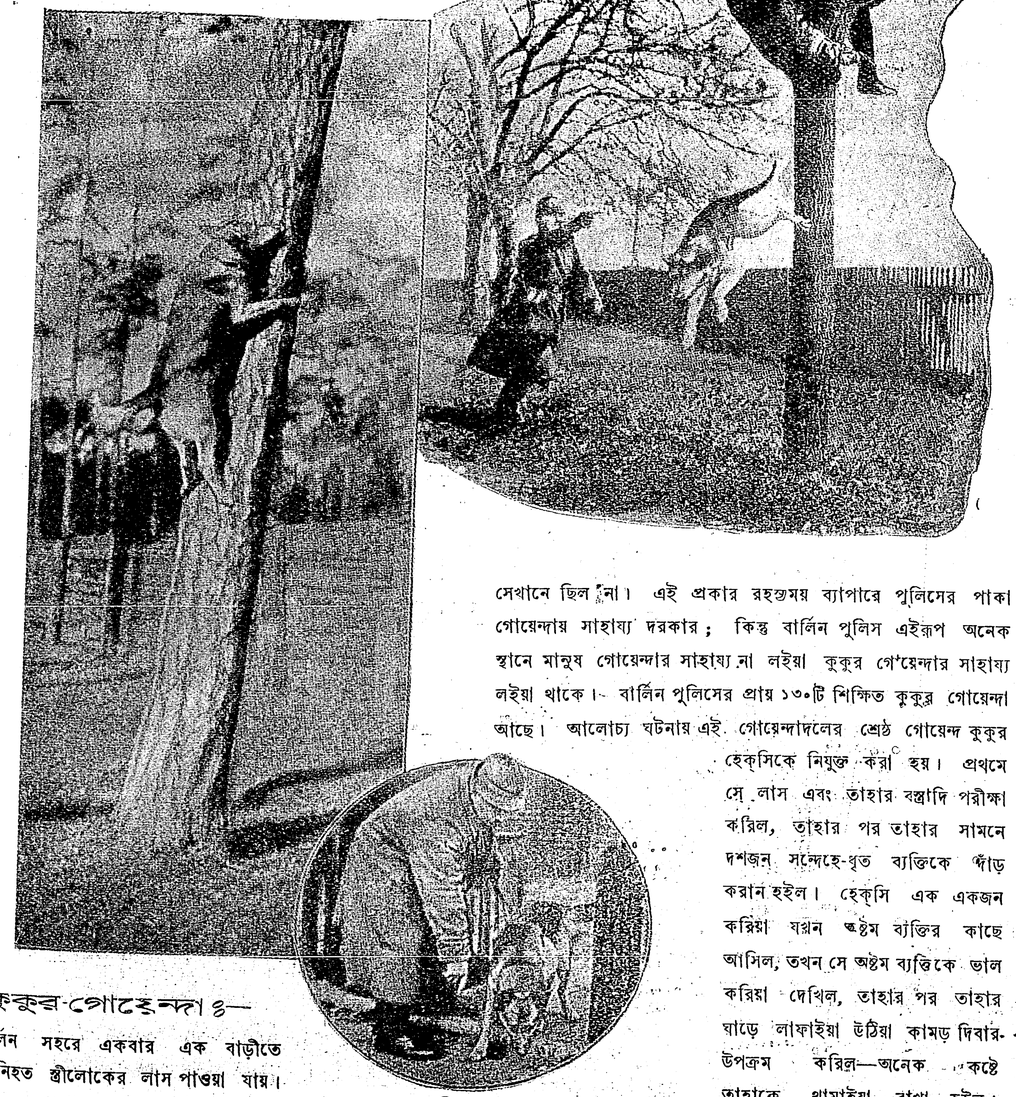

কুকুর-গোয়েন্দা ঃ—

বার্লিন সহরে একবার এক বাড়ীতে একটি নিহত স্ত্রীলোকের লাস পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকটি নিহত হইবার পূর্ব্বে ঘরের মধ্যে যে ধস্তা-ধস্তি হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট চিহ্ন ছিল—কিন্তু খুনিকে ধরা যায়, এমন কোন চিহ্ন সেখানে ছিল না। এই প্রকার রহস্যময় ব্যাপারে পুলিসের পাকা গোয়েন্দার সাহায্য দরকার; কিন্তু বার্লিন পুলিস এইরূপ অনেক স্থানে মানুষ গোয়েন্দার সাহায্য না লইয়া কুকুর গোয়েন্দার সাহায্য লইয়া থাকে। বার্লিন পুলিসের প্রায় ১৩০টি শিক্ষিত কুকুর গোয়েন্দা আছে। আলোচ্য ঘটনায় এই গোয়েন্দাদলের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দ কুকুর হেক্‌সিকে নিযুক্ত করা হয়। প্রথমে সে লাস এবং তাহার বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিল, তাহার পর তাহার সামনে দশজন সন্দেহে-ধৃত ব্যক্তিকে দাঁড় করান হইল। হেক্‌সি এক একজন করিয়া যখন অষ্টম ব্যক্তির কাছে আসিল, তখন সে অষ্টম ব্যক্তিকে ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া উঠিয়া কামড় দিবার উপক্রম করিল—অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইয়া রাখা হইল।

কুকুর-গোয়েন্দা

সেই অষ্টম ব্যক্তি তাহার অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

এই গোয়েন্দা কুকুরেরা এই প্রকারে অনেক রহস্য খোলসা করিয়া দেয়। একবার আর একটি কুকুর বহু রাস্তা অতিক্রম করিয়া, কতকগুলি বাড়ীর ছাত টপকাইয়া অবশেষে অপরাধীকে ধরাইয়া দেয়।

শিশুকাল হইতেই তাহাদিগকে এই সকল কার্য্য শিক্ষাদান আরম্ভ করা হয়। শিক্ষা দিবার সময় চাবুক ব্যবহার বা ধমকানো একেবারেই হয় না। অতি মিষ্ট ব্যবহার এবং মিষ্ট কথার দ্বারা কুকুরদের চোর এবং অন্যান্য অপরাধী ধরিতে পারগ করিয়া তোলা হয়। গোয়েন্দা কুকুরদিগকে গাছে চড়া, সাঁতার দেওয়া, দেওয়াল লঙ্ঘন করা ইত্যাদি নানা প্রকার বিদ্যা শিখান হয়। এই কুকুরদের প্রত্যহ চারঘণ্টা করিয়া, পল্টনদের মত, প্যারেড অর্থাৎ কুচ-কাওয়াজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বয়ং-ক্রিয় সিঁড়ি ঃ—

চলন্ত গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া প্রায়ই অনেক দুর্ঘটনা হয়। গাড়ীর দুয়ার হইতে রাস্তা অনেকখানি নীচে বলিয়াই এই দুর্ঘটনা বেশী হয়। আমেরিকার শিকাগো সহরে এক প্রকার নতুন ধরণের সিঁড়ি অনেক গাড়ীতে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সিঁড়ি গাড়ীর নীচে লুকান থাকে—গাড়ীর দুয়ারে পা-পোষের মত একটি ইস্পাতের পাত পাতা



স্বয়ং-ক্রিয় সিঁড়ি

আছে। দুয়ার দিয়া বাহির হইবার সময় এই পাতে পায়ের চাপ পড়িবামাত্র সিঁড়িখানি বাহির হইয়া আসে—এই সিঁড়িতে পা দিয়া নির্ভয়ে রাস্তায় নামা যায়। ইস্পাতের পাতের উপর হইতে পায়ের চাপ সরিয়া যাইবামাত্র সিঁড়িটি আবার দুয়ারের তলায় চলিয়া যায়।

অদ্ভুত উপস্থিত-বুদ্ধি ঃ—

ডিক্ রিয়ান্ নামক একজন বিখ্যাত মোটর দৌড়ানেওয়ালা একবার মোটর রেস দিবার সময়, হঠাৎ তার মোটরে আগুন ধরিয়া যায়। রাস্তার পাশেই একটি হ্রদ ছিল, ডিক্ রাস্তার রেলিং ভাঙ্গিয়া মোটর-

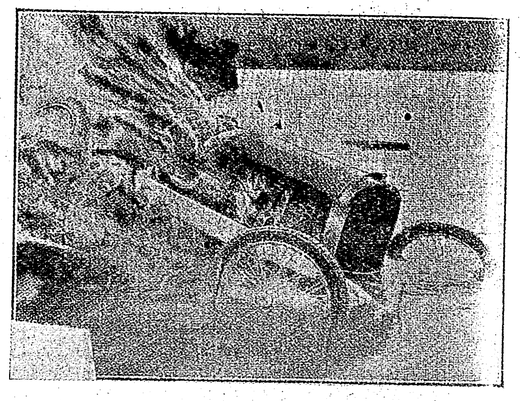

অদ্ভুত উপস্থিত-বুদ্ধি

খানাকে সেই হ্রদের মধ্যে চালাইয়া দিল—এবং মোটর জলে পড়িবামাত্র সে সামান্য একটু আঁচড় খাইয়া মোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বুদ্ধি করিয়া এই ভাবে জলে না পড়িতে পারিলে ডিক্ আগুনের হাত হইতে রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ।

ক্ষুদ্রতম হরিণ ঃ—

সিংহলে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রকায় হরিণ পাওয়া গিয়াছে। এই হরিণগুলি দেখিতে ছুঁচার মতন তবে ছুঁচা অপেক্ষা কিছু বড়। ইহারা



ক্ষুদ্রতম হরিণ

বড় হরিণের মত দেখিতে সুন্দর নয়। ইহাদের পা দেখিলে মনে হয় যেন সরু সরু কাঠি কোনো রকমে দেহের সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিংহলে এই অদ্ভুত হরিণের নাম "গোটোন" অর্থাৎ ছুঁচা হরিণ। ছবিতে যে দুটি হরিণ দেখা যাইতেছে—কয়েক মাস পূর্ব্বে সিংহল হইতে উহাদের বোষ্টন সহরে আনয়ন করা হইয়াছে। উহাদের তিনটি পথে মারা যায়।

কাচনির্ম্মিত নৃত্যশালা ঃ—

ফ্রান্স দেশের এক সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহরে একটি কাচ-নির্ম্মিত নৃত্যশালা আছে। ইহার আশেপাশে বা উপরে কোথাও বাতি নাই—

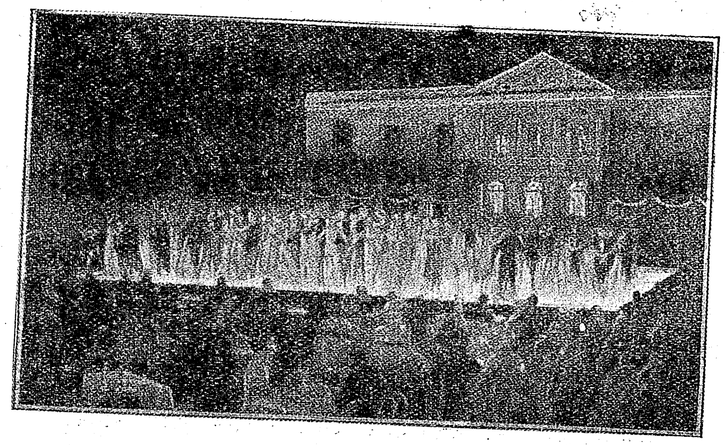

কাচনির্ম্মিত নৃত্যশালা

নৃত্যকালে যতটুকু আলোর দরকার, তাহা কাচের মেঝের নীচে হইতে আসে। কাচের মেঝের নীচে বৈদ্যুতিক আলো বসান আছে। যখন নৃত্য চলিতে থাকে, তখন দূর হইতে তাহার দৃশ্য বড় সুন্দর হয়। ছবি দেখিলে নৃত্যের সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বিদ্যালয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা ঃ—

বিলাতের এক শিশু-বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য বৈকালে বিশ্রাম করিবার চমৎকার এক ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়ের পাঠ এবং ক্রীড়া ইত্যাদির পর শিশুরা খুব ক্লান্ত হয়—তখন তাহাদের বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন। স্কুল-ঘরের বেঞ্চিগুলিকে এই সময় উল্টাইয়া দেওয়া হয়—এবং বেঞ্চির চার পায়ায় ৪টি হুকের সাহায্যে জাহাজের নাবিকদের মতন দোলা বিছানা (hammock) টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার বিশ্রামলাভের ফলে দেখা গিয়াছে যে শিশু ছাত্রদের স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়। লেখা এবং পড়া—দুইই তাহারা মনোযোগ দিয়া করিতে পারে।



বিদ্যালয়ের বিশ্রাম-ব্যবস্থা

র‍্যাডিও-সাহায্যে ছবি তোলা ঃ—

বর্ত্তমান যুগে "র‍্যাডিওর" সাহায্যে জগতে নানা প্রকার অসাধ্য সাধন হইতেছে। বেতারের সাহায্যে পাঁচ-হাজার মাইল দূরে সংবাদের আদান-প্রদান প্রায় সহজসাধ্য হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুকালের মধ্যেই ইহা টেলিগ্রাফের মত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। বর্ত্তমান সময়ে র‍্যাডিওর সাহায্যে দূর হইতে ফটো তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা সামান্য পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছে। G. L. Baird নামক একজন স্কচ, বৈজ্ঞানিক এই পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি একটা ঘর হইতে সামান্য দূরে অন্য একটি ঘরে একটি মুখের "motions" অর্থাৎ "নড়ন চড়ন"এর ছবি প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। র‍্যাডিওর সাহায্যেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। র‍্যাডিও-প্রেরিত ছবিটির সহিত আদত বা মূল মুখচ্ছবির একেবারেই কোন প্রকার মিল নাই। র‍্যাডিও-ছবিখানি একটি কঙ্কালের মুখ বলিয়া মনে হয়। চোখ দুইটির এবং মুখের স্থানে কাল কাল চিহ্ন আছে—তাহাতে ছবিটিকে কোন কিছুর

র‍্যাডিও-সাহায্যে ছবি তোলা

মুখের ছবি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইতি-

পূর্ব্বে আর কেহ চলন্ত কোন দ্রব্যের এমন বদ্ ছবিও তুলিতে সমর্থ হন নাই।

র‍্যাডিও-প্রেরিত এই ছবিখানি দেখিলে হাসি পায়। কিন্তু যদি চিন্তা করিয়া দেখা যায় যে, আর কোন বৈজ্ঞানিক এই কার্য্যে এতখানি সাফল্য লাভ করেন নাই—এবং এই প্রণালীতে কার্য্য হইতে হইতে অবশেষে র‍্যাডিও-প্রেরিত ছবি মূল ছবির একেবারে হুবহু অনুকৃতি হইবে—তখন আশ্চর্য্য না হইয়া পারা যায় না। এই বৈজ্ঞানিক television অর্থাৎ বহুদূর হইতে কেমন করিয়া একজন লোক আর একজনের মুখ দেখিতে পাইবে, তাহারও চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য এই কার্য্যে এখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায় নাই। র‍্যাডিও-প্রেরিত ছবিখানি এতৎসহ মুদ্রিত হইল—ইহা দেখিলে কৃতকার্য্যতার সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সাময়িকী

'ভারতবর্ষ' আজ চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিল। বিগত ত্রয়োদশ বৎসর যাঁহার কৃপায় 'ভারতবর্ষ' বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম করিতেছি। তাহার পর, 'ভারতবর্ষে'র যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই অমর সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের নাম পরম শ্রদ্ধা-ভরে স্মরণ করিতেছি। এই ত্রয়োদশ বৎসর যে সমস্ত লেখক-লেখিকার অনুগ্রহ ও সহানুভূতিতে 'ভারতবর্ষ' তাহার উদ্দেশ্য সাধনে অবহিত হইতে পারিতেছে, যে সকল পাঠক-পাঠিকা আমাদিগকে উৎসাহ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। 'ভারতবর্ষে'র সেবায় আমরা যত্ন চেষ্টা-সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে কোন দিন ত্রুটী করি নাই; বর্ত্তমান বৎসরেও আমরা যাহাতে আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতে পারি, তাহার জন্য ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

নববর্ষের এই প্রথম সংখ্যায় যাঁহার প্রতিকৃতি 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট সুশোভিত করিল, তাঁহার নাম পৃথিবী-বিখ্যাত, তাঁহার অবদান ভারতবর্ষের কেন, সমস্ত পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ্। বাঙ্গালা-দেশ ধন্য যে, স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তেজস্বী, মনস্বী পুরুষকে এই দেশেরই একজন, এই বঙ্গ-জননীর একজন সুসন্তান বলিয়া জগতের সম্মুখে গর্ব্ব করিতে পারে। আজ দেশের দুর্দ্দিনে যদি স্বামী বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইত। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অগণিত শিষ্যগণ যে ত্যাগের, যে সেবার আদর্শ দেখাইতেছেন, তাহাতে সেই পুরুষ-প্রধানের নাম চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আজ আমরা সেই জ্বলন্ত-প্রতিভার আধার, কর্ম্মযোগী, নর-নারায়ণের শ্রেষ্ঠ সেবকের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া সেই মহাত্মার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেবার ইউরোপ-ভ্রমণ সময়ে অকস্মাৎ অসুস্থ হওয়ায় পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি অসমাপ্ত রাখিয়াই ইটালী পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইটালীর পণ্ডিতবর্গ ও কবি অকৃত্রিম বন্ধুগণের যে ইহাতে আশা-ভঙ্গ হইয়াছিল, কবিবর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। তাই, কয়েকদিন হইল তিনি পুনরায় ইটালীতে গমন করিয়াছেন। বিশ্বদূত সংবাদ দিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ইটালীতে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত হইতেছেন; নানা-স্থানের অধিবাসিগণ সাগ্রহে তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বিশ্ব-ভারতীর দরবারে আমাদের রবীন্দ্রনাথের এই সমাদর দেখিয়া আমরা পুলকিত হইতেছি; আর ভাবিতেছি, কি আগ্রহ এই বৃদ্ধের! কি একাগ্রতা এই মহাপুরুষকে অনুপ্রাণিত করিতেছে! যে বাঙ্গালী পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেই স্থবির হইয়া স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই বাঙ্গালীই একজন বিশ্বের দরবারে তাঁহার বাণী শুনাইবার জন্য অধীর হইয়া, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে নির্ভয়ে গমন গমন করিতেছেন। বাঙ্গালী কি এ আদর্শ অনুসরণ করিবে না?

হিন্দু মুসলমানের অভিনয় এখন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মফস্বলে চলিতেছে। অভিনয়টা কিন্তু এক তরফা হইতেছে; মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুর মন্দিরাদি ও মূর্ত্তির অবমাননা করিতেছে, আর হিন্দুরা সেই সংবাদ দেশ-বিদেশের খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিয়া বসিয়া আছে। সরকার বাহাদুর বলিতেছেন, খবরের কাগজওয়ালারা তিলকে তাল করিয়া মনান্তর আরও বাড়াইতেছে। যা সামান্য কিছু হইতেছে, তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি না করিয়া, একটু সহিয়া গেলেই দুদিনে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। এ উপদেশ অমূল্য; ইহা সুশীল ও সুবোধ বালকের মত প্রতিপালন করাই নাবালক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

কলিকাতা সহরে দাঙ্গা মিটিয়াছে বটে, কিন্তু হাঙ্গামা মিটে নাই। সে হাঙ্গামাও বড় সহজ নহে। ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল, এখন রহিলেন শুধু ঢাক। এই ঢাকের বাদ্য লইয়াই গোল বাধিয়াছে। মুসলমান বলিতেছেন, মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রা হিন্দু করিতে পারিবে না, তাহারা কখনও এমন কুকর্ম্ম করেও নাই; এখন কুচক্রীদিগের পরামর্শে মস্‌জিদের পবিত্রতা গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিবার জন্য হিন্দুরা মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রা চালাইবার জিদ্ ধরিয়াছে; মুসলমানের জান কবুল, তাহারা কখনও ঢাক বাজাইতে দিবে না। এই ভয়ে জড়সড় হইয়া কলিকাতার পুলিশ সেদিন শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরীর বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা পূর্ব্বে ছাড়-প্রাপ্ত পথে যাইতে দিতে অস্বীকার করেন; হিন্দুরাও, সেই পথেই শোভাযাত্রা না যাইতে দিলে মাকে বিসর্জ্জনই দিবেন না বলিয়া ঘরের দেবীকে আবার বাহির হইতে ঘরে তুলিয়াছেন। সরকার বলিতেছেন, বেশ ত, দেবী আর কয়েকদিন সেবাই পান না, মুসলমানের ঈদ চুকিয়া যাক, তাহার পর দেবীর বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করা যাইবে। একটু ক্ষমা-ঘেন্না (give and take) না করলে কি চলে? তথাস্তু!

এ ত গেল রাজ রাজেশ্বরীর কথা। দারজিলিং হইতে শ্রীল শ্রীযুক্ত লাট বাহাদুর এক রোবকারী জারী করিয়া কলিকাতার রাজপথে হিন্দুর শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। লাটসাহেব বলিয়াছেন, চিৎপুর রোডের সু-প্রসিদ্ধ নাখোদা মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া কোন সময়েই কোন শোভাযাত্রা বাজনা বাজাইয়া যাইতে পারিবে না; আর আর যে-সব মস্‌জিদ আছে, তাহাতে কোন্ কোন্ সময়ে উপাসনা হয়, তাহা স্থির করিয়া জানিয়া সেই-সেই সময়ে বাজনা বন্ধ করিয়া শোভাযাত্রা চালাইতে হইবে। এই আদেশে হিন্দুরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন; তাঁহারা বলেন, আগাগোড়া বাজনা বাজাইয়া তাঁহারা আবহমানকাল রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন, কোথাও বাজনা বন্ধ করেন নাই; সুতরাং এ আদেশে তাঁহাদের অধিকার লোপ হইল। এ কথার কোন অর্থই নাই। যাঁরা এতদিন দয়া করিয়া অধিকার বহাল রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই দয়া করিয়া সে অধিকার বন্ধ করিলেন। ভিক্ষুকের আবার অধিকারের দাবী!!

আমরা বলি, এই যে বাজনা বাজাইয়া শোভাযাত্রা, বলিতে গেলে, এক রকম বন্ধই হইল। ইহাতে ভালই হইল। কলিকাতার অলিতে-গলিতে মস্‌জিদ্, আর পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ আছেই। সুতরাং বাজনা বন্ধই হইল। বড়লোক হিন্দুর কথা বলিতেছি না, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের গৃহিণীরা আর বড়-মানুষের দেখাদেখি ছেলের বিয়েতে গোরার বাজনা, রহমতুল্লার ব্যাণ্ড, ব্যাগ-পাইপ, ঢাক-ঢোল, সানাই, রোসনচৌকীর বাহানা ধরিতে পারিবেন না, কারণ বাজনা বাজাইয়া শোভাযাত্রা যে এক রকম বন্ধই হইল। সুতরাং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের একটা বড় খরচ কমিয়া গেল। এজন্য তাঁহারা সদাশয় মুসলমান-নেতৃবৃন্দ তথা গবর্ণমেণ্টের বহুত খোসনামী করিতে বাধ্য। তবে একটা কথা আছে। এই যে সব মুসলমান বাজনাদার বিবাহ, বিসর্জ্জন প্রভৃতির শোভা-যাত্রায় বাজনা বাজাইয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তাঁহাদের উপায় কি হইবে? বোধ হয় করিম রহিমের দল সে ব্যবস্থাও করিবেন; সরকারকে বলিয়া এই সকল বেকার ভদ্রলোককে কলিকাতা পুলিশের পাহারাওয়ালা অনায়াসেই করিয়া দিতে পারিবেন; কারণ, অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে যে কলিকাতায় মুসলমান পাহারা-ওয়ালার সংখ্যা অতি কম থাকাতেই বিগত দুই দফা দাঙ্গা ঘটিতে পারিয়াছিল। অধিক সংখ্যক মুসলমানের নিয়োগে সে আশঙ্কা দূর হইবে। আর এই সকল বেকার বাণ্ড ও ব্যাগ-পাইপওয়ালাদের মধ্যে যাঁহারা কোন রকমে উর্দ্দু বা ইংরাজীতে (বাঙ্গালা অক্ষরে নহে) নাম সহি করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মুন্সেফ্, ডেপুটী, সবডেপুটী, সব্ রেজিষ্ট্রার, কাউন্সিল ও মিউনিসিপালের সদস্য পদে বাহাল করিলেই বেকার সমস্যাও মিটিয়া যাইবে এবং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি হিন্দু-মুসলমানে গোলযোগও শেষ হইয়া যাইবে। কারণ যাহা লইয়া গোলযোগ, তাহারই যে মীমাংসার পথ আমরা দেখাইয়া দিলাম!

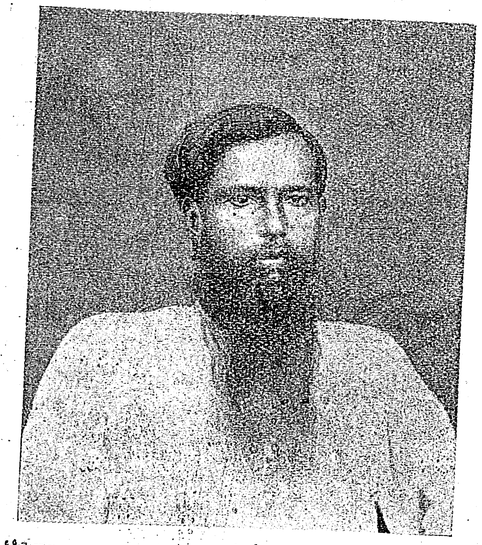

৺কেদারনাথ মজুমদার

ময়মনসিংহের গৌরব, বাঙ্গালা-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, আজীবন সাহিত্য-চর্চ্চা-নিরত, 'সৌরভ' পত্রের সম্পাদক, বহু গ্রন্থ-লেখক কেদারনাথ মজুমদার আর ইহজগতে নাই। এই সেদিনও কলিকাতার রাজপথে কেদারের সঙ্গে দেখা হইল; কেদার বলিলেন "দাদা, বাড়ী চলিলাম।" তখন ত বুঝি নাই, কেদারনাথ নিত্যধামে যাইবার কথা বলিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পরই ময়মনসিংহে যাইয়া কেদারনাথ আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। কেদারনাথের মৃত্যুতে আমরা ভ্রাতৃ-বিয়োগ-শোক পাইলাম—এ শোকের সান্ত্বনা নাই।

বর্ষ-বোধন

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

যে রূপ দেখায়েছিলে বৈশাখে সুন্দর,
রক্তিম মদির-রশ্মি নিদাঘ অরুণে ;
ছায়াঘন আম্রবন-কুঞ্জে মনোহর,
ঝঙ্কারি বিহগ গীতি সুকণ্ঠ তরুণে !
হে বর্ষ !. বিগত সেই অসীম উল্লাস,
সন্ধ্যার আরতি সম দেবতা দেউলে !
গেল যে শিশির অন্তে মুগ্ধ মধুমাস,
রাঙাইয়া যাত্রাপথ অশোকের ফুলে !
আন সে সুখের দিন সৌর-করোজ্জ্বল,
গ্রহ-তারাময়ী নিশি চন্দ্রমাশালিনী ;
হেমাভ মঞ্জরী বুকে মধুভরা ফল,
নলিনীর মৃদুহাসি-চঞ্চলা দামিনী!
অনন্ত সৌন্দর্য্যে তব বিশ্বের বিকাশ,
ভূতলে পাতালে স্বর্গে জ্যোতিঃ পরকাশ!

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত রসরচনা 'কৌতুক-যৌতুক' মূল্য ২৲
শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত নূতন নাটক 'শ্রীকৃষ্ণ' মূল্য—১৷৷০
শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু প্রণীত 'দীপালীর বাজী' মূল্য—১।০
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত নাটক 'লছমী' মূল্য—১৲
রায় নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত বাহাদুর প্রণীত "স্মৃতিপথে" বা বঙ্গের নব জাতীয়তার অর্দ্ধ শতাব্দী মূল্য—২৲
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ অনূদিত মাইকেল মধুসূদনের ক্যাপটীভ্ লেডীর বঙ্গানুবাদ মূল্য—৷৷০
শ্রীযুক্ত নীলকমল সেন প্রণীত 'পুণ্যপ্রেম' মূল্য—১৸০
শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত হাওড়া হুগলীর ইতিহাস ১ম খণ্ড মূল্য—২৲
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা প্রণীত রাজার জাতি, বা কায়স্থ জাতির ইতিহাস মূল্য—২৷৷০

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.



শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে —রবীন্দ্রনাথ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works